G.E.C.
ALL TRANSISTOR
A World of Good Listening
7 Transistor Table Model BC. 723
in beautiful bakelite cabinet. 2 Bands —MW. + SW 19—60 M. Ferrite rod aerial. For operation on 9 V. Eveready Battery Pack 276P or 6 x 1.5 volt round batteries 951/1050.
G.E.C.
RADIO
E GENERAL ELECTRIC CO. OF INDIA PVT. LTD.
Price : Rs. 298
inclusive of Excise Duty
* Local taxes extra

just to keep people and loads on the move, Dunlop makes one million tyres a month...

Today, India moves faster. New factories, farms and agro-industries, schools, colleges and hospitals are springing up all over the country. New roads are being built and more and more people and things are on the move. More bicycles, motorcycles, scooters, cars, trucks and buses are being manufactured.

To meet the growing demands of road transport, Dunlop is making more than a million tyres a month for all types of vehicles. To suit the special operating and road conditions of the country, every kind of tyre is marketed by Dunlop after rigorous tests on machines and on the road.

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কর্মধারার সংগে
পরিচিত হবার জন্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়ুন

প শ্চি ম ব ঙ্গ

সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক

এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা
তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি

প্রতি সংখ্যা :: ৬ পয়সা

ষাণ্মাসিক :: দেড় টাকা **বার্ষিক :: তিন টাকা**

ও য়ে স্ট বে ঙ্গ ল

পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত তথ্যসংবলিত সচিত্র
ইংরেজি সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা :: ১২ পয়সা

ষাণ্মাসিক :: তিন টাকা **বার্ষিক :: ছয় টাকা**

- গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন।
- চাঁদার টাকা **তথ্য-অধিকর্তার** নামে পাঠাতে হবে।
- ভি পি. পি-তে পত্রিকা পাঠান হয় না।
- পত্রিকা বিক্রির জন্য উচ্চ কমিশনে এজেন্ট চাই।

তথ্য-অধিকর্তা,
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটার্স বিল্ডিংস,
কলিকাতা, ১

ডব্লিউ. বি. (আই অ্যান্ড পি. আর.) এ ডি. ভি. ১২৩৩৩৮/৬৭

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

চতুরঙ্গ

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৮

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ ভারতীয় ঐতিহ্য ১

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দুঃসহ ৫

মৃগাঙ্ক রায় ॥ মাঝেরহাটে ৭

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ॥ আমাকে আর এ্যালকোহলিক ৮

সুনীলকুমার নন্দী ॥ উদাসী ৯

শান্তি লাহিড়ী ॥ জেনেছিলে সবই ১০

মতি নন্দী ॥ দুর্ঘটনা ১১

লোকনাথ ভট্টাচার্য ॥ অথ "ভোর" প্রসঙ্গ ২১

অসীম রায় ॥ শব্দের খাঁচায় ২৯

অশ্রুকুমার সিকদার ॥ কবিতার আয়তন ৭৪

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ॥ প্রেমপত্র ৮৫

সুধাংশু ঘোষ ॥ আধুনিক সাহিত্য ৮৯

সমালোচনা—নরেশ গুহ, অচ্যুত গোস্বামী, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, অশোক মিত্র ৯৩

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১০ হইতে প্রকাশিত।

ধীর সমীরে...
দার্জিলিঙে যখন ঝিরঝিরে হাওয়া
বয়, তখন বোঝা যায় উজ্জ্বল
উপভোগ্য দিন প্রত্যাসন্ন। বোঝা
যায়, এবার নীল দিগন্তে
তুষারমৌলি গিরিশ্রেণী দেখা দেবে,
ফুটে উঠবে অগণ্য বনফুল।
ঋতুরঙ্গমঞ্চে এই পটপরিবর্তনের দিনে
আপনিও দার্জিলিঙে আসুন।
'লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজে'
(ফোন ৬৫৬) বা 'শৈলাবাসে'
(ফোন ৬৮৪) ওঠাই সুবিধে।
রিজার্ভেশনের জন্যে ম্যানেজারের কাছে
অথবা নিচের ঠিকানায় লিখুন।
ট্যুরিস্ট ব্যুরো
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অজিত ম্যানশন, নেহরু রোড, দার্জিলিঙ
ফোন : ৫০ গ্রাম : DARTOUR
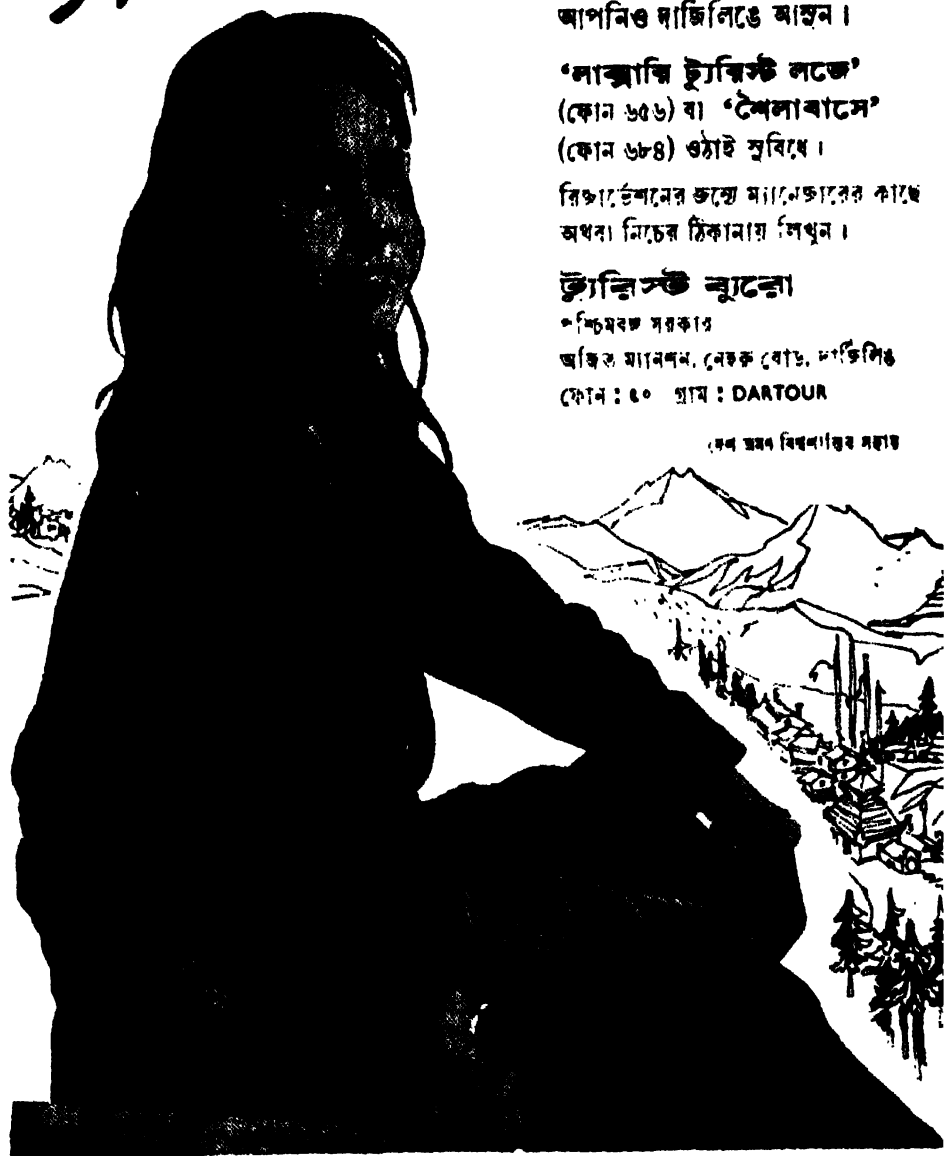
ভারতীয় ঐতিহ্য

হুমায়ুন কবির

সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়া মানুষের সভ্যতা কি ভাবে বিকশিত হয়, মধ্যযুগের ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে তার পরিচয় মেলে। বিদেশাগত অভিযাত্রীদের বিজয় অভিযানের ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পত্তনে পূর্বেকার কৃষিসর্বস্ব অর্থনীতির রূপ তখন বদলাতে শুরু করেছে। সামন্ততন্ত্রকে স্বীকার করেও আলাউদ্দিন খিলজী জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টাকে রাজস্বার্থ অতিক্রম করে জনসাধারণের স্বার্থসম্বন্ধে চেতনার পূর্বাভাস মনে করলে ভুল হবে না। মহম্মদ তুগলক মুদ্রামান নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা এবং সোনা রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে নতুন ধরনের মুদ্রা প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও এ কথা প্রমাণ করে যে বিনিময়ের বাহন হিসাবেই টাকা পয়সার সামাজিক সার্থকতা, তা নইলে কেবলমাত্র নিজস্ব গুণের ফলে মুদ্রার কোন অন্তর্নিহিত মূল্য নেই। মুদ্রামানের তাৎপর্য নির্ধারণে যাঁরা সহায়তা করেছেন, ইতিহাসের বিচারে মহম্মদ তুগলক তাঁদের অন্যতম অগ্রদূত।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারণা ও সংগঠন কি ভাবে পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের ইতিহাসে তার বহু নিদর্শন মেলে। ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় চেতনার বিকাশ এবং তার ফলে জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইয়োরোপে অর্থনীতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক বিকাশের এবং রাজনীতির প্রভাবে অর্থনীতির পরিবর্তনের কথা প্রায় সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিচারে এ ধরনের প্রচেষ্টা বিশেষ হয়নি। আকবর রাজশাসনে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন, তার ফলে যে কিভাবে ধনতন্ত্রের পত্তন সম্ভব হয়েছিল, আজো তার বিশদ আলোচনা হয়নি। তিনি যে সজ্ঞানে ধনতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের কথা ভেবে কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, একথা বললে ভুল হবে কিন্তু তাঁর আমলেতেই এবং তাঁরই নির্দেশের ফলে জমি অথবা শস্যের বদলে মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব এবং অন্যান্য সরকারী লেনাপাওনা আদায়ের ব্যবস্থা হয়। ফলে সমাজে এবং

অনেক কারণ আছে। আরব শক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যধারা মালয়, যবদ্বীপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের তুলনায় পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং ইয়োরোপের সঙ্গে অধিক গুরুত্ব লাভ করল, ফলে গুজরাট ভারতবর্ষের বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। অর্থনৈতিক জীবনের এই বিকাশের ফলেই রাজপুত শক্তির বিস্ময়কর অভ্যুদয়। পঞ্চদশ শতকের শেষে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে সমুদ্রপথে ইয়োরোপের সঙ্গে বাণিজ্যের নতুন পথ খুলে গেল, মালাবার, করমণ্ডল এবং পূর্ব ভারতে ইয়োরোপিয় বণিকেরা নতুন বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করল। ইয়োরোপিয় নৌ-শক্তির কাছে পরাজয়ের ফলে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য বহুলাংশে আরবদের হাতছাড়া হয়ে ইয়োরোপিয় বণিকদের হাতে চলে এল। এ সমস্ত পরিবর্তনের ফলে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গুজরাটের আর পূর্বের গুরুত্ব রইল না এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজপুত শক্তির ভূমিকার অবসান হল। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজ বাণিজ্যসংস্থা স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের বাণিজ্যধারার কেন্দ্র গুজরাট হতে দক্ষিণে সরে এল এবং ধীরে ধীরে আরবসাগরের বদলে ভারত মহাসমুদ্র এবং বঙ্গোপসাগর এ নতুন বাণিজ্যধারার প্রধান বাহক হয়ে দাঁড়াল। রাজপুত জীবনসন্ধ্যা এবং মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনের এই পরিবর্তনের অন্যতম রাজনৈতিক অভিব্যক্তি।

ইয়োরোপের সঙ্গে বাণিজ্য যত বাড়তে লাগল, নতুন নতুন অঞ্চলে অর্থনৈতিক জীবনের চাঞ্চল্যও তত দেখা দিল, রাজনৈতিক সংঘর্ষও সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে নতুন ধারায় বইতে সুরু করল। প্রথমে মাদ্রাজ এবং পরে কলিকাতায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অদৃষ্ট নিয়মিত হতে লাগল। রাজপুত শক্তির অবসান সপ্তদশ শতকের গোড়াতেই স্পষ্ট, মহারাষ্ট্র শক্তিও খুব বেশী দিন টিকল না। শতকের মাঝামাঝিই মহারাষ্ট্র জীবনস্রোতে মন্দা দেখা দিয়েছিল কিন্তু তবু প্রায় আরো পঞ্চাশ বৎসর তারা ইয়োরোপের নবাগত শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছে। ইন্দো-ইয়োরোপিয় বাণিজ্যধারার প্রধান দায়িত্ব যতদিন পর্তুগীজদের হাতে ছিল, ততদিন মহারাষ্ট্র শক্তি একেবারে নেভে নি কিন্তু সে বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ যখন ইংরেজ ও ফরাসীর দখলে এল, তখন মহারাষ্ট্র শক্তিও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে এল, কিন্তু বোম্বাই বন্দরের পত্তনের ফলে ভারতবর্ষের বাণিজ্যধারা পুরোপুরি দক্ষিণে এবং পূর্বে সরে যায় নি। মহারাষ্ট্র শক্তি মলিন হলেও তাই কোন সময়েই ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায় নি। দিল্লী তখনো ভারতবর্ষের রাজশক্তির কেন্দ্র, তাই রাজপুত এবং মহারাষ্ট্র শক্তি দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষে যখন রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্র কলকাতায় চলে এল, মহারাষ্ট্র শক্তিও তখন পূর্বের প্রাধান্য হারিয়ে ফেলল।

দিল্লীর সঙ্গে রাজপুত এবং মারাঠাদের সংঘর্ষকে অনেকে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে হিন্দু এবং মুসলমানের সংঘর্ষ বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু রাজপুত এবং মহারাষ্ট্র শক্তির উত্থান ও পতনের ইতিহাসকে যদি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় তবে এ কথাই যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে অর্থসম্পদ ও রাষ্ট্রিয় প্রভুত্বের জন্যই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। দুপক্ষেই যুধ্যমান শক্তি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ সংগ্রামকে ধর্ম বা সংস্কৃতির সংঘর্ষ বলে প্রচার করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে এ সমস্ত জাগতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ধর্ম বা সংস্কৃতির আমদানী যুক্তিহীন এবং আকস্মিক।

[ক্রমশঃ
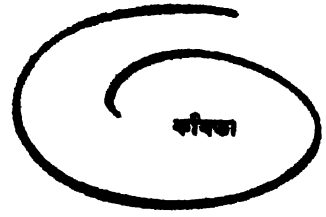
দুঃসহ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সময় দূষিত হলে যাই কোথা নিঃসময়ে চ'লে
ব'লে দাও হে ঈশ্বর! সমাজ দূষিত হ'লে বনে যেতে পারি।
এ বাসা দূষিত হ'লে অন্য বাসা খুঁজে নিতে পারি,
সময় দূষিত হলে যাই কোথা নিঃসময়ে চ'লে?
সত্য ক'রে বলো প্রভু, বিভুদ্রোহী কোনো কেউ শয়তান আছে
এ মন দূষিত হলে অন্য মনে যে দেবে আশ্রয়?
আত্মাও দূষিত হলে যার কাছে পাবো বরাভয়
ফলবে কি বিষফলই এই ভব-সংসারের গাছে?

এই তো সেদিন ঘুমে দেখলাম আমি যেন বনে চ'লে গেছি।
সে নিবিড় বনপ্রান্তে প'ড়ে আছে অর্ধভুক্ত সভ্যতার শব।
শ্বাপদের চলে ভোজ, কিন্তু গৃধ্র সুযোগের অপেক্ষায় আছে;
শ্বাপদটা চ'লে গেলে শুরু হবে শিবার উৎসব।
এ দৃশ্যে বিমূঢ় আমি গৃধ্রকে শুধাই -
এমন জ্ঞানীর ভেক নিলে হে কী ক'রে?
চোখ পাল্টিয়ে গৃধ্র বলে ওঠে---রাষ্ট্রনীতি প'ড়ে।
শুধালাম—কিসে হলো সভ্যতার এ রকম হাল?
রাষ্ট্রনীতি মহিমায়?......অমনি হো হো হেসে ওঠে গৃধিনীর পাল।
এবার শিবারা আসে দল বেঁধে, নিষ্ক্রান্ত শ্বাপদ।
দেখে ভাবি, এ আবার কিসের আপদ!
গৃধ্র পরিচয় ক'রে দিলো—এ'রা সহকর্মী, এ'রা মহাজ্ঞানী।
শৃগাল শুধরে দিলো—বলো মারণাস্ত্রের বিজ্ঞানী।
বলি—আহা, তাই বুঝি সভ্যতার এ রকম হাল?

মারণাস্ত্র মহিমায়?... অমনি হো হো হেসে ওঠে শৃগালীর পাল।
গৃধ্র বলে শব ছিঁড়ে এতক্ষণ খেয়ে গেলো যে শ্বাপদ ওরই নাম ক্ষুধা-
ও-ও এক সহকর্মী: সংগ্রামে সভ্যতা হত, বিপন্ন বসুধা।
নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নকথা শতবার ভাবি
মনে হয় এ তো নয় হিং টিং ছট্‌ ·
এ যে সত্য পূর্বাভাস, আসন্ন সংকট।
নিষ্পিষ্ট সভ্যতাকে বুভুক্ষার মহাগ্রাসে গিলে
উল্কাপিণ্ড এ পৃথিবী ভেসে যাবে অন্তহীন সময়-সলিলে
সৃষ্টি ক'রে লক্ষ কোটি প্রাণ আর প্রাণনাশ ফেনা
ধ্বংস, মৃত্যু, জীর্ণতার চিহ্ন তার কিছু থাকবে না।
নিষ্প্রাণ মননের কিবা তবে দাম আর কিবা তার মানে
পৃথিবীর শেষ সত্য যদি ভাবি প্রাণে নয়, জড়ে ও অপ্রাণে।

মৃন্ময়কণা ছেড়ে চিন্ময়কণা আজ নিরূপের তাই
চক্ষে ভাসে সভ্যতার শব।
আর্তনাদ ছাড়া আর অন্তিমের গান নাই কোনো
চক্ষে ভাসে সভ্যতার শব।
শকুনেরই জিঘাংসায় মহোৎসবে নেচেই নেচেই ওঠে
চক্ষে ভাসে সভ্যতার শব।
হাঁ ক'রে চিবোতে যেই আসে ক্রূর ক্ষুধার্ত দন্তুর শ্বাপদ
চক্ষে ভাসে সভ্যতার শব।
যূথবদ্ধ পাষণ্ডরা যখনি দাঁড়িয়ে থাকে চতুষ্পার্শ্বে মম
চক্ষে ভাসে সভ্যতার শব।

ধ্বংসে প্রতিশ্রুত জানি সৌরবিশ্বশৃঙ্খলার অমোঘ নিয়ম।
এ দশক চলে যাবে, এ শতক চলে যাবে
চলে যাবে হয়তো বা এ মিলেনিয়ম
শুধু এক বৃহৎ প্রশ্ন লিখে রেখে আকাশের নীলে
হে বিধাতঃ, আত্মদহনের কালে তুমি বুঝি পৃথিবীকে জন্ম দিয়েছিলে
কিংবা তার জন্ম হলো সৌরবিশ্বপ্রকৃতির গর্ভস্রাবক্ষণে
আশু মরণের শাপে, জরা, অপঘাত আর ক্ষুধা-মৃত্যু-পণে.

আমাকে আর এ্যালকোহলিক

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অধরে অস্পষ্ট হাসির অন্তরালের কুয়োতলায়
তৃষ্ণা আমার ষোলোকলার
স্নান সেরেছে
সর্বনেশে
পাতালপুরীর রহস্যে ঠিক
আর আমাকে এ্যালকোহলিক
যায় কি বলা?
অধরে অস্পষ্ট হাসির অন্তরালের কুয়োতলায়
তৃষ্ণা আমার ষোলোকলার
স্নান সেরেছে!

এখন কুয়োর চতুর্ধারে
হার যা শস্য সাত খামারে
সহস্র রক্ত উন্মাদনায়
ছড়িয়ে আছে
কোথায় আছে খন্দ খানায়
আমাকে স্বাগত জানায় লুঠ-তরাজে -

পাতালপুরীর রহস্যে ঠিক
আমাকে আর এ্যালকোহলিক
বলাই বাজে!

উদাসী

সুনীলকুমার নন্দী

হাওয়া দিচ্ছে, খাঁ-খাঁ মাঠ......
ধুলো উড়ছে......
নদী
রুক্ষ বালি ঝিলিকাটে, বুকে ভাসছে ও-কী!

গা-ছম্‌ছম্‌......
ও কিছু নয়, গোধূলি-বিভ্রম·
আর একটু পথ চোখ বাড়ালে
বুক-ভাসা উচ্ছ্বাস
মিলায়, মিলায়
উজান ছায়া,
জলজ পানা ঘাস
ভাসছে জলায় হাওয়ায় হাওয়ায়,
ভালোবাসার স্নান
হবে না, পথে ধু-ধু বালি .....
পাহাড়-খসা টান
ফেলে এলাম,
ভুলে গেলাম প্রতীক্ষিত নদী

পাথুরে পথ, উদাসী হতে শিখেছি সম্প্রতি।

জেনেছিলে সবই

শান্তি লাহিড়ী

তুমি সব জেনেছিলে নাকি?
নিমের শাখায় তাই পুষেছিলে সাধের জোনাকি।

তুমি আর কি কি যেন চেয়েছিলে—কুতবমিনার?
আমি প্রতিশ্রুত শিরস্ত্রাণ দিলে
শিরের প্রার্থনা রেখেছিলে সন্তর্পণে বুকের পাঁজরে।
আমি দুর্দশার ভয় করি,
তাই রোজ জাল ফেলে নদীর সমস্ত মাছ ধরি।
কেটে দেখি নীল অঙ্গুরীয়
আছে নাকি, মৃত মীন রাশিচক্র বাক্সে তোলা থাকে
বহুকাল, অবরোধ ভেঙেছি সকলই
দুহাতে উৎসবে দিই খড়্গ তুলে ছাগশিশু বলি।
অন্যদিন শ্যাম তৃণদল।
আকাশ মেঘলা হলে ঘরে তুলি সাবেক ফসল।
বিলাসী বাতাসে করি অন্দর প্রান্তর
ভুলে যাই আছে পার্শ্বচর।
সে যেমন সবকথা আমাকে জানায়
আমারও তো ব্যক্তিগত নাই.

আমি আর্ত হাত ধরি ভুল নুলিয়ার
অঙ্গীকার করাছিল এনে দেব কুতব-মিনার!

দুর্ঘটনা

মতি নন্দী

রাস্তা পার হয়েই সুকুমারের সঙ্গে দেখা। প্রায় ছ'বছর পর। অশোকও অবাক হল। হেসে এগিয়ে গিয়ে বলল—কেমন আছ।

ওদের দেখা চৌরঙ্গীর বাসস্টপে। সুকুমারের হাতে পোর্টফোলিও। পোশাকে সাহেব। চালচলন ভারিক্কি। মোটা গলায় সে উত্তর দিল, ভাল, করছ কি এখন?

—মাস্টারি। বলেই অশোক একটু অস্বস্তি বোধ করল। সুকুমার ঠিক কত মাইনে পাচ্ছে তা সে জানে না। ছ'বছর আগে ছিল সাড়ে তিনশো। এখন নিশ্চয় অনেক হয়েছে।

—কেন আর কিছু করার মত পেলে না?

প্রশ্নটা শুকনো হাসিতে এড়িয়ে গিয়ে অশোক বলল, এখন বাসা কোথায় করেছ? বহুদিন পরে দেখা, না?

—পাইকপাড়া। একটা ভাল ফ্ল্যাট দেখে দিতে পার?

—কেন? জায়গাটাতো ভাল।

—ভাল তো, কিন্তু বর্ষায় অসহ্য। দুশো পর্যন্তও দিতে পারি, সাউথে কিংবা তোমাদের ওদিকে যদি পাও তো—

একটা পরশু পর্যন্তও ছিল, আলিপুরে আমার পিসতুতো ভাইয়ের বাড়ী। দুশো পঁচিশে ভাড়া হয়ে গেল।

—দিন তিন-চার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হত।

সুকুমার হেসে উঠল।

—ঠিকানাটা রেখে দাও, পেলেই খবর দিও। কুলোয় না আর, ছেলে দুটো যা দুরন্ত হয়েছে। একটু বড়ো জায়গা না হলে আর থাকা যাচ্ছে না।

সুকুমার ব্যাগ খুলে কার্ড এগিয়ে দিল। না দেখেই অশোক পকেটে রাখল। অন্যমনস্কের মত দুজনেই বাসের আনাগোনা, লোকেদের ওঠানামার দিকে তাকিয়ে থেকে এক সঙ্গেই পরস্পরকে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। অশোক বলতে যাচ্ছিল, আচ্ছা চলি এখন, একদিন যাব। আর সুকুমার বলতে যাচ্ছিল, সময় করে একদিন এস। না বলতে পারার অপ্রতিভতা এড়াতে সুকুমার বলল, চল, বহুদিন পরে দেখা, কোথাও বসা যাক।

সঙ্গে সঙ্গে অশোক রাজী হয়ে গেল।

তারা চৌরঙ্গীর পূব ফুটপাথ ধরে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে সুরু করল। অশোক লক্ষ্য করল সুকুমার একটু মোটা হয়েছে, ফলে চলনটা যেন পরিশ্রান্ত মানুষের। সে ভাবল, ও নিশ্চয় খুব যত্নে রয়েছে। অতসী ভাল মেয়ে, স্বামীর সম্পর্কে উদাসীন হতেই পারে না। ভাল মেয়ে বললে সব বলা হয় না, রূপে গুণে, স্বভাবে । অশোক হাতড়াতে শুরু করল কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

সুকুমার একটা বইয়ের দোকানের সামনে থেমে পড়ল। বেছে বেছে একটা কিনল।

দামে সস্তা, মলাটে পুরুষদের উস্কানী দেওয়া ছবি।

—আজকাল এইগুলোই পড়ি, বেশ লাগে। পোর্টফোলিওর মধ্যে বইটা ভরে নিল। চলতে চলতে সুকুমার বলল, কলেজে ঢুকে এই ধরনের বই পড়তাম। তখন বেশ লাগত, মাঝে লাগত না, এখন লাগে। ওই মাঝামাঝি সময়টাতেই অতসীর সঙ্গে আলাপ। আগে বা পরে হলে হ'ত না, সিরিয়াস মানুষদের তখন সহ্যই করতে পারতুম না।

—তুমি কি এখনো আগের মতই সিরিয়াস রয়ে গেছ?

জবাব দিতে গিয়ে অশোক থ হয়ে গেল। সুকুমার এ কোথায় তাকে নিয়ে ঢুকেছে। এতটুকু হয়ে সুকুমারকে অনুসরণ করে একটা চেয়ারে বসল। পাশের টেবিলে তিনটি মেয়ে। অশোক প্রাণপণে সিধে তাকিয়ে ভাবল, সুকুমার অধঃপাতে গেছে।

-তুমি কি খাবে?

- কিছু না।

– অন্ততঃ দু ঢোক।

অশোক মাথা নাড়ল না, সেলাম দিয়ে বেয়ারা হাসল। সুকুমারও হাসল।

- ও জানে আমি কি খাই। প্রায়ই আসি। তবে অন্য কিছু ভেব না, শুধু খেতেই আসি। মেয়েদের সম্পর্কে আমি এখনো সিরিয়াস, ও: তখন তো তুমি কথাটার জবাব দিলে না।

—কি আর দোব, আমি আগের মতই রয়ে গেছি। রোজগার তো আর বাড়েনি যে বদলে যাব।

প্লিজ, প্লিজ, রাগ কোর না, ও ধরনের কিছু বলতে চাইনি। আমিও সিরিয়াস হতে চাই। রোজগার বাড়লেই মানুষ বদলায় এসব তোমার মাথায় কে ঢোকাল, কমলেও তো বদলায়। তার মানে তুমি এক জায়গাতেই রয়ে গেছ?

অশোক কথা বলল না। বেয়ারা গ্লাস বোতল নিয়ে হাজির হয়েছে।

-কিছু একটা খাও অন্তত, বাবুর জন্য ভিমটো লাও।

বেয়ারা মাথা নোয়ালো। অশোক ভাবল কথাটা। এক জায়গায় সে নিশ্চয় নেই। কিছু একটার সঙ্গে তুলনা করলে টের পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কার সঙ্গে করবে? সুকুমার ত বদলেছে, সুতরাং তুলনা করে বোঝা যাবে না। অতসী, সেও কি? যদি আগের মতই রয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ওর পাশে নিজেকে দাঁড় করিয়ে বোঝা যেতে পারে। বাড়ীর কেউ, মা, বোনেরা -এদের লক্ষ্য করেও তো টের পাওয়া যেতে পারে। নাকি ওরাও বদলেছে। কিন্তু আমি তো টের পাই না।

-ভাবছ কি, খাও। মাস্টারি করে চলছে কেমন? বিয়ে-থাতো করনি নিশ্চয়।

অশোক মাথা নাড়ল, না।

--করবে নিশ্চয়। রোজগারপাতি বাড়াও।

অশোক গ্লাসের কানায় আঙুল বোলাতে বোলাতে চিন্তিত সুরে বলল,— ভাবছি একটা কোচিং খুলব। চেষ্টাচরিত্তির করলে শ' পাঁচেক টাকা আয় বাড়ানো যেতে পারে।

--গ্র্যান্ড! সুরু করে দাও। তারপর বিয়ে করে ফেল। টাকা লাগলে বল, হাজার-খানেক পর্যন্ত ধার দিতে পারি। চাকরি বড় বিশ্রী জিনিস, স্বাধীন কিছু একটা রোজগারের ব্যবস্থা থাকা অনেক ভাল। পারি না আর।

অশোকের কষ্ট হল সুকুমারে জন্য। এ লোকটাও সুখী নয়।

—সুকুমার বললে অশোক, আমি বৌকে ভালবাসি। অতসীকে তুমি তো জানই, ভালবাসার মত মেয়ে নয়? বল তাই নয়?

মাতাল হচ্ছে বোধ হয়। অশোক অসুবিধা বোধ করতে শুরু করল। তবে পথে-ঘাটের মাতালদের মত নয়। কথাগুলোই যা অস্বাভাবিক। তা নয়ত বৌকে ভালবাসার মধ্যে নতুনত্বের কি আছে!

—ওকে সুখে রাখার জন্য কি না করেছি, মুখের রক্ত তুলে খেটে চলেছি। অথচ জান, ও কিন্তু আমায় ভালবাসে না।

সুকুমার এক চুমুকে গ্লাস শেষ করল।

—আর নয় আমার কাজ আছে। হঠাৎ যেন সুকুমার বদলে গেল। মাতাল বোঝবার মত একফোঁটা চিহ্নও চোখেমুখে নেই। অশোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। প্রতিদিন বাড়িতে ঢোকার সময় সে এ জাতীয় কষ্টে ভোগে। ভীতু চোখে সবাই তাকায়, সংসারের একমাত্র রোজগেরে, সবাই তাকে তুষ্ট করতে ব্যস্ত। ওরা যত ব্যস্ত হয় ততই অশোকের কষ্টটা বাড়ে। ভয়ও হয়, এদের ভবিষ্যৎকে বাঁচিয়ে রাখার সামর্থ্য তার কতটুকুই বা। বর্তমানেই বা কতটুকু পারছে।

বেয়ারার লম্বা সেলাম পেছনে ফেলে ওরা বেরোল। সন্ধ্যা নেমেছে প্রায়। কলকাতার এই অংশটি ফুরফুরে হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

—আমি চলি। দেখা করতে হবে একজনের সঙ্গে। ভাল কথা ইন্সিওর করেছ?

—পাগল, প্রিমিয়াম দেবার টাকা কোথায়।

—তা বটে, তবু করে রাখা ভাল, এ শহরকে তো বিশ্বাস নেই। আর করলে আমায় খবর দিও কিন্তু।

লম্বা পা ফেলে সুকুমার এগিয়ে গেল। টলছে না। ক্লান্তও দেখাচ্ছে না। অশোক নিজের হাঁটাটাই ক্লান্তিকর বোধ করল। এবার টিউশনী তারপর বাড়ি, দুটো বোন আর মা। আধময়লা জামাকাপড়ের গন্ধ, আরশোলা ওড়ার শব্দ। ওরা কেউ এখন কথা বলবে না যাতে একটু হাসা যায়, বা দুটো হাসির কথা বলা যায়। এমন কোন পরিস্থিতি তৈরী হবে না যাতে মনে হবে আমি সকলের ভালবাসার পাত্র। ফিসফিস করে ওরা ঝগড়া করবে কিংবা নিজেদের মধ্যেই হাসাহাসি করবে। তবু ওদের কথাই দিনরাত ভাবতে হয়। অশোক ভাবল ওরা আমার থেকেও অসহায় তাই ওদের ভালবাসি হয়তো। সুকুমার বিয়ে করেই বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে গেল। আমিও পারি একটা বিয়ে করে আলাদা হতে। অশোক বোধ হয় বিয়ের কথা ভাবল বছর পাঁচেক পরে। পাঁচ বছর আগে মা একবার বিয়ের কথাটা তুলেছিল। দূর সম্পর্কের এক অফিসার দাদা তখন বলেছিল, চেষ্টা করব। উচিত ছিল বড় মেয়ের বিয়ের কথা বলা, তা না বলে ছেলের বিয়ের কথা তুলেছিল। অশোকের কাছে তখন আশ্চর্যের ঠেকেছিল।

চৌরঙ্গীতে পৌঁছেই একটা দমকা বাতাসের ঝাপটা খেল অশোক। ভাল লাগল। অন্ধকার ময়দানের দিকে তাকাল। তাকিয়ে ইচ্ছে করল মাঠে ঘুরে আসতে। রাস্তা পার হবার জন্য ডানদিকে তাকাতেই দেখল দূরে কি যেন একটা হয়েছে। ছুটে ছুটে মানুষ জড়ো হচ্ছে রাস্তার মধ্যে। একটা ডবল ডেকার বাস দাঁড়িয়ে।

অশোক কৌতূহলী হল। একটু জোরে হেঁটে ভীড়ের কাছে পৌঁছল। যা প্রথমে ভেবেছিলো। তাই-ই ঘটেছে। একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কি করে চাপা পড়ল?

—যা করে পড়ে। চলন্ত বাসে উঠতে যাচ্ছিল, পিছলে পড়ল। পেছনের বাসটা ব্রেক কষার সময়ও পেলে না।

একজন বলল,—আহা এই বাজারে একটা লোকের মরা মানে যে কি সর্বনাশ হয়ে যাওয়া।

শুনে বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে গেল অশোকের। যদি সে নিজে বাসের তলায় যেত। বাড়ির তিনটি প্রাণীর অবস্থা তা হলে কি হত!

- একদম মরে গেছে কি?

—একদম সঙ্গে সঙ্গে।

অশোকের ইচ্ছে করল একটুখানি দেখে। ভীড় ঠেলে গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁকি দিল। একি! থরথর করে কাঁপল সে। সন্দেহ নেই কোন। ব্যাগটা পুলিসের জিম্মায়, দেখেই সে চিনল। ভয় তাকে কোণঠাসা করে ফুটপাথের কিনারে হাজির করল। কাঁপুনি থামেনি। এখন সে কি করবে? ইচ্ছে করছে ছুটে পালাতে, কিন্তু তা নয় কিছু একটা করা উচিত। যে চাপা পড়েছে এ তার বন্ধু একথা বললে কোন লাভ নেই। সুকুমারকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে। কিন্তু সেও অনর্থক, কারণ ও তো মরেই গেছে। তবু কিছু একটা করা দরকার। একটা লোককে দেখে অশোকের মনে হল অনেকগুলি সন্তানের পিতা, স্বল্প আয় করে কিন্তু টাকা জমায়। লোকটিকে সে জিজ্ঞাসা করল,—যে চাপা পড়ল তার সঙ্গী কেউ ছিল না?

—কি জানি মশাই, থাকলে তো দেখতেই পাওয়া যাবে।

- তা বটে তবে থেকেই বা আর কি করত, করার মত কিছু তো নেই।

—তবু বাড়িতে তাড়াতাড়ি খবরটা পৌঁছত।

বাড়িতে খবর দেওয়া। অতসীকে খবর দেওয়া। তাড়াতাড়ি কার্ডটা বার করে অশোক ঠিকানা পড়ল। ছুটলো বাস স্টপের দিকে। ২বি বাস ছেড়ে যাচ্ছে। বেপরোয়ার মত লাফিয়ে উঠে পড়ল।

বাসে উঠেই মনে হল এভাবে লাফিয়ে ওঠাটা তার উচিত হয়নি। বহু লোক এই ভাবেই মারা গেছে। মৃত্যুর কথা ভেবে অশোক প্রাণপণে হ্যান্ডেল আঁকড়ে রইল। ফলে দোতলায় উঠতে অসুবিধা হওয়ায় দুচারজন বিরক্তি প্রকাশ করল। রেগে উঠল অশোক। ঠেলেঠুলে দোতলায় উঠল। বসার জায়গাটাও কিছুটা অভদ্রের মতই জোগাড় করে নিল।

বসার পরই সে ভাবল খবরটা কি ভাবে অতসীকে দেওয়া যায়। শোনা আছে, আনন্দের খবর, লটারিতে বহু টাকা পাওয়া বা চাকরি পাওয়ার মত খবরগুলো গ্রহণের প্রস্তুতি হিসাবে মনকে প্রথমে দুঃখিত করে দিতে হয়। ধাক্কা সামলাবার জনাই এর দরকার, নয়তো আনন্দে কেউ কেউ মারাও গেছে নাকি। অতসীও মরে যেতে পারে। সুতরাং ওকে প্রথমে আনন্দিত করে তারপর দুঃখের খবরটা দিতে হবে। কী বীভৎস কাজ। অসম্ভব প্রায় ছ'বছর পরে এই রকম এক খবর নিয়ে কারো সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে না।

নেমে যাবার কথা অশোক ভাবল। কিন্তু মাঝ পথে নেমে কি লাভ! বহুদিন পরে বাসে বসবার জায়গা পাওয়া গেছে, এক্ষুনি ছেড়ে উঠতে তাই আলসেমি ধরল। বাড়ির কাছাকাছি এলে বরং নামা যাবে। অশোক যা ভাবল তা করল না। পাইকপাড়া পর্যন্তই টিকিট কাটল। এতদিন পরে অতসী কেমন দেখতে হয়েছে, তাই জানবার লোভটুকু ইতিমধ্যে প্রবল হতে শুরু করেছে।

বাস থেকে নেমে ঠিকানা অনুযায়ী বাড়ি খুঁজে নিতে অশোকের দেরী হল না। তিনতলা বাড়ি। দোতলা থেকে বিনিয়ে কান্নার শব্দ আসছে। কড়া না নেড়ে অশোক রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে থাকল। খবর পেয়ে গেছে তাহলে। নিশ্চয় অতসীই কাঁদছে। অপ্রিয় দায়িত্বের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে ভেবে অশোক খানিকটা নিজেকে হালকা বোধ করল। এখন তো চলেও যাওয়া যায়। কিন্তু এতটা পথ এসে এবং ছ'বছর পরে এসে চলে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। তাছাড়া অনেক কিছু করবার মত কাজও রয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেওয়া, হাসপাতালে যাওয়া, সেখান থেকে শ্মশানে। তারপরের দায় অবশ্য অতসীর ভাইয়েদের। বিধবা বোনকে নিশ্চয় তারা ফেলে দেবে না। শ্বশুর-বাড়ির অবস্থা ভাল নয়, সম্পর্কও ভাল নয়। আলাদা হওয়াতে সুকুমারে মা বা ভাইয়েরা খুশী হয়নি।

বাড়ির মধ্য থেকে এক বিধবা বুড়ি বেরিয়ে এল। অশোক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল,--কাকে খুঁজছেন।

মুখে আসছিল সুকুমারের নাম, সামলে নিয়ে অশোক ফিসফিস করে বলল,—অতসী কি ওপরে?

ওপরে কেন, ওরা তো নিচের ভাড়াটে।

-তবে কাঁদছে কে?

সে তো বাড়িওলা গিন্নী, ও হপ্তায় খবর এসেছে মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে জলে ডুবে মরেছে।

—অতসী কোথায়?

-ছেলেদের নিয়ে পার্কে বেড়াতে বেরিয়েছে।

অশোকের পায়ের নিচে মাটি কেঁপে উঠল। ইচ্ছে করছে ছুটে পালাতে। কিন্তু ছুটতে গেলেই পড়ে যাবে, পা ভীষণ ভাবে কাঁপছে। খবরটা তা হলে তাকেই দিতে হবে। হায় ভগবান এই বিনিয়ে কান্নাটা কেন অতসীর হল না। কেন তার সঙ্গেই আজ সুকুমারের দেখা হল, কেন দুর্ঘটনা দেখতে সে এগিয়ে গেল। অমন তো রোজই কতকগুলি মানুষ বাস-চাপা যাচ্ছে, কই তাদের বাড়িতে খবর দেবার জন্য তো তার মাথা ব্যথা হয় না।

অশোক একটু একটু করে নিজের উপর রেগে উঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নিচের মাটিও শান্ত হয়ে গেল। এসেছে যখন খবরটা দিয়েই যাবে। রাস্তার লোকের মতই নিরাসক্ত ভাবে খবরটা দেবে। সুকুমার যে বাসে চাপা পড়েছে, সেটা যখন অন্য লোকেই চালাচ্ছিল, তখন ভয় পাবার কি আছে। সুকুমার নিজের দোষেই মরেছে। মদ খেয়ে চলন্ত বাসে উঠতে গেছল, কেউ তাকে অমন করে উঠতে বলে নি, কাজেই নির্ভয়ে খবরটা দেওয়া যায়।

ভাবতে ভাবতে অশোক একটু জোরে হেঁটেই পার্কে পৌঁছল। খুব ছোট পার্ক নয়, মাঝে মস্ত পুকুর। অনেক লোকের ভীড়। খেলাধুলোর পাট সাঙ্গ করে দামালরা ঘরে ফিরে গেছে। শান্তিপ্রিয় বয়স্করা এখন জিরোতে এসেছে। এ পার্কে অশোক অনেকবার এসেছে। বহুদিন আগে অতসীর সঙ্গেই একবার এসেছিল।

খুঁজে বার করতে হবে। কোন দিক থেকে শুরু করবে ভাববার জন্য অশোক দাঁড়াল। ঘাসের উপর বসা দুটি কিশোর আই. এ. এস. পরীক্ষার দুরূহ বিষয় নিয়ে আলোচনায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, বেঞ্চে বসা বৃদ্ধদের মধ্যে কেউ হেসে উঠল, ঝালমুড়িওয়ালার কাছ

থেকে এক যুবতী কাঁচা লঙ্কা নিল, ওপর থেকে পিঠে কি যেন পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে অশোক জামাটা টেনে তুলে দেখল। বিরক্তিতে কিশ্‌কিশ্‌ করে উঠল দাঁত। আর তো তিনদিন জামাটা পরার কথা। একটা কাঠির জন্য নিচু হয়ে খুঁজতে খুঁজতে মনে পড়ল পকেটে দেশলাই আছে।

ঝেড়ে ফেলেও দাগটা রয়ে গেল। বিরক্তিতে মন বিষিয়ে গেল। এখন অতসীকে খুঁজে বার করতে হবে। দুপাশে চোখ রেখে সে পুকুর ধার দিয়ে এগোল। সামান্য যেতেই মনে হল দুটি ছেলে নিয়ে যে মহিলাটি চিনেবাদাম খাচ্ছে, সেই অতসী। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য লক্ষ্য করতে লাগল। শরীরটা ভারী হয়েছে মাত্র নয় তো মাথা নোয়ালে ঘাড়ের কাছে শিরদাঁড়াটা আগের মতই ঠেলে ওঠে, চিবোবার সময় রগের কাছটা সেইরকমই দপদপ করে, ঝুরো চুল তুলে নেবার জন্য সেই ভাবেই আঙুলগুলো বেঁকে যায়।

প্রথম কথা অতসীই বলল।

তাই বলি কে এমন ভাবে এতক্ষণ ধরে তাকাচ্ছে।

· চিনতে পেরেছিলে?

--একটু একটু খুব বেশি বদলাওনি দেখছি।

-চিনেছিলে যদি ডাকলে না কেন?

--ছ'বছরেও যে মানুষের টিকি দেখা গেল না, তাকে কেন যেচে ডাকতে যাব?

--না ডাকতে পার কিন্তু বসতে বলতেও তো পার।

অনুমতির দরকার আছে নাকি, এটা তো পার্ক।

--বিনা অনুমতিতে বসা যায়, কিন্তু কারুর সঙ্গে তো বসা যায় না।

অশোক গুছিয়ে বসল। অতসীর ছেলে দুটি অবাক হয়ে দেখছে। বড়টি মার কানে কানে কথা বলল। অতসী তাকে বোঝাল—মামা হয়, বুড়ো মামা, নাড়ু মামা যেমন আছে না, তেমনি অশোক মামা হয়।

বাদাম ভাঙতে ভাঙতে অশোক বলল, রোজই আস নাকি।

-নাঃ, তবে মাঝে মাঝে আসি। বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারছি না, বাড়িওয়ালার মেয়ে মরেছে জলে ডুবে, আজ দশদিন ধরে কান্নার বিরাম নেই। উঠতে বসতে খেতে শুতে একটা স্বর খালি তাড়া করে চলেছে। এমন একঘেঁয়ে লাগে না—

একঘেয়ে শব্দটাকে অতসী একটু বেশি টেনে ধরেছিল। অশোক ওর মুখের দিকে তাকাতে বাধ্য হল।

--এই ভাবে মরাটা ভারী বিশ্রী, অবশ্য সব মরাই বিশ্রী তবু এমনি মরা আর অপঘাতে মরার তফাৎ আছে। আছে না?

মরা কথাটা অশোককে বার বার আঘাত করল।

দাঁতের ফাঁকে চিবুনো বাদাম আটকে গেছে। জিব দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, —সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

--কবে, আজ?

--বাসা বদলাতে চায়, কেন এ জায়গাটা তো ভালই।

-- আমি দরকার মনে করি না, এটা ওর বাতিক, এই নিয়ে তিনবার বদলানো হয়েছে। বাসায় ফেরার পথে ওর এখানে ফেরবার কথা আছে, আমরা একসঙ্গে ফিরব। কটা বাজে?

—ঘড়ি নেই।

—ছিল তো।

—গ্যাছে।

অতসী যেন আহত হল। একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল,—সেই বাসাতেই আছ?

—হ্যাঁ।

—বোনেদের বিয়ে হয়েছে?

—না।

—করছে কি?

—মাস্টারী।

—বিয়ে করবে না?

—একটা চাকুরে কাউকে বিয়ে কর, সুবিধে হবে। আমার মত লেখাপড়া জানা অকর্মাকে কোর না।

—কেন তুমি খারাপ হলে কিসে?

—নয়? শুধু তো খরচ করছি, নিজে রোজগার তো করতে পারি না।

—সুকুমার বলছিল ও তোমায় ভীষণ ভালবাসে।

—ও আমার জন্য খুব খাটে। অমন করে আর কাউকে কিন্তু খাটতে দেখলাম না।

—কজনকে তুমি দেখেছ?

অতসী তাকিয়ে রইল। গলায় স্বরটা মোচড়ান, তেতো। অশোক বুঝতে পেরে লজ্জা পেল। ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, ভাল না বাসলে খাটা যায় না, সে মানুষ যা কারও যারই হোক না কেন।

অতসী চুপ রইল। অশোক ভাবল, এ সব কথা সে কেন বলতে গেল, যে কথাটা বলার, তাই তো বলার উপায় থাকছে না। একটা আনন্দিত পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

—যাকগে ওসব কথা পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আর দেখা হয়?

অতসী গম্ভীর হয়ে থাকল।

—মিনতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মেদিনীপুরে ওর স্বামী বদলি হয়েছে। তোমার মতই মোটা হয়েছে। বিয়ে করলে কি মোটা হয়? সুকুমার পর্যন্ত হয়েছে।

অতসী মুখ ফিরিয়ে জলের দিকে তাকাল। ছেলেদুটি ভীষণ লক্ষ্মী, ছোটাছুটি না করে ঢিল ছোঁড়ার খেলায় ব্যস্ত। বেড়ুনো মানুষগুলি আলগোছে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। অতসীর ভারী-চেহারা দুটি ছেলে সঙ্গে থাকার জন্য অশোক স্বস্তিবোধ করল। ওরা কেউ তাদের প্রেমিক-প্রেমিকা ভাবছে না, স্বামী-স্ত্রী ভাবতে পারে তা ভাবুক। অশোক কনুয়ে ভর দিয়ে ঘাসে শরীর বিছিয়ে হাল্কা সুরে বলল,—এত ভাবছ কি? গম্ভীর হয়ে থেকে যদি আমার অস্বস্তির কারণ হও তাহলে বরং আমার চলে যাওয়াই উচিত।

ছেলেদুটি পুকুরের কাছাকাছি চলে গেছে। অতসী ডাকল। বাধ্যের মত ওরা কাছে এল। জলের দিকে না গিয়ে ওদের খেলতে বলল অতসী।

—সুকুমার বলছিল ওরা খুব দুষ্টু।

—সুকুমার ওদের খুব ভালবাসে।

—তোমাকেও।

অতসী হাসল। অশোক মন দিয়ে লক্ষ্য করল। হাসলে আগের মত টোল পড়ে না, মাংস জমেছে।

—সুকুমারের কিন্তু একটা বদ অভ্যাস হয়েছে দেখলুম।

—হ্যাঁ, তবে মাত্রা ছাড়ায় না। আমিও কিছু বলি না। কি হবে বলে, ওইতে আনন্দ পায়, তা থেকে কেন বঞ্চিত করব।

—তোমার ভয় করে না?

—কিসের?

অশোক চুপ করে রইল। একটা ঝোপকে মাঝে রেখে ছেলে দুটি লুকোচুরি খেলছে। তাই দেখতে সে ব্যস্ত হল।

—কিসের ভয়?

—যদি মাত্রা ছাড়ায়?

—নাঃ, তাতে ভয় পাবার কি আছে। ওসব ভয়টয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

—যদি কাজের ক্ষতি হয়, চাকরী চলে যায়?

—যদি তাই হয়, তাহলে আমাকেও কাজ খুঁজতে হবে। বিয়ের আগে স্বামী পুত্র সংসার ইত্যাদির চমৎকার একটা ধারণা করেছিলাম, বিয়ের পরও কিছুদিন ছিল। এখন আর ওসব ভাল লাগে না। কেমন যেন নীচু নীচু বোধ করি সব সময়। কিছু একটা না করা ভীষণ লজ্জার ব্যাপার।

—এতে সুকুমার আপত্তি করবে না?

—করবে। ওইত আমার কাজের প্রধান বাধা, নয়ত এই পাড়াতেই মেয়েদের স্কুলে একটা কাজ পেয়েছিলাম।

—সুকুমার যদি বাধা না দেয়, ধর সে হয়ত নিরুদ্দেশ হয়ে গেল বা পাগল হয়ে গেল—

উঠে বসল অশোক। ছেলে দুটির আর খেলাও ভাল লাগছে না। মায়ের কোলে আর পিঠে দুটিতে ঠাঁই নিয়েছে। অতসী ঝুঁকে পড়ল। কোলেরটির চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলল,—তুমি কি বলছ বুঝছি না। সুকুমার পাগল বা নিরুদ্দেশ হতে যাবে কেন?

—সঠিক তা নয়, মানে ধর ওর অস্তিত্ব তুমি ভুলে যেতেও ত পার।

—পাগল, তাই হয় কখনো। অত সহজেই ভোলা যায় নাকি?

ছেলেদুটি বায়না ধরেছে বাড়ি যাবার। অতসী উঠে দাঁড়াল। অশোক উঠল না।

—আমার এবার বাড়ি যেতে হবে, তুমিও চলো।

—আর একটু থাক। কি হবে এখনি গিয়ে, বসে বসে তো কান্না শুনবে।

—এদের বসতে ভাল লাগছে না, বরং একটা চক্কোর দি।

পুকুর ধারের রাস্তা দিয়ে ওরা হাঁটতে শুরু করল। আলো কম রাস্তা অসমান। অশোক একটি ছেলের হাত ধরল। অন্যটিকে অতসী কোলে তুলে নিল। দূরে কোথায় কালী-কীর্তন হচ্ছে। পার্কের পাশ দিয়ে ঝড়ের মত বাস ছুটে চলেছে। অন্ধকার বেঞ্চে বসা একজোড়া ছেলেমেয়ের পাশ দিয়ে ওরা হেঁটে গেল। বাতাসে জলাঘাসের গন্ধ। পুকুরের মধ্যে একটা দ্বীপ, সেখানে কিছু গাছপালা। দ্বীপটায় অন্ধকার ঝোপ হয়ে রয়েছে। পার্কের বাতিগুলোর রশ্মি জলের উপর বিছানো আঙুলের মত অন্ধকার ধরার জন্য পাতা। উত্তেজনায় মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। হোঁচট খেয়ে অতসী টলে পড়ছিল, কোন রকমে সামলে নিল। ছেলেটিকে কোল থেকে নামাতে চাইল। ছেলে গলা জড়িয়ে গোঁ ধরল, নামবে না।

—না নামলে, যদি পড়ি তো, দুজনেই পুকুরে গিয়ে পড়ব, নামো লক্ষ্মী ছেলে, নামো।

কেঁদে উঠল ছেলে, অশোক তাকে কোলে নেবার জন্য হাত বাড়াতেই অতসী বেঁকে দাঁড়াল।

—থাক।

ওরা আবার হাঁটতে সুরু করল। সাবধানে আস্তে আস্তে। অতসীর গলায় মুখ গুঁজে ছেলেটি কাঁদছে। জলা গন্ধ। আর একজোড়া নারী পুরুষ ঘাসের উপর। অশোকের হাতটা প্রাণপণে আঁকড়ে বড় ছেলেটি হাঁটছে। মাঝে মাঝে গায়ে লেপটে আসছে। অশোক ওর চুলে হাত দিল।

—পুকুরটা বেশ বড় তো! অনেকক্ষণ হাঁটছি।

—কোলে বোঝা নিয়ে হাঁটতে বিশ্রী লাগছে।

অশোক হাসিটা বোঝাবার জন্য মুখে শব্দ করল। তারপর বলল, একা হাঁটতে সব সময়েই ভাল লাগে, বোঝা নয় এমন কাউকে নিয়ে হাঁটতে আরো ভাল লাগে যেমন তোমার সঙ্গে এখন ভাল লাগছে।

সুকুমার আমায় নিয়ে বেরোতে চায় না। আগে বেরোত।

—কেন চায় না?

—জানি না।

মনে হল সামনেটা যেন ঢালু। অশোক ছেলেটির হাত শক্ত করে ধরল।

সুকুমারকে খুব ক্লান্ত মনে হয়েছিল। অতসী চুপ রইল।

তোমারও কি ক্লান্ত লাগে? অতসী চুপ।

কথা বল। অশোক চাপা সুরে প্রায় ধমকে উঠল।

ভাল লাগছে না কথা বলতে।

তখন থেকে শুনছি ভাল লাগে না, আর ভাল লাগে না। কি ভাল লাগে তবে?

তা যদি জানতুম? অদ্ভুত একঘেয়েমির মধ্যে পড়ে গেছি যেন। যা হোক একটা কিছু এসে যদি নাড়া দিয়ে যায়, প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

অশোক এতক্ষণে অতসীর চোখ দেখতে পেল। আলোর মধ্যে ওরা এসে পড়েছে। রাস্তাটা সমান। ছেলেটি হাত ছেড়ে হাঁটতে শুরু করল। আলোর নীচে তাস খেলছে বন্ধুরা, যুবকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করছে। অতসীর চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। ছেলেকে অনেকক্ষণ কোলে নিয়ে আছে, নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে।

- ওকে নামিয়ে দাও বরং।

শোনা মাত্রই ছেলেটি গলা আঁকড়ে ধরল। অতসী টলে উঠল একবার। কোন রকমে ঘাড়টাকে ঘুরিয়ে অশোকের দিকে তাকাল, হাসলও করুণভাবে। ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল অশোকের মাথা। এতটুকু ছেলের এত জোর কেন? দুহাতে ছেলেটির কাঁধ ধরে সে টানল।

- থাক অশোক। ওকে জান না ও কিছুতেই ছাড়বে না।

অশোক এবার রীতিমত জোর দিল। ছেলের হাতের চাপে লাল হয়ে উঠল অতসীর মুখ। দম আটকে গেছে। প্রাণপণে মাথা ঝাঁকাল। হাত দিয়ে নিজের গলা ছাড়াতে গিয়ে সে হঠাৎ অশোককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

পিছিয়ে এল অশোক। অতসী হাঁপাচ্ছে। ছেলেটি বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে চলেছে। বাতাসে জলাগন্ধ। বন্ধুরা তাস খেলছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অতসী স্বাভাবিক হয়ে উঠল। আবার চলতে শুরু করল।

অশোক নিজেকে বিস্বাদ বোধ করল। ক্লান্ত লাগছে।

অতসী একটু আস্তে হাঁটো, একটা খবর আছে।

অতসী গতি কমাল না। অশোক যেন আরও পিছিয়ে পড়েছে।

অতসী আস্তে হাঁটো, একটা ভাল খবর আছে। তোমাকে সেই কথাটা বলার জনাই এসেছি, আমি শিগগিরই বিয়ে করছি।

অথ "ভোর" প্রসঙ্গ

লোকনাথ ভট্টাচার্য

একটা উপন্যাস লিখেছিলুম (বাঃ বাঃ, কী ভয়ংকর কীর্তি, কী অসাধ্য সাধন, হাততালি দিন সবাই), নাম "ভোর"। বেরিয়েও ছিল। খুঁজলে কয়েক শো কপি যে এখনো পাওয়া যাবে না নানান বইয়ের দোকানে, তা নয়, একেবারেই নয় অন্তত মাননীয় ও মহানুভব প্রকাশকের কথায় যদি বিশ্বাস করতে হয়। এবং সে-বিশ্বাস না-করাটা বা করতে না-চাওয়াটা ক্ষুদ্র তুচ্ছ লেখকের পক্ষে শুধু প্রগলভতাই হবে না, হবে অসভ্যতাও, এক বিপজ্জনক অসৌজন্যের স্বাক্ষর, যার দরুন বলা যায় না, হয়তো মাননীয় প্রকাশক আমার পরের আর কোনো বই ছুঁতেই চাইবেন না, বলবেন 'যান মশাই, একবার আপনার ভালো করতে গিছলুম, এদিকে আপনি...' ইত্যাদি। যাই হোক, সে কথা আপাতত ওঠেই না, কারণ ওঁর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করা তো দূরে থাকুক, উল্টে তিনি যা বলছেন সেটা সঙ্গে সঙ্গে নতমস্তকে মেনে নিতেই যেন আমারও স্বতপ্রণোদিত প্রয়াস, তাই কথাটা যে তিনি বলছেন, তাতে এক ধরনের ভালোই লাগছে বলা চলে।

না, পরে যদি তিনি আমার অন্য বইয়ে হাত না দিতে চান, সেটা ওঁর কথায় আমার সন্দেহ প্রকাশ বা না-প্রকাশের দরুন হবে না, হবে সম্পূর্ণ অন্য কারণে : 'আপনার বই বিক্রী হয় না,' ব'লে দেবেন। এবং সেটা একটা ভয়াবহ সম্ভাবনা, বই বিক্রী না হওয়াটা নয়, বই ওঁর না নিতে চাওয়াটা। এমনিতেই তো প্রকাশক পাওয়ার তাড়নায় ছোটা এক কী করুণ সন্দো, বিশেষত আমার মত ওঁদের পক্ষে, যারা উঠতি লেখক (অন্যকথায়, অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত) ও বাংলায় লেখেন, কিন্তু থাকেন শুধু কলকাতারই নয়, বাংলার বাইরে। ওঁদের অনেক অনর্থক সময় কাটে তাই কলকাতার প্রকাশকের ঠিকঠিক ঠিকানা যোগাড়ে, ও তাঁদের একটার পর একটা চিঠি ছাড়তে, দশটা বিশটা পঁচিশটা, যার মোদ্দা বক্তব্য (যদিও চিঠিতে ঠিক সেভাবে লেখা চলে না) : 'মশাই, একটা বই লিখেছি, ছাপবেন দয়া ক'রে?' এবং আপনাদের কেউ যদি সেই অভাগাদের একজন হন, যাঁরা প্রকাশকের চৌকাঠকে টিপ ক'রে এরকম দশটা-বিশটা-পঁচিশটা চিঠি আগে কখনো ছুঁড়েছেন বা এখনো ছুঁড়ে চলেছেন হাজার-হাজার মাইল দূর থেকে, তো সেসব চিঠির অনিবার্য নিয়তি সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই অবগত আছেন, আমার কিছু বলা বাহুল্য। জানেন, একমাস-দুমাস-তিনমাস যায়, বহু চিঠির উত্তরও আসে না, একটা-দুটোর যদিও বা আসে, সে-উত্তর প্রায় ক্ষেত্রেই নেতিবাচক। অতএব হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা, অর্থাৎ প্রকাশক পেয়েও ওঁকে রাগানো, সেটা আমাদের অনেকের পক্ষেই একটা আশংকাসংকুল প্রস্তাব। তবু, যেমন বললুমই, কপাল যদি মন্দ হয় তো তাঁকে না রাগিয়েও, এমন কি তাঁকে সর্বতোভাবে তুষ্ট রাখার চেষ্টা ক'রেও, হায়, কিছুই হয় না—একটা ছাপলেন, কি বড় জোর দুটো বই ছাপলেন (অনেকটা করুণাময়ের ভাবেই), পরে বললেন, 'না মশাই, আপনার বই বিক্রী হয় না।'

তাই সেরকম কোনো সম্ভাবনার মাথা-উঁকি না দেওয়া পর্যন্ত অন্তত আমার নিজের দিক থেকে অন্য কোনো উস্কানি যাতে তাঁকে না দিয়ে বসতে হয়, সে-চিন্তায় সর্বদাই সন্তর্পিত পদে চলি, ভয়ে ভয়ে থাকি। এই ধরুন প্রচ্ছদের প্রশ্নটাই, "ভোর"-এরই প্রচ্ছদ,

আমার যে খুব মনঃপুত হয়েছে বলতে পারি না। উল্টে মনে হয়েছে সস্তা, অর্বাচীন, এবং এক কথায়, শিল্পীর তিন-রঙা প্রয়াস সত্ত্বেও (যার জন্যে প্রকাশকের মারফৎ তাঁকে ধন্যবাদ দিতেও পিছপাও হই নি—ঐ সেই ভুক্ত রাখার প্রচেষ্টা, যার উল্লেখ আগেই করেছি), অসুন্দর। কিন্তু মিষ্টি হেসে গাঁই-গুঁই ক'রে (বলা বাহুল্য, মার চিঠিরই মাধ্যমে, কারণ তাঁর-আমার মাঝখানের ভৌগোলিক দূরত্ব সাংঘাতিক) যখনই প্রকাশককে আভাস দিতে গেছি —এই যেমন, 'প্রচ্ছদটা একটু অন্য ধরনেরও হ'তে পারত, অবশ্য যা হয়েছে সেটা তেমন খারাপ নয়, একেবারেই নয়, বরং ভালোই, বেশ ভালোই'—তখনই তিনি আমায় তাঁর শেষ ও চরম যুক্তি শোনাতে ছাড়েন নি : 'আরে মশাই, আমাদের পাঠকরা সাধারণ ব্যক্তি, উন্নাসিক প্রচ্ছদ দেখলে তারা দৌড় মারবে, এমনিতেই তো আপনার বই খটোমটো, ইন্টেলেকচুয়াল (শুনে যে গোপন তৃপ্তি পাইনি, বলব না), বিক্রী হওয়া শক্ত।'

অতএব প্রচ্ছদে চাই রঙ, জবড়জঙ্গ। যে-প্রস্তাবের পরিকল্পনা আমি করি ও যার নক্সাও তাঁর কাছে আগে পাঠাই, এবং বলা বাহুল্য যেটা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, সেটা কিছু 'উন্নাসিক' ছিল না, বরং তার চেয়ে সরল প্রচ্ছদ ভাবা শক্ত। কিন্তু তা চলবে না, এবং সেটা তো দেখাই গেল। বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদের বাজারটা বড় কুরুচিদুষ্ট, প্রায় নক্কারজনক, ঘৃণ্য, এবং তা ক্রমশই ঘৃণ্যতর হওয়ার পথে—এ-ব্যাপারে দুয়েকটি সুরুচিসম্পন্ন প্রকাশক ধীরে ধীরে মাথা তোলার চেষ্টা করছেন, মানছি, কিন্তু সেটা রীতির ব্যতিক্রম। প্রচ্ছদের ব্যাপারে (যেমন অন্যান্য নানান ব্যাপারে) বোধ হয় ফরাসীদের মত সভ্য জাতি আর নেই—গালিমার-প্রকাশিত বইগুলির কথা একবার ভেবে দেখুন! কী সরল, অনাড়ম্বর প্রচ্ছদ, অথচ কী সুন্দর বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। তবে দেশে-বিদেশে প্রকাশকের নানান অনুশাসনে বিপর্যস্ত হন না, এমন ভাগ্যবান লেখক সত্যই বিরল। তাই তথৈবচ তো আমাদের দেশে আরো বিশেষ ক'রেই—এই সেদিনই এক স্বনামধন্য বাঙালী লেখক বলছিলেন, তাঁর নতুন বইয়ের নামকরণের দায়িত্বটাও তিনি প্রকাশকের হাতে সানন্দে ছেড়ে দেন, কারণ বই-বিক্রী প্রণালীর সকল অলি-গলি একমাত্র প্রকাশকই জানেন। তা হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—সত্য, তবে বিক্রী হ'তে পারার উপরই বইয়ের চরম সার্থকতা নির্ভর করে কিনা, অনেকের কাছে সেটাও বিবেচ্য ব'লে ঠেকতে পারে। যাই হোক, মোদ্দা কথাটা হ'ল এই যে অসামান্যরাই যখন পারেন না, তখন আমি বা সেই গোত্রীয় সামান্য লেখকরা কোন আহাম্মক স্পর্ধায় দাঁড়াবেন প্রকাশকের বিরুদ্ধে, এবং কেনই বা? খামাখা।

অবশ্য এ-প্রসঙ্গে এ-পর্যন্ত যা বললাম, তা সম্পূর্ণ ইহ বাহ্য না হ'লেও বহুরূপী প্লানির মাত্র একটি রূপের পরিচয়। বলছিলুম, বইটা লিখেছিলুম, আসলে লিখেছি সম্প্রতি, এবং তা বেরিয়েছেও সম্প্রতি, এই বছর খানেক হ'ল। বেশ কয়েকটি সমালোচনাও বেরিয়েছে, এবং কোনো লেখকের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের পক্ষে সেসব সমালোচনার মোটামুটি বক্তব্য অনায়াসেই আমার বুকের ছাতিটাকে একটু স্ফীত করতে পারে। কিন্তু কার্যত, বড় ম্রিয়মান বোধ করেছি—গদগদ হওয়ার বদলে।

যাক, অবশেষে গলা থেকে এই ইঁদুরটা বার ক'রে ফেলতে পেরে ভালো লাগছে। ইঁদুর, কারণ বক্তব্যটা নিজের বা নিজের লেখার সম্বন্ধে, তাই নিজেই সেটা বলতে লজ্জা করে, ভয় হয় পাছে লোকে কিছু ভাবে বা বলে। কিন্তু ভাববেই বা কেন, বা বলবেই বা কেন, কারণ ইতিমধ্যেই বহু-আওড়ানো ও চিরাচরিত হ'লেও কথাটা কিছু কম সত্য নয় যে কোনো লেখাই তার লেখকের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, বিশেষত লেখা যখন প্রকাশিত হ'য়ে গেছে। তখন

তার সঙ্গে তার লেখকের সম্পর্ক পৃথিবী ও চাঁদের মতন, যারা এককালে এক ছিল, আজ আর নেই—আজ সেই পৃথিবীর লোকই যাত্রা করতে চায় (ক'রে ফেলল প্রায়) চাঁদে। আমার মনে হয়, ঠিক সেইরকমই লেখকরাও মাঝে মাঝে আকাশচারী হ'তে পারেন, খুঁজে পেতে তাঁদেরই সৃষ্টিকে নতুন বিশ্লেষণের আবিষ্কারে। এটা কোনো অহংকারী অভিযান নয়, আত্মশুদ্ধির তীর্থযাত্রা। তাই সুধী সজ্জন বন্ধুজন সম্পাদকের নিমন্ত্রণে প্রবন্ধ লিখতে বসলেই যে আমাকে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা বা কাফকার হার্দ্য হাহাকার বা ফরাসী নব উপন্যাসের ধারা নিয়ে পড়তেই হবে, সেটা মেনে নিতে মাঝে মাঝে খারাপ লাগে। শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরীর দাক্ষিণ্যে (*The Continent of Circe*'-র সূচীপত্রের আগের পৃষ্ঠাটিতে পেয়েছি) সারা জগতের একটা সার বক্তব্যকে নানান ভাষায় কী ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, জানলুম: আত্মানং বিদ্ধি, Gnothi Seauton, Nosce te Ipsum, Know Thyself, Connais-toi Toi-meme। অতএব জবাবদিহিরও প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়, যদি নিজের লেখা নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

আসলে "ভোরে"র সমালোচকদের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, তাঁরা আমার বইয়ের প্রশংসা করেছেন বলে নয়। সেই প্রশংসা তো আমার মনে ধরে নি, উল্টে তা চিড়িং ক'রে বেদনা ও হতাশার গোপন বীণায় টান মেরেছে, যা আশা করেছিলুম তাঁরা আলোচনা করবেন, তা তাঁরা করেন নি—তাই নিজেই তলিয়ে দেখতে চাই আজ বইটার এটা-ওটা দুয়েকটা দিকের একটু-আধটু, এবং এটা অনিবার্যভাবে আত্মশিক্ষা ও আত্মশুদ্ধির পথ, সমালোচকদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা সেই কারণেই। তাঁরা যা বলেছেন, তার আলোচনা এখানে আমার বিষয়ই নয়, শুধু বলতে চাই, দুচারটি কথায়, বইটির বক্তব্য, গুণাগুণ, লিখনশৈলী, ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার আজকের ধ্যান-ধারণার রূপটি।

বইটির থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে পারছি আজ, এ হবে অন্যায় ও অসত্য হামবড়ামি—শুধু উদ্দেশ্য যা, তা নম্রভাবে, বিশ্বাস করুন নমস্কারের সঙ্গে, আমার লেখার অভিজ্ঞতাটাকে অন্যদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নেওয়া এখানে। তাতে, বলা বাহুল্য, লাভ আমারই মুখ্যত, কারণ এভাবে আলোচনা করার দায়ে প'ড়ে বইটির অনেক জিনিস—যেমন দোষগুণ, তার অভীষ্ট ও সেই অভীষ্টের কোনো বাঞ্ছিত, গ্রহণযোগ্য রূপ দিতে পেরেছি কি না শেষ পর্যন্ত—তা আমার নিজেরই কাছে পরিষ্কার হ'য়ে যেতে পারে। তবু সেই নিজের লাভটুকুই নয়, এতে হয়তো অন্যেরাও আংশিক লাভবান বোধ করতে পারেন, হয়তো অন্য লেখকেরাও, যাঁরা নতুনভাবে ভাবতে চাইছেন বা লিখতে চাইছেন বা ভাবছেন বা লিখছেন। আসলে তাঁদের সঙ্গে অভিজ্ঞতার একটা মিল বা অমিল খোঁজা, একটা দেওয়া-নেওয়া, জানা-জানানো, ও তাতে উভয়পক্ষেরই মানসিক পুষ্টির সম্ভাবনা আশা করা।

প্রথমেই লেখার সম্পূর্ণ শারীরিক দিকটা। এমন কিছু মোটা বই নয়, ছাপার অক্ষরে ২২০ পৃষ্ঠা, আমার পিঁপড়ের-সারি হস্তাক্ষরে পুরো ১০০ পৃষ্ঠা। পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি প্রায় নেই বললেই হয়, সামান্য যেটুকু আছে তা ঘটেছে প্রথম লেখার প্রণালীর মধ্যেই, লেখা শেষ হওয়ার পর গালে হাত দিয়ে ও বিশ্লেষণী চোখে ভাবতে ব'সে নয়। শব্দান্তরে, এক নাগাড়ে লেখা ও শেষ করা, ও যেভাবে শেষ সেভাবেই প্রকাশ। তার মানে এই নয় যে পরে চোখ বোলাইনি—বুলিয়েছি, শুধু পরিবর্তন বা পরিমার্জনের আবশ্যকতা বোধ করিনি। এটা কি করা চলে, বা সর্বক্ষেত্রে উচিত করা, বাঞ্ছনীয়? জানি না। তবে এখন মনে হয়, হয়তো কিছু পরিমার্জনের চেষ্টা পরে করতে পারতুম, তাতে কিছু-কিছু ভুল-ত্রুটি বা

অভাবের বোধ যা থেকে গেছে, তা হয়তো সংশোধিত হত। লেখাটা হয়েছে যেন অনেকটা গা' থেকে ঝেড়ে ফেলার মত ব্যাপার, মন ছুটেছে সর্বক্ষণ তীব্রবেগে শেষের দিকে, এবং একবার শেষ করতে পেরেই নিষ্কৃতির নিশ্বাস, পরে তার সঙ্গে নিজের ঐ পৃথিবী ও চাঁদের সম্পর্ক।

পুরো ২১ দিনে লেখা, শুধু সকালে-সন্ধ্যায় কাজ ক'রে ও মাঝখানে সারাদিন অফিস ক'রে, অর্থাৎ এটা-ওটা টেলিফোন, এর-ওর নানা প্রসঙ্গে সর্বক্ষণ হঠাৎ-হঠাৎ এসে হাজির হওয়া, দরকার পড়লে এখানে-ওখানে দৌড়োনো। রবিবার বা অন্যান্য ছুটীছাটায় এক নাগাড়ে (খাওয়া ও স্নানের সময়টা বাদ দিয়ে) দেড় থেকে দু হাজার শব্দ লেখা, এক কথায়, ঐ শেষের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা। আর কিছু মনে করার মত অবকাশ নেই, কারণ বলেইছি তো, লেখাটা একটা প্রচণ্ড আত্মশুদ্ধির অগ্নিকক্ষ, লেখারই প্রসাদগুণে মন সর্বমুহূর্তে ভরপুর। পাশের শব্দটা শুনি না, ঐ জুনের (যখন লিখছিলুম) প্রচণ্ড গরমে ঘামে-ভেজা হাতটা দেখি না, শুধু মোটামুটি আন্দাজ, আজকের মধ্যে যেমন ক'রেই হোক এই পৃষ্ঠাটা বা এই ক'টা পৃষ্ঠা শেষ করতেই হবে। অর্থাৎ, লেখার সময় লেখার আয়তনের দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছে মনে, যদিও আগাগোড়া ইতিবৃত্তের একটা আলো-আঁধারি ধারণা সর্বক্ষণই জেগে ছিল, জানতুম কোত্থেকে কী হবে—কারণ লেখা আরম্ভের আগে ঘটনার একটা ছক কেটে রাখি, ও পরে সেই ছক ধ'রে এগোই। তাঁরা (এই ধরুন, যেমন কামু, যাঁর "বহির্বাসী" এত সংক্ষিপ্ত হ'য়েও এত অনবদ্য, সম্পূর্ণ) আমার চিরকালের ঈর্ষার পাত্র, যেসব লেখকেরা আয়তনের চিন্তায় কখনো দায়গ্রস্ত হন না, যেটিকে ঠিক যেমনভাবে বলতে চান, তেমনি-ভাবেই বলেন ও ব'লে ক্ষান্ত হন, তার জন্যে যত কম বা যত বেশি কথাই লাগে না কেন, লাগুক। তবে, যে-ইংগিত আগেই দিয়েছি, আয়তনের দিকে এই বেশি ঝোঁকার দরুন "ভোর" যা হ'তে পারত, তা হয়নি—ছোট জিনিস কোথাও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, আর আসল জিনিসটা মার খেয়েছে, তাকে সারতে হয়েছে অল্প কথায়।

হয়তো এটাও বলতে পারি এখানে, "ভোর" যখন লিখছি, মনে তখন লেখক হিসেবে হতাশ বোধ করার কারণ ছিল, ভাবছিলুম, কেন আবার আরেকটা উপন্যাস লিখছি, কী দরকার লিখে, কে-ই বা ছাপবে, আর বিশেষ ক'রে এই ধরণের যখন উপন্যাস। তার আগে দুটো উপন্যাস শেষ করেছি, যার একটা (দ্বিতীয়টি) নিয়ে কলকাতার কয়েকজন প্রকাশক পরস্পরের মধ্যে লোফালুফি খেলছেন, কেউই নিতে রাজী নন (যদিও অবশেষে এক মহানুভব প্রকাশক এগিয়ে আসেন, বইটিও বেরিয়ে গেছে); প্রথমটি প'ড়ে ছিল বহু দিন, শেষে "চতুরঙ্গ"র কর্তৃপক্ষ তাঁদের পত্রিকায় সেটিকে আশ্রয় দিলেন। সে-ছাপা সবে সুরু হয়েছে "চতুরঙ্গে", যখন লিখছি "ভোর"। কিন্তু বললুমই তো, একবার কোমর বেঁধে লিখতে বসলে আশা-হতাশা শুধু কথার কথা, কিছুই মনে থাকে না।

আইডিয়াটা কোত্থেকে পাই, ঠিক ক'রে বলা মুস্কিল—হয়তো জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' মনের অবচেতনে দানা বেঁধে ছিল বা আছে বহুকাল, অথবা বলা যায় না, হয়তো এটা আমার নিজস্ব একটা ভাব যা আমার ছেলেবেলা থেকে মাতিয়েছে : এই সর্ব অর্থে একটা সুখী লোকের হঠাৎ বিতৃষ্ণা, সব ছেড়ে চলে যাওয়া। ঐ 'হঠাৎ'-টাকে যথাসম্ভব হঠাৎ ও নাটকীয় করে তোলার তাগিদেই ভেবে আবিষ্কার করতে হয়েছে একটি রাত্রির এই উপাখ্যান, এই এক সন্ধ্যা হতে ভোরের কাহিনী, যার যে-সন্ধ্যা গত ও যে-ভোর আগত, তারা প্রশস্ত বিপুলগ্রন্থ স্রোতস্বিনীর এপার-ওপারের মত, মিলবার নয়।

অল্প কথায় ঘটনাটি হল এই, বলছি বইতে যেভাবে ঘটেছে, সেই ভাবেই। সুমন-

নীরার বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় পার্টি—নীরা, যাকে তার স্বামী একদিন আদর করে 'নিবিড়া নিথর নীরা' বলে ডাকত, কিন্তু ইদানীং ততটা ডাকে না। পার্টি, কারণ, সুমন নতুন কাজ পেয়েছে, তার মনের মত ও ভারত-সরকারে—আগে কাজ করত আমেরিকান প্রচার-বিভাগে, যেখানে সে বন্দী হয়ে ছিল, যেখানে তার অস্তিত্বকে সে চিরদিন ঘৃণার চোখে দেখে এসেছে ও যেখানকার কর্মজীবন তার আজ সাড়ে-পাঁচটায় ছুটিতেই শেষ। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ছন্দে যে পরিবারটির জাগরণ বা ঘুমের সমস্ত মুহূর্ত দোলায়িত, তার সম্পূর্ণ পরিচয় বইয়ের দু'তিন পৃষ্ঠাতেই। নীরা সুন্দরী যুবতী, বয়স হয়তো ত্রিশ, সুমন হয়তো পঁয়ত্রিশ, এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অসীম সস্নেহ প্রেম, যার থেকে এটাও ধরে নেওয়া যায়, অন্তত ধরে নেওয়া উচিত, যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীরও তাই, অর্থাৎ অসীম সস্নেহ প্রেম। একটি ছোট মেয়ে, একমাত্র সন্তান, প্রস্ফুটিত ফুলের মত, ইস্কুলে পাঠাভ্যাসের প্রথম ধাপে অক্লান্ত হচ্ছে। নীরাও উপার্জন করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সে শিক্ষয়িত্রী—বাড়ীতে মোটর গাড়ী, এবং সামগ্রী-সাজানো সভ্যতার আরো অনেক সরঞ্জাম। আসন্ন গ্রীষ্মের দাপট থেকে বাঁচার জন্যে এয়ারকন্ডিশনার না হোক, অন্তত একটা এয়ারকুলার কিনবেই, কোনমতে সুমনকে রাজী করাবেই, ভাবছে নীরা। শুধু বর্তমান সুখই নয়, বৃহত্তর সুখেরও সকল সম্ভাবনা আগামী দিনে, কারণ আমেরিকানদের চাকর হয়ে সুমনকে আর থাকতে হচ্ছে না, কাল থেকে সুরু হচ্ছে তার নতুন জীবন, যাচ্ছে এমন এক জায়গায় যেখানে যেতে চেয়েছিল। এটাও নীরাই ভাবছে, যখন সুমন তখনো ফেরেনি আমেরিকানদের সঙ্গে তার শেষ কর্মদিন সম্পন্ন করে এবং নীরা স্বয়ং ব্যস্ত পার্টির নানান আয়োজনে।

এদিকে সুমনের ফিরতে দেরী হয়, অজানা আশংকায় ভরে ওঠে নীরার মন, আসন্ন সন্ধ্যায় আকাশে অকাল কৃষ্ণ মেঘ দেখে সে চঞ্চল হয়, বার বার গেট খুলে তাকায়, দূরে সাদা গাড়ীটাকে আসতে দেখা যাচ্ছে কি না। অবশেষে সুমন যখন ফিরল, তখন সাতটা বেজে গেছে, এবং দেখা গেল, সঙ্গে স্কচের যে-বোতলটা আনার কথা ছিল তার, তা সে ভুলে গেছে। এবং কেমন যেন অন্যমনস্ক সে, কেমন যেন উল্টোপাল্টা কথাও বলছে। নীরা গা করে না, ভাবে ক্লান্তি, এটা ক্লান্ত সুমনের, আর কিছু নয়। অচিরেই ধীরে ধীরে অতিথিরা আসতে থাকেন, পার্টি সুরু হয়--এটা-ওটা হাসি, কখনো বা কারুর অশ্লীল ঠাট্টা, সুখী সমাজের স্বাভাবিক ইতরতা। হঠাৎ কখন প্রচণ্ড ঝড় ওঠে, সন্ধ্যার সেই কালো মেঘটার কীর্তি, ইলেকট্রিক আলো নিবে যায়। ভাগ্যিস, খাওয়ার পালা আগেই সাঙ্গ হয়েছিল এবং ঘরে মোমবাতিও ছিল -অতিথিদের ঠাট্টা-তামাসা চলতে থাকে। এক সময় নীরা দেখে, সুমনের জায়গাটা খালি, ভাবে হয়তো বাথরুমে গেছে, এখুনি ফিরবে। কিন্তু সুমন ফেরে না, বাথরুম বা অন্যত্র কোথাও তার সাড়া মেলে না—রাত বাড়ে, অতিথিরা একে একে বিদায় হন। সুমনের ব্যবহারে লজ্জিতা, এবং কোথায় সে গেল তা ভেবে শঙ্কিতাও, নীরা গেট বন্ধ করে ফিরে আসে--তখনো ইলেকট্রিক আলো নেই, যদিও ঝড় থেমে গেছে, আপ্লুত জ্যোৎস্নায় আকাশ ওপরে।

বাড়ীতে যখন অতিথি-অভ্যাগতের পালা, সুমন বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায় নিজেরি অজান্তে, এসে দাঁড়িয়েছে নিমগাছতলায়, আত্মার কোন কাকড়াবিছের কামড়ে তার শরীর মন জ্বলছে। যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে কোথাও, যে-পৃথিবী সুপ্ত ছিল মাটির তলায়, আজ তা মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। সে দেখছে তার ফেলে-আসা জীবনটা, তার ধূসর অসারতা, সামগ্রী-সাজানো সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করে শিউরে উঠেছে।

দূরে সরে যাচ্ছে নীরার মুখ, ম্লান হয়ে আসছে প্রেমের প্রতিজ্ঞা, এক অকথ্য অবোধ্য ব্যর্থতার বোধ যেন তার গলা টিপে ধরতে চাইছে। কানে ভেসে আসছে নীরার কিছুক্ষণ আগের উক্তি—'কাল থেকে নতুন জীবন'—ও হতাশার ক্ষীণ হাসিতে অমনি বিকৃত হতে থাকে তার ঠোঁটের কোণ। নতুন জীবনই বটে! তা কত নতুন, তা যেন সে আগে থেকেই জানে, ও তাতে তার স্বাদ নেই। মনে পড়ে যায় তার ছেলেবেলাকার বহু মিস্টিক অভিজ্ঞতার কথা—ফুলের সঙ্গে ফুল হয়ে, রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের সঙ্গে রেলগাড়ীর ইঞ্জিন হয়ে, অন্য মানুষের হাসির সঙ্গে একাত্ম হয়ে এক বিরাট প্রাণ ও প্রেমের স্রোতে নিজেকে সমর্পণ করার তার এককালীন সংকল্পের কথা। সে-সংকল্পের তুলনায় তার আজকের জীবনের যা-কিছু সাধনা-অভিনিবেশ, তা ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ঠেকে। এমন কি নারীকেও, নীরার প্রেমকেও শৃংখল বলে মনে হয় তা যেন পায়ে পায়ে জড়ায়, তাকে আটকায়, ছোট করে, বৃহত্তের সঙ্গে তার মিলনের অন্তরায় তা। অন্যদিকে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া চিন্তার হাত হতে নিষ্কৃতি পাবারও সে কম চেষ্টা করে না, তাদের দুজনের প্রেমের ও কামের বহু নিবিষ্ট মুহূর্তের স্মৃতিতে নিজেকে আকুল করতে চায়, ভাবে এই করে চেনা তীরে যদি সে আবার সাঁতরে ফিরে আসতে পারে, কিন্তু বৃথাই, সমুদ্রের ডাক ও উত্তাল তরঙ্গ তাকে কেবলি তীর হতে দূরে নিয়ে যায়। হঠাৎ সম্বিৎ ফেরে, যখন রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে ইলেকট্রিক আলো আবার জ্বলে ওঠে, রাত তিনটে নাগাদ। সুমন বাড়ী ফেরার পথ ধরে।

তারপর যেটুকু রাত তখনো অবশিষ্ট, নীরার সঙ্গে তার তর্ক চলে, যদিও সে-তর্কে ততটা সে যোগ দেয় না, কারণ তার মনে হয়, কথা তার ফুরিয়ে গেছে, আর কিছু বলার নেই, বোঝাবার নেই, বোঝারও নেই। কিন্তু বোঝার, বোঝাবার থাকে নীরার, বিশেষত সুমনের প্রস্তাব যখন এত সাংঘাতিক : এ-জীবনে আর তার স্পৃহা নেই, সে চলে যেতে চায় নিরুদ্দেশ যাত্রায়, একা, নিঃসম্বল। জানতে চায় নীরা, কেন এসব কথা আজ এভাবে উঠবে হঠাৎ, কেন সুমন তাকে আগে থেকে প্রস্তুত করেনি, একটু আভাস পর্যন্ত কখনো দেয়নি? এ কি তবে বৈরাগ্য সুমনের, সে-প্রশ্নও নীরা করে। বৈরাগ্য কাকে বলে, তা সে জানে না—সুমন উত্তর দেয়। পীড়াপীড়ি করে, যেন এসব বড় বড় প্রশ্ন নীরা তার কাছে না তোলে, আসলে সে কিছু জানেনি, আর কিছু জানতেও চায় না, কিছু কখনো বোঝেনি, আর কিছু বুঝতেও চায় না—যা চায় সে, তা শুধু চলে যেতে, আর তার এই যাওয়াটা যেন নীরা কঠিন করে না তোলে, তেমনি সহজেই এটাকে যেন নীরা মেনে নেয় যেমন করে মেনে নিতে হয় জীবনে জন্ম-মৃত্যুর ঘটনা, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সত্য।

ওদিকে ভোর হয়ে আসে, উঁকি মারে আসন্ন সূর্যোদয়। সুমন পথে বেরোয়, পকেটে তার একশো টাকার একটা নোট যা জোর করে নীরা পুরে দেয়—নীরা তাকে যেতে দেয়, কারণ জানে বাধা দিয়ে লাভ নেই, শুধু বলে, 'কিন্তু এটাও ব'লে রাখছি সুমন, তোমাকে ফিরতে হবে, তুমি ফিরে আসবেই। কারণ এ-ঘরের প্রতিটি ধূলোকণা তোমায় ডাকছে, যে-ধূলোকণার চেয়ে কোনো আকাশও বড় নয়—আর কী বলব তোমায়। যাও, বেড়িয়ে এস ভালো করে, সুস্থ হয়ে ফিরে এসো—আমরা অপেক্ষা করে থাকব।'

এবার দেখতে পারি কাঠামোর দিকটা। গল্পটিকে—গল্পই যদি বলা যায় একে—ভাগ করা হয়েছে চারটি অসম অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ের দৈর্ঘ্য ৩৪ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয়ের ৫৪ পৃষ্ঠা, তৃতীয়ের ৯৮ পৃষ্ঠা, ও চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ের আবার ৩৪ পৃষ্ঠা। প্রথম ও শেষ অধ্যায়ের পৃষ্ঠাসংখ্যায় মিল ইচ্ছাকৃত বা পূর্বপরিকল্পিত নয়, আপনা থেকে হয়ে গেছে। প্রথম

অধ্যায়ের বিষয় ও সময় : পার্টির আয়োজনে ব্যস্ত ও সুমনের প্রতীক্ষারত নীরা, সময় অপরাহ্ন পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটা। অধ্যায়ের শেষ নীরার অকাল কৃষ্ণ মেঘ দেখায় ও তার শংকিত প্রশ্নে : তবে সুমনের কিছু হয়নি তো?

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সুরু সুমনের আপিস থেকে ফেরা দিয়ে, ও শেষ অতিথিদের বসিয়ে রেখে তার চুপি চুপি পলায়নে, অতিথিদের একে-একে বিদায়ে ও সুমনের চিন্তায় একলা পড়ে থাকা নীরায়। মাঝে পার্টির সমারোহ, ঠাট্টা-টিটকিরি, ইত্যাদি। সময় : সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ।

তৃতীয় অধ্যায়ে সুমন একলা তার চিন্তা বা চৈতন্যস্রোতে, নিমজ্জমান—প্রতিটি মুহূর্তে তার চারটি বিভিন্ন সময়বোধ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত : বর্তমান, যথার্থ অতীত, কল্পিত বা বাঞ্ছিত অতীত যা ঘটেনি, এবং কল্পিত বা বাঞ্ছিত ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ, চিন্তায় এই সব কটাই এক হয়ে রয়েছে : যেটা হচ্ছে, যেটা হয়েছে, যেটা হয়নি কিন্তু হতে পারত ও হলে ভালো লাগত, এবং যেটা হলে ভালো লাগবে। অধ্যায়ের শেষ ইলেকট্রিক আলো ফিরে আসায় ও সুমনের বাড়ীর পথ ধরায়। সময় সাড়ে দশটা থেকে রাত তিনটে।

চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ে সুমনের প্রত্যাবর্তন, নীরার সঙ্গে কথোপকথন ও অবশেষে পথে যাত্রা। সময় রাত তিনটে থেকে ভোর।

এ-বিশ্লেষণ আমার পক্ষে এখন করা সম্ভব হলেও লেখবার সময় এ-সম্বন্ধে সচেতন ছিলুম না। একমাত্র অধ্যায়ের অন্তগুলো ছাড়া (যেগুলো খানিকটা চেষ্টাপ্রসূত এবং পূর্ব-পরিকল্পিত, কারণ নাটকীয় উপাদানটাকে যে অধ্যায়ের পরে অধ্যায়ে বজায় রেখে চলতেই হবে, এ-ইচ্ছা সর্বদাই জাগ্রত ছিল মনে) আঙ্গিকে ও ঘটনায় বিন্যাস্তির ভঙ্গীতে আর যা-কিছু এসেছে, আপনা থেকেই এসেছে। আরো একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য : প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যা কিছু ঘটছে, তা নীরার চোখ দিয়ে ঘটছে, অন্য উপস্থিতদের চোখের বা দৃষ্টির মাধ্যমে নয়; তৃতীয় অধ্যায়ে নীরার বদলে সুমনের চোখ কাজ করছে। এবং দু-ক্ষেত্রেই, এই আঙ্গিকটা (যেটাকে পুরোপুরি চৈতন্যস্রোতের আঙ্গিক বলা হয়তো ভুল হবে, যদিও তার খুব কাছাকাছি নিশ্চয়) স্বাভাবিকভাবেই আমার হাতে এসেছে, ভেবে-চিন্তে বার করতে হয়নি।

এইভাবে বিশ্লেষণ করতে বসে মনে হচ্ছে, জান্তে বা অজান্তে, সমালোচকরা তাঁদের বক্তব্যে বইটির দুটি বড় ত্রুটির প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন—একটি ত্রুটি কাঠামোর, অন্য ত্রুটি একেবারে বিষয়টির আত্মা-সংক্রান্ত, যদিও দুটির কোনোটিকেই বিচ্ছিন্নভাবে দেখা উচিত নয়। প্রথমত, পার্টি নিয়েছে ২২০-এর ৮৮ পৃষ্ঠা, যে-প্রাধান্য তাকে দেওয়া অন্যায়ই হয়নি শুধু, তার ফলে মুখ্য বক্তব্যের যথোচিত বিস্তারের অবকাশ সংকুচিত হয়েছে। কারণ আসল জিনিসটা কী বইয়ের?—সুমনের চলে যাওয়া ও তার কারণ। পার্টি নিশ্চয়ই সেই কারণ নয়। এই আপত্তি আরো বড় হয়ে চোখে পড়ে শেষের দিকে, যা আনছে দ্বিতীয় ত্রুটির প্রসঙ্গ : পাঠকের কাছে সুমনের চলে যাওয়া গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। মনে হয়, শেষটা কষ্টপ্রসূত, এবং এভাবে গেলেও এ-যাওয়া সুমনের চিরকালের নয়, ক্ষণিকের—যেন খিদে পেলেই ফিরে আসবে। আসলে নাটকীয়তার ওপর জোর দিতে গিয়ে কেবলি ভেবে-ছিলুম (হয়তো) আমি, আগে থেকে কোনো আভাসই দেব না, শেষের বাজীতে কিস্তি মাত করব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, খোলাখুলি আভাস না দিলেও অন্য কোনো প্রস্তুতির দরকার ছিল (যেটা বইতে নেই) যাতে শেষটা মেনে নেওয়া পাঠকের পক্ষে সম্ভব হত। এই প্রস্তুতি

যা পাঁয়তাড়া কষা আমি অনায়াসেই চেষ্টা করতে পারতুম, পার্টির পিছনে খামোখা অতগুলো পৃষ্ঠা খরচ করার বদলে। অত প্রশ্নে দরকার কী, আমি যদি সুমন হতুম, সুমন যা শেষ পর্যন্ত করল তা কি করতে পারতুম? ভাবতেই বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে, ভয় ধরে।

কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী বন্ধুজন কথাচ্ছলে এ-প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের উল্লেখ করেছেন মানতে দ্বিধাবোধ করেছি, কারণ চৈতন্যদেব কথাটাতেই কেমন এক ধর্ম-ধর্ম ও অনাধুনিক গন্ধ, যার সঙ্গে আমার মানসিক মিল নেই। সুমনকে সম্পূর্ণ এ-যুগের ও আমাদের সকলেরই একজন হিসেবে পেতে চেয়েছিলুম, ও সেই আলোকেই তার শেষ কার্যটিকে পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতেও সাধ ছিল। তবে র‍্যাঁবোর উদ্দেশে ক্লোদেল যা বলেছিলেন— mystique à l'état sauvage অর্থাৎ আদিম বা অপরিণত অবস্থার মিস্টিক—তা হয়তো অংশত সুমনের প্রতিও প্রযোজ্য হ'তে পারে। এবং এটুকুও মানব, 'ভোর' লেখার সময় যে-চেতনায় কে যেন আমায় কান মুলে নিবিষ্ট করায়, তাকে আধ্যাত্মিক আখ্যা দিলে আমারো আপত্তি থাকা উচিত নয়।

আশা করি, মাননীয় প্রকাশককে আরো নতুন ফ্যাসাদে ফেলতুম না, এসব খোলাখুলি আলোচনার দরুণ বই যদি আরো কম বিক্রী হয় (অর্থাৎ, একেবারেই বিক্রী হয় না) তো তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে হয়তো পুরোপুরি নতুন ক'রে আবার 'ভোর' লিখতে বসতে পারি, কে জানে! বলা যায় না, হয়তো শুধু তাঁকেই নয়, নিজেকে সন্তুষ্ট করার তাগিদেও সে-কাজে হাত দিতে বাধ্য হ'তে পারি একদিন।

শবের খাঁচায়

। শেয়ালদা ।

অনীশ রায়

একটু সকাল সকাল দোকান বন্ধ করেন সুবোধ ডাক্তার। বাগবাজার স্ট্রীটে তাঁর পুরোনো ডিসপেনসারী। বাইরে শীতের সন্ধে ধোঁয়া আর কুয়াশার আক্রমে। স্টেথিসকোপের বাক্স বন্ধ করতে করতে হঠাৎ থেমে যান। এই সময়টা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সময়। রোগীর ভিড় নেই, বাড়ি ফিরে পয়সার অনটনের দরুণ যে অপ্রীতিকর অবস্থার সামনে বেশীর ভাগ দিন পড়তে হয় তা থেকেও তিনি দূরে। পাশের ক্যাম্প চেয়ারে শুয়ে সুবোধ ডাক্তার কয়েক মিনিটের জন্যে চোখ বোজেন। আর ছেলেবেলার দেখা খুব অস্পষ্ট স্মৃতি উনিশ শো পাঁচ সালের কলকাতা, তারপর যুদ্ধে মেসোপটেমিয়া, আরব, তুরস্ক। সুবোধ ডাক্তারের খুব খেজুর খেতে ইচ্ছে করে। সেই সব রসাল পেজাই সাইজের খেজুর কলকাতায় বিশেষ চোখে পড়ে নি। বেশ কয়েকটা বছর কেটেছিল মরুভূমিতে ঘোড়ার পিঠে লম্বা আলখাল্লাপরা মানুষগুলোর মধ্যে। তারপর দেশে ফিরে এক দুপুরের কথা খুব মনে আছে। ডালহাউসি স্কোয়ারে বাসে যাচ্ছেন। হঠাৎ বিকট আওয়াজ। পঞ্চাশ হাত দূরে ওয়াটসন সাহেবের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চলেছে। চারদিক হৈচৈ/হুলস্থূল। সবাইকে পেটাচ্ছে পুলিস। তারপর চাকরী ছেড়ে টেররিস্টদের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন। খুব বাজেভাবে ধরা পড়েছিলেন পিস্তল সঙ্গে। সাত বছর জেল। সুবোধ ডাক্তার চোখ মেলে ডান কব্জিটা আলোর সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকেন। জেলের ভেতর ইংরেজের মারের দাগ এখনও মেলায় নি। হঠাৎ তাঁর দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ হয়। ডাকেন, 'পরেশ, পরেশ!'

পরেশ হাজির হয় মুখ বেজার করে। সে জানে এই সময়টাতে স্বাদেশিকতার ফোয়ারা ছুটবে। বাড়িতে তার নতুন বউকে বারবার বুঝিয়েছে কেন দোকান বন্ধ সকাল সকাল করেও তার দেরী হয় ফিরতে। 'বুড়োর বয়স যত বাড়ছে তত দেশ দেশ করে এই ভিমরতি বাড়ছে' তার এই ধরণের কৈফিয়ত তার যুবতী স্ত্রীর ঠিক গ্রাহ্য নয়।

'আচ্ছা পরেশ, আমরা কি করলাম অ্যাদ্দিন? এই চারদিকে এত দারিদ্র, অনাহার, এতরকমের পাপ, জাল জোচ্চুরী। এর জন্যেই আমরা পড়ে পড়ে ইংরেজের মার খেলাম?'

পরেশ প্রতিবাদ করে না, ঘাঁটায় না পাছে কথায় কথা বেড়ে যায় আর স্ত্রীর কাছে আরও দীর্ঘ কৈফিয়ত দিতে হয়।

'এই দ্যাখো, এই শ্রীদাম। একেবারে ছিনিমিনি খেলা হল এদের নিয়ে। বাচ্চা ছেলে যদি বলে, মাথায় চড়ে হাগব, তাই মানতে হবে? কতগুলো উজবুক বললে হিন্দু আর মুসলমান এত আলাদা যে দুটো দেশ না হলে তারা বসবাস করতে পারবে না। অ্যাদ্দিন যে হিন্দুমুসলমান এক সঙ্গে ছিল, তোরা শালারা কোথায় ছিলি? এই সব সেল্ফ্ স্টাইল্ড লীডার্স, এই সব ট্রেটার্স!'

সুবোধ ডাক্তারের গলা চড়ে যায়। আরও শীর্ণ রুক্ষ রুগ্ন লাগে তাঁর ছুঁচলো মুখখানা। আর পরেশ নিজের মনে মনে বলে, 'গ্যাস, গ্যাস! আজীবন নিজেকে গ্যাস দিয়ে কাটিয়ে দিল।' প্রকাশ্যে বললে, 'অতো উত্তেজিত হবেন না, শরীর খারাপ হবে।'

'কথা বলে শরীর খারাপ হয় না সুবোধ ডাক্তারের। কেউ কখনও ভেবেছিল সুরেন

বাঁড়ুজ্জেকে হারিয়ে দেবে বড় কর্তা? তোমাদের এই চীফ্‌ মিনিস্টার বিধানচন্দ্র রায়কে আমরা ডাকতাম বড় কর্তা। বড় কর্তা কবে কথা বলেছে হে? চীফ মিনিস্টার হয়ে। আমরাই তো কয়েকটা ছোকরা জিতিয়ে দিলাম বিধানচন্দ্রকে।'

পরেশ যতই নেকনজরে দেখুক ডাক্তারের স্বাদেশিকতা, এ ধরণের কথাবার্তা (বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ নামে ডাকা কিংবা তাকে তুমি বলা) তাকে কিঞ্চিৎ অভিভূত না করে পারে না। একটু ভয়ে ভয়ে বলে, 'একবার চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করুন না?'

সুবোধ ডাক্তার ফেটে পড়লেন, 'কেন, কেন দেখা করব? আমাকে দেশ সেবার জন্যে পেনশান দাও—এই জন্যে? দ্যাখো পরেশ, স্বাধীনতা আসার পর ব্যাঙের ছাতার মতো সারা দেশ জুড়ে দেশপ্রেমিক গজিয়েছে। যারা কখনও দেশ সম্পর্কে ভাবে নি, খালি নিজের পেট সেবা করেছে, তারা মিনিস্টার, দেশনেতা। তারা প্লেনে চড়ে দেশবিদেশে ভোজিখেলানে বেড়াচ্ছে। আমি যদি শুকিয়ে মরি তবু এই দেশপ্রেমিকদের কাছ থেকে হাজার মাইল তফাত থাকব।'

'এতে ডাক্তার বাবু কিছু হবে না। কতগুলো হাভাতে হাঘরে লোক ডিসপেন্সারীতে ভিড় বাড়াবে। বিনে পয়সায় চিকিৎসা করাবে আবার আপনাকেই চোখ রাঙাবে। আর যারা কাজ গোছাবার তারা কাজ গুছিয়ে নেবে।' গম্ভীর আত্মপ্রত্যয়ে পরেশ বললে।

'এই কাজ গুছোনই তো দেখছি। দিল্লীতে, কলকাতায়, দেশের সর্বত্র এই কাজ গুছোন। তোমার সঙ্গে মিলছে না মতে, ক্লিক্‌ করে হটিয়ে দিলাম। বড্ড সমালোচনা করছো, মিনিস্টার বানিয়ে দিলাম। আরও বাড়াবাড়ি করো জেলে ভরে দিলাম।...আর এই কতগুলো কাগজ জুটেছে। ছেলেবেলায় গাঁয়ে কবিগান হত। বড় বড় কবিয়াল আসত। কর্ণ, অর্জুন, রাম, রাবণ, যেদিকে ভিড়িয়ে দাও সেদিকেই গাইবে। প্যালা পেলেই হোল। কাগজগুলোও অবিকল এক।'

সুবোধ ডাক্তারের এ ধরনের জোরাল কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত হলেও মাঝে মাঝে পরেশের অসোয়াস্তি হয়। বাড়িতে বকা খাবে এই হিসেব ভেস্তে যায়। চাপা উত্তেজনায় বলে, 'আপনি স্যর কিছু মনে করবেন না। একদম কমিউনিস্টদের মতো কথা বলছেন ডাক্তারবাবু।'

'ছেঁদো কথা বোল না, ছেঁদো কথা বোল না।' সুবোধ ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ষাটটা বছর পার করে দিয়েছি যেভাবে আর কটা বছরও তেমনি কেটে যাবে।'

তারপর হঠাৎ শান্ত গলায় বললেন, 'তবে পরেশ, আমরা বোধহয় বুড়ো হয়ে গেছি। আমরা যেভাবে ভেবেছি দেশসম্পর্কে সেরকমভাবে সরকারও ভাবে না, কমিউনিস্টরাও ভাবে না। কই, দেশ যখন ভাগ হল, কোন মিঞা তো ট্যাঁ ফোঁ করে নি। আর এই সব শ্রীদামদের নিয়ে সরকারও বাণিজ্য করছে, কমিউনিস্টরাও বাণিজ্য করছে। দেশ বলতে, দেশের লোক বলতে আগের দিনের সেই মমতা নেই। মিনিস্টারদের বলতে যাও, তারা শোনাবে সংখ্যাতত্ত্ব, কিভাবে ঝড়ের গতিতে দেশ এগোচ্ছে তার ফিরিস্তি। আর তোমাদের বামপন্থীদের কাছে যাও, তাঁরা প্যাঁচ কষবে কিভাবে তাদের পার্টি জোরাল হবে।......আমার মাঝে মাঝে কিরকম ভয় হয়। হয়ত দেশের লোকেরা এইরকমই চেয়েছিল, এইরকমই চায়, এই গোঁজামিল আর জোড়াতালি, এই সব কথার ধাপ্পা দেশের নামে।'

পরেশকে এবার ক্লান্ত দেখায়। অবসন্নভাবে মুখ বেজার করে দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিকে চেয়ে সুবোধ ডাক্তারের মুখের ভাবখানাও পাল্টে যায়। 'বড্ড রাত করিয়ে দিলাম পরেশ।

বড় দেরী হয়ে গেল তোমার। এই সব কথা জানো বুকের ওপর বড় চেপে বসে থাকে। একটু বলে হালকা হই।'

সুবোধ ডাক্তার উঠে পড়েন। পরেশ টপাটপ জানলার ছিটকিনি আঁটতে থাকে। যেন আবার কোন কথা উঠে পড়বে এই ভয়ে ইজিচেয়ারখানা দেয়ালের কাছে ঠেলে দেয়। সুবোধ ডাক্তার টুক টুক করে হালকা পায়ে অন্ধকারে ধোঁয়া আর কুয়াশায় মিলিয়ে যান।

প্রত্যেক দিনের মতো দরজায় তালাচাবি দিয়ে পরেশ কম্পাউণ্ডার পাশের দোকানে এক কাপ চা খেতে যায়। সেখানে পা দিতেই কানে আসে রেডিয়োর ঘোষণা, 'অস্ট্রেলিয়া ওয়ান্ হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি ফাইভ্ ফর টু।' আর ক্রিকেটে বিশেষ উৎসাহ না থাকলেও পাশে বসা লোকটিকে উৎসাহের সঙ্গে পরেশ বললে, 'ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ্ ফর টু! বাঃ বেড়ে খেলছে তো!'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সে হাঁফ ছাড়ে। সুবোধ ডাক্তারের অপ্রীতিকর সান্নিধ্য থেকে সরে গিয়ে সে এখন তার নিজের জগতে প্রবেশ করেছে।

দুই

'আজও এল না!' সুবোধ ডাক্তার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন।

'তাতে কি হোল! জলে পড়েনি তো।' প্রমদাদেবী খাটের পাশ থেকে উঠে এলেন। খাটের পেছনে এক কোনে ঠাকুর ঘর করা হয়েছে। খাটের নীচে পটল আলুর ঝুড়ি, কয়েকটা সজনের খাড়া মাথা বের করে আছে, খাটের আর এক কোনে কোন রকমে পাতা টেবিল, সেখানে নির্মলের ছোট ভাই পরিমলের পড়ার ব্যবস্থা। দেয়াল ভর্তি তেত্রিশ কোটি না হলেও প্রায় শ'খানেক দেবদেবীর ছবি আর ক্যালেন্ডার। দেয়ালের যে অংশগুলো ফাঁক সেগুলো আর কাঠের কড়ি বর্গার আশেপাশে নোনা আর ঝ্যাংলা। তার ওপর চুণকাম করার ব্যর্থ চেষ্টায় কোথাও কোথাও চাপড়া চাপড়া নীল, কোথাও কালো। বাইরে একটা কলের প্যাঁচ কেটে যাওয়ায় দিবারাত্র জল পড়ার শব্দ।

দেশ থেকে আনা বিশাল ভারী রং ওঠা আলমারীর ফাঁকে কাপড়ে উপচে পড়া আলনাটার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সুবোধ ডাক্তার বলেন, 'কি আছে সেখানে? আমার খালি ভয় হয় কোন সাধুবাবার পাল্লায় পড়ল কিনা!'

প্রমদাদেবী খাটের ওপরে এসে বসলেন। দুবেলা রান্নার ধকল পুজো আর্চা সেরে এই সময়টা তাঁর আধ ঘন্টার জন্যে ছুটি। খাটে বসেই বললেন, 'চিনি কিন্তু ফুরিয়ে গেছে।'

'ফুরিয়ে গেছে তা আমি কি করব?'

'তাহলে চা বন্ধ করে দাও।'

'তাই করব।'

'তুমি কোনদিন তাই করবে! ধার করে চা খাবে।' সুবোধ ডাক্তার সেদিকে কান না দিয়ে বললেন, 'নির্মলটা কোন সাধু টাধুর পাল্লায় পড়ল নাকি?'

'পড়লে তো ভালই। সিনেমা আর আড্ডার চেয়ে...' ঘুমে তাঁর চোখ জুড়ে আসে।

সুবোধ ডাক্তার এক গেলাস জল খেয়ে স্ত্রীর পাশে এসে বসলেন খাটে। একবার নিজের গালে হাত বুলোন আর চোয়ালের ছুঁচলো হাড়গুলো হাতে বেঁধে। 'প্রমোদ, আমি বড় বুড়ো হয়ে গেছি, না?'

'গাল ভেঙে গেছে বলেই বড় বিশ্রী দেখায়।'

'খুব রোগা হয়েছি কি?'

'কবে আর মোটা ছিলে?'

প্রমদার নিঃশ্বাস দ্রুত ওঠে পড়ে। কখনও কখনও মৃদু নাক ডাকার মতো আওয়াজ আসে। সুবোধ ডাক্তার একবার নিস্পৃহভাবে তাঁর ক্লান্ত স্ত্রী, খাট, আলনা, পটলের ঝুড়ি আর দেয়াল ভর্তি দেবদেবীর মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেলেন। হয়তো তাঁর স্ত্রীর মতো মেজাজ হলে মানসিক শান্তি পেতেন। তাঁর স্ত্রীকে বড় বেশী অভিভূত হতে দেখেন নি সুখেও না দুঃখেও না। তাঁর মতে দেশের হালচাল ঈশ্বরের ইচ্ছায় এক রকম চলছিল এখন আর এক রকম চলছে। সবই ভগবানের হাত। মানুষ কি করতে পারে! একথা তিনি এতবার শুনেছেন কিন্তু এ সান্ত্বনায় তাঁর অস্থিরতা কমেনি। অন্তত দাদার মতো মানুষ শাঠ্যের আশ্রয় নিতে পারে, ব্যক্তিগত উচ্চাশার চরিতার্থতা লাভের জন্যে সবরকম শয়তানীর আশ্রয় নিতে পারে।

বলা বাহুল্য দাদার এরকম রূঢ় সমালোচনায় শুধু পরেশই বিরক্ত নয়। প্রমদাদেবীও মাঝে মাঝে চটে ওঠেন, নির্মল মৃদু আপত্তি জানায়। নির্মল যুক্তি দেখায়, 'তোমরা বাবা স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করেছ আর জ্যাঠামণিকে সরকার চালাতে হয়। তোমাকে ঐ চেয়ারে বসালে তুমিও একই রকম হতে। তা না হলে থাকতে পারতে না।'

'আমি ও চেয়ারে......' অত্যন্ত অভদ্র কথা বলে ফেললেন সুবোধ ডাক্তার উত্তেজিত স্বরে।

নির্মল শান্তভাবে যুক্তি দেখায়, 'থিওরি আর প্র্যাকটিসে কিছু কিছু ফারাক থাকবেই। ভোটের জন্যে মানুষ যে সব প্রতিজ্ঞা করে তা মানতে গেলে সরকারকে দেউলে হতে হবে......তোমরা ভাবতে ইংরেজ তাড়ালেই দেশে স্বর্গ নেমে আসবে। দুশো বছরের জঞ্জাল তো একদিনেই সরানো যায় না।'

সুবোধ ডাক্তার ফুঁসে উঠেছিলেন, 'তুই যে তোর জ্যাঠামণির অ্যাসেম্বলি বক্তৃতা 'কোট' করছিস--সব হবে, আস্তে আস্তে হবে—একদিনে সব হয় না—সবই ঠিক আছে। গড্ ইজ ইন্ হেভেন্ অ্যান্ড অল থিংস্ রাইট ইন্ দ্য ওয়ার্ল্ড'।'

নির্মল আবার এতখানি যেতে পারে না। এতখানি যেতে তার নিজের বুদ্ধিবৃত্তি বিসর্জন দেওয়া বলে মনে হয়। আর পুরনো জামানার পিতা সংশয়কুব্ধ আধুনিক জামানার পুত্রকে ব্যঙ্গ করেন নির্মম ভাবে। 'আমার মনে হয় ভবেনের বদলে তুই তোর জ্যাঠামনির প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে যা। তুই ইংরেজি-টিংরেজি শিখেছিস, সূক্ষ্ম বিচার করতে পারিস। আর ও ব্যাটার পেটে বোমা মারলেও কিছু বেরোবে না।'

'এটা তুমি বাবা আমার ওপর অন্যায় কোরছ।' নির্মল আহত স্বরে বলে।

'তুই যে রাস্তায় যাচ্ছিস সে রাস্তা ঐদিকে।'

নির্মল চাপা উত্তেজনায় বললে, 'তোমার রাস্তায় যেতে গেলে আমার কমিউনিস্ট হতে হয়। আর কমিউনিস্টদের সঙ্গে আমার আউট-লাইনেই মিল। ভেতরে গেলে তাদের কথা আমি বুঝতে পারি না। তারা আমার কথা বুঝতে পারে না। বিশ্বেস করো, এই সুব্রত—একসঙ্গে খেলেছি পড়েছি। বিপদে পড়লে তার কাছে পরামর্শ নিতে যাই। ওরকম সৎ ছেলে আমার চেনা জানার মধ্যে একটাও নেই। কিন্তু এক জায়গায় আমরা একেবারে আলাদা।'

'কারণ তুমি অপরচুনিস্ট। তোমার ব্যক্তিগত উচ্চাশা আছে, তার নেই।'

'অপরচুনিস্ট নই, তবে হয়তো হব।'

সুবোধ ডাক্তারের উত্তেজনা দপ করে নিভে যায়। গভীর বিষাদের সঙ্গে ছেলের দিকে তাকান। যখন সরকারী চাকরি ছেড়ে নিজের ডিসপেন্সারী খুলে বসলেন তখন নির্মল তিনচার বছরের শিশু। আর সে যুগে বিবেকানন্দের লেখা লোকে খুব পড়ত। তাঁরও প্রায় মুখস্থ ছিল। তিনি মনে মনে আওড়াতেন, 'ইন্ডিয়া নিডস্ এ থাউজেন্ড বিবেকানন্দ।' তিনি নিজে হয়তো আর পারবেন না, কিন্তু ছেলেকে সেই নিরবিচ্ছিন্ন আপোষহীন সত্যের সংগ্রামে এক অতন্দ্র সৈনিক হিসেবে কল্পনা করে আনন্দ পেতেন। এই এক হাজার বিবেকানন্দ কিরকম ভাবে দেশ চালাবে, তাদের নিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি কিরকম হবে সে সম্পর্কে তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু তিনি মানসলোকে প্রত্যক্ষ করতেন এবং এখনও করেন সেই এক আশ্চর্য ভারতবর্ষ যেখানে মানুষের সাধনায় সত্যই শেষ পর্যন্ত জয়ী।

তাঁর সেই স্বপ্নের সুদূর প্রসারী অরণ্য অকস্মাৎ ন্যাড়া মাঠ হয়ে গেল যখন তাঁর দাদা রাজনীতিতে এলেন। প্রচুর অর্থব্যয়ে এক মারাত্মক নির্বাচনী সংগঠন তৈরী করে নদীয়ার গ্রামাঞ্চল থেকে অ্যাসেমব্লিতে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে এক ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হলেন। সুবোধ ডাক্তার চোখ রগড়ে সেই ন্যাড়া মাঠে শূন্য আকাশের নীচে ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন। তারপর নির্মলকে কেন্দ্র করে যেটুকু স্বপ্ন অবশিষ্ট ছিল তাও ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে।

'তোর স্বামিজীর কথা মনে আছে? স্বামিজী কি বলেছিলেন?' তিনি ছেলেমানুষের মতো বলে ওঠেন।

আর করুণামিশ্রিত হাসি আর সমবেদনায় নির্মলকেই বাপের মতো দেখাচ্ছিল। 'ওসব কথা আজকাল কেউ বলে না বাবা। ভোট পাবার সময় বলতে হয়, তারপর লোকে ভুলে যায়।' নির্মল শান্ত গলায় বলে।

'তাহলে......' সুবোধ ডাক্তার তাঁর হাতের কব্জি চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলেন, 'ইংরেজের হাতে এই মারের দাগগুলো মিথ্যে? আমরা অ্যাম্নি যা ভেবেছি করেছি সব আজগুবি? কতগুলো গর্ভস্রাবকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে নিজেদের সর্বস্ব দিয়েছি?'

'তুমি ভুল করছো বাবা। পাওয়ার করাপ্টস্। পাওয়ার নিলে তুমিও পাল্টে যেতে।'

'ডোন্ট এপ্ ইওর গ্র্যাঠামশি,' একেবারে ফেটে পড়লেন সুবোধ ডাক্তার। 'এ সব কথা স্বাধীনতা পাবার পর যে ব্যাঙের ছাতার মতো প্যাট্রিয়ট গজিয়েছে সারা দেশে তাদের বল। আমরা অমন রাজনীতিতে বিশ্বেস করিনি, করব না।'

'সুব্রতও বলে এ আজাদী ঝুঠা হ্যায়।'

'ঝুঠা তো বটেই। যে দেশে মিনিস্টারের চিঠিতে ছেলে ভর্তি হয় স্কুল কলেজে, চাকরির প্রমোশন হয়, সে দেশের আজাদী ঝুঠা নয়?'

'সব দেশেই হয়। আমেরিকাতেও হয়, রাশিয়াতেও হয়, বৃটেনেও হয়।'

'নির্মল, এটা আর্ম-চেয়ার পলিটিক্স্ নয়। দেশটা খুব একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। আমাদের সময় আমরা সবাই এ নিয়ে ভেবেছি, যাকে বলে আলোড়িত হয়েছি। আর তোরা কি করবি? খালি কেরীয়ার করবি, একে ওকে ধরে কয়েকশো টাকা ওপরে ওঠবার জন্যে প্রাণপাত করবি?'

'আমরা প্রোডাকশান করব, অর্গানাইজ করব, স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং বাড়াব।'

সুবোধ ডাক্তার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, 'ইউ আর লস্ট নির্মল। তোকে তোর জ্যাঠা-মণির মতো কথায় ভূতে পেয়েছে, আমাকেও পেয়েছে।......আর কিরকম সব মজার কথা বেরিয়েছে বাজারে! রোজ খবরের কাগজের পাতায় পাতায় কিলবিল করে। তুই কলেজ এক্সচেঞ্জ সেভ করবি না?'

নির্মল বিহ্বলভাবে বিদ্রূপে বিস্ফারিত বাপের চোখের দিকে তাকায়। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে বলে, 'তোমার বুঝতে পারছি না।'

'শুধু কথার চিড়ে ভেজে নারে, একবার দুচোখ খুলে মানুষের দিকে তাকা।'

'তাকাচ্ছি তো, কিন্তু তোমার মতো ভাবতে পারছি না।......অবশ্য বাংলাদেশের অবস্থাটা একটু বেকায়দার। তার জন্যে পার্টিশন দায়ী।'

'তার জন্যে দেশের লোক দায়ী নয়।'

'তবে কে দায়ী বল?'

সুবোধ ডাক্তার একটু চুপ করে থাকেন।

দেয়ালের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলেন, 'দেশের জন্যে মনের মধ্যে একটা স্বপ্নের দরকার আছে। শুধু এফিশিয়েন্সিতে তোর জ্যাঠামণি পর্যন্ত হওয়া যায়। আর বেশী কিছু হওয়া যায় না।'

তার বাপের এই শান্ত স্বর নির্মলের ভাল লাগে।

স্বামীর পাশে খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে প্রমদা তন্দ্রাচ্ছন্ন। কিন্তু তিনি ঘুমোচ্ছেন না। কিছুকাল হোল সন্ধের সময় সারাদিনের খাটুনির পর তাঁর অবস্থাটা এরকম হয়। এক প্রবল ঝিমুনির মধ্যে অতীত আর বর্তমান মিলে যায়। তিনি এখন যেমন খাটের ওপর ঝিমুতে ঝিমুতে আসলে মাছ কুটছেন ফরিদপুরে, তাঁদের গ্রামে বাঁধাবাড়ির উঠোনে। বঁটির ওপর উবু হয়ে বসে বসে তাঁর মাজা ধরে গেছে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তাঁর সুডোল কুড়ি বছর বয়সের ফর্সা হাত দুখানার দিকে নিজেই মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছেন। পাশে দুই জা-ও মাছ কুটছে। আটদশটা এক বিঘত কই একটার পর একটা আছাড় মারছে মাটিতে মেজো-জা আর গাল পাড়ছে, 'মরণ হয় না মাছের, মরণ হয় না মাছের।' সামনে তিন চারটে মাছের স্তূপ—রয়না, পাবতা, কালবাউস, ভেদা, কই, সরল পুঁটি......আরও যেন কি কি মাছ ছিল প্রমদার বিস্মরণ হয়েছে।

'উল্টে পড়বি, উল্টে পড়বি' প্রমদা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন।

সুবোধ ডাক্তার বিরক্ত হন। 'আবার ঘুমের মধ্যে চেঁচাচ্ছ? আবার মাঝ রাত্তিরে দেখি উঠে বসে আছো। তুমি একটা ভিটামিন খাও। ঐ তাকের ওপর আছে, কদ্দিন থেকে বলছি।'

আসলে প্রমদা তার মেজো জাকে সাবধান করে দিলে। সে নৌকো নিয়ে চলেছে পায়খানায় কিন্তু এমন খেয়ালী দাওয়া থেকে তার মোটা শরীর নিয়ে একেবারে ঝাঁপ খেয়ে পড়ল নৌকোয়। নৌকো টলমল করছে। সামলাতে গিয়ে একধারে কাত হয়ে পড়ল। দাওয়ার নীচেই একগলা জল। পড়লে কিছু না, মাছের মতো সাঁতরায় জা-টা, তবে এই ভোর বেলাতে তার অনেক কাজ, এখনি পুজোর জোগাড় দিতে হবে। 'উল্টে পড়বি উল্টে পড়বি', আবার চিৎকার দিল প্রমদা। না, সামলে নিয়েছে, বৈঠা বাইছে মেজো জা। তিরিশ চল্লিশ হাত দূরে জলের ওপর আমগাছগুলোর মাথা জেগে আছে। মেজো জা সেদিকে মিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ থেকে একটা মশা প্রমদার বাঁ গাল ডাক করে ঘুরছিল। এবার কামড়াতেই

চুলকোতে চুলকোতে উঠে বসলেন। জলে তারা বাঁধাঘাট মিলিয়ে গেল। ঘাটের পাশে সুবোধ ডাক্তার তাঁর টাক আঁচড়াচ্ছেন সযত্নে। দু'গাছি চুলের জন্যে তাঁর প্রবল যত্ন।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। 'কে?' টাক-আঁচড়ানো বন্ধ মুহূর্তের জন্যে। শব্দ মিলিয়ে যায় ওপরের দিকে।

'নির্মল কি গাঁজায় দম্ দিচ্ছে বরানগরে?'

প্রমদার তন্দ্রা ছুটে যায় খাড়ি ধরা নিয়মে। 'আলু নেই খেয়াল আছে?'

'নেই তো নেই'। দু'গাছি চুলেও ঢেউ দিয়েছেন সুবোধ ডাক্তার। তারপর দরজার ওপরেই বিবেকানন্দের ছবিখানার দিকে চেয়ে চোখ বুঁজলেন।

'কোথায় চললে?'

'সার্বজনীনে, বেটারা সেনগুপ্তকে বাদ দেবে।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'তাতে কি হয়েছে? তুমিও আমার কম্পাউন্ডারের মতো কথা বলছো? শোন...... স্টার থিয়েটারে নিভাননী প্লে করছে, আমরা রোজ যেতাম। এই যে এখন আর্ট করে খুব বিখ্যাত হয়েছে, যামিনী রায় গো। সবাই যেতাম এক সঙ্গে। নিভাননীর প্লে করতে করতে হাতে পায়ে খিল ধরেছে। আমরা গেলাম দলবলে গ্রীনরুমে। সেনগুপ্ত পা টিপে দিচ্ছে। আমাদের দেখল, একটু নড়ল না। একবার হাত উঠল না সেনগুপ্তর। একে বলে চরিত্রবল। এ কি অ্যাসেমব্লির বক্তিমা!'

সিঁড়ির ধোঁয়া ঠেলে একটা লোক উঠছে। 'মা, এলাম'। নির্মলের মুখখানা খুব তাজা। গঙ্গার ধারে তার এ-ক'দিনের স্বাস্থ্য সঞ্চয় যে মাঠে মারা যায়নি তা স্পষ্ট।

'কোন মাতাজীর শিষ্যটিষ্য হোসনি তো?' সুবোধ ডাক্তার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন।

প্রমদা চুপচাপ, মায়ের দিকে চেয়ে নির্মল হাসবার চেষ্টা করে। 'চুপ করে আছো যে?'

'তোমার মতো নেচে বেড়াব? বুড়ো বাপকে দিয়ে বাজার করাচ্ছি, খেয়াল আছে? একটু আলু নিয়ে এসো মোড় থেকে। এখনও খোলা আছে দোকান।'

নির্মল একবার বিহ্বল ভাবে তাকায় মা-র দিকে, তারপর বাজারের থলিটা হাতে বেরিয়ে যায়।

তিন

সাহিত্য পড়ানোর ব্যাপারে নির্মলের সামনে সবসময়ে এক অদৃশ্য বাধা থেকে যায়। এক প্রাতঃস্মরণীয় ইংরেজী অধ্যাপকের বিখ্যাত উক্তি,-ছাত্রগণ কলাবউসদৃশ, তার পক্ষে মানা মুশকিল। যে যুগে এক এক প্ল্যানে দেশ কঁহাত সামনে লাফ মারল তা গজ-ফিতে দিয়ে মাপা হয় প্রতি বছর সে যুগে সাহিত্য পড়ানোর আরও কোন দৃঢ় ভিতের প্রয়োজন। সাহিত্য চর্চার কি খুব প্রয়োজন? ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে, সাম্প্রতিক ইংল্যান্ড কিংবা রাশিয়ার তার হয়তো মানে থাকতে পারে। কিন্তু গত দশ-পনেরো বছরে মন্ত্রীদের কণ্ঠে, খবরের কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপনে, চাকরির জগতে এত বেশী টেকনলজির জয়যাত্রা স্বাগত এবং এতবার সাহিত্যভাবনা মানসিক আলস্যের নামে চিহ্নিত যে ছেলে ছোকরাদের বুক চিতিয়ে সাহিত্যপড়া কিংবা পড়ানোর ইচ্ছে না থাকাই স্বাভাবিক। তাদের কলেজে যারা

ইংরেজী সাহিত্য পড়ান পার্টি-কর্মী গৌতম সেন, বিদেশ-ব্যাকুল প্রদীপ্ত মিত্র, যে ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁচা কবিতা লেখে বাংলা রোমান্টিকে আর ভাবে বিষ্ণু দে সুধীন দত্তের পরেই আধুনিক বাংলা কবিতার তার স্থান, তারা কেউই বুক চিতিয়ে সাহিত্য পড়ায় না। নির্মল পড়ায়, মরীয়ার মতো। ডুবন্ত মানুষের চিৎকার তাই তার গলায় মাঝে মাঝে ধরা পড়ে।

বরানগর থেকে ফেরার কদিন পরেই নির্মলের এই 'ভাল করে পড়ানোর' সদিচ্ছার পরীক্ষা হয়ে যায়। কলেজের কালচে বাদামী দেয়ালগুলো চোখ নীচু করে পার হতে হতে তার কানে আসে ডেঁপো কণ্ঠস্বর, 'নির্মল খুব মাজা দিয়েছে দেখেছিস?' নির্মল সাঁৎ করে দেয়ালের কাছ থেকে সরে আসে। আরশোলারা পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাসী নয় তা কলেজের আবহমান কাল চুনহীন বর্ণহীন দেয়ালগুলোর গায়ে তাদের চাকবাঁধা বাসা দেখলেই মালুম হয়। ছেলেটা যে সোজাসুজি তাকে নাম ধরে ডাকেনি সে জন্যে নির্মল মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দেয়। তাছাড়া কাকেই বা সে দোষ দেবে। সেও তো একবার যখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিল তখন বাংলা অধ্যাপকের চাদর সজোরে টেনে ধরে বলেনি 'আপনার চাদরটা স্যার ফাইন?' নির্মলের বাইবেলের একটা লাইন মনে পড়ে, 'দা সেম্ মেশার উইল বি মিটেড আন্টু ইউ।'

এটা ছোট ক্লাস তাই বাঁচোয়া। সেই দুশো মাথা আর চারশো চোখের অপ্রতিহত দেয়ালে মাথা ঠোকা নয়। স্পেশ্যাল ক্লাস, যারা টেস্টে ভাল করেছে—কলেজের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সামনে তার সদিচ্ছার যাচাই হয়ে যাক। পনেরোটা ছেলের নাম ডাকতে বেশী সময় লাগে না। 'কবিতা প্রসঙ্গে একটা সাধারণ আলোচনা করব, এর সঙ্গে তোমাদের পরীক্ষার হয়তো কোন যোগ নেই......কিন্তু' (নির্মল একবার ঠোঁট কামড়ায়। কি দরকার ছিল শেলীর 'প্যানথিসম', কীটসের 'হেলেনিজম' ওয়ার্ডসওয়ার্থের আর একটা ইজম এই তো বাঁধাধরা রাজপথ যা তার প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপকেরা চওড়া ফাঁকা রেডরোডের মতো বিছিয়ে দিয়েছেন তাদের সামনে তার ওপর দিয়েই পঞ্চাশ মাইলে বেগে তার অধ্যাপনার গাড়ি উড়িয়ে যাওয়াই ভাল ছিল নয় কি?) একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলে 'তবে হয়ত সাহিত্যের ব্যাপারটা বুঝতে কিছু কাজে লাগতে পারে' (যেখানে পরীক্ষার নম্বর একমাত্র ছাত্র-শিক্ষকের মাঝেখানে সেতু সেখানে এ ধরনের আবেদন একটু অপ্রাসঙ্গিক নয়?)

নির্মল পেছন ফিরে বোর্ডে লিখতে থাকে :

> O Rose, thou art sick :
> The invisible worm
> That flies in the night
> In the howling storm

চকটা ভাঙে, একটা দুটো মন্তব্য কানে আসে, 'শুধু ওয়েস্ট অফ্ টাইম, আমরা পণ্ডিত হতে চাই না, পরীক্ষায় পাস করতে চাই।' নির্মল থমকায়। প্রয়োজন আছে এসব কথা বলার? একবার মুখ তোলে, বিরক্তি অবসাদ বিমূঢ়তা যেন সব চোখ ছেয়ে আছে। ছাত্রগণ কলাবউসদৃশ একবার মনে মনে আওড়ায় সে। করিডোরে যেন মহাশূন্যে গৌতম সেনের মুখখানা ভাসতে ভাসতে চলে যায়। 'আবার সেই সাবজেকটিভ্ ওয়ার্ল্ডে নিজেকে প্রোজেকশান? এ রোড দ্যাট্ লিড্স্ নোহোয়্যার।' গৌতমের সেই স্বাভাবিক পরম পিতার কণ্ঠ নির্মলের কানে বাজতে থাকে। নির্মল ঘুরে দাঁড়ায়। লোকাল ট্রেনে দাদের মলম বিক্রেতার গভীর স্থৈর্য ও বিনয় আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করে। ক্লাসের প্রতিকূল অবস্থায়

সে নিজেকে তাদের মনমওয়ালার পর্দায় দাড়ি কামিয়ে বল পেয়েছে। কবিতার মননের দর আজকাল পড়ে গেছে। বড় বড় বিজনেস হাউসের মহৎ সেই তার পেছনে। কিন্তু উইলিয়াম ব্লেক বা অ্যান্ড্রু মার্ভেল সাহেবের কবিতার মনন ও হাতকাটা তেল অনেক মনের রোগ সারাতে সক্ষম। তবে খুব সাবধান, নকলে বিশ্বাস করিবেন না। শেলীর প্যানথিজম, কীটসের হেলেনিজম এই সব বাঁধা গত নকলি মাল। এ হোল গৌতম সেনের রাস্তা, হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট হবার রাস্তা। এগুলো মুখস্থ করলে পরীক্ষায় পাশ করা যায় কিন্তু মনের রোগ সারে না। কবিতা আর বাড়ন্ত গাছ থাকে না, হয় বাসি বেলফুলের মালা। নির্মল আর একবার বুকভরে নিঃশ্বাস নেয়, আর একবার চক ভেঙে লেখে :

Has found out thy bed
Of crimson joy,
And his dark secret love
Does thy life destroy.

নির্মল তার কবিতার মনন বেচে, ইংরেজীতে নীচু গলায়। ছাত্রেরা প্রায় করুণার তার কথা শোনে যেমন লোকাল ট্রেনের যাত্রী নিজেদের কোন রসাল গল্প বিপন্ন করেও ক্যানভাসারের কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়। সামনের বেঞ্চে কয়েকজন ছেলে নোট নেয়। একটি ছেলে হুমড়ি খেয়ে লিখছে যেন নির্মলের প্রত্যেকটা কথা চাবি দিয়ে বাক্স বন্দী করবে। সেদিকে চেয়ে একটু মুষড়ে গেলেও নির্মল থামে না। 'একটা খুব প্রাথমিক কথা, ভাষা ও ভাবের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা আমরা আলোচনা করব। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবের উদয়, আবার একই যুগে বিভিন্ন মেজাজের কবি। বিশেষ কবির ব্যক্তিত্ব বিশেষ গঠন আশ্রয় করেছে এবং বলতে গেলে বিশেষ ভাষার সৃষ্টি করেছে। কবিতার এই কারণে মৃত্যু নেই কারণ তা যখনই সার্থক তখনই তা নতুন ভাব ও ভাষার সম্পৃক্ত সমন্বিত রূপ। একই প্রেম, একই মৃত্যু, একই ভগবদ ভক্তি—তার ওপরে উইলিয়াম সেক্সপীয়র, উইলিয়াম ব্লেক কিংবা অ্যান্ড্রু মার্ভেল। যেমন......নির্মল আবার বোর্ডের দিকে ফেরে। আবার পেছন থেকে চাপা গুঞ্জনের ঢেউ। নির্মল দেখেছে কথা বলা, হাত-পা নাড়ানো, চোখ তুলে চাওয়া এগুলো সব মিলে বোধ হয় মনের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করে, পিঠ ফিরলেই সে চাপ বেড়ে যায়। 'বড্ড বাড়াবাড়ি করছে রে......' বোধ হয় সেই সারা বছর গলায় মাফলার জড়ানো বয়স্ক ছেলেটার গলা। 'বড্ড ইনভলভ্‌ড, ঠিক পিনপয়েন্ট করতে পারছে না,' এটা নিশ্চয় অমলের —এ ক্লাসের বোধ হয় সবচেয়ে ভাল ছেলে। নির্মল আবার হোঁচট খায়, পিনপয়েন্ট মানে কি? এটা কি বিজনেস হাউসের বোর্ড মিটিং যেখানে তিনটে কি চারটে ড্রিলিং মেশিন বসাবার টেন্ডার ডাকতে হবে? আবার চক ভাঙে :

O, lest the world should task you to recite
('আমাদের আর তিন মাস বাকী আছে স্যার!')
What merit lived in me, that you should love,
After my death, dear love, forget me quite,
('ব্লেক্ স্টান্ট!' 'চালাকি করে মহৎ কাজ হয় না!')
For you in me can nothing worthy prove;
Unless you would devise same virtuous lie,
To do more for me than mine own desert,

নির্মল বরাহ বেগে ঘুরে দাঁড়ায়। গত তিন লাইন লিখবার সময় পেছনের বেঞ্চি দুটো ভেঙে যাবার জোগাড়। তালে তালে পা ঘষার সাথে সাথে গা দোলানো যেন কবিতার বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গত। উইলিয়াম সেক্সপীয়র তো দৌড় দেয়। নির্মল স্থির। আহত জন্তুর কাতরতা তার চোখে নেই, বরং সে এক বিক্ষুব্ধ পাহাড়। চোখে অবজ্ঞা, চিবুক আরো ছুঁচলো, ঠোঁটে বিদ্রূপ। এ অবজ্ঞা যেন সামনের অপ্রস্তুত ছেলেগুলোর দিকে চেয়ে নয়, যাদের পাগুলো এখনো ইতস্তত নড়ছে, যারা নির্মলের অকস্মাৎ মুখ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের অঙ্গ সঞ্চালনে ব্রেক কষতে এখনও অপারক। এ অবজ্ঞা তার নিজের দিকে চেয়ে। এই পা-দাপানি গা-দোলানি আর এখন এই মুখতোলা মোসাহেবী একগুলো যেন তার কবিতা পড়ানোর প্রকাণ্ড ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। এরই দর্পণে নির্মল নিজেকে দেখে একজন ব্যর্থ মানুষ। এরচেয়ে... ..নির্মল ভাবে. ....এর চেয়ে ভবেন গাঙ্গুলী হতে আপত্তি কি?

নির্মল ঘড়ির দিকে দেখে আর মিনিট দশেক বাকী। আর মিনিট দশেক তানা-না-না করে কাটিয়ে দিলেই চলে। কিন্তু নির্মল আজকের পরাজয় ঠিক মেনে নিতে পারছে না। সে ক্ষেপে উঠেছে। হঠাৎ ওয়ার্ডসওয়ার্থের ক্লাসিজম এর ওপর বক্তৃতা শুরু করে। 'ওয়ার্ডসওয়ার্থ টিয়ার্স ওপন্ এ প্যাসেজ টু ইনফিনিটি ষাই ট্রিভিয়াল থিংস্।' তারপর ইংরেজী শব্দের হীরক খণ্ড ছিটোতে থাকে যেমন: 'স্পেকট্রাল্ ফিগার্স গ্লবিং উইথ্ ট্রেমুলাস্ ভাইটালিটি, মেটাফিজিকাল পার্সেপশান অফ্ ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি, যা ইন্টুইটিভ্‌নেস অব ডিসকভারি গিভিং কমনপ্লেস্ এ টাচ অফ্ রোম্যান্টিক গ্ল্যামার।'

নির্মল মাতালের মতো বলে যেতে থাকে আর ক্লাসের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে যায়। ছাত্রেরা মাতালের মতো তার বাক্যসুধা পান করে। চারপাশ নিস্তব্ধ, শুধু খস খস করে লিখবার শব্দ। ছেলেবেলায় বাগবাজারে গঙ্গার পাড়ে এক ভাঁটিখানার স্মৃতি নির্মলের মনে অস্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে। যে সব শব্দের আসলে কোন প্রতিধ্বনি নেই, যেগুলো ঠাসা কবিতার কুঁড়ি নয়, রাত-জাগা বাসি ফুলের মালা, যা অনেক হাত-ফেরতা হয়ে আসছে, দশ বছর আগে যা তার মাস্টার মশাই বলেছেন তার তিরিশ বছর আগে কোন ইংরেজ সমালোচক বলেছেন সেই কাগজের গোলাপ অনেকের মতো নির্মল সাজায় তার ক্লাসে। আর চমকপ্রদ ফল ফলে। ছেলেরা দুর্ধর্ষ গতিতে লেখে, সশ্রদ্ধভাবে তাকায়। নির্মল ঘড়ির দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসে। তিন বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রের এটা অন্যতম প্রশ্ন। আবার নোংরা দেয়ালগুলোর দিকে তার দৃষ্টি পড়ে। শব্দের ভাঁটিখানায় বসে আছে তারা সবাই।

টিচার্স রুমে এসে নির্মল হাঁফায় পরিশ্রমের জন্যে নয়, ব্যর্থতায়। যেন তার সারাদেহ জুড়ে হাই ওঠে। গা এলাতে গিয়ে চেয়ারটার নড়বড়ে পায়া সম্পর্কে সজাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে গৌতম সেনের মুখখানা তার কাঁধের ওপর নেমে আসে, 'কি ব্রাদার ডনকুইকসোট, কি রকম রাজ্য জয় করছো?

তারপর শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত আজকাল তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে রকম দো-আঁশলা ভাষায় ব্যক্ত করে তেমনিভাবে গৌতম বলে যায়। 'এসব পিস্-মিল সলিউশান হয় না ব্রাদার। দ্য ফোরমোস্ট থিং ইজ রেভোলিউশান, আর বাকী যা সব তা হল ব্রতচারীর 'চল কোদাল চালাই'। সাহেবদের সময়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা যে রকম হাফ-প্যান্ট পরে কচুরীপানা তুলতে নামতেন সেই রকম আনরীয়াল।'

নির্মল আগেও তর্ক করেছে, কিন্তু তার ফলে দু-তিন দিন কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

গৌতমের কর্সা ধারাল মুখের বাঁকা বিদ্রূপের ধার ভাতে কমেনি। বিশ্বনের অজুহাতে বাস্টারমশাই ক্লাস করে পড়াবেন না বা গতানুগতিক ধারাই কেবল অনুসরণ করবেন এ যুক্তি নির্মল কোন কালেই মানতে পারবে না যদিও তার স্বাভাবিক মেজাজের ধারে এই অসত্যটা গৌতম আরও অনেক সত্য আর অর্ধসত্যের সঙ্গে বেশ মানানসই ভাবে মিলিয়ে দিতে পারে। সাম্যবাদ আর কাজে ফাঁকি দেওয়া এ-দুটো পাশাপাশি এতই বেমানান যে এ রূপটা নির্মলের কাছে দাঁড়ায় যেন দামী স্যুট-টাই-পরা আগাগোড়া তিলক-লেপা-কপাল কোন তামিল ব্রাহ্মণ যে ভুরুণ পণ্ডিতে ইংরেজী বলে অথচ যার কথা ইংরেজের কাছে প্রায় দুর্বোধ্য। অথবা নির্মল গৌতমের কথায় সাড়া না দিয়ে সিগারেটে টান দিয়ে ভাবে সাম্যবাদ আর আলস্যের বেতারে মিল তেমনি কি মিলে নেই তার সাহিত্য পড়ানোর অভিলাষ আর কলেজের পারিপার্শ্বিক?

'এসব না করে রাদার কলেজে একটা কালচারাল সাব-কমিটি করো,' গৌতম বললে।

এটা তার নতুন কথা। নির্মল চোখ তুললে, 'সাব-কমিটি'?

'হ্যাঁ, কলকাতায় গত ইলেকশানে ছাব্বিশটা সীটের মধ্যে এতগুলো সীট পেলে বাম-পন্থীরা যারা বেগুলি হলেও সাম্যবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু আমাদের ছাত্রদের দিক থেকে সেই সুচিত্রা সেন আর উত্তমকুমার, সাহিত্যেও সেই ইন্‌ফ্যান্টাইল ন্যাকামি। বাংলা বই মানে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির বিসর্জন, ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে তো প্রসঙ্গই ওঠে না, 'এ ডেড্‌ হোয়েল্‌ ওয়াশ্ড এশোর—আমরা কাকের মতো তার গা খুঁটছি।'

গৌতম যখন কথা বলে তখন নির্মল টের পায় তার রাজনৈতিক মতবাদের ঘোরতর বিরোধী হয়েও তাকে কেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এত খাতির করেন, ক্লাসে সম্পূর্ণ ফাঁকি দিয়েও সে কেন ছাত্রদের আর সহকর্মীদের এত প্রিয়।

'আচ্ছা গৌতম, তুমি এখানে পড়ে আছো কেন?' নির্মল গৌতমের লম্বা ফর্সা আঙুলগুলোর নাচানির দিকে চেয়ে চেয়ে বলে, 'তুমি যে দিকেই যাবে 'সাইন' করবে......'

'বিকজ্‌ আই বিলিভ্‌ ইন্‌ রেভোলিউশ্যান', এমনভাবে গৌতম বললে যেন সে 'ইন্টার-ভিউ' দিচ্ছে সাংবাদিকদের।

নির্মলের উৎসাহ দপ্‌ করে নিভে যায়। ক্লান্ত গলায় বলে, 'রেভোলিউশান মানে তো কালচারাল সাব-কমিটি, ক্লাসে ফাঁকি. . ..'

'তুমি সে ভাবে দেখতে পারো, কিন্তু আমরা দেখছি আমরাই পুরনো জঞ্জাল সরাচ্ছি, আমরাই দায়িত্ব নিচ্ছি দেশের ভবিষ্যৎ গড়বার সমস্ত স্তরে, শিক্ষক ছাত্র মধ্যবিত্ত শ্রমিক চাষী;—সমস্ত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পাল্টে গেছে—'হিস্‌ট্রি ইজ অন্‌ আওয়ার সাইড..... '।

''আওয়ার' মানে?'

'মানে আমরা, আমাদের পার্টি আমাদের ফ্রন্ট, সমস্ত ডেমোক্র্যাটিক পিপলস্‌ অফ্‌ দ্য ওয়ার্ল্ড......।'

নির্মল যেন বুঝতে চেষ্টা করে। তারপর আস্তে আস্তে বলে 'এ রকম জ্যাঠামশিও বলেন। বিশ্বেস করো, একদম এক কথা ;খালি তোমাদের ডেমোক্র্যাসিতে আমেরিকান সরকার পড়ে না আর জ্যাঠামশির ডেমোক্র্যাসিতে রুশ সরকার পড়ে না। কিন্তু তোমাদের বক্তব্য অবিকল এক। তোমরা দুজনেই সারা পৃথিবীর লোককে দুই বেহেস্তে নিয়ে যাচ্ছো।'

গৌতম হঠাৎ জ্বলে ওঠে, 'তোমার জ্যাঠামশির কথা বোল না। হি ইজ অ্যান্‌ ইডিয়ট্‌।'

নির্মলের মুখখানা কঠিন দেখায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'হতে পারেন। তবে

তাঁদের তোমাদের বক্তব্য এক।......আর সত্যিই তো,......আগামী কংগ্রেস সেশনের প্রস্তাব আর তোমাদের পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাব অনেক জায়গাতেই প্রায় একটু কথার অদল বদল। ......আমার কি মনে হয় জানো—তুমি হয়তো হাসবে—কথার মানেগুলো সব হারিয়ে গেছে, শুধু তার আওয়াজ আছে।'

গৌতম আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমার এসব হেঁয়ালী ফিলজফিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্শানে কিছু এসে যায় না। হিস্ট্রি ইজ ডিটারমিন্ড বাই কংক্রীট অ্যাকশান।'

'সে অ্যাকশানটা কি?'

'অ্যাকশান মানে......' গৌতম একমুহূর্ত ইতস্তত করে। নির্মল বললে, 'অ্যাকশান মানে জ্যাঠামণি বলবেন জন-জাগরণ, তোমরা বলবে গণ-আন্দোলন।'

'তুমি কি সত্যিই বলছো নির্মল, কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে, কংগ্রেস আর সমস্ত বামপন্থী পার্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই?'

'হয়তো কোথাও আছে, কিন্তু তাদের বক্তব্যে কোন অমিল নেই। দুজনেই ল্যান্ড রিফর্ম চায়। দুজনেই শিল্পের জাতীয়করণ চায়।'

'তারা চায় না, আমরা চাই।'

নির্মল সজোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে 'তা হয়তো বোঝা যাবে পরে—আজি হতে শতবর্ষ পরে। ইতিমধ্যে তোমরা দুই পক্ষ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একই কথা বলে যাচ্ছো। আমার কাছে তাই একটা কথাই মনে হয়।' নির্মলের ক্লান্ত মুখখানা উজ্জ্বল দেখায়। এতক্ষণ পর যেন সে কোথাও আশ্রয় পেয়েছে।

গৌতম বেজারভাবে বলে, 'কি কথা?'

'কথার মানেগুলো সব হারিয়ে গেছে। শুধু তার আওয়াজ আছে।'

চার

যদি বলা যায় চিঠির মধ্যে দিয়ে কোন মানুষকে পাওয়া তাহলে কথাটা বড় সৌখীন লাগে। কারণ এমনিতেই পাশাপাশি বাস করেও মানুষ কি পারে পরস্পরের মাঝখানে দুর্মর দেয়াল ডিঙোতে? সব সময়েই কি সে পরিত্রাণ করে না সে দেয়াল ডিঙোতে কিন্তু ঠিক যেন ডিঙোনো হয় না। শরীরের কোন অঙ্গের বৈকল্যে পাশাপাশি ঠিক আসা যায় না। অনেক ডনকুইক্সোট চেষ্টা করে যায়, সহস্র সহস্র সঙ্গম কিংবা লক্ষাধিক চুম্বনের মারফত, পাতার পর পাতা চিঠি লেখা কিংবা কাঁদাকাটি করে বাঁচার মারফত। কেউ কেউ আঁচড়ে কামড়ে হাঁই হাঁই করে মিলিত হতে চায়। কিন্তু এ যেন একটার পর একটা বাধার ঢেউ সামনে। কবিতায় বেশ ম্যানেজ দেওয়া যায়। লাখো লাখো যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু,— আহা যেন খবরের কাগজের ঝলমলে হেডলাইন, বগলে করে এখনি চায়ের দোকানে গিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু লাখো কেন এক যুগের মধ্যেই কি টানাপোড়েন, কি অন্তহীন পরিভ্রমণ, কি অবিশ্রান্ত মানসিক কুচকাওয়াজ। হিয়ে কি হিয়ার ওপর থাকে? থাকে না। যৌবনের তপ্ত রক্তের হাওয়া পাল্টায় প্রতি দশকে দশকে কিংবা তারও আগে। শুধু কি বিতৃষ্ণা অবসাদেই হিয়ে বিরূপ হয় হিয়ার ওপর? বরং হিয়া আকর্ষিত হয় ত্রিভুবনের নতুন নতুন প্রসাদে। যারা শব্দের কোন লৌহশাস্ত্রে সত্যকে আবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী তাঁরা বলবেন অস্তিত্বের এই কমিক কিংবা ট্র্যাজিক রূপের জন্যেই মানুষ আসলে একলা। কিন্তু

একথা কি বোকনা বা হুজুর লোক-না তা ঠিক সমাজতাত্ত্বিকের অভ্রান্ত যুক্তিতে বলা না গেলেও একথাটা বলতে বোধ হয় কোন বাধা নেই যে মানুষের মাঝখানে পরস্পর বাধা দূর করা খুব বেকায়দার ব্যাপার।

বস্তুত এসব কথা এমন কিছু আহা মরি নয় যে নির্মলের অজানা। চিঠিতে কাবিা করার তার ছেলেবেলা থেকে বিরাগ। এমনকি বোধ হয় করাচী কিংবা ঢাকা না হয়ে মেয়েটির চিঠি যদি দিল্লী কিংবা পাটনা থেকে আসতো তাহলে বোধ হয় তার প্রতিক্রিয়া অন্য রকম হোতই। যে বিধানে অকস্মাৎ একদিন রেডিয়োতে সে শুনলো আরও অনেকের সঙ্গে যে দেশের লোকের রান্নাঘর আর শোয়ার ঘরের মাঝখান দিয়ে প্রায় দড়ি টেনে দুটো দেশ বানানো হচ্ছে, আর কেউ লুঙ্গি পরে কিংবা ধুতি পরে, কেউ গরু খায় কেউ খায় না এই ভিত্তিতে একটা দেশ হঠাৎ দুভাগ হয়ে গেল, কতকগুলো লোক হঠাৎ পাগলের মতো ভাবতে আরম্ভ করল যে দেশের আর কতকগুলো লোকই সমস্ত অনিষ্টের কারণ তখন থেকেই দেশভাগের বিরুদ্ধে, প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিত মানুষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটা রাগ ছিল তার মনে। মেয়েটার চিঠি প্রথম থেকে তাকে টেনেছিল কারণ বাংলা দেশ সম্পর্কে মমতায় আচ্ছন্ন চিঠিগুলোর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন জ্বালা ছিল যা খুব ফ্যালনা নয়। সে জ্বালার হয়তো কোন অবয়ব নেই কিন্তু আরও অনেকের মতই নির্মল ভাবত এই জ্বালা হয়তো একদিন অবয়ব পাবে।

তাই যাকে বলে একটা 'হ্যান্ডিক্যাপ' রাজু পেয়েছিল। এই সুবিধেটা না থাকলে তার প্রথম দিককার আট-দশ পাতার বিরাট বিরাট চিঠি বোধ হয় নির্মল ঠিক দাড়ি কামাবার জন্যে ব্যবহার না করলেও বিশেষ পাত্তা দিতো না। তবে একথা সত্যি একেবারে মামুলী কমবয়সী ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে প্রায় প্যানপেনে চিঠির মধ্যেও মেয়েটার হঠাৎ হঠাৎ সাবালকত্বের ছাপ পাওয়া যেত। যেমন, 'আর এই লেখার বদ-অভ্যেস—এ যে কি অভিশাপ তা জানি আমি একা। লেখকেরা লেখে সৃষ্টির তাগিদে। আমার মতো বেহায়ার মতো লেখে কে? অর্থ নেই, উদ্দেশ্য নেই, কতগুলো অক্ষরের মধ্যে সান্ত্বনা হাতড়ে বেড়ানো। আচ্ছা নির্মলদা, দার্শনিকেরা স্মরণাতীত কাল থেকে দেহ থেকে আত্মার মুক্তি কামনা কেন করেছেন : আমি যে প্রতিটি মুহূর্ত বলি, হেই ভগবান, আত্মার কাছ থেকে মুক্তি চাই আমি। ওটার কাছ থেকে 'ফ্রেঞ্চ লীভ' নেবার চেষ্টা হয় বই কি যেমন নিজের অজান্তে লোকের কুৎসা করছি, যা বুঝেছিলে তার ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করছি কিন্তু কোথায় ভেতরে ঝিমিয়ে আসা চোখ পরমুহূর্তে ড্যাব ড্যাব করে তাকায় কেন? মানুষ এমন বাজে বাজে কথা বলেছে কেন জনমভোর—বলছে আঁধার থেকে আলো, ভুল থেকে সত। আমার মুশ্চু আমি যে দেখছি, ইলিউশান-এর মধ্যে, মনগড়া স্বপ্নের মধ্যেই ছিল বেঁচে থাকবার, লড়াই করবার প্রেরণা।'

আর একটা কথা চিঠির মধ্যে দিয়েও স্পষ্ট, মেয়েটা রুগ্ন। তার অসুখটা খানিকটা কমবয়সী মনের ফোঁপানি হলেও বেশ কিছুটা শারীরিক। মেয়েটা যে মনেপ্রাণে স্বাস্থ্য কামনা করে সেটাও স্পষ্ট। দৈহিক স্বাস্থ্য লাভের জন্যে এ রকম ছটফটানি নির্মলকে স্পর্শ করে। ঠিক প্রেমিকা নয়, অনেক সময় কোন অসুস্থ বোনের মতো লাগে মেয়েটিকে যে বিনিদ্র রাত জ্বরো চোখ মেলে কাটায়। আর এই স্বাস্থ্যের জন্যে তার আকাঙ্ক্ষাও মাঝে মাঝে তাকে বেশ একটা আটপৌরে চেহারা দান করে যেটা নির্মলের কাছে আকর্ষণীয়। যেমন সাম্প্রতিক কোন চিঠিতে সে লিখেছে—'আমাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতেই হবে। যন্ত্রণাহীন মাথা নিয়ে

অবকাশহীন রাতে ঘুমিয়ে উঠে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখা যে কতখানি, তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আর কিছু না থাকুক ওইটুকুই যথেষ্ট। নির্মল, দুটো মানুষের বিরতিহীন ভালবাসার টানাহেঁচড়ায় কত জীবনী শক্তি, কত অমূল্য তেজ ক্ষয় হয়, একে বাদ দিয়ে যদি আমি সুস্থ বোধ করি, আমাকে ঠাণ্ডা মৃত মানুষ বলবে তুমি? আমার বাঁচার পথ যদি হয় ঘাসপাতা আলোছায়া বই আর নিয়মানুবর্তিতা, আমাকে জড় বলবে তুমি?

তোমাকে আর অচেনা বা দূরের মনে হয় না। আর আমাকে বুঝেছো তো? আমরা নির্মল ওদের মতো হবো না যারা শুধু একটু নীড় বাঁধে, অবশিষ্ট স্বল্প জীবনীশক্তি খরচ করে ঘরকন্নার জন্য প্রয়োজনীয় শান্তির খোঁজে। বন্ধুত্বের জন্যও ঝুঁকি পোয়াবো আমরা। কষ্ট পাবো তৃপ্তি পাবার জন্যে। রাজী?'

বস্তুত নির্মল গত দু-তিন বছরে যেন মেয়েটির প্রতি বিদ্রূপের ভঙ্গী থেকে এমন এক মনোভাবের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে তাকে ঠিক ভালবাসা টালবাসা হয়তো বলা যায় না। কিন্তু এক প্রবল কৌতূহলে সে আবিষ্ট। আর তার এই আবিষ্টের ভাব তাকে কিছুদিন থেকে প্রায় অসামাজিক করে তুলছে। বালীগঞ্জ প্লেসে গিয়ে খুকুমণির সঙ্গে গল্প, তার বরের টাক পড়েছে কেন এই দুঃখের শরিক হওয়ার চেষ্টা, জ্যাঠামণির তাকে বিলেতে পাঠানোর আগ্রহ, তার বাবার হঠাৎ পূর্ববঙ্গের রেফিউজিদের জন্যে ক্ষেপে ওঠা, তাদের ক্যাম্প কলোনীতে গিয়ে বিনে পয়সায় চিকিৎসা, এমনকি তার বাবার গত কয়েক মাসের হার্টের অসুখ, নিঃশ্বাসের কষ্ট, কলেজে গৌতম সেনের কালচারাল সাব-কমিটিতে 'ধনতান্ত্রিক জগতের সংস্কৃতিচর্চা বনাম সমাজতন্ত্রে সংস্কৃতি বিকাশ' নিয়ে আলোচনা এর কোনটাই ঠিক নির্মলকে ধরে রাখতে পারেনি। এমনকি গ্রাম থেকে ফেরার পর সুব্রতর সঙ্গেও বিশেষ কথাবার্তা হয়নি। সুব্রতর উৎসুক চোখের দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। খালি ক্লাসে সে পাগলের মতো প্রায় চোখ বুজে 'মেটাফিজিকাল পারসেপশান্ অফ ইটার্নিটি', 'ইন্টিগ্রেটেড হোল', 'কো-রিলেশন অফ টাইম এ্যান্ড স্পেস', এইসব যে বাহারে কথাবার্তা প্রচুর ইংরেজী লেখক সমালোচকের দৌলতে বাজারে বেরিয়েছে, সেগুলো আউড়ে যায়। সেইসব কথাগুলো তার জিভ থেকে বার হয়ে মাঝে মাঝে হাত পা মুখ বার করে শূন্যে নেচে নেচে তার দিকে চেয়ে চেয়ে ভেঙ্‌চি কাটে। মুহূর্তের জন্যে নির্মল থমকে দাঁড়ায়, চোখ বন্ধ করে, আবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের অন্তর্নিহিত গতির চাপ বা মোমেনটামে ঠোঁট খুলে একটার পর একটা শব্দ ছিটকাতে থাকে। বাড়িতে ফিরে আসে একটা অভুক্ত লোকের মতো। তারপর বাপ ডিসপেনস্যারীতে বেরোবার পর নির্মল সেই চিঠির তাড়া নিয়ে বসে। আর সেই সব চিঠিগুলো পড়তে পড়তে তার চার পাশের নিরেট সত্য পরিস্থিতি এবং সেখানে সঞ্চারমান মানুষগুলো লাগে বায়বীয় আর যে অশরীরি অস্তিত্ব চিঠির লাইনে লাইনে নিজেকে জানান দিচ্ছে তাকে ধরা যায় ছোঁয়া যায়।

রাজু একটা ছবি পাঠিয়েছে 'বস্তু সেজেগুজে তুলেছি'--ফটোগ্রাফের পেছনে লেখা। মাথায় গড়ন ছোট মানানসই, সেইজন্যে বোধ হয় চোখ দুটো খুব বড় লাগে। আরও বড় লাগে মুখের হাঁ। মুখের হাঁখানা একটু বড়ই। পাতলা হালকা চেহারা, একটু বেশী হালকা, সমস্ত শরীরটা দেখা না গেলেও ঠিক স্বাস্থ্যবতী যুবতী ভাবা মুশকিল। সিল্কের শাড়ি না পরে একটা সাদা হাফ শার্ট পরলে বোধ হয় তাকে আরও মানাতো। কারণ তার ঘাড়, উৎসুক চোখে তাকানোর মধ্যে এমন এক পরিপাটির অভাব আছে যা তরুণী-সদৃশ নয়। মেয়েটি যেন নিজেকে দেখতে বলছে না নিজেই দেখতে চায়। সেই জানলার বাইরে তাকানোর

চোখ নির্মলকে যেমন একদিকে আকর্ষণ করে তেমনি একটু অবাকও করে। যেমন ধরা যাক, এয়ার হস্টেসদের চেহারা। তাদের পোশাকে চালচলনে একটা যেজো ছন্দ দেবার চেষ্টা। কিন্তু তাদের আলাদা চেহারা বেশ নিরীক্ষণ করেই নির্মলের মনে হয়েছে যে সেই কারিতকর্মা ভাবখানা ছাপিয়ে 'আমাকে দেখো' ভাবখানাই প্রবল। এ ভাবটা নারীদের এত অপ্রাণী যে এর অভাবে নির্মলের একটু যে খারাপ লাগে না তা নয়। যা এর চিঠিগুলো অবলম্বন করে তার মনের মাঝখানে যে একটা স্বপ্ন জমে উঠেছিল তা চোট খায়। মেয়েটার চেহারা এমন যে তাকে নিয়ে যেন বিশেষ স্বপ্ন দেখা যায় না। সে যা নয় এমন কোন ভূষণে তাকে ভূষিত করা যায় না অথবা তাকে নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করা চলবে না।

কিন্তু মাঝে মাঝে এই নিরবয়ব চিঠি আর ফটোগ্রাফের বিরুদ্ধে নির্মলের অন্তরাত্মা প্রবল বিদ্রোহ করে। সে চিঠি লেখা বন্ধ করেছে। তখন তার নীরবতা ঠাট্টা করে চিঠি এসেছে ওদিক থেকে। সে যে রাজুকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে তা বুঝি ধরা পড়ে গিয়েছে আর সেজন্য তাকে ঘন ঘন পরিহাস। আবার পরিহাসটা বোধ হয় অসুখের চাপে কিছু পরিমাণ সিরিয়াস হয়ে যায়। 'আমার বাঁচার পথ যদি হয় ঘাসপাতা আলোছায়া বই আর নিয়মানুবর্তিতা, আমাকে জড় বলবে তুমি?' তাহলে থাকো না চুপ করে। এই উদ্ভিদসদৃশ জীবন নিয়ে (উদ্ভিদসদৃশ কথা নির্মলের নয়, বোধহয় মার্কসের কোন চিঠি থেকে সে ব্যবহার করে), নির্মলকে কেন মিছিমিছি জ্বালাতন করা বছরের পর বছর তার অশরীরি উপস্থিতি দিয়ে - নির্মল মনে মনে যুক্তি দেখায়। সে প্রেত চায় না পরীও চায় না, সে চায় মানুষ। আর মানুষের যে বন্ধুত্বের প্যাটার্ন, যে ঘরসংসারের প্যাটার্ন তৈরী করেছে তার মাঝখানে সে চায় দাঁড়াতে। রাজু ঠিকই লিখেছে, দুটো মানুষের মাঝখানে বিরতিহীন প্রেমের টানাহ্যাঁচড়া......' কিন্তু তার আপত্তি তো এইখানে, এই অশরীরি যোগাযোগের সঙ্গে প্রেমেরও কোন যোগাযোগ নেই। রাজু একবার কলকাতায় আসুক। একবার তারা পরস্পর ভালভাবে কথা বলুক। তখনই বোঝা যাবে তারা পরস্পরের কাছে প্রয়োজনীয় কিনা। নইলে এভাবে দুজনের সময় নষ্ট করে লাভ? মহাপুরুষ হতে না পারুক সাধারণ মানুষের কাছেও জীবনের দাম সাংঘাতিক। নির্মল চায় তারা এভাবে নিজেদের শুধু ক্ষয় না করে। ঠিক এভাবে না হলেও সে তার মনের কথাটা জানাবার চেষ্টা করেছে তার চিঠিতে কিন্তু ঠিক সাড়া আসেনি ওদিক থেকে। 'এই যে তোমার চিঠির মারফত আমি বুকভোরে নিঃশ্বাস নেবার ভরসা পাচ্ছি, আবার একটু একটু করে পৃথিবীর দিকে তাকাচ্ছি, তার কি কোন দাম নেই?' তার নিশ্চয় দাম আছে কিন্তু......যাই হোক নির্মল নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে। যেন তার জীবনের একটা মস্ত বড় সমস্যার শেষ পর্যন্ত কিনারা হোল। রাজু আসছে। দিদিকে কলকাতায় আসবার জন্যে পাটিয়ে তারই সঙ্গে আসছে। নির্মল উৎসুক ভাবে চেয়ে থাকে সামনের শনিবারের দিকে। অ্যাদ্দিনে সে বুঝতে পারবে যে তাদের চিঠিগুলোর শব্দগুলো কি তার ক্লাসের প্রত্যহ সাজানো শব্দগুলোর মতই মৃত নিরর্থক না সে শব্দগুলো সত্যিই কথা বলে।

•

পাঁচ

ইস্টবেঙ্গল মেল প্রত্যেক দিনই লেট। এটা অবধারিত কারণ এ ট্রেনের যাতায়াত সাধারণ ট্রেন চলাচল নিয়মের বহির্ভূত। এতে যাঁরা চড়বেন তাঁরা ধরেই নেবেন রেলযাত্রীর

সাধারণ মর্যাদাটুকু তাঁরা পাবেন না। চেক্‌পোস্ট কাস্টমস্‌ কিংবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের যে কোন তকমা-আঁটা লোককে পান সিগারেট খাওয়ানো, ট্রেন থেকে যে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে না এই অবর্ণনীয় সুযোগটুকু দেবার জন্যে টিকিট ছাড়াও চা খাবার টাকা দেবার জন্যে প্রস্তুতি এ তো মামুলী ব্যাপার যেমন মামুলী ব্যাপার বাক্সতোরঙ্গ হাঁকড়ানো। কান থেকে যদি মেয়েদের মাকড়ি তুলে নেওয়া হয় কিংবা 'আপনার পেনটা তো বেশ' বলে কোনো কর্মচারী কোন যাত্রীর পকেট থেকে পেন উঠিয়ে নিজের পকেটে গোঁজেন তবু প্রতিবাদের কিছু নেই। এ সমস্তই বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক নয় কারণ শোওয়ার ঘর আর রান্নাঘরের মাঝখানে পাঁচিল তুলে দেশভাগটাই দেশের নেতাদের কাছে অস্বাভাবিক নয়।

এসব কথা নির্মল অনেকবার শুনেছে কিন্তু শেয়ালদা স্টেশনের নোংরা পরিবেশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এই সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সান্ত্বনা দেয় না। নির্মল নাকে রুমাল দেয়। প্ল্যাটফর্ম জুড়ে পূর্ব বাংলার বাস্তুহারা পুরুষ নারী ও শিশু। সম্প্রতি তাদের মধ্যে বসন্তের প্রকোপ বেড়েছে। সেজন্যে অথবা নানা জাতীয় দুর্গন্ধ চাপা দেবার জন্যে এন্তার ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়েছে সর্বত্র। আর সেই সব মিলে এমন একটা চাপা ভারি ধাতব গন্ধ সমস্ত প্ল্যাটফর্মে যে নির্মলের প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সেই অসহ্য ভিড়ে হঠাৎ 'হট্‌কে হট্‌কে' চিৎকার করতে করতে গর্জমান ইঞ্জিনের মতই কুলিরা ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে মাঝে মাঝে। শীত যাব যাব শুরু করেছে কিন্তু এরই মধ্যে অপেক্ষমান জনতার আরও অনেকের মতো নির্মল গল্‌ গল্‌ করে ঘামতে থাকে। এক সিগারেট কোম্পানীর বিজ্ঞাপন ভেসে ওঠে নির্মলের চোখের সামনে। চোঙা প্যান্ট পরনে প্রেমিক তার অস্বাভাবিক লম্বা পাদুখানা জুড়ে দাঁড়িয়ে প্রেমিকার সামনে, এক হাতে ফুলের তোড়া আর এক হাতের আঙুলে আলগোছে ধরা সিগারেট। নির্মল সিগারেট ধরায়।

গতকাল তার সঙ্গে সুব্রতর আলাপ হয়েছে। নির্মলের মনে হয় সে যেমন এক বায়বীয় অস্তিত্বের পেছনে ধাওয়া করেছে সুব্রতও কি তেমনি ছুটছে না এক অদৃশ্য অবাস্তব ভবিষ্যতের পেছনে পেছনে? তার ছোটার তবু এক অর্থ আছে। একটা রক্ত-মাংসের সন্ধানে। কিন্তু সুব্রতর এই পথচলা তো প্রায় আজভেঞ্চার। সুব্রত রাজনৈতিক পার্টিতে এসেছে কারণ দেশের মানুষের চেহারাটা সে বুঝতে চায় এবং সাধ্যমত সাহায্য করতে চায়। নির্মলের মনে হয় তারা দুজনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। তার সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সে যেমন খুঁজছে শব্দের বেড়াজাল ভাঙতে তেমনি সুব্রতরও চেষ্টা তাদের পার্টির কতগুলো লোহসদৃশ নিরেট সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নাড়া দিতে। অন্তত সুব্রত তার গ্রামের অভিজ্ঞতা ঠিক এইভাবেই বলেছিল নির্মলকে। গ্রামের 'পিপ্‌ল' ঠিক গৌতম সেনের 'পিপ্‌ল' নয়। সুব্রত যে গ্রামের অধিবাসী হয়েছিল তাদের অগ্রপশ্চাৎ আছে, তাদের সুখ-দুঃখ তাপ অতাপ বোধ আছে। কিন্তু গৌতম সেনের গ্রাম বা দেশের অধিবাসী কতগুলো কথার পুতুল। তারা গৌতমের পকেট থেকে বেরিয়ে নাচানাচি করে আবার গৌতমের পকেটেই ফিরে যায়।

আর যে কারণে সুব্রতর আচরণ নির্মলকে বিস্মিত করে তা হোল তার এই আজভেঞ্চার সম্পর্কে সে মুখচোরা নয়। সুব্রতকে শুধু মূঢ় ভাবার নয় প্রায় ওপরওয়ালার কর্তৃত্বে গৌতম ভর্ৎসনা করেছে এই সব 'পিপ্‌ল নিয়ে অ্যাব্‌স্ট্র্যাকশন্‌' করার জন্যে কিন্তু তাতে তার হুঁশ নেই। নির্মল তাকে খোঁচা দিতে সুব্রত একবার খালি বলেছিল, 'আমার হাজার রকম যুক্তি আছে আর্মার কোয়েলসলার হবার স্বপক্ষে, হাজার রকম যুক্তি পার্টিবাজি করার

বিরুদ্ধে। কিন্তু ভারতবর্ষ এত গরীব। এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আমাদের বাপুরা পারেন নি। আমাদের চেষ্টা করতে হবে।'

ঘামে শার্টের কলার ভিজে গেছে নির্মলের। মাজা ব্যথা করছে ঠায় দাঁড়িয়ে। পায়চারি করলে বোধহয় আরাম পাওয়া যেত। কিন্তু এই নরকে পায়চারি সৌখীন লাগে নির্মলের। হঠাৎ আপাদমস্তক অবসাদে সে আচ্ছন্ন হয়। এই অনিশ্চিত প্রায়-অপরিচিত একটা মানুষের জন্যে তার এই অপেক্ষা কি বালকসুলভ নয়? যে সমালোচকের বাঁকা দৃষ্টি সে সর্বক্ষণ সজাগ রাখতে সচেষ্ট সে দৃষ্টিতে নিজের দিকে তাকালে এই তিরিশ বছর বয়সে এক 'পেন ফ্রেন্ডের' জন্যে এতখানি উতলা হওয়া কি সাজে? তাছাড়া মেয়েটিকে সে যতদূর চিঠির মারফত জানে তাতে কোন প্যাটার্নে ফেলতে পারা মুশকিল। তাকে নিউরটিক্ বলে ফেলতে পারবে না, ভাবালু ভেবে নেকনজরে দেখতে পারবে না, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন কোন উৎসুক তরুণী ভেবেও কাছে টানতে পারবে না। বস্তুত রাজুকে সে যতবারই চিঠির মারফত শায়েস্তা করবার চেষ্টা করেছে ততবারই হার হয়েছে, ততবারই সে পিছলে বেরিয়ে গেছে। পাশাপাশি তারা দাঁড়ালেই কি সে ধরতে পারবে, কিংবা একেবারে সাদা বাংলায় বলতে গেলে, ধরে রাখতে পারবে? তাদের মাঝখানের বাধা কি শুধু
পাকিস্তান-হিন্দুস্তানের: আরও কি কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নেই?

তাছাড়া......এক বালকসুলভ আতঙ্ক নির্মলকে বিহ্বল করে। যেন এতক্ষণ সে মনের আনন্দে জল ঘাঁটছিল, এখনই কেউ আসবে তার ঝুঁটি ধরতে। মেয়েটার চেহারা কিরকম? ছেলেবেলার সেই অস্পষ্ট স্মৃতি বাদ দিলে একমাত্র সেই ফটোগ্রাফ। সেই ফটোগ্রাফখানাই তাদের এই নিরবয়ব সম্পর্কের মাঝখানে একমাত্র সেতু। কিন্তু এই প্রচণ্ড ভিড়ে যেখানে প্রায় প্রত্যেক মুখই একরকম, একই রকম ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, বিহ্বল সেক্ষেত্রে একটি কমবয়সী মেয়েকে সে চিনে নেবে কি করে? বরঞ্চ এই প্ল্যাটফর্মে একটা নতুন পুলিস কেস্ ঘটাবার সে সুযোগ দেবে না কোন অপরিচিত মেয়ের পেছনে ধাওয়া করে? উদ্ভ্রান্তভাবে নির্মল ফটোগ্রাফখানার কথা ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে মুখখানা মার্লিন ডিয়েট্রিচ্ কিংবা গ্রেটা গার্বোর হলেও এই ভিড়ে একইরকম লাগত। এই প্রকাণ্ড ভিড়ের প্রবল চাপে সমস্ত মানুষই উদ্বিগ্ন। এক ধূসর বিবর্ণ চাদরে মুখ ঢেকে যেন লোকগুলো চলেছে কিংবা দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তো গোয়েন্দা-বিভাগের কর্মচারী নয় যারা ফটোগ্রাফ পকেটে রেল-স্টেশনে এয়ারপোর্টে বন্দরে অপেক্ষা করে, গুধিনীনয়নে টেনে বার করে ফটোগ্রাফের সঙ্গে অপরিচিত মানুষের মুখের আদলের মিল। একটা ট্রেন থেকে একদল মেয়ে আর ছেলে নামল। ছেলেগুলোর পরনে ছুঁচলো পেন্টুলুন আর টেরেলিনের শার্ট। মেয়েগুলো হ্যাংলাটে হ্যাংলাটে, লম্বা লম্বা ঠ্যাংয়ের ওপর একরাশি পাছা জর্জেটের শাড়ি ঠেলে নিজেদের জানান দিচ্ছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে নির্মল উদ্বিগ্নভাবে চিন্তা করে এরই মধ্যে বোধহয় একজন তার মানসী। প্রাণপণ গোয়েন্দাসুলভ অভিনিবেশে দলটিকে দেখতে থাকে নির্মল। হঠাৎ 'হট্‌কে হট্‌কে হট্‌কে' করতে করতে মালপত্র মাথায় একটা গর্জমান ইঞ্জিন তার প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। নির্মল নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আর দাঁড়ায় না। ভিড় ঠেলতে ঠেলতে গেটের কাছে এসে পড়ে। যে রেলকর্মচারীটি এতক্ষণ ইন্টবেঙ্গল মেলের খবরাখবর দিচ্ছিল সে অন্যমনস্ক নির্মলের দিকে চেয়ে বললে, 'এখনও চল্লিশ মিনিট লেট।'

নির্মল দাঁড়ায় না। স্টেশনের বাইরে এসেই সে দক্ষিণমুখী একটা বাসে উঠে পড়ল।

'কি রাজকুমার, কোথায় ডুব দিয়েছিলে?' খুকুমণিকে আরও ফর্সা লাগছে, আরও

গোল দেখাচ্ছে তার চেহারা।

'বাড়িতে রুটি খাচ্ছো?' নির্মলের গলায় তার স্বাভাবিক বিদ্রূপ ফিরে আসে। সে যেন আবার চারপাশের বালকসুলভ আচরণে ফোড়ন করবার সুযোগ পেয়ে ভেতরে ভেতরে ধন্য হয়ে গেছে। খুকুমণির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসে। কিছুক্ষণ আগে শেয়ালদার ভিড়ের মধ্যে যে তরুণ উদ্দিপ্ত বিহ্বলতায় অপেক্ষা করছিল তার চিঠির বান্ধবীর জন্যে সে এক ভিন্ন দেশের লোক। তার সঙ্গে নির্মলের যোগ নেই।

খুকুমণি তার স্বভাবসিদ্ধ কেঁদো-আহ্লাদী গলায় কথা বলে, জিভ্ চাটে, মাঝে মাঝে দুর্দান্ত ইংরেজী বলে ফেলে। আর নির্মল তার পাশে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। এতক্ষণ পর তার চেনাজগতে সে ফিরে এসেছে।

'বোম্বাইয়ের এক কোম্পানী একটা ফুড বার করেছে, এই যেমন বেবিফুড তেমনি। এক মাসে তোকে তন্বী করে দেবে,' নির্মল কথা বলে আরাম পায়।

খুকুমণি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'তোমরা একটা কিছু করো বাপু। এ আর পারি না। দিনের পর দিন রুটি খাচ্ছি দোবেলা। দুপুরে চোখ ঠেলে ঘুম আসে। 'অনুরোধের আসর' শুনতে শুনতে চোখের পাতা জুড়ে আসে। খোকনটার বেশী বায়না নেই। এক পেট খাইয়ে দাও। তারপর নিজের মনে খেলতে খেলতে ঘুমোয়। আর এই বাড়ি করেছে বাবা, যেন হাওয়াখানা। সারা দুপুরটা ঘুমের সঙ্গে লড়াই করি। কি শাস্তি! তারপর আয়নাতে মুখ দেখি। গালটা আরও ফোলাফোলা, চোখের পাতা ভারি। একটা কিছু ব্যবস্থা করো বাপু।' একটুক্ষণ চুপ করেই খুকুমণি আবার উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওমা, তোমাকে আসল খবরটাই দেওয়া হয় নি!'

'বরের প্রমোশন?'

'বাবা বলেছে বুঝি?'

'জ্যাঠামণি বলবেন কেন? তোর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। আহ্লাদে যেরকম ফুলছিস!'

'ওমা সে কি কথা! কাঁদলেও ফুলব গো। ...আর ভাল লাগে না ভেবে ভেবে। ও'কেও বলেছি। মোটারা কি মানুষ না? মোটা হয়েছি, হয়েছি কি? তোমার কিসে কমতি হচ্ছে?'

'বিলেতে আজকাল কাকে বিউটি বলে জানিস তো?' নির্মলের গলায় আবার স্বাভাবিক বিদ্রূপ। 'যেসব মেয়েদের সামনেও কিছু নেই, পেছনেও কিছু নেই।'

'ওমা সে কি কথা গো! সে কি কথা!' খুকুমণি উপুড় হয়ে লুটিয়ে লুটিয়ে হাসে। আর সেই চোখ মুখ লাল করা হাসিতে নির্মলও যোগ দেয়।

'এত হাসি কিসের?' প্রবোধ সেন ঘরে ঢোকেন। নির্মলের ফুর্তিবাজ চটুল মেজাজ তাঁর পছন্দ। আস্তে আস্তে দেয়ালের গায়ে লাগানো আরাম-চেয়ারে গা এলিয়ে দেন।

'তোমার অ্যাসেম্ব্লির ঝামেলা চুকল?'

'হ্যাঃ! সব এক কথা। এটা হয় নি সেটা হয় নি। এই বারো তেরো বছর এক কথা! বেশ কথা বাপু। সামনের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জেতো। তারপর দেশ স্বর্গরাজ্য বানাও। কে তোমাদের বাধা দিচ্ছে?' প্রবোধ সেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন।

'সুবোধের বুকের ব্যথাটা সেরেছে?' চোখ বন্ধ করে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেন। তারপর নির্মলের জবাবের অপেক্ষায় না থেকেই বলেন, 'সব পাগলামি। ওরকম এঁদো পচা ঘরে সাধ করে কেউ থাকে!'

আবার নির্মল তার বাবা-জ্যাঠার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জগতের সামনে দাঁড়ায়। সম্প্রতি জ্যাঠামশির তরফ থেকে আক্রমণ লকাণীয়। তিনি কি কোন পুরস্কৃতপূর্ণ ব্যাপারে ন্যাং খেয়েছেন উঁচু মহলে, অভিষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় স্বাভাবিক হাসি হারাতে বসেছেন। গত কয়েকদিন যে কাগজ দেখা হয় নি সে কথাটা নির্মলের মনে আসে।

প্রবোধ সেন চোখ খোলেন। তাঁর মোটা জোড়া ভুরু তুলে ভাইপোর দিকে চেয়ে বলেন, 'আমাদের এই বাংলাদেশে আদর্শ আদর্শ করেই আমরা গেলাম। এই সব রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, এগুলো না হলেই আমাদের ভাল ছিল। আমরা এত পড়ে পড়ে মার খেতাম না চারপাশ থেকে। এর চেয়ে যদি আমরা গুঁড়ো সাবান, পেরেক, সুতোর কল—একটা যে কোন জিনিস যা লোকে দৈনন্দিন ব্যবহার করে, যা বেঁচে থাকতে লাগে—এমনি কোন জিনিস তৈরী করে বিক্রি করার কায়দাটা আয়ত্ত করতাম তাহলে এত দেউলে হতাম না। বাংলাদেশের কী হবে? যাদের দিয়ে কিছু হোত সেই সব ছেলে-ছোকরারা দিনরাত 'চলবে না চলবে না' করছে আর অন্য জায়গার লোকেরা ধীরে ধীরে আমাদের উৎখাত করে নিজেরা গেড়ে বসছে।'

'আপনি যে বাবার মতো বলছেন!' নির্মল অবাক হয়ে বললে।

'মোটেই না।' প্রবোধবাবু ভুরু নাচালেন, চোখ কুঁচকালেন। গলা চড়িয়ে বললেন, 'আমি যাদের কথা বললাম তাদের ফটো টাঙিয়ে রেখেছে সুবোধ দেয়ালভর্তি করে। সভা-সমিতিতে যখন বক্তৃতা করি তখন তাদের সম্পর্কে আমিও অনেক কথা বলি। তোমার বাবার চেয়েও ভাল বলি, কারণ ওগুলো আগে থেকেই তৈরী থাকে। কিন্তু ওর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না।'

নির্মল চুপ করে থাকে। ওকে সামান্য বিহ্বলও দেখায়। কোন লোক সম্পর্কে তার মনে মনে একটা দৃঢ় নকশা থাকে। তার জ্যাঠামণি তার মনের নকশা থেকে বেরিয়ে আসছেন। কথাগুলো কি সত্যিই জ্যাঠামণি বিশ্বাস করেন?

প্রবোধ সেন আবার নির্মলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'সত্যিই আমি বিশ্বাস করি না। কাল একটা পার্টিতে .. ঐ যে নতুন ইরিগেশানের সেন্ট্রাল মিনিস্টার,... ..বেঁটে কালো......কি নাম :.. .ওকে বলছিলাম -আই কন্‌সিডার ইট এ মিস্‌ফর্চুন দ্যাট্‌ বেঙ্গল ইজ টু বার্ডন্ড্‌ উইথ্‌ দ্য হেরিটেজ অফ্‌ নাইনটিন্থ্‌ সেঞ্চুরী। পশ্চিম বাংলা জবুথবু হয়ে বসে আছে আর সব প্রদেশ মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে। সব ব্যাপারে. কি গভর্নমেন্ট, কি বিজনেস্‌, কি পড়াশোনায়। দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম, ছেলেমেয়েগুলো দেখে প্রাণে বল এল। একেবারে সাহেব মেমের মতো ইংরেজী বলছে।'

জ্যাঠামণির শেষ কথাটায় নির্মলের সামান্য হাসি পেলেও ওঁর বক্তব্যের দৃঢ়তা তাকে স্পর্শ করে। আবার তার মনে হয় এ বক্তব্যের সঙ্গে তার একাত্মতা অনেকখানি। এ পথে চিন্তা করলে বোধহয় সুরাহার পথ ধরা যায়। এ বক্তব্যের পেছনে যে জ্বালা তা নিষ্ফল আক্রোশেই নিঃশেষিত নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর ভেতর থেকে সুবোধ ডাক্তার কথা বলে ওঠে, 'বাংলাদেশের ওপর দিয়ে তো কম ঝড় গেল না!'

'পাঞ্জাবের ওপর দিয়েও গেছে। দিল্লীর আশেপাশে পাঞ্জাবী রিফিউজিদের দিকে তাকাও আর শেয়ালদা স্টেশনে পড়ে-থাকা আধমরা লোকগুলো দেখো। একদিকে আত্ম-বিশ্বাস আর একদিকে ভিখিরীপনা।'

'এর জন্যে তো সরকারও দায়ী,' ফস্‌ করে বেরিয়ে পড়ে কথাটা।

প্রবোধবাবু আবার জোড়াভুরু কুঁচকালেন, 'বাবার কথা রিপিট কোর না নির্মল। তুমি নাবালক নও। নিজে যা ভাবো সেটা বলো। সরকারের হাজার রকম দোষ আছে। কিন্তু আমাদেরও নিজেদের দোষ নেই? সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি রিফিউজি নিয়ে ব্যবসা করছে, করছে না?'

'কেউ কেউ করছে।'

'সমস্ত পার্টি, সমস্ত পার্টি! প্রবোধ সেন কাউকে পরোয়া করে না। আজ ক্যাবিনেটে আছি। কাল দরকার হলে ছেড়ে দেব। ক্যালকাটা বার উইল্ ওয়েল্‌কাম মি উইথ্ ওপন্ আর্মস্।'

নির্মল চুপ করে থাকে। খুকুমণি উঠে গিয়েছিল। পাথরের গেলাসে এক গেলাস দুধ নিয়ে বাবার সামনে রেখে বললে, 'অতো চেঁচামেচি কোর না বাবা। ছোড়দা এলেই তুমি বক্তৃতা আরম্ভ করো।'

'আমরা আর কটা বছর! ওরাই তো ফিউচার।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'সুবোধ আর আমাদের সুব্রত চন্দর—একেবারে এক টাইপ। সেই পুরনো আদর্শবাদের এপিঠ ওপিঠ। ওর ঐ সখের গাঁয়ে ঘোরার আগে আমি ওকে বলেছিলাম, কমিউনিস্ট যদি হতে চাও বাবা, অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে যাও। সেখান থেকে কমিউনিস্ট হয়ে এলে লোকে মানবে। এখানে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরলে তোমায় কে পুঁছবে? আর তোমার বাপ......আমার কাছে সব খবর আসে নির্মল। ওকে বোল, অতো রিফিউজিদের সঙ্গে মাখামাখি না করতে। শুনলাম বাগজোলা ক্যাম্পে তোমার বাবাকে নিয়ে গিয়েছিল। তুমি জানো?'

নির্মল অস্পষ্টভাবে বললে, 'কি জানি, ঠিক জানি না। বাবার ডিসপেন্সারীতে অনেক ধরনের লোকই তো আসে!'

'মাঝে মাঝে যখন তোমার কথা ভাবি তখন মনে হয় তুমিও নিজেকে ওয়েস্ট করছো। ও'রা সজ্ঞানে করছেন, তুমি নিজের অজান্তে করছো......আমি বলছি না তোমার নিজের বাছবিচার নেই। তোমার সে ক্ষমতা আছে বলেই আমার দুঃখ হয়।'

ভাইপোকে এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, 'একটা বড় অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মে চাকরি আছে। করবে?'

নির্মল চোখ তুলে চায় তার জ্যাঠামণির দিকে। একবার ইতঃস্তত করে কি বলবে ভেবে। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রবোধবাবু বললেন, 'এখনই তোমায় কিছু বলতে হবে না। থিংক্ ওভার ইট্। মাসখানেকের মধ্যে বললেই হবে। ওরা বোধহয় বছরখানেক পরে একবার বিলেত ঘুরিয়ে আনবে। তারপর একটা হায়ার পোস্টিং-এ দেবে। এখনই তোমার কাছ থেকে জবাব চাচ্ছি না।'

প্রবোধ সেন উঠতে উঠতে বললেন, 'কাল আবার সকালে এয়ারপোর্ট। বার্মার নু আসছে। খাবার দিতে বল, খুকুমণি। দুদিন হোল একটু অম্বলের ভাব হয়েছে। খালি ভাত আর একটু মাছের ঝোল। ব্যস্!'

নির্মলও উঠে পড়ল। খুকুমণি বললে, 'বাঃ! তুমি বোস। আমি এখনই আসছি।' কিন্তু নির্মল সেদিন আর বসল না।

ছয়

দোতলা বাসের সিঁড়িতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় নির্মলকে। দেয়ালনার সেই ঘাম আর ভিড়ের দাঁড়িতে বাসে চরণদাসের মানুষের চাপে আবার জেগে ওঠে তার মনে। গোয়েন্দা-বিভাগে যেরকম মুখে রুমাল চেপে বা ঐ ধরনের কোন সঙ্কেত মারফত দুই অপরিচিত লোকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয় তেমনি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করলে কিরকম হোত? তার চিঠির বান্ধবী মুখে রুমাল চেপে বা খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে ট্রেন থেকে নামত আর অমনি সে ছুটে যেত অকুতোভয়ে। আসলে আত্মগ্লানিতে নিজেকে আরও করুণ বেকায়দাজনক দেখতে নির্মলের ইচ্ছে হচ্ছিল। রাজুর চিঠির সেইসব লাইনগুলো যা তার কাছে অত্যন্ত কাঁকন্ত বলে মনে হয়েছিল সেগুলো তাকে ভেঙচাতে থাকে। অনেকক্ষণ পর জানলার পাশে একটা সীট পেয়ে ধপ্ করে বসে পড়ে নির্মল। ফুরফুরে হাওয়ার চোখ জড়িয়ে আসে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নির্মল স্বপ্ন দেখে রাজু ট্রেন থেকে নামছে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে। নির্মল এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরতে গেল আর অমনি ভাঙা প্লাস্টিকের পুতুলের মতো রাজুর হাতখানা খুলে এল তার হাতে, প্লাস্টিকের মাথাটা ঘাড় থেকে আলগা হয়ে গড়াতে গড়াতে চলল। আর একটা রেফিউজি ছেলে কোথা থেকে দৌড়ে এসে ধাঁই করে তাতে এক সট লাগিয়ে দিলে। সেই মাথার একটা শূন্যে উঠে নির্মলের মুখে আচম্কা লাগতেই নির্মলের চট্‌কা ভেঙে যায়। বাসটা হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল। আর দুটো স্টপ পরেই পাঁচমাথার মোড়।

বাড়ির সামনেই একটা ছোট ভিড়। নির্মল সেদিকে খেয়াল না করেই এগোয়। পরেশ কম্পাউন্ডার তার দিকে শুকনো মুখে তাকাল। পাড়ার কতগুলো ছেলে যারা নিজেদের মধ্যে জটলা করছিল তারাও হঠাৎ কথা থামিয়ে দেয়। কেউ কেউ উৎসুকভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে। নিশ্চয় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা নিয়ে বিতর্ক চলছে, নির্মল ভাবলে। পাশ কাটিয়ে ভেতরের দিকে এগোচ্ছিল এমন সময় পাড়ার রতন পেছন থেকে বললে, 'দাদু অ্যারেস্টেড্ হয়েছে।'

'কে?' নির্মল চম্‌কে ওঠে।

পরেশ সামনে এসে বললে, 'ডাক্তারবাবুকে পুলিশ নিয়ে গেছে।'

'তার মানে?'

'আজ সকালে বাগজোলা ক্যাম্পে ফায়ারিং হয়েছে। চারজন লোক মারা গেছে। ডাক্তারবাবু গিয়েছিলেন ক্যাম্পে। ওখান থেকেই নিয়ে গেছে ওঁকে।'

নির্মল হতভম্ব হয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। পরেশ বলে যায়, 'পুলিশ ডাক্তারবাবুর নামে রায়টিং কেস্ ঠুকে দিয়েছে। ক্যাম্পে রেফিউজিদের গ্রেপ্তার করতে এলে ডাক্তারবাবু পুলিশকে বাধা দেন। সেই শ্রীদাম বেটা পুলিসে মরেছে।'

'জ্যাঠামণিকে জানানো হয়েছে?'

'না না, উনি মানা করে দিয়েছেন। আমি দেখা করেছি হাজতে। আমাকে বললেন, জেলখানায় তাঁর অভ্যেস আছে। কিন্তু ওঁর দাদাকে জানাতে বারবার নিষেধ করেছেন।'

পরেশের কাছ থেকে চাবির থোপাটা নিয়ে নির্মল সোজা ডিসপেনসারীতে এল। কোন ভুলতে খুকুমনি ধরল, 'কিগো, এত রাত্তিরে কেন?. বাবাকে? কেন? আমি তো আছি। আমি কি কিছু বুঝি না? বাবার মত কোন আসে আমাকেই ধরতে হয় দাদা।'

'জ্যাঠামণিকে বল্ বাবা অ্যারেস্টেড্ হয়েছেন।'

'সে কি গো! কি হবে?'

'কিছু হবে না। তুই বল্। আমি ফোন ধরে আছি।'

অনেকক্ষণ কেটে যায়। ফোন কানে দিয়ে নির্মল দেখতে থাকে দেয়াল ডেস্কের ফোকর আনাচকানাচ থেকে বেরিয়ে কীটপতঙ্গ কেমন মহোৎসবে মেতেছে। দেয়ালের ওপর ফর্ ফর্ করে আরশোলা উড়ছে। দুটো লম্বা বাদামী পোকা এতক্ষণ খুব মনোযোগের সঙ্গে একখানা খোলা ইংরেজী বিবেকানন্দের বইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়া নাড়ছিল। হঠাৎ আলোর আর শব্দে তারা স্থির হয়ে থাকে। তড়বড় করে এক জাঁদরেল টিকটিকি দৌড় মারে একটা মাঝারী সাইজের টিকটিকির পেছনে।

'কে নির্মল?' একবার গলা খাঁকারী দেওয়ার পর ভারী গলায় স্বর এল টেলিফোনে।

'কোথায়? বাগজোলায়? বেঙ্গল পোলিস্?......বড় রাত হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি আই-জি'কে ফোন করছি। ছোট বউকে বেশি ভাবনা না করতে।'

'পুলিশ রায়টিং কেস্ ঠুকেছে,' নির্মল একটু উত্তেজিতভাবেই বললে।

'তা তো করবেই, যার যা কাজ।.....সকালের মধ্যেই এসে যাবে।' প্রবোধ সেন ছেড়ে দিলেন। ঠং ঠং ঠং করে অযত্নে রিসিভার রাখার আওয়াজ আর তাঁর নিস্পৃহ গলায় নির্মলের খেয়াল হয় তার উত্তেজনা না দেখালেই ভাল ছিল। সত্যিই কি দরকার ছিল বাবার এই বৃদ্ধ বয়সে রেফিউজিদের নিয়ে মাতামাতি করার?

'কেন গিয়েছিলি ফোন করতে?' বাড়ি ফিরলেই মা বললেন।

'বেশ করেছি, খাবার দাও।'

নির্মল সে রাত্তিরে রাজুকে আবার স্বপ্ন দেখে। তারা দুজনে বসে আছে মাঠের মধ্যে অন্ধকারে। এদিকে সেদিকে আগুন জ্বলছে। গুলির আওয়াজও শোনা যায়। কিন্তু সে সব কিছু তারা শুনছে না, দেখছে না। পাশ ফিরতে চৌকিটা মচ্ মচ্ করে ওঠে। ঘাড় ফিরিয়ে টাইম পিসের দিকে চায়। সাড়ে তিনটে।

'বাবা কি ফিরেছে?' ঘুমের মধ্যে নির্মল জিজ্ঞাসা করে।

'না।' ও ঘর থেকে জবাব আসে। প্রমদা দেবী ঘুমান নি।

খুব ভোরে সুবোধ ডাক্তার ছাড়া পেলেন। সারা রাত্তিরে ঘুম হয় নি। আর সেই সঙ্গে ঘুমোয় নি থানার ছোকরা ও-সি নিবারণ মজুমদার।

নিবারণ তুখোড় ছেলে। পরীক্ষায় কখনও ফেল করে নি। তারপর কোন দেশবরেণ্য ফুটবল ক্লাবের বি টিমে একদা জোয়ান সেন্টার ফরোয়ার্ড। খেলা খেলা করে বাইশটা বছর কাটিয়ে যখন ক্লাবের এ টিমে যাবার আজীবন স্বপ্ন প্রায় সফল হতে চলেছে তখন সহসা বাপের মৃত্যু তাকে ছুটন্ত বলের গতিতে ধাঁ করে ছুঁড়ে দিল পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরের লাইনে। সেখানে একটা পুলিশী বিপ্লব ঘটিয়ে সে প্রথম রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষায় তাক্-লাগানো নম্বর পেয়ে ইন্সপেক্টর হয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি তারও উৎসাহে ভাটা পড়েছে। নিবারণ উপলব্ধি করছে, চাকরীর এক বিশেষ স্তরে উঠতে যে যাতবোত আয়ত্তের প্রয়োজন তা তার নাগালের বাইরে।

কাল রাত্তির বারোটায় একজন অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইন্সপেক্টর ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়েছে, 'স্যার, এস্-পি ডাকছেন আপনাকে।' আর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্কশ উষ্মিত গলায় নিবারণের কাছে একথা চাপা থাকে না—যে বুড়োটাকে তারা কাল

লোকেরা খুব শাসাচ্ছিল সে বেটা একটা ভি-আই-পি।

নিবারণ রাত্তির থাকতে থাকতে নিজের আলমারীতে তুলে রাখা কাপে চা পাঠিয়েছে। মোড়ের দোকান থেকে কিনে বাসি নিমকি আর লেডিকেনি পাঠিয়েছে গাঁটের পয়সা খরচ করে।

রাত্তিরে আবার মেজিয়া বিলের সামনে দুটো স্ট্যাবিং কেস্ ছিল। সে সব চুকিয়ে রাত বারোটায় শুয়েছে। পা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। কোন রকমে জোরে শরীরটা টানতে টানতে নিবারণ নিজেই চাবির গোছা হাতে নিয়ে হাজতের সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা রাত্তিরে যেমন বসেছিল তেমনি ঠায় বসে আছে। না-খাওয়া-চা আর মিষ্টি পড়ে আছে সামনে। প্রচণ্ড বিরক্তিতে নিবারণের মেজাজ আরও খারাপ হয়ে যায়।

চাবির শব্দে সুবোধ ডাক্তার মুখ তুলে তাকান। হাজতের দরজা খুলে নিবারণ হাঁক দিল, 'আসুন সার।'

রাত জাগার দরুন সুবোধ ডাক্তারের মুখখানা আরও ছুঁচলো দেখায়। টাকের ওপর কয়েক গাছা বেঁটে সাদা চুল খাড়া হয়ে আছে। 'কোথায় যেতে হবে?' বসা গলায় বলেন।

'আপনার বাড়িতে সার। আমাদের ভ্যান আনতে বলেছি। আমি দিয়ে আসব আপনাকে।'

'আমার বিরুদ্ধে যে রায়টিং কেস্'।

'ও সব কিছু নেই, বাইরে আসুন।'

সুবোধ ডাক্তার বাইরে এলে নিবারণ সামনের চেয়ারটা তাঁকে এগিয়ে দেয়। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরায়।

'আমাদের সার ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্টটা একটু ভুল ছিল। আপনার কষ্ট হোল। আর আমাদেরও এই মিছিমিছি ঝক্কি।.... .এবারে এক কাপ চা খান।'

সুবোধ ডাক্তারের আপত্তি না শুনেই নিবারণ চেঁচিয়ে চায়ের অর্ডার দেয়, 'বেশ ভাল করে গরম জলে কাপগুলো ধুয়ে দিতে বলবি।' তারপর আস্তে আস্তে ক্লান্ত স্বরে বললে, 'এখন সার জামানা পাল্টে গেছে। এখন হাতে ছুরিশুদ্ধ খুনীকে ধরলেও তাকে চেয়ারে বসিয়ে চা খাওয়াতে হয়। হয়তো কোন ভি-আই-পি'র ভাইপো বেরিয়ে পড়বে। কি দরকার ঝামেলায় বলুন। আবার মাঝরাত্তিরে ফোন, দৌড়দৌড়ি।'

'আপনারা ভুল করেছেন। আমার কোন আত্মীয়স্বজন নেই।'

নিবারণ হেসে বললে, 'আমি সবই জানতে পারব।......তবে সার একথাটা জানবেন, এই ভি-আই-পি-দের জন্যে দেশটার সর্বনাশ হচ্ছে। আপনি চোর ডাকাত ধরবেন না রাজনীতি করবেন?'

'আমি বলছি তো আমার কেউ নেই। কেন এসব কথা শোনাচ্ছেন?'

নিবারণ গম্ভীর হয়ে বললে, 'কেন বৃদ্ধ বয়সে মিথ্যে বলছেন? এই সেদিন, আমার এক বন্ধুর কথা শুনুন। বেচারা হাওড়ায় মদ চোলাইয়ের কারবারে হাত দিতে গিয়েছিল। চাকরী যায় যায় আর কি! কি করবেন বলুন আপনি? এখানে যে কটা মিল আছে সব কটার ম্যানেজমেন্ট গুণ্ডা পোষে। আমাদের একেবারে পাকা খবর। থানার চার্জ নেবার পর গত বছর দুটো গুম্ খুন হয়ে গেল। ধরলাম ঠিক। কেসে টিকল না। হাইকোর্ট থেকে জাঁদরেল সব ব্যারিস্টার নিয়ে এল মিল মালিক। মাঝখান থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের কড়া স্ট্রিকচার খেলাম।..... নিন, চা খান।'

নিবারণের কথা শুনতে শুনতে এতক্ষণ একটা চাপা রাগে সুবোধ ডাক্তার ফুলছিলেন। রাগটা তাঁর নিজের ওপর। এই যে হঠাৎ স্কুলের পড়ুয়া আর 'তুই' সম্বোধন বদলে দিয়েছিল চায়ের কাপ আর 'সারে' রূপান্তরিত হোল এই ম্যাজিকের পেছনের নির্মমের যাদুকর তাঁর দাদার হাত তিনি টের পেলেন। তবে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে একটু প্রকৃতিস্থও হলেন। গত চব্বিশ ঘণ্টায় তাঁর চারপাশে যে ঝড়ের মতো ঘটনা ঘটে গেল সেগুলো অনেকটা ধরতে পারেন এখন। কিন্তু বারে বারে হোগলার বনের মধ্যে শ্রীনাথের বিরাট লম্বা দেহখানার স্মৃতি তাঁকে বিভ্রান্ত করে দেয়। কাল পুলিশের সঙ্গে রেফিউজিদের খণ্ডযুদ্ধের সমস্তটাই তাঁর আজগুবি লাগে। সেই প্রচণ্ড চীৎকার, টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া, খোলা মাঠের মধ্যে ইতস্তত ছাউনিগুলোর এদিক ওদিক থেকে উদভ্রান্ত চীৎকার আর্তনাদ, তার দু-তিন ঘণ্টা আগে রেফিউজি নেতাদের আস্ফালন আর ঠিক ধীর গতিতে বাঁধের ওপর থেকে রাইফেল কাঁধে আস্তে আস্তে পুলিশ বাহিনীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নানা ছুতোয় তাদের সেখান থেকে কেটে পড়া—এ সমস্তটাই তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়।

'আমরা সার সব সময় আছি,—কংগ্রেসেও আছি, কমিউনিস্ট হলেও আছি। আমরাই সার পিপুল। আমাদের গাল দিয়ে কি হবে। লোক যদি চুরি করে, ডাকাতি করে, আইন ভাঙে, ছুরি মারে, মাতলামি করে, সোডার বোতল ওড়ায়, অন্যের স্ত্রী নিয়ে ভাগে—আপনি কি করবেন? গায়ে হাত বুলোবেন? গান্ধীজীর বাণী শোনাবেন, লেনিন আওড়াবেন? মানুষের স্বভাব পাল্টাতে পারেন?'

'দেশ কোথায়?' হঠাৎ চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে সুবোধ ডাক্তার প্রশ্ন করেন।

'দেশ? হ্যাঁ, আমিও রেফিউজি সার। দেশ ফরিদপুরে। তবে এখন তো পাকিস্তান মানে তুরস্ক।'

'পাকিস্তান মানে তুরস্ক?' সুবোধ ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে তাকালেন।

'তাছাড়া আর কি! ও দেশের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক বলুন। ও সব কথা ভেবে কি লাভ!'

'এখনকার ছেলেছোকরারা তাই বলে নাকি?'

'হ্যাঁ সার, বলতে বাধে কারুর। কিন্তু ঘটনাটা তাই।......আমাদের পক্ষে—যারা বয়সে কিছুটা বড়—তাদের পক্ষে একটু কষ্ট হয় বৈ কি! ছেলেবেলায় শ্মশানঘাটে নৌকো চুরি করে ও-পারে যেতাম ফুটবল খেলতে। চাঁদনী রাত্তিরে মধুমতী পার হওয়া! সঙ্গে একটা ছেলে ছিল—ফার্স্ট ক্লাস বাঁশী বাজাত......সে অন্য জিনিস।'

'ও কথাগুলো সব ভুলে যেতে পারবে?' সুবোধ ডাক্তারের ক্লান্ত মুখ সামান্য উত্তেজিত দেখায়।

নিবারণ যেন এতক্ষণ বড় বেশী কথা বলছিল সেই অনুশোচনায় নিজেকেই ধমকে ওঠে, 'লোককে তো খেয়েপরে বাঁচতে হবে।......ওসব কথা ভুলে গেছি।......আমাদের ছেলেরা একদিক থেকে অনেক ভাল হবে। এইসব দেশ কেশ নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

তারপর গত রাত্তিরে যে রকম কর্কশভাবে প্রশ্ন করছিল সেই রকম প্রশ্ন করে, 'আপনি ঐসব ক্রিমিনালদের মধ্যে গিয়েছিলেন কেন?'

'ডাক্তারি করতে?'

'আর কোথাও......' নিবারণ সামলিয়ে নেয় নিজেকে। 'যাক্ যাক্......বাদজোলা ক্যাম্পের রেফিউজিরা একেবারে ক্রিমিনাল টাইপ। অনেকগুলোর নামে কেস আছে।

ওদিকে আর যাবেন না।'

সুবোধ ডাক্তার হেসে উঠে বললেন, 'ফায়ারিং-এর কোন দরকার ছিল না। একেবারে ওয়ান্টনেস্‌। পুলিশ অনেক দেখেছি। কিন্তু এ রকম ভিড়কে ঘিরে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে প্রথম দেখলাম।'

'এ ব্যাপারে আর জ্ঞান দেবেন না।......মনে রাখবেন, ভি-আই-পি দাদা না থাকলে এ কেসে আপনাকে ছটি মাস জেল ঠুকে দিত ম্যাজিস্ট্রেট।......এখন চলুন। ভ্যান এসে গেছে।'

খোলা ভ্যানের কোণে ঝিমোতে ঝিমোতে সুবোধ ডাক্তার যখন বাড়ির দিকে চলেন তখন ভোরের আলো ভাল করে ফোটে নি। সারা রাত্তির অবসাদে, প্রায় গোটা দিনের অনাহারে তাঁর চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে যায়। মাঝে মাঝে কয়েকটা মুখ ভাসতে থাকে তার চোখের সামনে। গাড়িতে চলতে চলতে এক একবার তাঁর ভ্রম হয় তিনি বাবজোলা ক্যাম্পে রেফিউজিদের ত্রিপলের ডেরায় পাটকেতের সামনে বসে আছেন কি না। একটা ছবি মনের মধ্যে ভেসে উঠতে সুবোধ ডাক্তার এই গভীর অবসাদের নিজের মনে হাসেন। গতকাল ফায়ারিং-এর পর সদ্যবিধবা মহিলাটি যখন কোন স্থানীয় নেতার পায়ে আছড়ে পড়ল তখন তিনি অদূরে ডাক-করা ফটোগ্রাফারের দিকে চেয়ে আর মেয়েটিকে পা থেকে তোলেন না। ফটোগ্রাফার ছোকরাও সেয়ানা, সে আর ক্যামেরার শাটার টেপে না। আর সেই রোরুদ্যমানা নারীকে পায়ে রেখে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থাকেন ঠায় দু মিনিট। কি অবস্থা! গত চব্বিশ ঘণ্টার অভিজ্ঞতায় সুবোধ ডাক্তারের কাছে এ কথাটা একেবারে জ্বলন্ত যে মন্ত্রী, খবরের কাগজ, রাজনৈতিক পার্টির নেতা—সকলের কাছেই অক্ষম বিহ্বল এই মানুষগুলো আসলে পণ্য, নিজেদের সাফল্য আরও এঁটে বসানোর জন্যে এরা এক একটি নাট বল্টু।

'মাড্‌ল মাড্‌ল, আগাগোড়া মাড্‌ল', সুবোধ ডাক্তার বিড়বিড় করেন।

'পড়ে যাবেন মিস্টার সেন, পড়ে যাবেন। শক্ত করে বসুন।' আরও কি সব বললে নিবারণ। সুবোধ ডাক্তার বুঝতে পারেন, ছোকরা তাঁকে আপ্যায়িত করতে চায়।

শ্রীদাম পরশু এসেছিল তাঁর ডিস্‌পেনসারীতে। তার মেয়ের কুড়ি দিন হল জ্বর ছাড়ছে না, একবার তাঁকে যেতে হবে। একটু উদ্বিগ্নভাবে জানিয়েছিল তাদের দণ্ডকারণ্য পাঠানো নিয়ে একটা কি ব্যাপার চলেছে। 'আমরা কি কাগজ পড়ি। আমরা জানব?' শ্রীদামরা কাগজ পড়ে না, পড়লেও বুঝতে পারে না। দণ্ডকারণ্য পাঠানোর জন্যে সরকার চাপ দিচ্ছে আর রেফিউজি নেতারা--তাদের মধ্যেও আবার দু দল, বামপন্থী আর নমশূদ্র সমাজের এক মোড়লের দল। শ্রীদামের কথা শুনে মনে হয়েছে এরা দু দলই দণ্ডকারণ্য যেতে বাগড়া দিচ্ছে অথচ সোজাসুজি সরকারকে তাদের মতামত জানাচ্ছে না। এই তক্কে মোড়ল ভাবছে সে মন্ত্রীসভায় সেঁধিয়ে যাবে আর বামপন্থীরা ভাবছে এ এলাকা থেকে আগামী নির্বাচনে জিতেই নতুন সরকার স্থাপন করবে। গুলি চলবার পর অবস্থা শান্ত হলে একটা ঢ্যাঙা বুড়োর কথা মনে আসে তাঁর। যখন নমশূদ্র মোড়ল বলছেন, 'আমরা দণ্ডকারণ্যে যেতেও বলব না, বাধাও দেব না,' তখন সেই ঢ্যাঙা বুড়ো উবু হয়ে বসে থাকা মানুষগুলোর ভেতর থেকে লাফিয়ে উঠে বলেছিল, 'আপনারা একটা কথা বলেন স্যার। এত কথা বলবেন না। বলেন দণ্ডকারণ্য যাব কি যাব না, পুলিশ এলে রুখব কি রুখব না। এত কথা বললে সব গুলিয়ে যায়। বলুন, আমরা সার সার দাঁড়াই। আপনারা আমাদের

পর্দাজ করে যান।'

খোলা ট্রাকে হাওয়ায় টাকের ওপর ডাক্তারের লম্বা সাদা চুলের গুছি সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। জোরের হাওয়ায় তিনি একটু ঘুমিয়ে নিতে চান, কিন্তু পারেন না। সম্পূর্ণ নেতাহীন, রাজনৈতিক পার্টি, সমাজ সচেতন কর্মী বা সরকারের কর্মচারীর সত্ত্বেও সেই রাস্তা হাজার দু-তিনেক মানুষের ক্ষোভ হতাশা আর অন্ধবুদ্ধ নিষ্ফলক আক্রোশ সুবোধ ডাক্তারের বুকের ওপর চাপ হয়ে থাকে। যাদের আশ্চর্য সাহস আর আত্মনি ষ্ঠার কথা ছেলেবেলা থেকে তাঁকে মুগ্ধ করে এসেছে পূর্ব বাংলার সেই নমশূদ্র সমাজের মাত্র দশ বারো বছরের মধ্যেই এই ভূতুড়ে পরিণতি তাঁকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। কাল সকালবেলা যখন ক্যাম্পে ঘুরছিলেন, পাটের ক্ষেতের পাশ দিয়ে ওষুধের ব্যাগ হাতে উঁচুনীচু ত্রিপলঘেরা ঝোরাগুলোর ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা করছিলেন তখনও বিরাট লম্বা চওড়া খাঁচাওয়ালা কয়েকটা লোক দেখে তাঁর ছেলেবেলা ভেসে উঠেছিল মনের মধ্যে। লোকগুলোর চওড়া কাঁধ, কাঁধ, চামড়া গায়ের ওপর চল চল করছে। কয়েক বছরের ক্যাম্পজীবনের গ্লানি তাদের মুখে চোখে কিন্তু একটা গোঁ বোধ হয় এখনও তারা ছাড়ে নি। লাশগুলো একটার পর একটা হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়িতে উঠছিল তখন একটা কান্নার আওয়াজ তিনি শোনেন নি। গাড়িটা চলে যাবার পর ত্রিপলের গলামানুষ সমান উঁচু তাঁবুতে তাদের স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েগুলো গড়াগড়ি যায় ধুলোয়। একটা লোক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'পুলিশকে আমরা হটাইয়া দিছি, এই আমরা—এই বাঁশের চটা, বলে' লোকটা তার বুক চাপড়াল। সুবোধ ডাক্তার গভীর অবসাদের মধ্যে জেগে উঠলেন। এই ক্ষোভ আর প্রতিরোধের ভবিষ্যৎ কি?

হঠাৎ তিনি গভীর আত্মগ্লানি বোধ করেন। তাঁর ভাইয়ের একটা চালু বক্তব্য—পাঞ্জাবী রেফিউজি আর বাঙালী রেফিউজির তুলনামূলক সমালোচনা মনে পড়ে তাঁর বাগজোলা ক্যাম্পের নিঃসঙ্গ লোকটার মতো চীৎকার দিতে ইচ্ছে করে 'কি করেছ সরকারের বুড়ো খোকারা এই লোকগুলোর জন্যে?'—সুবোধ ডাক্তার সত্যিই চেঁচিয়ে ওঠেন।

নিবারণ ঝুঁকে পড়ে বললে, 'আমাকে বলছেন স্যার?......আর দশ মিনিট। এই এসে পড়লাম।'

সুবোধ ডাক্তার ঝিম্ মেরে বসে থাকেন। আর ভাবেন, লোকগুলো শুধু গুলির খোরাক, খবরের কাগজের খোরাক, আর প্যানপেনে সহানুভূতির খোরাক হয়েই থাকল। যেমন তারা ব্রাত্য ছিল তেমনিই থাকল।

নিবারণের গলা কানে এল, 'বাগবাজার স্ট্রীট এসে গেছে স্যার। এবারে কোন দিক?'

সুবোধ ডাক্তার তন্দ্রা আর অবসাদের মাঝখানে জেগে উঠলেন, আস্তে আস্তে বললেন, 'বাঁয়ের গলি।'

গলির মুখেই নির্মলকে দেখা গেল। নির্মল, পরেশ কম্পাউন্ডার, রতন, আরও পাড়ার দু-চারজন ছেলে দাঁড়িয়ে। ট্রাক থামতে নিবারণ হাত বাড়িয়ে সুবোধ ডাক্তারকে নামতে সাহায্য করে। কিন্তু তিনি নিজে নিজেই উঁচু পা-দানি থেকে প্রায় লাফিয়ে নামেন। নির্মল এগিয়ে এলে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'তুই একটা......'; বলতে যাচ্ছিলেন অকালকুষ্মাণ্ড। কিন্তু বোঁ করে মাথাটা ঘুরে যায়। পা টলে ওঠে। নির্মল বাপকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরে।

যা ভয় করেছিলেন সুবোধ ডাক্তার তাই সত্যে পরিণত হোল। কিছুদিন হোল ডিস্পেনসারীতে সন্ধের দিকে তাঁর নিশ্বাসের কষ্ট হোত, বুক ধড়ফড়ানি বেড়ে যেত। মাঝে মাঝে কার্ডিওগ্রাফ করার কথা মনে যে হয় নি তা নয়। কিন্তু যে অসুখের চিকিৎসা

নেই সে অন্ধের নির্বাচন করেই বা কি লাভ? বরং আজীবন যে গতিতে জীবনটা চালিয়ে এসেছেন তাতে হঠাৎ ছেদ পড়বে। আস্তে আস্তে হাঁটতে হবে। আর তাঁর স্বামীর জীবনাদর্শ অর্থাৎ এ পৃথিবীর সমস্ত ক্রিয়াকর্মই এক অমোঘ নিয়মে পরিচালিত এবং মানুষ নিমিত্তমাত্র গীতার এই প্রাচীন ও লোভনীয় মতবাদ মেনে নিয়ে টুক্ টুক্ করে বাকী কটা দিন কাটিয়ে দিতে হবে।

তাঁরই বন্ধুপুত্র যোতু হার্ট স্পেশালিস্ট হয়ে বিদেশ থেকে ফিরে খুব পসার করেছে। নির্মল তাকে ডাকে। এক্ষেত্রে ডাক্তারেরা যা করে থাকে যোতুও তাই করলে। বললে, 'শুয়ে থাকবেন না, হাঁটাচলা এখন একদম বারণ।'

বিলেত থেকে ফেরার পর যোতু ফিডেল কাস্ত্রোর মতো দাড়ি রেখেছে। লম্বা চেহারা, দাড়ি আর রিম্‌লেস চশমায় সে যখন খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল তখন প্রমদা দেবী তাঁর স্বাভাবিক সন্তান বাৎসল্যে সেই ঝকঝকে কয়েক হাজারী ব্যক্তিত্বের দিকে স্নেহের চোখে তাকিয়ে ছিলেন। 'কিছু ভাববেন না। জ্যাঠামশাইকে ছোটাছুটি করতে বারণ করুন। দেশে এত লোক আছে। নেতারা আছেন। তাঁরা দেশ ঠিক চালিয়ে নেবেন। অতো ভাবনার কি।'

চশমাটা নাকের ওপর তুলে একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে বললে, 'জ্যাঠামশাই, ইউ লুক্ টেন ইয়ার্স ইয়াংগার।'

বুকের যন্ত্রণা সত্ত্বেও সুবোধ ডাক্তারের হাসি আসে। পসার জমাবার সমস্ত বিদ্যাই ছোকরা আয়ত্ত করেছে।

যোতু নির্মলের দিকে চেয়ে বললে, 'একটা দিন বাদ দিয়ে আমায় ফোন করলেই হবে। আমি এসে দেখে যাব।'

তারপর চোখবোজা সুবোধ ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললে, 'আপনার সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকে কত গল্প শুনে এসেছি বাবার কাছে। মেসোপটেমিয়ার কোন্ ক্যাম্পে সাহেব পিটিয়ে ছিলেন। ইট্ সাউন্ডস্ লাইক্ এ ফেয়ারী টেল্।'

সিঁড়ি দিয়ে তড়বড় করে নামতে নামতে বললে নির্মলকে, 'মনে হচ্ছে স্ট্রোক। তবে আগের জামানার লোক। এখন তো চাল্লিশেই টেঁসে যায়। তুমি তোমার আড্ডাগুলো কমিয়ে এখন কদিন বাপের সেবা করো।'

সারা দুপুর সুবোধ ডাক্তার মড়ার মতো পড়ে থাকলেন। ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন, বোধহয় তার ঘোর। সেই ঘুমের মধ্যেই তিনি বাগজোলা ক্যাম্পের কোলাহল শুনতে পান। গুলি চলার পর সেই নিষ্ফল আক্রোশ চাপ হয়ে তার বুকের ওপর এঁটে থাকে। [illegible] তিনি ধুঁকতে থাকেন। বিকেলের দিকে একবার চোখ খুললেন। স্ত্রী খাটের পাশে পুজোয় বসেছেন। নির্মল এগিয়ে এসে এক ডোজ ওষুধ খাওয়াল।

স্ত্রী-কে বললেন, 'তোমারই জয় প্রমোদ। মনে হচ্ছে আমাদের কিছু করবার নেই।'

প্রমদা দেবী স্বামীর পাশে বসে তাঁর একখানা হাত ধরে থাকেন। আস্তে আস্তে বলেন, 'যিনি করবার তিনি করবেন।'

'সে তো তুমি ইংরেজ আমলেও বলতে,' হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে বলেন সুবোধ ডাক্তার।

'তুমি এখন কথা বোল না। কষ্ট বাড়বে।' প্রমদা দেবী স্বামীর টাকের ওপর চুল-গুলো সমান করে পেতে দেন।

এপাশ ওপাশ করতে করতে সুবোধ ডাক্তারের ঘুম আসে। বোধহয় বিপদ কাটল। কিন্তু এমন স্থির হয়ে শুয়ে আছেন যে পাশের ঘর থেকে সেদিকে চেয়ে নির্মলের ভয় করে।

আছে নাক আর কপাল আরও ধারাল লাগে যেন তা অজন্তাদের কিছু নয়। রাত্তিরে ঘরের মধ্যে উঠে কয়েকবার নির্মল এঘরে আসে। প্রমদা দেবীর স্বামীর এক হাত ধরে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। নির্মল আরও কাছে আসে। শুধু ধীরে ধীরে সুধীর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে।

সাত

পরদিন সকালে ডাক্তারকে সুস্থ দেখায়। তিনি সেদিনই ডিস্‌পেন্সারীতে যাওয়া মনস্থ করেছিলেন তবে নির্মলের ঘোর আপত্তিতে আর কোথাও বেরোলেন না। নির্মলের বইয়ের তাক থেকে মলাট-ছেঁড়া "পিক্‌উইক পেপার্স" পড়তে লাগলেন। নির্মলের দেরীতে ক্লাস। কলেজ কামাই করবে কি না ভাবছিল, সুবোধ ডাক্তার বললেন, 'খোঁতু আর কি বলবে! আমি বলছি, আই অ্যাম্‌ অল্‌ রাইট।' একটু থেমে বললেন, 'যদি কিছু হয় কেউ কিছু করতে পারবে না। তুই যা।'

দুপুরেও আজকাল ট্রাম খালি থাকে না। তবে সেদিন দৈবাৎ একটা সীট পাওয়া গেল। নির্মল বসে পড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যদিও হৃদযন্ত্রের প্রক্রিয়া দুর্জ্ঞেয় তবু সকালে তার বাপের চেহারা দেখে তার চিন্তাটা একটু কেটেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে সে যে একজনের হঠাৎ আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিল ভাবতে আশ্চর্য লাগে। চারপাশের বাস্তবটা এত জীবন্ত যে তার চিঠির মানসী সম্পর্কে তার অনুভূতিগুলো সৌখীন ঠেকে বৈ কি। তার বাপের দেশ সম্পর্কে যে বিরাট হতাশা এবং তার জ্যাঠামশির প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার পাশে তার অশরীরি মানসীর জন্যে প্রতীক্ষা জোলো লাগে না? নির্মল আত্মগ্লানিতে অধীর হয়ে ভাবে এই প্রতীক্ষার চেয়ে গৌতমের কাল্‌চারাল সাব-কমিটিতে মেতে থাকাও ভাল।

মন্থরগতিতে ট্রাম থেকে নামে নির্মল। আবার সে কথার ঝাঁপিখানা খুলে বসে। এক এক ভাঁড় করে শেলীর প্যান্‌থিজম্‌, কীট্‌সের হেলেনিজম্‌ ছেলেদের সামনে রাখে। আবার উইলিয়াম সেক্সপীয়রের বাণীও বিতরণ করতে হয়। বাংলাদেশ কেন সেক্সপীয়র নিয়ে মাতামাতি করেছিল নির্মলের আজকাল এ প্রশ্নটা বড্ড বেশী খোঁচা দেয়। সাহিত্য কিংবা ইংরেজী সাহিত্য মানেই যেন সেক্সপীয়রের কতগুলো নাটকীয় লাইন। তারপর লাফ্‌ দিয়ে বাঙালী পাঠক চলে আসে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে, কিছুটা শেলীতে, আর যারা ভীষণ আধুনিক তারা [illegible]টস্‌-এলিয়টে। এই অসংলগ্নভাবে সাহিত্য পড়া এবং পড়ানোর ব্যবস্থা ভীষণ ফোঁপরা লাগে নির্মলের [illegible]ছে। এমন যোগসূত্র মনের মধ্যে গেঁথে তোলার কোন চেষ্টা নেই যাতে বিভিন্ন মেজাজের লেখকদের বুঝতে সুবিধে হয়।

তবে নির্মলের সুমতি হয়েছে। এসব বিপজ্জনক কথাবার্তার ইঙ্গিত সে আর লেকচারে দেয় না। সেদিনও পর পর দুটো ক্লাসে কথার তুবড়ি ফুটিয়ে নিরবচ্ছিন্ন অবসাদে গুম্‌ হয়ে বসেছিল টিচার্স রুমে। আবার গৌতমের ধারাল বিদ্রূপমাখা মুখখানা ভেসে ওঠে। 'ফোনে ফেমিনিন্‌ ভয়েস্‌।.....এর আগেও করেছিল। নাম বললে না।' আবার সেই ওপরওয়ালার হাসি হাসলে গৌতম।

আর নির্মল এতক্ষণ ট্রামে আসতে আসতে যে আত্মগ্লানিতে ভরে উঠেছিল, যে গ্লানিতে হঠাৎ স্বপ্নজগৎ থেকে সটকেছিল, সে গ্লানি কোথায় উড়ে যায়। গৌতমের চাহনি ভ্রূক্ষেপ না করেই সে পাশের ঘরে প্রায় দৌড়ে যায়।

'হয়তো কে?'

'আমি রাজু' খুব চাপা গলা।

নির্মল চুপ করে থাকে। চিঠিতে অশরীরি মনে হোক কিন্তু এবার আরও অস্বাভাবিক লাগে এত বেশী পরিষ্কার গলা।

'আমি সেদিন......' নির্মল শেয়ালদা থেকে তার পালানোর বৃত্তান্ত বলতে চায় কিন্তু নিজের কাছেই হাস্যকর লাগে।

'বলতে হবে না......বুঝতে পারছি। তবে না এলে বোধহয় বুঝতে পারতাম না কি অ্যাব্‌সার্ড ব্যাপারটা।......আমরা পরশু সকালে চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় উঠেছো?'

'হোটেলে।' রাজু শেয়ালদার একটা হোটেলের নাম করে। নামটা শুনে নির্মল একটু চম্‌কে যায়। নারীঘটিত মামলার ব্যাপারে কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে আইন আদালতের কলামে নামটা বেশ কয়েকবার দেখেছে।

'ওখানে কেন?'

'গ্র্যান্ডে উঠবার পয়সা নেই।'

নির্মল আবার চুপ করে থাকে। একবার ভাবে সামনা সামনি বসে থাকলে কি রাজু এমনভাবে বলতে পারত।

তারপর লোকে যেমন কিছু বলার না থাকলে বলে, 'কি খবর?' তেমনি ভাবে জিজ্ঞেস করে, 'আজ সকালে কোথায় গিয়েছিলে?'

'থানায়।'

'সে কী?'

'জানা ছিল না বুঝি? আমারও অনেক কিছু জানা ছিল না।......এটা বেশ গল্প লেখার মতো হোল। এত কাণ্ডকারখানা করে এলাম। এসে দেখি ফক্কা!'

নির্মলের এতক্ষণ যা মনে হচ্ছিল এবার তা ঠিক বুঝতে পারে। এটা যে তাদের প্রথম পরিচয় তা তার মনে হচ্ছিল না। ফোনের মারফত থাকায় এ যেন তাদের চিঠিরই আর একখানা চিঠি। সেজন্যে অন্তত রাজুর তরফ থেকে প্রথম পরিচয়ের জড়তা একেবারেই নেই। সে তাকে মনের আনন্দে আর একখানা চিঠি লিখছে, আত্মবিশ্লেষণ করছে।

'এখন আমার ক্লাস নেই। এখন থাকবে?'

'এখন? না না, আমরা এখনই ব্যাঙ্কে যাচ্ছি।'

নির্মল বিহ্বল হয়ে চুপ করে থাকে।

'থানা, ব্যাঙ্ক—খুব হেঁয়ালী লাগছে, না? থানায় গিয়েছিলাম হাজিরা দিতে। হিন্দুস্থানের লোকেরা আমাদের ওখানে গেলেও এমনি হাজিরা দেয়। আর মাত্র পঞ্চাশ টাকা সঙ্গে আনতে দিয়েছে। ব্যাঙ্কে নিয়ে যাচ্ছে দিদির এক বন্ধু। যদি আর কয়েকটা টাকা পাওয়া যায়।'

'সন্ধেবেলা?'

'থাক্‌ না। চিঠি আর ফোন—এই করেই ফিরে গেলে হয় না?'

ওদিক থেকে কট্‌ কট্‌ আওয়াজ আসে। একটা অচেনা গলাও শোনা যায়। নির্মলের সন্দেহ হয়, কেউ আড়ি পাতছে। তাড়াতাড়ি বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আমি সন্ধে ছটায় যাব। থেকো কিন্তু।' ওদিক থেকে সম্মতির অপেক্ষা না করেই রিসিভার নামিয়ে রাখে।

কোন ছেড়ে চুপ করে বসে থাকে নির্মল। রাজু যেন ধাপে ধাপে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এখনও সে বারবীর, অদৃশ্য। কিন্তু তার কথা কানে এসে বাজছে। আর চিঠিতেও তার যে দুরকমের মেজাজ সে পরিচয় কোনোও এল। রাজুর শেষ কথা, 'চিঠি আর কোম— এই করেই ফিরে গেলে হয় না?' নির্মলের কানে বাজতে থাকে। আর কিছুক্ষণ আগে তার আশেপাশের পরিবেশ যেরকম প্রত্যক্ষ জীবন্ত মনে হচ্ছিল তা আর লাগে না। বস্তুত আরও একটা প্রত্যক্ষ জীবন্ত সত্য শেয়ালদার সেই কুখ্যাত হোস্টেলে আরও দুটো দিনের জন্যে আছে।

ছটা বাজবার আগে নির্মল যে সেদিন কি কি করেছিল তা তার খেয়াল নেই। একটা ক্লাসে সে প্রায় চোখ বুজে উইলিয়াম সেক্সপীয়রের সর্বগ্রাসী প্রতিভার ওপর অনবদ্য বক্তৃতা করে ফেলে কারণ আত্মসচেতনতার দংশন ছিল না তার মধ্যে। সে তখন সেক্সপীয়র সমালোচকদের প্রদর্শিত সমস্ত অলিগলিতে স্বচ্ছন্দ বিচরণে অভ্যস্ত। এমনকি দু'তিনজন ওস্তাদ ছোকরা যারা সে পেছন ফিরলেই 'নির্মল কিরকম মাজা দিয়েছে দ্যাখ্' এরকম মন্তব্য করতে অভ্যস্ত তাদের মনোযোগও আকর্ষণ করে। প্রায় গৌতমের আত্ম-বিশ্বাসে সে ক্লাস নেয়। খুব কিছু পরিশ্রম বোধও হয় না। আসলে নির্মল তার আর একটা সত্তাকে এখন বিশ্রাম দিতে চায়। পাহাড় ডিঙোতে হবে বলে লোকে যেমন সমতলভূমিতে আস্তে আস্তে হালকাভাবে হাঁটে তেমনি নির্মলও বাঁধা সড়ক থেকে বেরোবার পরিশ্রম করে না। তার ফলে তার লেকচার হয় সুবোধ্য, সর্বজনপ্রিয়।

ক্লাস নেবার পর টিচার্স রুমে খানিকক্ষণ বসেছিল। সেখানে গৌতম আর সুব্রতর মধ্যে একটা তর্কাতর্কি বেধে যায়। কতগুলো কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসেই সেই উত্তেজিত চিৎকারে। 'ক্লাস কোলাবরেশন', 'ডগ্‌ম্যাটিক অ্যাপ্রোচ্', 'রিভিশনিস্ট মেন্টালিটি', অথবা 'পার্লিয়ামেন্টারী সোসাইটি কি ট্যাকটিকাল?' বা 'স্ট্রাগ্‌ল উইদিন্', স্ট্রাগল উইদাউট', 'ইম্পিরিয়ালিজম ইন্ নিউ শেপ্', 'বুর্জোয়া এথিক্স'—এই ধরনের ইংরেজী কথা কখনো রাগত ভাবে কখনো বিরক্তিতে, কখনও অবসাদে বলা হতে থাকে। সেই উৎক্ষিপ্ত কথার ঘূর্ণী নির্মলকে এক একবার স্পর্শ করে আবার চলে যায়। তখন নির্মল কান খাড়া করে তার এই দুই বন্ধুর সান্ধ্যভাষা শুনতে থাকে। কিছু কিছু যে বোঝে না তা নয়, তারপর তার মনে হতে থাকে এ কথাগুলো বা সমস্ত প্রাণহীন কথার লক্ষণ অর্থাৎ 'থিং ইন্ ইট্‌সেল্ফ' বা এমন এক স্বয়ম্ভূরূপে রূপান্তরিত হয়েছে যে সেগুলো প্রস্তর যুগের মানুষদের কুঠার কিংবা ছুরির মতো সাজিয়ে রাখার যোগ্য, ব্যবহার করা যায় না।

আবার কখনও কখনও এ ধারণা হতে থাকে যে বোধহয় তাদের গোটা সাম্প্রতিক কালই এই সব কথার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। সেজন্যে যারাই কিছু ভাবতে চেষ্টা করে তাদেরই এই সব শব্দকে আশ্রয়। তারপর ধীরে ধীরে এইসব শব্দের ফাঁসে আগাছায় নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে। ঠিক যেমন সুব্রতর কথা শুনে মনে হয় সে এই কথার আবর্ত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে, যেন গৌতমের সঙ্গে কতগুলো ক্ষেত্রে তার তাত্ত্বিক মিল থাকলেও খুঁটিনাটিতে তাদের অনেক ফারাক। এই ভাবখানা সুব্রত যতবারই সামনে রাখতে চেষ্টা করে গৌতমের আক্রমণ রুখবার জন্যে ততবার নিজেই ভেসে যায় জমকাল শব্দের ঘূর্ণীতে। তাদের বিরোধের এবং উত্তেজনার অনেকখানি বুঝতে না পারলেও নির্মল প্রত্যেকবার যে উপসংহার লক্ষ করে এসেছে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে অর্থাৎ গৌতম অনুপ্রাণিত কণ্ঠে জ্ঞান দিতে থাকে এবং সুব্রত বেজারভাবে শুনে যায়।

নির্মলের এক একবার সন্দেহ হতে থাকে তার সঙ্গে রাজুর পত্রালাপও হয় তো এই রকম কোন শব্দের মুখোশ যার সঙ্গে রোজকার সকাল সন্ধে রাত্রির জীবনের অনেক ফারাক। কথায় অনেক চমক সৃষ্টি করা যায় কিন্তু মানুষের জীবন যে অনেকখানিই চমকহীন, এবং এই চমকহীন গল্পের উপসংহারহীন নিরবচ্ছিন্নতার জন্যেই না সেটা এত অদ্ভুত, এতখানি চ্যালেঞ্জের প্রয়োজন তার সামনে দাঁড়াতে। আর যতো সময় যায় ততোই দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করে শেয়ালদার সেই বাজে হোটেলটার জন্যে। এ যেন শুধু তার ব্যক্তিগত ব্যাপার না, প্রায় একটা তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ। যেখানে কথায় এত বাহার সেখানে বাস্তবের চেহারা কেমন?

সন্ধে ছটা শেষ পর্যন্ত বাজল আর ঠিক সেই সময় কিংবা তার দু-চার মিনিট আগে নির্মল শেয়ালদার সেই হোটেলের সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। এমন সাঙ্ঘাতিক ভাবে বাড়িখানা উঠেছে যে একনজরেই বোঝা যায়, একবারে নয়, থেকে থেকে কোন ঠিক প্ল্যান না করে বাড়িটা তোলা হয়েছে। ওপরের দিকগুলো ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ পায়রার খোপ। বাড়িটায় আবার দু-তিনটে সিঁড়ি। একটা ভুল সিঁড়ি থেকে নেমে এসে থামতে থামতে নির্মল দ্বিতীয়টির দোতলায় উঠবার বাঁকে পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়ায়। একগাদা পানের পিকে টকটকে লাল দেয়ালের কোণ। কোণের মুখে জমাদার দাঁড়িয়ে, বাঁ হাতের কেনেস্তারাতে ছাই ডিমের খোলা আর ডান হাতের ঝাঁটা থেকে টপ্ টপ্ করে ময়লা জল গড়াচ্ছে।

নির্মল ওপরে চোখ তুলে চাইতেই দেখে সিঁড়ির মুখে দুটি মহিলা। বোধহয় তাঁরাও তার মতো থমকে দাঁড়িয়ে আছেন সিঁড়িতে নামবার জন্যে। দুজন মহিলা একেবারে দুরকম। প্রথমটি বছর তিরিশেক, মোটা শ্যামলা রং, বয়সের তুলনায় বেশী ভারিক্কী চেহারা। আর দ্বিতীয়টির বয়স কম, পাতলা ফ্যাকফেকে ফর্সা, একটু রূপস ফর্সা· পেঁয়াজী তাঁতের শাড়ির ওপর বাদামী চুলের বেণী। চোখ দুটো বেশ বড়ই কিন্তু নির্মলকে দেখে সে দুটো চোখ আতঙ্কে আরও বড় দেখায়। মেয়েটি সাঁ করে ঘরের মধ্যে চলে গেল। দেয়াল ঘেঁষে পিঠে দেয়ালের চুন মেখে নির্মল ওপরে উঠে আসে। সামনে দরজার মাথায় আলকাতরায় লেখা ঘরের নম্বরটা দেখে ভাঙা গলায় প্রায় আত্মগতভাবে সুব্রত বলে, 'রাজু এখানে আছে?

মহিলাটি অপ্রসন্নভাবে তাকালেন নির্মলের দিকে। 'ও আপনি. .. নির্মলবাবু . . আসুন'। ঘর থেকে মেয়েটির গলা পাওয়া যায়, 'কোথায় আসবেন, আমরা এখন বেরোচ্ছি।' ভদ্রমহিলা খানিকটা ধমকের ভঙ্গীতেই মেয়েটিকে কি যেন বললেন। নির্মল ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকে সিঁড়িতে। মিনিটখানেক পরে ঘর থেকে মহিলাটি ডাকলেন, 'কই, এলেন না?'

নির্মল ঘরে ঢোকে। দরজাটা নীচু। মাথা হেলিয়ে আসতে হয়। ঘরের মধ্যে একটা তক্তাপোষ ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই নেই। আমকাঠের ধুলোভর্তি একটা টেবিলে আরও ধুলোভর্তি এক ফুলদানিতে দুছড়া আধ-শুকনো রজনীগন্ধা। এক দেয়ালে রামকৃষ্ণ আর এক দেয়ালে স্নানরতা সুন্দরী জাতীয় প্রায়-বিবস্ত্র এক নারী, নীচে আ ধোয়া কাপ-ডিশ, প্লেটে ডিম চ্যাড়চ্যাড় করছে।

নির্মল তক্তাপোষের এক কোণে বসে পড়ে। চোখ নীচু হতেই দেখলে মাঝে মাঝে ফাটা তেলচিটে সতরঞ্চি পায়ের নীচে। মহিলাটি বললেন, 'যা অপরিষ্কার চার দিক, তাড়াতাড়িতে আর কোথাও জায়গা পেলাম না।'

নির্মল গত ক্রয়েক বছর ধরে যার চিঠি পড়ে আলোড়িত হয়েছিল সে মাথা নীচু করে জানলার নীচু কার্নিশে বসে থাকে। গভীর অভিনিবেশে তার জুতোর ফাঁসের বকলশ

নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

'আমি সেদিন স্টেশনে গিয়েছিলাম। কিন্তু এত লেট ছিল ট্রেনটা......'

'ও সেদিন! প্রায় পঁচিশটা লেট। কলকাতা আর আসেই না।' একটু চুপ করে মহিলাটি বললেন, 'না এলেই পারতাম। বুঝেছেন? যায় কয়েকদিনের জন্যে। টাকাকড়ি আনতে দেবে না। বলুন, এসে কি লাভ?'

নির্মল এটা বুঝতে পারে যে এই মহিলাটিই তার অকূলে কূল। একবার আড়চোখে কার্নিশে-বসা মেয়েটির দিকে চায়। বোধহয় মাটিতে মিশে যেতে পারলে তার পক্ষে ভাল হোত।

মহিলাটি বললেন, 'আরও খারাপ লাগে কি জানেন,—যে সব জায়গায় ছেলেবেলায় থেকেছি সেসব জায়গা কি দারুণ পাল্টে গেছে। আজ সকালে পার্ক সার্কাসে গিয়েছিলাম; এক আত্মীয় থাকেন। গিয়ে দেখলাম সেই ভদ্রলোকই আছেন, আর কেউ নেই।' তারপর হঠাৎ রাজুর দিকে চেয়ে বললেন, 'তুই যে আমাকে এত জোর করে নিয়ে এলি। এখন কি? কথাটথা বল্।'

ওদিক থেকে মেয়েটি বললে, 'আজ না গেলে তোমার আর দোকানে যাওয়া হবে না বলে দিচ্ছি।'

'আর দোকান! এ কটা টাকায় কিছু হয়? যা ধরতে যাচ্ছি তাই এত দাম!

মেয়েটি শূন্যে চেয়ে বললে, 'আর একটা দিন পরে এলে হোত না?'

নির্মল কি বলবে বুঝতে পারে না। হাসবার চেষ্টা করে। এমন সময় পাতলা ছিপ্‌ছিপে শ্যামলা এক যুবক ঘরে এসে ঢোকে। চশমার ভেতর থেকে একবার নির্মলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে নমস্কার করে। বেশ ঠাণ্ডা চেহারা। নির্মলকে বলে, 'আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

নির্মল বুঝতে পারে রাজু ও তার ভেতরের সম্পর্ক যতই বায়বীয় হোক তাকে একটা ভিত দেবার চেষ্টা করতে হয়েছে রাজুকে কলকাতায় আসবার জন্যে।

রাজুর দিদি বললেন, 'তোমার বেড়ানো হয়ে গেল এর মধ্যে? কোথায় গেলে?'

'চিৎড়ির কাটলেট। সাপ্পুভেলী, যেখানে আমরা খেতাম। অবিকল এক টেস্ট', তরুণটি বললে।

দিদি বললেন, 'তুমি তাহলে আমার সঙ্গে চল। কমলালয় স্টোর্সে যাব......আর......'

'আমিও যাব,' আর্তনাদ রাজুর গলায়।

বয়সটা এমনিতেই কম। তার ওপর আরও কম লাগে। এখনও কৈশোরের সেই চোখা ছেলেছেলে ভাবখানা যৌবনের লালিত্যে ধসে যায় নি। অথবা এ তার সুন্দরতার যাত্রের অভাব। ঠিক বুঝতে না পারলেও নির্মল এক প্রবল মমতাবোধ করে প্রায় এই অপরিচিত মেয়েটির জন্যে। দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'আচ্ছা, আপনারা যান। আমি না হয় কাল সকালে আসব।'

রাজুর দিদি আশ্চর্য হয়ে তাকান তাঁর বোন আর নির্মলের দিকে। রাজু এতক্ষণ পর চোখ তোলে। চোখ তুলে একবার নির্মলকে খুঁটিয়ে দেখে। আর তার কণ্ঠ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা পাল্‌লাটে আলো তার চোখে ঝিলিক মারে। তার দিদির দিকে চেয়ে বললে, 'আচ্ছা, তোমরা যাও। এত তোড়জোড় করে এলাম নির্মলবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে।'

রাজুর দিদি যাবার আগেও একবার ইতস্তত করলো, [illegible] যাবি? না তুইও থাকবি?'

'না না, তোমরা যাও।' অসহিষ্ণুভাবে রাজু মাথা নাড়ায়।

আর দিদি ছোকরাটি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কেমন মনমরা হয়ে বসে থাকে। জোর করে কথা বলার ভঙ্গীতে বললে, 'দিদির আর শাড়ির পাড় পছন্দ হয় না। আজও ঠিক ফিরে আসবে। আমি গেলে জবরদস্তি করে একটা কিনিয়ে দিতাম।'

'খুব খারাপ লাগছে, না?' নির্মল প্রথম আলাপের অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে আলাপ করতে চায়। আজ আর কাল দুটো দিন। অপ্রাসঙ্গিক কথায় এ দুটো দিন নষ্ট করতে সে রাজী নয়।

রাজু সেদিকে কান না দিয়ে বললে, 'খোকাবাবুটা যা খেতে ভালবাসে।'

—'খোকাবাবু কে?'

'ঐ যে গেল দিদির সঙ্গে। চিংড়ির কাটলেট, মাংসের কারী, দই মাছ, কাবাব হেন তেন —একেবারে রাক্ষস।' রাজু এবার অনেকটা স্বচ্ছন্দে হেসে ওঠে।

'আমি যখন তোমার কলকাতায় আসার কথায় উৎসাহ দেখিয়েছিলাম তখন ভাবি নি তোমার এত হুজ্জুত পোয়াতে হবে।'

'গানটান জানা আছে? এই রবীন্দ্রনাথ?' এমন হাল্কাভাবে ভাববাচ্যে রাজু প্রশ্নটা রাখে যে তার উদ্দেশ্য কি নির্মল ঠিক ধরতে পারে না। একটু অপ্রস্তুতভাবে বলে, 'বাথরুমে গান গাই।'

'হোক না হোক না,' রাজুর সারা মুখে চাপা বিদ্রূপ।

সুচিত্রা মিত্র না রাজেশ্বরী দত্ত কিংবা ঐ রকম কারুর রেকর্ডে গাওয়া গান গাইবার চেষ্টা করে নির্মল। খুব একটা ভাল কিছু শোনাচ্ছিল না আবার একেবারে অখাদ্যও নয়। কিন্তু মাঝপথে এসে নির্মল বুঝতে পারে গান শোনায় রাজুর কোন ইচ্ছে নেই। আসলে যে বিষয় তাকে টানে, যে ভাবনা নিয়ে সে আলোড়িত তা ঢাকবার জন্যে কোন রকমে তা-না-না-না করে সময় কাটিয়ে দিতে চায়। একবার ঘড়িও দেখে। নির্মল মরীয়ার মতো গান গেয়ে যায় যেমন মরীয়াভাবে কলেজের ক্লাস নেয়। তারপর গান থামিয়ে বলে, 'এবার আমরা স্বাভাবিকভাবে আলাপ করতে পারি, কি বলো রাজু?'......তারপর যেন রাজুকে ফাঁকি দিয়ে ঘুম ভাঙাবার জন্যে বলে, 'তুমি বার বার চিঠিতে যার দিকে হাত বাড়িয়েছো আমি সেই লোকটা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। কেন পালাচ্ছো?'

নির্মলের কথার মধ্যেই মেয়েটির চাহনি কোমল হয়ে ওঠে। স্থির দৃষ্টিতে সে যখন নির্মলের দিকে চায় তখন নির্মল লক্ষ করে ফটোগ্রাফের সেই সাদামাটা কৌতূহলী চাহনি যা তাকে আকর্ষণ করেছিল।

নির্মল আবার বাঁধ ভাঙবার বেগে বলতে থাকে, 'আমাদের হাতে সময় কম। এর মাঝখানে আমাদের দুজনের দুজনকে চিনে নেওয়া দরকার।'

'কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রাজু প্রশ্ন করে।

'দরকার নেই?'

'না, কোন দরকার নেই।......আমি একটু শান্তি চাই। ছেলেবেলা থেকে চারপাশে শুধু অশান্তি দেখে এসেছি।'

নির্মল ব্যগ্রভাবে বললে, 'তাহলে মিছিমিছি কেন এলে রাজু?'

'তোমার সময় নষ্ট হচ্ছে।'

নির্মল দমে না। বলে, 'তোমারও।......আর তুমি যে এই কষ্ট সহ্য করেছো সেই জন্যেই আমাদের দায় আরও বেড়ে যায় না?'

রাজ্জু কপালে হাত দিয়ে বলে, 'আজ দুপুর থেকে মাথাটা ধরেছে। একটু চা আনতে বলি।'

ফাটা মোটা পেয়ালায় চা খেতে খেতে নির্মল তাকায় মেয়েটির দিকে। চা-টা বোধ হয় তাদের জন্যেই বিশেষভাবে করা। এমন গোবরগোলা কালচে কড়া চা সে অনেক দিন খায় নি।

আধ-খাওয়া পেয়ালাটা সরিয়ে রাজ্জু বলে, 'আমার এক বন্ধু আছে—ফজলু। সে আমার আইডিয়াল।'

'তাই নাকি? কিন্তু চিঠিতে......' নির্মলের স্পষ্ট মনে পড়ে চিঠির লাইনগুলো।

'চিঠিতে তো মানুষ কত কিছু লেখে।' আবার পাগলাটে পাগলাটে ভাবে তাকায় নির্মলের দিকে।

'আমি কিন্তু যা লিখেছি তা বিশ্বাস করি।'

'আমি মহৎ লোকদের ভয় পাই।'

নির্মল অপ্রসন্নভাবে বললে, 'ঠাট্টা করছো?'

'ফজলু খুব সাধারণ, সাধারণভাবে সংসারযাত্রা করে জীবনটা কাটিয়ে দেয়। আমি ভেবে দেখছি, তাই ভাল। যার যে রকম ক্ষমতা। অসাধারণ হবার ক্ষমতা আমার নেই।...... আমার দিদিকে যে জন্যে ভাল লাগে। আমি ওর মতো হতে পারলে খুশি হব।'

আর চিঠি পড়তে পড়তে নির্মলের যেমন মনে হয়েছে কথার আড়ালে সে নিজেকে ঢাকছে তেমনি এই মুহূর্তে সে বুঝতে পারে না এটাই তার ঠিক মনের কথা কি না। বলে, 'তোমার চিঠির কথা আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম।'

'বাঃ!'

'সে কি বললে জানো?'

'পাগল বলেছে তো?'

'নিউরটিক'

রাজ্জু হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'ওয়ান্ডারফুল! আমার এ কথাগুলো এমন ভাল লাগে! নিউরটিক, সেন্টিমেন্টাল, এক্সেন্ট্রিক!—এ সব কটা লেবেল আমি কপালে আঁটব।'

'আমি লেবেলে বিশ্বাস করি না।'

'সে কি! আশ্চর্য কাণ্ড! তা কি কখনও মানুষ পারে? মানুষের কতটুকু শক্তি!'

'সত্যি রাজ্জু। এটাই তোমার সবচেয়ে আকর্ষণের ব্যাপার। তোমার ঐ চিঠির জোরাল কথাগুলোর পেছনে কি আছে সেইটাই জানবার ইচ্ছে।'

'বাঃ, বেশ নায়কের মতো কথা। আমি কিন্তু নায়িকার মতো কথা বলতে পারি না। একেবারে মিস্‌ফিট। আমার ভীষণ হাসি পেয়ে যায়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ রাজ্জু বললে, 'তুমি তো হিন্দু, আমি তো মুসলমান না?'

'হ্যাঁ, তোমরা কাছা না দিয়ে ধুতি পরো, আমরা কাছা দিয়ে পরি। তোমরা দাড়ি রাখো, আমরা দাড়ি কামাই। তোমরা......'

'হয়েছে, হয়েছে!' কৌতুকে রাজুর চোখ উজ্জ্বল দেখায়। তার পরই দপ্ করে নিভে যায়। আস্তে আস্তে বলে, 'মতিনকে জানা ছিল? একই স্কুলের না বলোরে? মাঝখানে খুব কমিউনিস্ট হয়ে গেল। বাংলা ভাষা আন্দোলনে ক্ষেপে উঠল।'

নির্মলের মনের মধ্যে একটা আবছা চেহারা ভেসে ওঠে। ফর্সা হ্যাংলা চেহারা। একটা স্মৃতি এখনও মরে যায় নি ভেবে অবাক হয়। মতিন রোজ হাফপ্যান্টের পকেট ভর্তি করে তাদের বাগানের নারকোল কুল আনত।

'নিউজ এজেন্সিতে ছিল না?' এ রকম একটা অস্পষ্ট খবর শুনেছিল নির্মল।

'এখন সে জার্মানীতে সেট্ল করেছে।'

'সেটল্ করেছে?'

'শুনতে খুব কষ্ট হয়, না?' রাজুর গলায় বিদ্রূপ ছিল না। আক্রান্ত গলায় আস্তে আস্তে বললে, 'আমাদের আর দেশ টেশ বলতে কিছু নেই। সেই ছেলেবেলার হিন্দু-মুসলমানের বিরাট ভারতবর্ষটা কোথায় মিলিয়ে গেল! এখনও আমার একটা ক্লাস ফোরের ভূগোল আছে। ম্যাপটার দিকে মাঝে মাঝে তাকাই।'

নির্মল টের পায় রাজু এখন আর কথার পেছনে নিজেকে ঢাকছে না। কিন্তু বাংলা দেশ ভাগের পেছনে যেমন একটা দুঃখ আছে তেমনি এক তীব্র হতাশাও আছে। সেই হতাশা আর সেই হতাশা থেকে একেবারে মরীয়া হয়ে মাথাকোটা তার বাবার ক্ষেত্রে দেখেছে। আরও ভাল করে দেখেছে গত দু-তিন দিনের ঘটনায়। সেই হতাশা নির্মল পছন্দ করে না। আর সে চায় না রাজুকে অবলম্বন করে তার মনের মধ্যে যে স্বপ্ন গড়ে উঠেছে তার ওপর এই হতাশার ছায়া পড়ে। সাবধানে বলে, 'ও নিয়ে আর ভেবে কি লাভ? যা হবার তা হয়েছে।'

নির্মলের কথা রাজুর কানে পৌঁছল না। আত্মগত স্বরে বললে, 'আরও এই কলকাতায় পা দিয়ে মনে হচ্ছে আমাদের কোন দেশ নেই। কোথাও না! শেষ পর্যন্ত মতিনের মতই আমাদের দেশছাড়া হতে হবে।'

আবার সেই প্রবল অবসাদ যা তার চিঠির সজীবতার পাশাপাশি বয়ে চলেছে সেই অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকে মেয়েটা।

'আমরা যদি নিজেদের মন শক্ত করে পাশাপাশি দাঁড়াই. ....'

'আর একটা গান হলে কি রকম হয়?'

আবার পালাচ্ছে রাজু। আবার টা-না-না-না করে সময় কাটিয়ে দেবার তালে আছে। আবার সেই অচেনা পাগলাটে আলো তার চোখে খেলতে থাকে। বলে, 'ঢাকায় কয়েকটা হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে হোল। এ নিয়ে আবার সাহিত্যও হচ্ছে।'

রাজুর চাহনির সামনে কুঁকড়ে যায় নির্মল। 'তোমার চিঠি পড়ে কিন্তু মনে হয়েছিল......' বলতে গিয়ে থেমে যায়।

আবার স্বাভাবিক দেখায় রাজুর চেহারা। কোমল দৃষ্টি মেলে তাকায় নির্মলের দিকে। 'খুব খারাপ লাগছে, না? যেমনটি ভাবা গিয়েছিল তেমনটি নয় ঠিক বলি নি?......কি জানি, হয়তো আমি বড্ড তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেছি। এত ভালো ভালো কথা শুনলাম, এত ঘর ভাঙতে দেখলাম।.. ...এত তোড়জোড় করে না এলেই ভাল ছিল।'

তারপর নির্মলকে একটা কন্‌সোলেশান প্রাইজ দেবার ভঙ্গীতে বলে, 'সেই সাইকেলটা এখনও আছে?'

আসলে ছেলেবেলায় প্রতিবেশিনী মেয়েটিকে সাইকেলে দু-একবার চড়ানো এতই অপ্রাসঙ্গিক যে নির্মল অপ্রস্তুত বোধ করে। বলে, 'না, ওটা চুরি হয়ে গেছে অনেকদিন।'

রাজু একটু চুপ করে থেকে বললে, 'এর পরও যদি কাল ইচ্ছে থাকে আসার......'

'আমার কাল সকালের দিকে ক্লাস নেই। আসব।' নির্মল কথাটা লুফে নিয়ে বললে। তারপর উঠে পড়ে। উঠবার সময় মনে হচ্ছিল সে এক অপটু নট যে কোন রকমে রঙ্গমঞ্চে ঢুকে পড়েছে কিন্তু কেমনভাবে বেরোবে জানে না।

পরদিন সকাল সকাল চান করে ফিটফাট্ হয়ে বেরোয় নির্মল। ন'টার মধ্যেই শেয়ালদার হোটেলে পৌঁছায়। মোট্কা তালা ঝুলেছে দোতলার মুখে দরজায়। নির্মল নেমে আসে। রোদ্দুর চড়ে গেছে। চানের পর বলেই বোধহয় আরও চড়চড়ে লাগে। একটা অখ্যাত রেস্তোঁরায় ঢুকে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নির্মল নিজেকে প্রশ্ন করে—এটা কী ব্যাপার? তাদের পরস্পরের সম্পর্ক কি প্রেম না কৌতূহল যে কৌতূহলে লোকে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ে?

সেদিন দুপুরে আবার তার চিঠির মানসীকে খুঁজবার অভিযানে নির্মল ক্লান্ত বোধ করে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ায় কৌতূহল মিটে যাচ্ছে। একেবারে জলের মতো কে আসামী আর কিভাবে সে ধরা পড়বে; একেবারে স্পষ্ট তারা দুজনা আর দুটো সন্ধে কথার ফুলঝুরি জ্বালিয়ে আবার যে যার অন্ধকারে বাসা করবে। কথা কখনই অব্যর্থ সন্ধানের সহায়ক হবে না। বুঝতে দেবে না মেয়েটি তার সম্পর্কে কি চায় এবং মেয়েটির সম্পর্কেই তার কৌতূহলের কারণ কি। মেয়েটির চোখে কামনার বিশেষ ছাপ নেই, বক্ষদেশও মোটেই মার্লিন মনুরো-সদৃশ নয়। প্রায় বলা যায় যৌবন আসে নি এমনি এক মেয়ে তার মেজাজের স্বাভাবিক সজীবতায় তাকে আকর্ষণ করেছে আর কলকাতায় এসে তার স্বাভাবিক বিত্তৃষ্ণায় কুঁকড়ে গেছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু বিকেল হতে না হতেই অস্থিরতা বোধ করে নির্মল। একটা ভবিতব্যের মতো সেই নোংরা হোটেল তাকে টানে। সিঁড়ির মুখেই রাজুর দিদির গলা শোনা যায়, 'সেই পাতা-পাতা জংলাটা কোথাও পেলাম না।'

'ঐ পেল্ হলদের ওপর খয়রীটা তো?' রাজুর গলা আসে।

'আর একটা পছন্দ হয়েছিল। নীলের ওপর ব্রাইট্ ইয়লো। কিন্তু যা দাম!'

'সব জায়গায় দাম!'

নির্মল ঘরে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছিল। দিদি বললেন, 'খোকা আবার বেরিয়েছে?'

'হ্যাঁ, পাগলের মতো ঘুরছে। পার্কসার্কাস, বালিগঞ্জ, শ্যামবাজার, মানিকতলা। এসে এক লম্বা ফিরিস্তি দেবে। আমার বড্ড ক্লান্ত লাগে শুনতে।'

'নির্মল?'

'জানিনা, হয়ত আর আসবে না।' একটু চুপ করে থাকার পর আরও নীচু গলায় রাজু বললে, 'না এলেই ভাল।'

নির্মল দুয়ার কাশে। দিদি বেরিয়ে এসে বলেন, 'ওমা, আসুন, আসুন। আপনার কথাই আমরা বলছিলাম।'

'কি রকম মাছোড়বান্দা দেখেছেন তো!' নির্মল হাসবার চেষ্টা করে।

'না না, কি বলছেন! চা আনতে বল্ রাজু।'

'আজ সকালে......?'

ভীষণ খাম্বাজ,' কর্কশ গলায় রাজ্ব জবাব দেয়।

চায়ের কথা বলতে রাজ্ব উঠে গেলে দিদি দুঃখ করেন, 'আমরা সবকটা বোনই এক রকম। ও একেবারে আলাদা। কি ভাবে, কি করে বুঝি না। ওর জন্যে আমাদের সব সময়

রাজ্ব ফিরে এসে ভাবখানা বলে, 'জীবন গায় উচ্ছ্বসিতা মাধুরী করেছো গান—গানটা জানা আছে?'

'আমি তো গান জানি না।'

'সে কি, খোকাবাবুটা থাকলে কি রকম গান শোনা যেত।'

নির্মল স্পষ্ট বোঝে তার আজকের অভিযান ব্যর্থ। গতকাল এক একবার মনে হয়েছিল, মেয়েটি তার খোলস ছাড়ছে। কিন্তু আজ সে রকম ভাববার কারণ নেই। বোধহয় সামনের চব্বিশটা ঘণ্টা এইভাবেই চালাবে।

'কাঁকিম আর ফিরে থাওয়া করলে না?' নির্মল মরীয়ার মতো চেষ্টা করে রাজুর নিস্পৃহতার কঠিন আবরণ ফুঁড়তে।

'কই, লিলি বাট্‌লারের সঙ্গে তো বিয়েটা হোল না।' তারপর নির্মলের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে বললে, 'অস্ট্রেলিয়ান্‌। দাদা কলম্বো প্ল্যানে সীড্‌নি ঘুরে এল না? ওখানে টেনিস্‌ খেলতে আলাপ। তারপর আর বিয়ে করে নি। সবই বাজে, না? পলিটিক্স, প্রেম, কোন কিছুরই কোন মানে হয় না।'

নির্মলের মনে হতে থাকে একটা ন্যাড়া অনাবাদী মাঠে সে জমি নিড়োবার চেষ্টা করছে। চিংড়ির কাটলেটের গন্ধ আসে। তার সঙ্গে ভেসে আসে শেয়ালদা থেকে ইঞ্জিনের একটানা হুইসিল। বোধহয় ছাড়ছে। রাস্তা থেকে প্রচুর লোকের গলার আওয়াজ হঠাৎ একসঙ্গে আসতে থাকে। বোধহয় একটা লোকাল ট্রেন এল। নির্মল ম্রিয়মাণ হয়ে বসে থাকে। রাজুর দিদি কি সব বলতে থাকেন। বোধহয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কথা, অথবা তার বোনের মাথায় যে একটু ছিট্‌ আছে সে সম্পর্কে দু-একটা ঘটনা এরই মধ্যে তাদের সেই জ্যাঠতুতো ভাই খোকাবাবু দড়াম করে দরজা খুলে ঢোকে। কলকাতার দর্শনীয় বিষয়গুলির কতগুলো সে দেখে ফেলেছে তার বর্ণনা দিতে থাকে।

তক্তাপোষ থেকে নির্মল উঠে পড়ে বললে, 'আজ আসি।'

রাজু সচকিত চোখে তাকায়। তারপর বলে, 'খোকাবাবুর গানটা শোনা হবে না? ওর আবার তাল ভুল হয় না।'

পাশের পাতলা পার্টিশানের ওপাশ থেকে একটা ভারী মদালস নারীকণ্ঠ হঠাৎ ভেসে আসে, 'অমন রাগ করে তাকিয়ে থেকো না।'

নির্মল চমকে উঠে রাজুর দিদিকে একটা অর্ধসমাপ্ত নমস্কার ঠুকে বেরিয়ে পড়ে।

আট

•

অদ্য শেষ রজনী। তারা দুজনেই ভাবে নি এ রকম একলা দুজনে মুখোমুখি বসবার সুযোগ হবে। কলকাতায় রাজুদের তিন দিন থাকার মধ্যে দুটো দিন যেভাবে কেটেছে আর একটা দিনও তেমনি কেটে যাবে। অর্থাৎ অজস্র পাতাকাটা যে মুর্শিদাবাদী জংলা সিল্কের শাড়ী উঠেছে তার স্টক নিঃশেষ বলে দিদি ক্রমাগত আক্ষেপ করবেন আর রাজু বলবে, যেন

নির্মলকে উৎসাহ দেবার জন্যেই, 'আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছো দান' করো না। তারপর রাজুর মামা করিমের কথা উঠবে। সেই অশেষ্টীর রমণীকে হুমর গানের গল্প তৃতীয় বার শুনবে। আবার সেই লম্বাপানা জ্যাঠতুতো দাদা যার জার্নালিজম পড়বার জন্যে আমেরিকা যাওয়া ঠিকঠাক সে এসে কলকাতার কোন্ কোন্ পাড়া ঘুরে এল তার ফিরিস্তি দেবে। সিঁড়িতে পায়ের ওঠা নামার শব্দ বাড়বে। পার্টিশানের ওপাশেই এক সন্দেহজনক প্রেমিকযুগলের কখনো বাষ্পাকুল কখনো আহ্লাদে সঘন গলা ভেসে আসবে। তার সঙ্গে আসবে চিংড়ির কাটলেটের গন্ধ, হোটেলের বয়কে বারবার ডাকবার পর ফাটা মোটা পেয়ালায় কয়েক কাপ চা, ইঞ্জিনের ভোঁ।

এরই মাঝখানে মাঝখানে রাজুর সচকিত চাহনি, সে চোখে একটাই অনুরোধ—এই মায়াবী অবাস্তব অবস্থার ছেদ টেনো না, এই রকম চলুক আর একটা দিন; তারপর আবার শব্দের মায়াজালে আশ্রয় নেব, শব্দের নরম লেপে গা ঢেকে নির্মল তোমার দিকে তাকাব। শব্দ বাদ দিয়ে তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে আরও সাহস লাগে। এই বেশ কাটছে বছরের পর বছর। এরই মাঝখানে আমি ডন্ কুইক্সোটের মতো বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে দিদিকে পটিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতা আসব আর তুমি তখন তোমার উদ্‌গ্রীব মুখখানা তুলে সিগারেট খাবে আর এক আধটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে। এই চলুক। চিঠিতে আমি বলেছি অন্য রকম হবে, অন্য রকম স্বপ্নের ইঙ্গিত আমি চিঠিতে দিয়েছি। কিন্তু দেখতে পারছো তো এরই মধ্যে থানার হাজিরা দিয়ে, এই নোংরা হোটেলের ভাত খেয়ে, শেয়ালদার অগণিত মানুষের ভিড় ঠেলে কাঁদনেই হাঁফিয়ে উঠেছি। বামুন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া যায়? আর হঠকারিতায় আমরা পাশাপাশি দাঁড়াতে পারি চিঠির মতো কিন্তু কয়েকটি আলোড়িত মুহূর্তের জন্যে নয়, সত্যিই কি বছরের পর বছরে জোড়া ক্লান্তি-অবসাদ-কাপট্যের মাঝখানে আমরা দাঁড়াতে পারব ঠাণ্ডা মাথায়, পরস্পরের প্রতি গভীর মমতায়?

আর নির্মল? নির্মল সেদিন হোটেলের ঠিক নীচেই ক্রমাগত ভিড়ের ধাক্কা খেতে খেতে করাচী থেকে লেখা রাজুর একটা সাম্প্রতিক চিঠি মনে মনে আওড়াচ্ছিল। এ চিঠিটা তার মুখস্থ হয়ে গেছে। আর তার মনে হচ্ছিল শব্দের খোলস থেকে মেয়েটা বেরিয়ে আসছে তার স্বরূপ নিয়ে

জানি ঠিক এখন আমার লেখা উচিত নয়, কারণ এখন আমি পৃথিবীতে নেই; কারণ এখন আমি স্বর্গে। তুমি আমায় স্বর্গে তুলে দিয়েছো! বুঝেছি তোমার তুলে-দেওয়া জায়গা থেকে জীবন আমায় বেশ চমৎকার একটা আছাড় দেবে। আমার ভেতর প্রাণসঞ্চার হচ্ছে। রাগ কোর না ছেলেমানুষীতে। কথা দিচ্ছি, তোমার ওপর কোন ভার চাপিয়ে দেব না। শুধু না জানিয়ে পারি না যে আবার যেন বেঁচে উঠেছি আমি। কি বোকা বোকা লাগে এই বাঁচাটা! জানি তোমার ভ্রূ কুঁচকে গেছে, জানি জীবনকে অপমান করলে তোমার সইবে না। এ মুহূর্তে সব মাপ করতে হবে। আমার ওপর রাগ করলে অন্যায় হবে।

তোমার চিঠিটা যে অসহ্য আনন্দ বয়ে এনেছে তা বোঝাতে চাই, বুঝলে?

দেশে যেতে খুব উৎসাহ পাচ্ছি না। পরীক্ষা সামনে। তোমায় দেখতে ইচ্ছে করে—তাও পাই। নানা কারণে। বলব সব, আস্তে আস্তে। ভয় হচ্ছে, দেশে ফিরে যদি কলকাতায় যেতে না পারি। আবার কলকাতায় যেতেও ভয় করছে।

অতীতের অনেক আগাছা আমার শরীর জড়িয়ে, তোমার পায়ে তা কাঁটার মতো ফুটতে পারে। আমার প্রশ্রয় দেওয়া সমীচিন কিনা সে বিচারের ভার তোমার ওপর রইল। আমার লোভ থেকে আমায় তুমি বাঁচাও।

তোমার কাছ থেকে এতটা পাওয়া যাবে আশা করি নি। স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াও পাঠিয়েছি ওদিকে স্বার্থপরের মতো। এটা ভাবি নি তোমার ওপর অন্যায় হোল কি না। নতুন করে জীবন গড়ার সাধ জাগছে। পারব কি তোমায় মাথায় তুফান না মেরে?

তোমায় তো পেয়েছি খুব কাছে—রাখতে পারব তো! সোজাসুজি জীবনটা রাখতে দেবে তো?

... ...। মনে হচ্ছে তারটা আমার খাঁচাটার। কিছুই বাড়তে পারছি না। একপেশে হাত বাড়িয়ে জীবনের পথ চোরাপথে খাচ্ছি, আমরা তাকে বুঝেছি, পালাও ঠিক।

তোমার মতো মানসিক ... যা আমার নেই, এইটে মনে রাখলে আমার কতকটাকে ক্ষমা করতে পারবে।

পুঃ— তুমি এমন অল্প কথায় বক্তব্য শেষ করো কেমন করে আমায় শেখাবে?

ঘরে ঢুকে নির্মল চমকে যায়। রাজু এমন চেটালভাবে লিপস্টিক মেখেছে, চুলে সাবান দিয়ে কাঁপিয়েছে আর তীব্রভাবে চেয়ে আছে তার দিকে যে এই মূর্তির সঙ্গে তার চিঠির সেই ধরোয়া দিলখোলা স্বচ্ছন্দ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল মেয়েটির কোন মিল নেই। এ সাজটা বোধহয় স্বেচ্ছাকৃত, যাতে নির্মল চটে যায়, যাতে তাকে হাল্কা দেখায় এ জন্যে সে তৎপর, যাতে চিঠির রাজুর অবয়ব একেবারে লেপেমুছে যায় নির্মলের মন থেকে আর তা-না-না-না করে আরও চব্বিশটা ঘন্টা কাটিয়ে দেয়া যায়।

'তোমার একটা গোল্ডফ্লেক দাও তো,' ভাঙা গলায় রাজু বললে।

'কেন?'

'কেন আবার?'

প্রায় ছিনিয়ে নেয় রাজু সিগারেটের বাক্সটা নির্মলের হাত থেকে। তারপর অনভ্যস্ত হাতে তুলতে গিয়ে দু-তিনটে সিগারেট মচকে দেয়। তারই একটা তুলে নিয়ে বলে, 'আগুন দাও।' ফোঁ ফোঁ করে জ্বলন্ত সিগারেটে টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে কাশতে থাকে। কাশতে কাশতে বলে, 'আমার কিন্তু অভ্যেস আছে। করিমের কাছ থেকে কত খেয়েছি। মাথাটা পরিষ্কার থাকে।'

'দিদি কোথায়?'

'দিদি মুর্শিদাবাদী, কাঞ্জীভরম্......'

'আর তুমি?'

'আর আমি?' রাজু হঠাৎ চোখ তুলে তাকায় নির্মলের দিকে। আর নির্মল লক্ষ করে সে চোখের তীব্রতা হঠাৎ নিভে গেছে। নির্মলের দিকে উদগ্রীবভাবে চেয়ে আছে সে দুই চোখ, কিছুটা মমতা মাখানো, কিছুটা অবসাদভরা।

'আমি ভাবছি দিদির সঙ্গে গেলেই ভাল হোত,' আবার ধোঁয়া ছাড়ে।......'এই তো বেশ আছি......কেন মিথ্যে স্বর্গ রচনা করব নির্মল?'

নির্মল আহত বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। রাজু বলে, 'এই বেশ আছি। এই হিন্দুস্থান-পাকিস্তান। এই ধর্মের নামে দু-দেশের বুড়ো বুড়ো লোকগুলোর বাঁদরনাচ!......কাল দিদি আমার নামে কী বলছিল? বলছিল না, আমার মাথায় ছিট্ আছে?' কি রকম একটা অস্বস্তিকর পাগলাটে চোখে রাজু তাকায় নির্মলের দিকে। আর নির্মল ঠিক বুঝতে পারে না তার এই চেহারাটা ঠোঁটে রং মাথায় মতো ঠাট না সাঁচ্চা কিছু।

'একসেন্ট্রিক্ না হলে কি বাঁচতে পারতাম নির্মল! একসেন্ট্রিক্ না হলে কি এত বাধা পেরিয়ে তোমার কাছে এমনভাবে ছুটে আসতে পারতাম! পাগল না হলে চোদ্দ বছরে বাপ যেমন বলেছিলেন তেমনি আমার বিয়ে হয়ে যেত।......হয়ত ভালই হোত। দিদির মতো চার-পাঁচটা ছেলে মানুষ করতাম। কিংবা কুলু হতাম, কুলুর বর আমার চাচার ছেলে। এখন বন্-এ আমাদের এম্‌ব্যাসীর ফার্স্ট সেক্রেটারী......তার বউয়ের মতো হতাম। কুলু খুব ভাল মেয়ে। কুলুকে সবাই ভালবাসে। আর শুনেছি বিলেতে ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে তার স্বামীর খুব সাহায্যে এসেছে। কিন্তু কুলু যখন আসে দেশে আর ঢাকায়

আমাদের বাড়ির দোতলা ঘরে আমরা বসি আর কথা বলি তখন মনে হয় ও রকম সাজানো বাগানের চেয়ে আমার নেড়া মাঠই ভাল।'

ধীরে ধীরে তার চোখের চাহনি পাল্টে তার দৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি ফিরে আসে।

'আর শাড়ীর গল্প কোর না। আমাদের হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা।'

'কোথাও যাবে নির্মল? কলকাতায় আসা অবধি বাস করেছি তোমার অসোয়াস্তিতে। এই নোংরা হোটেলের সিঁড়িতে জমাদার দাঁড়িয়ে থাকে ঝাঁটা হাতে, তারপর এই থানায় হাজিরা।......তুমি কখনও গিয়েছো পাকিস্তানে......যেও না। এত হিউমিলিয়েটিং, মাত্র পঞ্চাশ টাকা দেয় হাতে। আজ সারাদিন টাকার ধান্দায় আমি আর দিদি ঘুরেছি......এর মাঝখানে নির্মল তোমাকে কল্পনা করি নি।......এখন গঙ্গার ধারে যাওয়া যায় না?'

নির্মল স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখতে থাকে। আর তার চিঠির এক একটা লাইন ভেসে আসে তার মনে।......'অতীতের অনেক আগাছা আছে জড়িয়ে আমার সারা গায়। পারবে তো সহ্য করতে?'

'গঙ্গার ধার?......না না, কোথায় যাবে?'

নির্মল আসলে বলতে চাইছিল কোথায় পালাবে? সারা দেশটাই পাল্টে গেছে। গঙ্গার ধারও পাল্টে গেছে। কিন্তু এ কথাগুলো তার মুখে এল না। নির্মলের আগে কখনও এ রকম মনে হয় নি যে দেশ ও কাল এমন দীর্ঘ হাত বাড়িয়ে তাদের সম্পর্কের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পারে। দেশ ও কালের ব্যাপারটা যেন সুব্রত কিংবা গৌতমদের ব্যাপার, রাজনীতি কিংবা সমাজনীতিতেই তা প্রযোজ্য। চিঠিতে অন্তত তাই মনে হোত। চিঠিতে বার বার নির্মল রাজুকে বলেছে শক্ত হতে। তার নিজের অনুরোধ নিজের কাছে ঠিক ব্যঙ্গ না হলেও কিছুটা অর্থহীনভাবে কানে বাজতে থাকে।—'আমরা যদি পরস্পর শক্ত হয়ে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারি তাহলে কোন বাধাই খুব বড় হয়ে উঠবে না।' তখন কি ভেবেছিল রাজুকে থানায় যেতে হবে, নোংরা হোটেলে উঠতে হবে, কয়েকটা টাকার জন্যে হন্যে হয়ে পুরনো বন্ধুদের হাতড়াতে হবে। ঢাকায় গেলে তো তার একই অবস্থা হোত, রাজুর ভাষায় একই হিউমিলিয়েশান। রাজু যখন আসবে লিখেছিল তখন নির্মল ভেবেছিল তাদের প্রেমের ভুবনে দুটো লোকই থাকবে আর সব খাটো হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে আর সব লোক এত মাথা উঁচিয়ে আছে ও থাকবে সেটা খেয়াল করে নি। খেয়াল করলে,—নির্মল এখন ভাবে—মেয়েটাকে বোধহয় এই কষ্ট আর অসোয়াস্তির হাত থেকে রেহাই দিতে পারত।

রাজু দুহাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে। আর তার নীল-শাড়ি-পরা হাল্কা শরীরটা দেখতে দেখতে নির্মলের এক প্রবল মমতা জাগে। কাল হোটেলে রাজুর দিদির উদ্বিগ্ন কথাগুলো তার মনে আসে, 'ও একেবারে আধ্‌পাগলা। আমাদের কারুর মতো হয় নি। সব ব্যাপারে এমন বেপরোয়া। আমরা তো হিন্দু বাড়িতেও মিশেছি কত। ও কোন বাড়ির মতোই না। একেবারে নিজের মতো চলবে। আমার কি ভয় জানেন, হয়তো ওর মাথাটাই একদম খারাপ হয়ে যাবে।'

নির্মলের বুক দমে গিয়েছিল। তার নিশ্চয় একটা ব্যক্তিগত স্বপ্ন ছিল রাজুকে অবলম্বন করে। সে স্বপ্ন চোট খেয়েছে বলে আহত হয়েছে। কিন্তু এখন এ কথাটা স্পষ্ট হতে থাকে, রাজুর আধ্‌পাগলা হওয়া ছাড়া উপায় নেই। চারপাশে দেয়ালের মধ্যে থেকে কেউ যদি চেঁচায় তার কণ্ঠস্বর দেয়ালের ওপাশে পৌঁছে দেবার জন্যে তবে তা আস্বাভিকর

ঠেকতে পারে কিন্তু তা অস্বাভাবিক কেমন করে বলবে।

'আর দুটো ঘণ্টা কাটিয়ে দাও নির্মল। গানটান করো কিংবা বাজে কথা বলো। কাল সকালে ট্রেন।'

নির্মল চেয়ে থাকে প্রবল কৌতূহলে। সে যে প্রেমে ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়েছে, এখনই খপ্ করে রাজুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে তার, কিংবা তার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে এখনি বলবে, 'তুমি আমার, তুমি আমার'......এরকম কিন্তু ঠিক নির্মলের মনে হচ্ছিল না। অথচ এরকম ঘটার প্রতিবেশ খুবই অনুকূল। রাজুর দিদি অন্তত ঘণ্টা দুয়েক কাঞ্জীভরমের সঙ্গে ব্লাউস্ পিস্ ঠিক ম্যাচ্ করল কিনা দেখবেন, তারপর পার্কসার্কাসে তাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাবেন। যাকে বলে একটা সঘন পরিবেশ তার সমস্ত মালমশলা হাজির। কিন্তু নির্মলের মনে হচ্ছিল যে এই সময়টা তার কাছে খুব দামী তার কারণ সে এই মেয়েটি সম্পর্কে তার বোধ খানিকটা যাচাই করার সুযোগ পাচ্ছে।

নির্মল চার দিক চেয়ে দ্যাখে। নাঃ, গঙ্গার ধার নয়, এই নোংরা হোটেল, এই নোনা-ধরা দেয়াল, দেয়ালে অর্ধউলঙ্গ মেয়েমানুষের ছবি, নড়বড়ে চেয়ার আর তক্তাপোষ, একপাশে পড়ে থাকা সন্ধের এঁটো চায়ের পেয়ালা পিরিচ, নীচে ধুলোর ভরা সতরঞ্চি—এই তার প্রেমের পীঠস্থান। এইভাবে যে তারা দাঁড়িয়েছে এইটাই খুব বড় সত্য। চিঠির সত্যের চেয়ে তা হয়ত কর্কশ। কিন্তু এ সত্যের সৌন্দর্য তাকে স্পর্শ করুক।

প্রেমের পীঠস্থান? কথাটা নিজের কানেই খট্ করে লাগে নির্মলের। সে কি কথাটা বসিয়ে দিচ্ছে না জোর করে তার মানসিক আলস্যে? গত তিন বছর তাদের পত্রালাপের মাঝে মাঝেই সে নিজেকে প্রশ্ন করেছে—এটা কি একেবারে ছেলেমানুষী না সীরিয়াস্ কিছু? সেই প্রশ্নের সমাধানে অসমর্থ হয়ে সে প্রেম কথাটাকে আঁকড়ে ধরছে না?

প্রেম হোক আর নাই হোক—পিতপিতে আলোর নীচে একহারা নীল শাড়ীপরা মেয়েটার তেলহীন খোলা চুলের দিকে চেয়ে চেয়ে নির্মল বুঝতে পারে ব্যাপারটা তাকে প্রত্যক্ষ এক সত্যের মতো আকর্ষণ করছে। অনেক ব্যাপারই ঠিক এরকম প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে ওঠেনি তার জীবনে।

'তোমার চিঠিতে......' নির্মল চিঠির প্রসঙ্গ তুলতে চায়। অধোয়া কাচের ডিশগুলো আর তেলচেটে সতরঞ্চির দিকে চেয়ে চেয়ে সে স্বর্গ নরকের মাঝখানে সেতু বাঁধতে চায়।

'ও কথা থাক। চিঠি যখন লিখেছি তখন অনেক কথা ভাবি নি। হয়তো অনেক কথা ভাবি নি বলেই অতো জোরের সঙ্গে—অতো জোরের সঙ্গে তোমার কাছে আসবার সাহস পেয়েছি। তখন নিশ্চয় ভাবি নি একপুজোর সময় থানায় কাটাতে হবে একটা নড়বড়ে কাঠের টুলের ওপর বসে। আর বর্ডার চেক্ পোস্টে মানুষের কি নাজেহাল!'

রাজু একরাশ তেলহীন চুলের নীচে তার মস্ত বড় চোখ দুটো আর তীক্ষ্ণ চিবুক তুলে নির্মলের দিকে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ। 'আরও কত কি দেখলাম। তোমার কাছে আসতে গিয়ে আমার প্রাণের ভেতরটা যে এমনভাবে শুকিয়ে যাবে ভাবি নি। আগে ভেবেছিলাম আমার খুব জোর। কিন্তু এখন সব জোর আলগা হয়ে গেছে।...তুমি তো বেশ সেজেগুজে আসছো আমার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তুমি ভাবতে পারবে না কি পাহাড় প্রমাণ বাধা ঠেলে আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছি। ভাবছি ফিরে যাই।'

'আমিও তোমার এই গ্লানি ভাগ করে নেব।'

'শিরাজ্! গল্পের মতো কথা বোল না। একথাগুলো শুনতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু কি জানো—গত কয়েকদিন খালি শুনেছি তোমাদের কথা আর বাজে বকেছি—খালি মনে হচ্ছিল আমি তোমার চেয়ে আরও বুড়িয়ে গেছি।...তুমি হাসছো। কিন্তু গত কয়েক বছরে চারপাশে এত দেখেছি, যে সব জিনিস ভাবতাম সবচেয়ে দামী তা হঠাৎ ভেজো হয়ে গেছে। এই কলকাতাটা দ্যাখো—ছেলেবেলার স্বপ্ন। এখানে এসে কলেজে পড়ব। তারপর এক ঝাপটে দেশভাগ। আমরা খড়কুটোর মতো কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লাম।...বর্ডার চেক পোস্টে আমাদের এক সহযাত্রী এক হিন্দু ভদ্রলোকের পাসপোর্টভিসা নিয়ে কি নাজেহাল! এক প্যাকেট সিগারেট, পান, তারপর পাঁচ টাকার বায়না ধরলে, আমি খুব বকুনি দিলাম। তাতে কাস্টমসের সেই লোকটা থতমত খেয়ে পাসপোর্ট দেখতে চাইলে। আমার পাকিস্তানী কাগজপত্তর দেখে লোকটার কপালে চোখ উঠল। বোধহয় এরকম প্রতিবাদ বেশী সে দ্যাখে নি। দিদি খুব বকলেন আমায়।'

নির্মল তার হাতটা মুঠি করে বললে, 'এইটাই তো আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ রাজু। আমরা এই চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে পারব না?'

রাজু হেসে উঠল। মুহূর্তের জন্যে তার চোখে সেই পাগলাটে আলো খেলে যায়। 'রাগ কোর না। একটা কথা বলব...ছেলেবেলায় আমাদের পাড়ায় একটা প্লে হোত, ললিতাদিত্য। ভারী জমকালো পার্ট। আমার যে কি ভাল লাগত। তাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ললিতাদিত্যের সঙ্গে রাণীর সাক্ষাৎটা আমার মনে আসছে। বলব?'

সেই সকৌতুক মুখখানার দিকে চেয়ে, নির্মল একটু দমে যায়। হাসবার চেষ্টা করে বলে, 'বলো।'

রাজু তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। তারপর দুহাত বাড়িয়ে আবৃত্তি করে, 'অস্ত্রের ঝনৎকারে মিলনের মঙ্গলবাদ্য বেজে উঠুক, মৃতের আর্তনাদে মিলনশঙ্খ ধ্বনিত হোক। আর আমরা এ দুজনা এ শবের স্তূপের মাঝে আমাদের সাধের বাসর রচনা করি।' সাধের বাসর কথাটায় এমন টান দেয় রাজু যে দুজনেই হেসে ওঠে সশব্দে। হাসতে হাসতে রাজু বললে, 'তোমার কথা নির্মল আমার সেই ছেলেবেলার ভালবাসার ললিতাদিত্যের মতো লাগছে।'

নির্মল গম্ভীরভাবে বললে, 'মেলোড্রামাতে আমার আপত্তি নেই রাজু যদি সেই মেলোড্রামা সত্যি হয়।...আমি অনেক চালাক লোক দেখেছি। চালাক লোক হলে তুমি যে তোমার দুহাত বাড়িয়েছিলে আমার দিকে, সেদিকে তাকাতাম না। বলতাম, সেন্টিমেন্টাল কিংবা আরও জুৎসুইভাবে বলতাম, নিউরোটিক। কিন্তু আমি তোমাকে সত্যিই তারিফ করছি মনে মনে, এই বেড়া ডিঙ্গানোর জন্যে।'

তারপর নির্মল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে থাকে, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আজ বড্ড ভাল লাগছে রাজু। অনেকদিন পর মনে হচ্ছে আমি কথা দিয়ে সত্যিই কোন প্রয়োজনীয় বস্তুকে ধরতে চাইছি। বেশীর ভাগ কথাই তো হর্লিক্সের বিজ্ঞাপন। তোমার রাজু মনে হয় না, তোমার বাবা কিংবা ধরো আমার জ্যাঠা—মানে যারা সাকসেসফুল লোক—যাদের নামডাক হয়েছে, যাদের কথা রোজ কাগজে ফলাও করে বেরোয় তারা সবাই আসলে কথার মানে মেরে ফেলছে। যেমন ধরো জ্যাঠামণির মন্ত্র আমাদের স্টান্ডার্ড অফ লিভিং বাড়াতে হবে...

'কিংবা বাবার ইস্লামী গণতন্ত্র,' রাজু উৎসাহে যোগ দেয়।

এইসব কথার জালে তারা সুন্দরভাবে নিজেদের লজ্জায় আর ভয়ের ভোলায়। তোমার মনে হয় না এই হিন্দুস্থান পাকিস্তানে শুধু কতগুলো প্রাণহীন স্লোগান দিয়ে মানুষগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আর হিন্দুস্থান পাকিস্তান কেন অনেক জায়গাতেই......

'আর কথা নয়।' রাজু সজল চোখে তাকায় নির্মলের দিকে। 'আমার পাশে বোস।'

আর নির্মল এই আহ্বানের অপেক্ষায় ছিল। নির্মল আর রাজু পাশাপাশি বসে থাকে চিত্রার্পিতভাবে। তাদের চোখ দুজনের দিকে নেই, বরঞ্চ নিজেদেরকেই যেন দেখতে থাকে পাশাপাশি বসে। কিংবা পাশে বসা লোকটির চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে থাকে। এভাবে কটা মুহূর্ত কেটে যায়। আর নির্মল অনেক পরেও ভেবেছিল এই উজ্জ্বল মুহূর্তগুলোর কথা যেন তারা সারা জীবনের চিত্রকল্প হয়ে থেকে যাবে।

একবারও তার মনে হয় নি যে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়, বরং ভেবেছিল এইভাবে পরস্পরের গভীর সান্নিধ্যে থেকেও পরস্পরের ভাবনার স্বাতন্ত্র্য রাখা, নিজেকে অবলুপ্ত না করেও নিজেকে দান—এই অভিজ্ঞতা কি অনেক দামী নয়?

কতক্ষণ তারা এভাবে বসেছিল খেয়াল নেই হঠাৎ পাতলা পার্টিশানের ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ সহাস্য চীৎকারে তারা প্রায় ঘুম থেকে জেগে উঠল। 'না-না-না-না-না, অমন করে না, অমন করে না।' সেই চপল নারীকণ্ঠের ইঙ্গিৎ তাদের কানে পৌঁছয় না। তারপর পার্টিশানের ওপার থেকে দুটি নরনারীর সঙ্গমবাসনা চরিতার্থতার জন্যে যেসব অনুযোগ-আদর-ভর্ৎসনার স্বর ভেসে আসে তাদের কোনটাই তাদের কানে যায় না। তারা দুজন ঠিক মন্দিরের গাত্রে খোদিত দুই পাশাপাশি কিন্নর-কিন্নরীর মতই চিত্রার্পিত। চিত্রার্পিত নিজেদের অন্তরের সৌন্দর্যে। চারপাশের দুরপনেয় অসৌন্দর্যের চাপ থেকে নিজেদের সরিয়ে তারা এখন প্রবেশ করেছে এমন এক জায়গায় যেখান থেকে কেউ তাদের নড়াতে পারবে না।

পনেরো পাওয়ারের হলুদ আলোয় সেই নীল শাড়ী আর হলুদ পাঞ্জাবীপরা দুই মূর্তি সেই মুহূর্তে সমগ্র ভারতবর্ষ পাকিস্তান উপমহাদেশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এই চারপাশের অবিশ্বাস সন্দেহ আর আগুনের ঘৃণার মধ্যে এক রাতজাগা যাত্রার জমজমাট পরিবেশে তারা এক বহুপুরনো নাটকের নতুন নায়ক-নায়িকা। পাশেই চোখ ফিরলে বুঝি দেখা যাবে অসংখ্য শবের স্তূপ, লক্ষ লক্ষ দগ্ধ গৃহের ছাই উড়ছে হাওয়ায়।

অনেকক্ষণ পর নির্মল আস্তে আস্তে বলে, 'ব্লেকের কবিতা সেদিন গলা ফাটিয়ে ক্লাসে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম। এখন কবিতাটার মানে আরও পরিষ্কার।'

তারপর সে কবিতার প্রথম লাইন, 'O Rose, thou art sick......' আবৃত্তি করতেই রাজু চেঁচিয়ে উঠল, 'চুপ করো, চুপ করো। কবিতা আবৃত্তি কোর না। গান কোর না। আমাকে বুঝতে দাও, কবিতার ব্যাখ্যা দিয়ে কি সব সত্যকে ধরা যায়? মানুষ নিজেই নিজের ব্যাখ্যা।...তাছাড়া আমি সিক্ নই, সিক্ ছিলাম। খানিকটা সত্য খানিকটা মিথ্যে শব্দ চারপাশে ছড়িয়ে নিজেকে সব সময় ক্ষতবিক্ষত করেছি মানসিক দ্বন্দ্বে।...ব্লেকের কবিতা আমি পড়ি নি। কিন্তু এটা আমি বুঝতে পারছি প্রেমের রোগের কথা বলছো তুমি। আমার অবস্থাটা ঠিক উলটো। এই প্রথম মনে হচ্ছে সুস্থ হয়ে উঠছি।'

পার্টিশানের ওদিকে বাথরুম থেকে চেন্ টানার শব্দ আর হুড়মুড় করে জলের আওয়াজ আসে। তোয়ালে দিয়ে বোধহয় কোন পুরুষমানুষের গা হাত পা মোছার সঙ্গে

সঙ্গে 'আঃ আঃ' শব্দ। অকস্মাৎ নৈঃশব্দ্য, তারপর নিম্নস্বরে কথোপকথন, পুরুষালী গলায় ধমক। হঠাৎ মেয়েটির আদুরে গলা বেজে ওঠে, 'চ্যাটার্জীকে আমার কথা বোল গো।' কিন্তু পার্টিশানের এদিকে রাজু কিংবা নির্মলের কানে সেই কলকণ্ঠলগ্নার কণ্ঠ পৌঁছয় না। নির্মল ভাবছিল একেবারে একটা বায়বীয় ব্যাপার যার কোন ভিত্তি নেই, যা কেবল বর্ডার চেকপোস্ট, অসংখ্য সন্দেহ, অপরিসীম স্বিধা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আমার পক্ষে একেবারেই অপরাগ তা এখন শক্তিমান হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ প্রায় কবিতার মতো অলৌকিক। গৌতম সেনের ভাষায় বোধহয় সেন্টিমেন্টাল নন্‌সেন্স্‌। এর মানে কি সে জানে না। নির্মলের মনে মনে চিঠি আদান-প্রদানের ভেতরে ভেতরে সম্প্রতি রাজুকে অবলম্বন করে যে আটপৌরে স্বপ্ন গড়ে উঠেছে সে স্বপ্নের বোধহয় কোন ভিত নেই। এ স্বপ্নের কথা বলতে গেলে রাজু হাসবে, ললিতাদিত্য বলে ঠাট্টা করবে। কিন্তু এই ভাবে বেড়া ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে রাজু যদি আসে এবং তার মনে এইরকম উত্তাপ সৃষ্টি করে তাহলে সেটাই কি কম লাভ?

নির্মল ঠিক বুঝতে পারে না এইটাই তার মনের কথা কিনা। পরে ভেবে দেখেছিল, এটা তার মনের কথা নয়। বরং তার মানসিক আবেগের সে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা নক্সা চায়। সে জানতে চায় সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই কথাটাই তার মুখ দিয়ে ফস্‌ করে বেরিয়ে পড়ে, 'আমি জানতে চাই আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি,' গলা খাঁকারি দিয়ে নির্মল বলে।

রাজু হঠাৎ ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে। নিজের অজান্তেই চোখ রগড়ায়। এতক্ষণ যে নৌকোয় সে বিস্তৃত নীল জলে পাল তুলে বেড়াচ্ছিল তা হঠাৎ চড়ায় আটকে গেল। তার চোখের সেই সজল দীঘল দৃষ্টি হারিয়ে গিয়ে আবার সেখানে পাগলাটে তীক্ষ্ণ আলো খেলতে থাকে। তার ছোট সুগঠিত মাথার সঙ্গে তার মুখের হাঁখানা একটু বিসদৃশভাবে বড় মনে হয়।

'তুমি জানতে চাও? আমি চাই না,' রাজু বললে।

নির্মল বুঝতে পারে তার চালে ভুল হয়েছে। কিন্তু সে তো কথা সাজিয়ে এখানে আলাপ করতে আসে নি। সে যে এতক্ষণ মাঠের হাওয়ার মধ্যে বসে আছে তার তো একমাত্র কারণ তারা কথা সাজিয়ে পরস্পরকে ভুলায় নি। এতে যদি তাদের পরিবেশের মন্ত্র কেটে যায় তবু নির্মল একথা বলবে। সে পারবে না বছরের পর বছর এই বায়বীয় উপস্থিতির চাপ বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে। আর তাছাড়া তাদের মধ্যে বাধাটা কিসের? ধর্মীয়? সে তো তারা দুজনেই বিশ্বাস করে না। দুজনেই তো বিশ্বাস করে, যে প্রাথমিক বোধে তাদের আস্থা তার জানলা সমস্ত দেশকালে উন্মুক্ত।

নির্মল অধীর হয়ে বললে, 'সত্যি আমি জানতে চাই আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। এটা কি আমাদের মানসিক বিলাস না আরও কিছু। আরও কিছু শক্ত স্থায়ী কোন দৃঢ় ভিত্তিতে একে দাঁড় করানো যায় না?'

রাজু তার পাগলাটে দৃষ্টি দিয়ে নির্মলের দিকে তাকায়। বলে, 'তুমি নাকি কথার বাহার বড় ভয় পাও? আমাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, রাজনৈতিক দলের লোকেরা কেমন কথার সাজানো বাগান তৈরী করছে একটু আগে বললে না। আর তুমিই বলছো, শক্ত স্থায়ী দৃঢ় ভিত্তি......এগুলো সাজানো বাগান নয়? না না নির্মল, কোন কথা জানি না। আর সামান্য সময় আছে। দিদিদের নিশ্চয় পার্ক সার্কাসে খানাপিনা শেষ। এক্ষুণই খোকাবাবু

আসবে। এখনই চিংড়ি মাছের মালাইকারী, কড়াইভাজা শুরু হবে। শিগ্গির নির্মল, এসো আমরা যেমন বসেছিলাম তেমনি বসে থাকি।'

রাজু এবার আলগোছে নির্মলের গায়ে হেলান দেয়। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'সুন্দর জিত—আমি যদি তোমার মতো সুন্দর হতাম তাহলে নিশ্চয় বলতাম, আর পাকিস্তানেই ফিরে যাব না। কিন্তু আমি তা বলছি না। আমার পক্ষে সেটা বলা আর একটা সাজানো বাগান নির্মল, তাই না? তাছাড়া, আমি ঠিক জানি না, তোমার শক্তি কতখানি। আমার সম্পূর্ণ ভার তোমার ঘাড়ে তুলে দিতে আমার আত্মসম্মানে লাগবে। অতো তাড়া কেন নির্মল? আমাদের জীবন তো সামনে পড়ে আছে'।

আবার তারা চুপ করে বসে। আর সেই নোংরা সতরঞ্চি বেছানো মেঝের ওপর গায়ে-কোটা লড়বড়ে তক্তপোষে তাদের সেই চুপ করে পাশাপাশি নিজের মনে বসে থাকা দেখার গভীর তাৎপর্যপূর্ণ—তারা দাঁড়া এক আশ্চর্য সজীব মেলোড্রামা, সেই ছেলেবেলার তাল-লাগা ললিতললিতা নাটক। অথবা বলা যেতে পারে তারা বাংলা দেশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সেই তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে তারা দুজনেই তাদের দেশ ও কালের প্রকাণ্ড বৈপরীত্য মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হয়নি। অথচ তারা ঘুরে বেড়িয়েছে সেই কালহীন নীলাভ চিদাম্বরে যেখানে সমস্ত ঐক্য সুসংহত। গঙ্গার ধারে এমনটি ঠিক হোত না। গঙ্গার ধারে তারা হোত কেবল প্রেমিক যুগল। কিন্তু তাদের এই পরস্পর তন্ময় অথচ সম্পূর্ণ পৃথক স্বতন্ত্র ভঙ্গীতে বসার ভেতর তারা যেন এই দ্বিখণ্ডিত বাংলা দেশের অস্তিত্বই ঘোষণা করছে মৌনে। একবারও তারা দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়নি কিংবা চুম্বনে অধীর হয়নি। কারণ আলিঙ্গন এক্ষেত্রে অবাস্তব, চুম্বন অধৈর্যের সাক্ষর। তারা যেন এইভাবে চারপাশের নোংরা পরিবেশের মাঝখানে যুগের পর যুগ অপেক্ষা করবে তাদের মিলনলগ্নের অপেক্ষায়। তার আগে সবই কথা সাজানো প্রতিশ্রুতি। এ বুঝি সমস্ত বাংলাদেশেরই প্রতীক্ষা। বছরের পর বছর দেশের দুভাগে ধূনোধ্বনি হবে। সংখ্যালঘু মানুষদের ধড় অন্ধকারে শূন্যে চীৎকার করে দৌড়বে, তাদের বাড়ির ছাই উড়বে হাওয়ায় আর এরই মাঝখানে এই দুই বাংলাদেশ তাদের 'সাধের বাসর' রচনা করবার স্বপ্ন দেখবে পাশাপাশি বসে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। 'বুঝতে পারছো নির্মল আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?' রাজু নির্মলের হাতখানা ধরে জিজ্ঞাসা করে।

'বুঝতে পারছি।' নির্মল রাজুর হাতে মৃদু চাপ দেয়।

[ক্রমশঃ]

কবিতার আয়তন

অরুণকুমার সিকদার

দীর্ঘ কবিতার বিরুদ্ধে কবি ও সমালোচকেরা এখন যা বলছেন সে কথা সংক্ষেপে অনেক দিন আগে হোরেস কাব্যতত্ত্ব বইতে লিখেছিলেন—

I grieve when Homer nods: but every song
Is liable to tedium if long.

অনেক পরে এডগার অ্যালেন পো লিখেছিলেন 'I hold that a long poem does not exist.' পো-র অনেক কথার মর্ম ঠিকঠিক বুঝে উঠতে না পারলেও তাঁর কাব্যাদর্শ যে অনেক পরিমাণে বোদলেয়ারকে প্রভাবিত করেছিল, এ কথা এখন কবিতার পাঠকমাত্রেই জানেন। বোদলেয়ার ছিলেন শুদ্ধ শিল্পের সন্ন্যাসী; তাঁর ডান্ডিজম্‌ বা বাবুয়ানা সেই সন্ন্যাসেরই উল্টো পিঠ। বোদলেয়ার মালার্মে'র পর থেকে সেই শুদ্ধতার সন্ধানে কবিতা ক্রমেই আকারে ছোট হয়ে আসছে—নীতি তত্ত্ব উপাখ্যানের খাদ বর্জন করতে করতে হয়ে উঠছে আকারে লঘু। গীতিকবিতাকেই গণ্য করা হচ্ছে কবিতার সারাৎসার, দুই-তিনটি স্বল্পায়তন স্তবকে এখন কবিতার সমাপ্তি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইমেজিজমের গুরু হিউমের *The Complete Poetical Works* সারা জীবনের ফসল পাঁচটি কবিতার সংগ্রহ এবং সমগ্র কবিতাসংগ্রহের চরণসংখ্যা চল্লিশের বেশি নয়। এই প্রবণতা এখন এতদূর গড়িয়েছে যে পাশ্চাত্ত্যের কোনো কোনো কবি এক-দেড় লাইনকেই সম্পূর্ণ কবিতা বলে দাবি করতে শুরু করেছেন। যেমন গুইসেপ্পে উনগারেত্তি। তাঁর একটি কবিতা পাচ্ছি—

M'illumino
d'immenso

অসীমের আলোয় আমি নিজেকে প্লাবিত করি। বিমূঢ় বিরুদ্ধবাদী বলবেন, এটি কি কবিতা, না 'mere exclamation on a piece of paper.' ব্যাপারটি কী দাঁড়ালো সে সম্বন্ধে উনগারেত্তি নিজেও হয়তো নিশ্চিত ছিলেন না তাই একজায়গায় এই বাক্যটির নামকরণ করেছেন 'Mattina' (সকাল), অন্য জায়গায় 'Cielo e mare' (স্বর্গ ও সমুদ্র)। পো যিনি দীর্ঘ কবিতার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন তিনিও সেই অস্বীকারের এই পরিণাম দেখলে হয়তো চমকে যেতেন, কারণ তিনি আবার 'very short poem'-এর বিপক্ষে ছিলেন। এই প্রবণতা যদি চলতে থাকে তাহলে একদিন নিরঞ্জন মৌনকেই হয়তো কবিতা বলতে হবে।

বাংলা কবিতার সম্প্রতিকালে এই প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠেছে। কয়েকটি প্রমাণ উল্লেখ করি। শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত "বাংলা কবিতা" সঙ্কলনটিকে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কাব্যচর্চার প্রতিনিধিস্থানীয় বলা চলে। এই সংকলনের দীর্ঘতম কবিতাটির চরণসংখ্যা আটচল্লিশ। অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত "বারো বছরের বাংলা কবিতা"-র দীর্ঘতম কবিতাগুলির চরণসংখ্যা ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়। "কবিতাপরিচয়" নামে আধুনিক কবিতার ব্যাখ্যা সম্বলিত পত্রিকাটিতে বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচিত কবিতাগুলি ব্যতিক্রমহীনভাবে

দুর্বলতা। পঙ্‌ক্তিটির অর্থাভিসার হয়তো একটি কারণ, কিন্তু মনে হয় একমাত্র নয়—হ্রস্ব কবিতাই শুধু কবিতা এই মনোভাবও কি পিছনে দাঁড়িয়ে নেই?

জল কি তোমার জন্য ব্যথা পায়? তবে কেন, তবে কেন
জলে কেন যাবে তুমি নিবিড়ের সজলতা ছেড়ে?
জল কি তোমার বুকে ব্যথা দেয়? তবে কেন, তবে কেন
কেন ছেড়ে যেতে চাও দিনের রাতের জলভার?

কুড়িটি শব্দে একটি সম্পূর্ণ কবিতা। লক্ষ্য করার যে এই পুনরাবৃত্তিপরায়ণ কবিতাটি যেমন জিজ্ঞাসায় শুরু, তেমনি জিজ্ঞাসায় শেষ। উত্তর খুঁজতে গেলে দেরি হয়, ধৈর্য ধরে মনন-চিন্তার উপর নির্ভর করতে হয়—সেই সংকটে না যেয়ে ওষ্ঠপুটে জিজ্ঞাসু রেখে এবং একটি ব্যথাতুর ভাবচ্ছায়া সৃষ্টি করে সীমা টেনে দেওয়া হলো। স্বীকার করি সীমাবদ্ধতার চরণ চারটি চমৎকার, কিন্তু সীমাবদ্ধ অবশ্যই। এবং সব কবিতাই যদি ক্রমে-ক্রমে এই ধরনের হয়ে ওঠে? রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা অতিকথনে কাব্যের বাঁধুনি নষ্ট করেছে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু যদি 'স্ফুলিঙ্গ' লিখতেন তাহলে রবীন্দ্রনাথ কি রবীন্দ্রনাথ হতেন? পাউন্ডের সমগ্র *Cantos* আমি পড়িনি, তাই বলতে পারি না তার মধ্যে পূর্বাপর স্থাপত্যের মত বা সঙ্গীতের মত কোনো পরিকল্পনাগত ঐক্য আছে কিনা—না সেগুলি নিতান্তই ছোটো-ছোটো গীতিকাব্যের মুক্তোর একটি ছেঁড়া মালা। কিন্তু *Cantos* বাদ দিয়েও তাঁর অন্য দীর্ঘ কবিতা পড়লে বোঝা যায় তিনি যদি সারাজীবন হিউমের সাকরেদি করে 'In a Station of the Metro'-র মত

The apparition of these faces in the crowd;
Petal on a wet, black bough.

কবিতা লিখতেন তাহলে কবি হিসেবে তাঁর আসন নির্দিষ্ট হতো হিউমের পাশেই। এলিয়টের কথাই ধরা যাক, তিনি যদি 'The Waste Land' বা 'Four Quartets' না লিখতেন তাহলে তিনি ক্ষুদ্র কবিতার সিঁড়িতে মহত্ত্বের শিখর জয় করতে পারতেন না। দীর্ঘ কবিতা লেখেন নি অথচ মেজর কবির প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এমন নজির বেশি মেলে না—এই মুহূর্তে ইয়েটস্‌কে ব্যতিক্রম হিসাবে মনে পড়ছে। তাহলে কি উনপঞ্চাশোত্তর-প্রমুখ কবিরা অপ্রধান কবি হয়েই তুষ্ট থাকতে চান? এ কি বিনয়, না আত্মবিশ্বাসের অভাব? আত্মপ্রত্যয়ের অভাব কি শুধু কবির নিজের শক্তি সম্বন্ধে, না কবিতারই সম্বন্ধে? ব্যাপারটা হয়তো ইল্‌লজিক্যাল, কিন্তু বৃহত্ত্বের সঙ্গে মহত্ত্বের কোথায়ও একটা অনিবার্য যোগ আছে, তার হাত আমরা এড়াতে পারি না।

ভালেরি বলেছেন, শুধু বুদ্ধি দিয়ে কবিতা হয় না। অবশ্য বাংলায় এখন বুদ্ধিমানের চাতুরি দিয়ে এক ধরনের কবিতা লেখা হচ্ছে। 'The Waste Land'-এর নিন্দা করতে গিয়ে গ্রেভস তাকে কোলাজ-ধর্মী কবিতা বলেছিলেন, কোলাজ-কবিতা নামটি এই জাতীয় চতুর কবিতা সম্বন্ধে খাটে ('Collage being the technique of pasting, say, autumn leaves, bus-tickets, metal shavings, cigarbands, fur, playing cards and artificial flowers on a sheet of paper, in order to creat a 'significant' composition. What the composition is 'significant' of, is never explained.')। সে যাই হোক, ভালেরির কথার প্রতিধ্বনি শুনি জীবনানন্দের উক্তিতে 'নিছক বুদ্ধির জোরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়।' বুদ্ধি যথেষ্ট নয় এই কথা বলেছেন তাঁরা,

বুদ্ধিকে বর্জনের পরামর্শ কিন্তু দেননি। সম্প্রতিকালে বাংলা কবিতা যে আয়তনে ছোট হয়ে আসছে, দীর্ঘ কবিতা লিখিত হচ্ছে না তার একটা কারণ, বুদ্ধিকে চৈতন্যকে অবিশ্বাস, অবচেতনের কাছে আত্মসমর্পণ। এখন কবির শুধু অপেক্ষায় থাকা যতক্ষণ কিছু ইমেজ বা সুর সেই অবচেতনের অন্ধকার অতল থেকে উঠে না আসে। সেই আধিভৌতিক শক্তির নির্দেশে দ্যুতিলিখন লেখেন কবি। কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক প্রভুটির মাঝখানে যেই অন্তর্হিত হয় অমনি অপ্রস্তুত কবির কবিতার দাঁড়ি পড়ে যায়—অবচেতনের দম ফুরিয়ে গেলে কবি নামক কলের পুতুল হয়ে পড়ে নিশ্চল। হারবার্ট রীড একটি অদ্ভুত উপমা ব্যবহার করে এই কথাই বলেছেন—'The modern poet with few exceptions, writes poetry as if he were taking his Muse for a walk and gives up when he feels tired or falls behind his Muse.'

কবিতা পত্রিকা "কৃত্তিবাসে" একজন পঁচানব্বুই চরণ এগোনর পর হতাশ হয়ে হার মেনে অসমাপ্ত কবিতার শেষে বন্ধনীর মধ্যে লিখে দিয়েছেন 'বাকি অংশ লেখা হয়নি।' কিন্তু ছাপা হয়েছে, কারণ সকলেই মনে-মনে জানে যে এখনকার কবিতার একটা বড় অংশ এমন অসমাপ্ত কবিতা, যদিও মুখ ফুটে সে কথা কেউ কবুল করে না। "আহত দ্যুতিবিলাস" গ্রন্থে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় 'চূর্ণ কবিতাগুচ্ছ' মুদ্রিত করেছেন—সমাপ্তির চেষ্টায় হার মেনে এই মুদ্রণ পরাজয়ের স্বীকৃতি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় উৎক্ষিপ্ত কররেখা নামে এক থেকে একাধিক লাইনের কিছু বিচূর্ণ কবিতাকণাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন "হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ" গ্রন্থে এবং পাদটীকায় জানিয়েছেন—'নানা সময় নানা পদ্য শুরু করেছিলাম—এগোয় নি। লিখিত টুকরোগুলোর কয়েকটি তুলে দিয়ে নিস্তব্ধ অলিখিতের দিকে নির্দেশ করছি মাত্র।' এ কি নীরব কবিত্ব, না পরাভূত কবিত্ব? এর পরে কি আমরা অপেক্ষা করে থাকবো সেই কাব্য-কৌতুকের জন্য যখন কবি বাঁধানো শাদা পৃষ্ঠা পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে 'নিস্তব্ধ অলিখিতের দিকে নির্দেশ' করবেন?

এই জাতীয় অবচেতনে নির্ভরশীল কবিতার মধ্য দিয়ে ইমেজসঙ্গীতের সামঞ্জস্যে কখনো কখনো একটি ভাবমণ্ডল সৃষ্টি হয় বটে, কুজ্ঝটিকার দ্যুতির মত একটা অস্পষ্ট অর্থের আভা মেলে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অসম্বদ্ধতার দুষ্প্রবেশ্য হয়ে ওঠে। অথচ কবিতা যতক্ষণ শব্দে লেখা এবং শব্দ যতদিন অর্থময় ততক্ষণ অর্থের ছোঁয়া কবিতা এড়াবে কি করে? প্রত্যেক শিল্পই মাধ্যমের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে তবে সেই সীমাকে অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু চৈতন্যে অবিশ্বাসী এই কবিতা যেহেতু অর্থেও পুরোপুরি বিশ্বাসী নয়, সেজন্য সে যুক্তি-তর্ক বক্তব্য-তত্ত্বকে সন্দেহের চোখে দেখে। দীর্ঘ কবিতা, যেখানে কল্পনার সহযোগে যুক্তিতর্কের কাব্যময় পরম্পরায় সম্মত পরিণাম অর্জিত হয়, সেই কবিতা স্বভাবতই এই পরিবেশে লিখিত হতে পারে না। উপকরণকে ছন্দোবদ্ধ করার অর্থও যেমন জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম দীর্ঘ কবিতা রচনার জন্যও তেমনি প্রয়োজন হয়, চৈতন্যের সঙ্গে জড়ের নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারার মত ক্ষমতা। চৈতন্যে অবিশ্বাসী, অবচেতনে বিশ্বাসী কবিসম্প্রদায় এখন সেই সংগ্রামে লিপ্ত হতে রাজি নন, দীর্ঘ পরিশ্রম ও ধৈর্যে পরাঙ্মুখ তিনি সেই সংগ্রাম এড়িয়ে যান। অথচ জড়-উপকরণের উপর চৈতন্যের জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার নামই তো শিল্প।

ভালেরি এ কথা জানতেন, তিনি জানতেন যতক্ষণ কবির উপাদান শব্দ ততক্ষণ কবিতা থেকে অর্থ শোধন করা সম্ভব নয়। শুদ্ধ কবিতার প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি জানতেন

কবিতার শুদ্ধতা এক অনায়ত্ত আদর্শ—কবিতা থেকে যা-কিছু-কবিতা-নয় তাকে দূরে করার চেষ্টায় কবি নিরন্তর নিযুক্ত থাকেন বটে, কিন্তু সেই আদর্শ অর্জন করা যায় না কোনোদিন। 'In fact what we call a poem is in practical composed of fragments of pure poetry embedded in the substance of a discourse.' ভালেরির 'Le Cimetière marin' এবং 'Ebauche d'un Serpent' দীর্ঘ কবিতা দুটি এই কথার সত্যতা প্রমাণ করছে। অথচ এখন এই 'fragments' গুলিই পূর্ণ কবিতার মর্যাদা পাচ্ছে এবং 'substance of discourse'—এর প্রতি, মনীষার প্রতি সন্দেহবশত কোনো সত্যকার দীর্ঘ কবিতা লিখিত হচ্ছে না। কচিৎ দুটি-একটি দীর্ঘ কবিতা পাই বটে কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই দীর্ঘ কবিতার মৌলিক শর্ত মেনে নেয়নি—মননের উপলব্ধির অস্তিত্ব, স্থাপত্যধর্মী বা সংগীতধর্মী গঠন এবং চিন্তার প্রগতি; সেগুলির অনর্গল সংলগ্নতাহীন চীৎকারে ক্লান্ত হয়ে পাঠক বলে, দোহাই আপনি ক্ষুদ্র কবিতাই লিখুন সে তবু সহ্য হয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'অনন্তনক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে' মনে হয় একটি দীর্ঘ কবিতা, কিন্তু এটিও 'উৎক্ষিপ্ত কররেখার' মত কি বিচ্ছিন্নতার সমাহার নয়? ঐক্য কোথায়?—সম্বোধনের ভূমিতে, না বিভ্রান্ত অনর্গল পয়ারে? "তিন তরুণের" 'যোগাযোগ' অংশে শক্তি চট্টোপাধ্যায় যে চারটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন সেই জীবনানন্দ-প্রভাবিত কবিতাচতুষ্টয়ে তাদের ঐক্য নেই খানিকটা অস্ফুট তাৎপর্যের আভাস মেলে 'উটের মধুর আরব এসেছে কাছে' কবিতাটিতে। বাকি সব 'ক্ষিপ্ত বিকেন্দ্রীকরণ', 'উলোট-পালোট করে দিতে' চাওয়ার মত্ততায় অসম্বদ্ধ, অসংলগ্ন।

অথচ স্বদেশিবিদেশি কোনো কবিশ্রেষ্ঠ শুদ্ধতার সন্ধানে তত্ত্বকে, তর্কসোপানে বা সংজ্ঞার আলোয় অর্জিত উপলব্ধিতে কবিতার বিষয় করতে নারাজ হননি। সেই সময় তাঁরা দীর্ঘ কবিতাকে বাহন হিসাবে মেনে নিয়েছেন অনিবার্যভাবে। রিলকের কথা ধরা যাক, তিনি তো অবচেতনকে কম মর্যাদা দেননি। তিনি বলেছিলেন সব অভিজ্ঞতাকে সযত্নে জমিয়ে রেখে পরম ধৈর্যে অপেক্ষা করতে হয়—কবে সেই অভিজ্ঞতাপুঞ্জের মধ্যে একটি শব্দময় হয়ে আলোড়ন জাগাবে এবং নবজন্ম নেবে, তার জন্য। তাঁর ডুইনো এলিজির দশটি দীর্ঘ কবিতার উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। ইন্দ্রিয়ের জগতে সার্থকতার পর হৃদয়-জগতে প্রবেশের জন্য তিনি উন্মুখ হয়েছিলেন- অনুকূল অবসর এলো যখন তিনি ত্রিয়েস্তের নিকটবর্তী ডুইনো দুর্গে অবস্থান করছিলেন তখন। অনুবাদকের ভূমিকা থেকে জানতে পারি একদিন একটি বিরক্তিকর চিঠির জবাব মনে মনে গুছিয়ে নেবার জন্য তিনি সমুদ্রতীরে ঘুরছিলেন, এমন সময় গর্জমান ঝড়ের মধ্যে কেউ যেন ডেকে বললো—

Who, if I cried, would hear me among the angelic orders?

নোট বইয়ে তিনি চরণটি লিখে রাখলেন এবং এটিকেই প্রথম চরণ হিসাবে ব্যবহার করে সেদিন সন্ধ্যায় প্রথম এলিজিটি রচনা সমাপ্ত হলো। দুরূহ কাজ সম্পন্ন হয়নি, লেগেছিল দশটি বছরের অধ্যবসায়—দশটি বছর ধরে মনন ও কল্পনার যুগপৎ সংহত প্রয়োগ। যদিও তিনি চিঠিপত্রে নিজের ভূমিকাকে অকিঞ্চিৎকর বলে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন চরণগুলি 'grace' বা প্রেরণার অপর নাম তাকে যদিও ধন্যবাদ দিয়েছেন, কিন্তু সন্দেহ নেই তত্ত্বোপলব্ধিকে অচ্ছুৎ করে রাখলে এই মহৎ এলিজিসমূহের রচিত হতো না। শুধু অবচেতনের নিরালোক থেকে উঠে আসা ইমেজের দাক্ষিণ্যে নির্ভর করলে হতো না।

যা কিছু স্টেটমেন্টগন্ধী, ভাষণ ও বক্তব্যের স্পর্শসম্বলিত তার প্রতি এক অদ্ভুত

আতঙ্কে স্পর্শকাতর কবিরা এড়িয়ে চলেছেন যে কোনো বাক্যকে যা গদ্যে, যুক্তিতর্কপরম্পরা-নির্ভর গদ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে যা আকাট গদ্যবাক্য তাও কবিতায় ঠিক গদ্যের মতো ব্যবহৃত হয় না, সেই কারণে গদ্যবাক্য স্থান পেলেই কবিতা আর কবিতা থাকবে না এই ভয়ে আঁৎকে ওঠার কোনো কারণ নেই। শিল্পে কল্পনা ও সত্যের সম্পর্কটি ওয়ালেস স্টীভেনসের 'The Man with the Blue Guitar' নামক দীর্ঘ কবিতার বিষয়। তার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি—

A man bent over his guitar,
A shearsman of sorts. The day was green.

They said, "You have a blue guitar,
You do not play things as they are."

The man replied, "Things as they are
Are changed upon the blue guitar."

And they said then, "But play, you must,
A tune beyond us, yet ourselves,

A tune upon the blue guitar
Of things exactly as they are."

বক্তব্য শুধু তাত্ত্বিক নয়, অনেকগুলি বাক্যাংশও এখানে গদ্যে লেখা বেন, একেবারে দার্শনিক বিমূর্ত গদ্যে। কিন্তু শিল্পের প্রতীক নীল গীটারের সান্নিধ্যে সেই গদ্যও কবিতার ধর্মে আক্রান্ত হলো। শুদ্ধ কবিত্ব রক্ষার ছুৎমার্গে এই গদ্য এবং তত্ত্বকে যদি কবিতার জগৎ থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা হয় তাহলে সে চেষ্টাকে কবিতার প্রতি অনুরাগের প্রমাণ বলা যাবে না।

'Notes Towards a Supreme Fiction' নামক স্টীভেনসের বৃহত্তম এবং সম্ভবত মহত্তম কবিতার কেন্দ্রেও এই রকম তত্ত্বভাবনা বর্তমান—সত্য এক, পরিবর্তনের মধ্যে সত্য অনুস্যূত হয় এবং সত্য আনন্দ ও শান্তিদায়ী। কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ে যথোর যোগ-সূত্রগুলি উহ্য রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন এলিয়ট—এক থেকে অন্য কবিত্বের শিখরের মধ্যবর্তী সেই গদ্যময় উপত্যকাগুলি *Four Quartets*-এ এসে তিনি আর বর্জন করেন নি। বইটি খুলেই পড়ছি—

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.
What might have been an abstraction
Remaining a perpetual possibility

Only in a world of speculation.
What might have been and what has been
Point to one end, which is always present.

এই 'abstraction' বিমূর্তর পরম্পরায় গ্রথিত বাক্যসমবায়ে কোথাও চিত্রকল্প নেই, এমন কিছু নেই যা কোনো সুলিখিত দার্শনিক গদ্যে থাকতে পারতো না—একমাত্র আছে সঙ্গীত, প্রবাহ উচ্চারণের উপলব্ধিময়তার সঙ্গীত; এই সঙ্গীত অনেক সময় মহৎ গদ্যেরও সম্পদ। এই কথা আছে বলে কবিতার মৌলিক পাঠক *Four Quartets*-কে কি কবিতার রাজ্য থেকে নির্বাসিত করে দেবেন—না কাব্যের এলাকাকেই তিনি আরো প্রসারিত করে দেবেন যাতে এই গদ্যময় তত্ত্বময় রচনাংশও কবিতার সামগ্রিক অভিপ্রায় বিচারে কবিতারাজ্যেরই নাগরিকত্ব পায়? এলিয়টের এই কবিতাতন্তুর কি

The wave cry, the wind cry, the vast water
Of the petrel and the porpoise.

এইরকম বিচ্ছিন্ন ইমেজের জন্যই কোনোক্রমে সহনীয়? গদ্যকে নিষ্কাশিত করে অর্থাৎ চিন্তা ও তত্ত্ব বর্জন করে এই দীর্ঘ কবিতা কয়টি মহৎ হতে পারতো না, দীর্ঘও হতো না।

এই প্রশ্ন অন্য প্রসঙ্গেও সম্প্রতি উঠেছিল। "কবিতাপরিচয়ে" রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতার আলোচনাপ্রসঙ্গে 'প্রথম দিনের সূর্য'-র সঙ্গে প্রতিতুলনা করে শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন, 'ক্রমে দেখা যায় দুটি রচনায় মিলও যেমন, ভিন্নতাও তার চেয়ে কম নয়। এবং এই ভিন্নতা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি অকবিতার অংশগুলি কেমন নির্মমভাবে সরিয়ে দিলে ক্রমে জন্ম নিতে পারে একটি শুদ্ধ কবিতা।' উত্তরে আবু সয়ীদ আইয়ুব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'অন্যাংশমাত্র বেছে নিয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবার মতো বলা কি সাজে—বাকিটা সকড়ি, ওতে গদ্যের ছোঁয়া লেগেছে?' এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে তিনি এলিয়টের পূর্বোল্লিখিত কবিতার উদাহরণ দিয়েছিলেন। শঙ্খ ঘোষ এর উত্তরে শেষ পর্যন্ত জানালেন, 'গদ্যরূপে নয়, গদ্যপরিণামে' আসলে তাঁর আপত্তি। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই, তত্ত্ব বা চিন্তা বা তাদের বাহন গদ্যে কোনো আপত্তি নেই, কবিতায় ব্যবহারের সার্থকতাই একমাত্র নিরিখ। তাহলে দীর্ঘ কবিতা হলেই তাতে তাত্ত্বিকতা গদ্যময়তা তথা অ-কবিতার খাদ থাকে এই প্রশ্নে দীর্ঘ কবিতার বিরুদ্ধে আপত্তি করা যায় না দেখতে হবে কবিতার সামগ্রিক অভিপ্রায়ের দিকে নজর রেখে সাফল্যের সঙ্গে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। সাফল্য যদি মানদণ্ড হয়, nothing succeeds like success, এই প্রবাদবচনকে যদি সূত্র হিসাবে মান্য করি, তাহলে শুধু তত্ত্বময় গদ্য সম্বন্ধে কেন, কবিতার যে কোনো উপাদান, ইমেজ ছন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধেও একই প্রশ্ন ওঠে। তাহলে কবিতার গদ্যময়তাকে আলাদা করে নিয়ে আক্রমণ করার আর কোনো কারণ থাকে না।

'এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে', যদিও 'সে এখনও বেঁচে আছে কিনা তা শুদ্ধ জানি না'—এই দুই স্মৃতিভারাতুর খেদোক্তির দিগন্তের মধ্যে 'বৃষ্টির বিধুর দিনে' বিশ্বকালীন সভ্যতার সংকটকে সুধীন্দ্রনাথ দীর্ঘ 'সংবর্ত' কবিতায় ধারণ করেছেন। এই কবিতায় এমন তত্ত্ব ও সংবাদ আছে গদ্যে যার স্বাভাবিক স্থান; কিন্তু দীর্ঘ কবিতা যেহেতু জীবনোপলব্ধি প্রকাশের দুরূহতর দায়িত্বে তত্ত্বময় গদ্যকে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তাই 'সংবর্তে'র এই সব চরণগুলিকে শুদ্ধ কবিতায় স্থান পাওয়ার অনুপযোগী বলে মনে হয় না—

ব্যোমযান, কামান, পদাতি
যে-রাষ্ট্রের অঙ্গ নয়; ন্যায়, দয়া, মিতালি, মনীষা
যার মুখ্য অবলম্ব, বিজিগীষা
সামান্য লক্ষণ...

অথবা 'যযাতি' নামক দ্বিতীয় দীর্ঘ কবিতার এই চরণগুলি—

আমি বিংশ শতাব্দীর
সমানবয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে, বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎ পদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে.

এই জাতীয় স্টেটমেন্টগন্ধী বাক্যের স্পর্শকন্টকিত স্থাপত্যধর্মী দীর্ঘ কবিতা বাদ দিয়ে সুধীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিচার সম্ভব হয় না। সুধীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতার গঠন যদি স্থাপত্যধর্মী হয়, তাহলে বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতার গঠনবিন্যাস সাঙ্গীতিক। বিদ্রূপ ও বিশ্বাসের পাশাপাশি বিন্যাসে 'আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দনিষ্যন্দন আকাশের' নিচে কুৎসিত জীবনের ক্লেদগামী স্বার্থপর ব্যর্থতার হাহাকার বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতা 'জন্মাষ্টমী'-তে রূপায়িত; তার মধ্যেও বক্তব্যের প্রাধান্য আছে—কিন্তু তার জন্য কবিতাটির কবিত্ব আদৌ বিনষ্ট হয় নি।

সাম্প্রতিকদের কাব্যরচনার পদ্ধতির সঙ্গে আমি একজনের প্রণালীর খানিকটা যেন মিল দেখতে পাই। বাক্যকে ভেঙে দুমড়ে, ইমেজের পর ইমেজ স্তূপীকৃত করে, বিশেষ্য-বিশেষণকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিন্যস্ত করে শব্দ নিয়ে খেলায় মাতোয়ারা ছিলেন ডীলান টমাস। বলা নয়, বলার ধরণ, 'colour of saying' ছিল তাঁর কাছে মুখ্য। অর্থের চেয়ে শব্দের প্রাধান্য তাঁর প্রথম দিককার কবিতার দুর্বোধ্যতার জন্য দায়ী—কবিতা লেখার সংজ্ঞা তিনি দিয়েছিলেন 'the physical and mental task of constructing a formally watertight compartment of words..' যদি কোনো একটা মূল তাৎপর্য বা 'main moving column' এসে যায় ভালোই, নচেৎ নাই থাকলো। একটি বিখ্যাত এবং বহু-উদ্ধৃত চিঠিতে তিনি তাঁর কবিতা লেখার প্রণালীটি ব্যাখ্যা করেছেন— 'I make one image—though 'make' is not the word, I let, perhaps, one image be 'made' emotionally in me and then apply to it what intellectual and critical forces I possess—let it breed another, let that image contradict the first one, make, out of the third image bred out of the other two together, a fourth contradictory image and let them all, within my imposed formal limits, conflict. Each image holds within it the seed of its own destruction, and my intellectual method, as I understand it, is a constant building up and breaking down of the images that come out of the central seed, which is itsself destructive and constructive at the same time.' এই প্রণালীতে লেখা ডীলান টমাসের প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলিকে চরিতকার ফীট্জগীবন 'implosion' নাম দিয়েছেন। সাম্প্রতিককালের অনেক বাংলা কবিতা

সম্বন্ধেই এই কথাটি খাটে।

অথচ এই কবি, যাঁর কবিতা লেখার পদ্ধতি ছিল 'from words, not towards words', তিনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মৌলিক অভিজ্ঞতাসমূহের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে শেষ পর্যায়ে দীর্ঘতর কবিতা লিখতে উদ্যোগী হলেন এবং সেই দীর্ঘ কবিতাগুলিতে প্রাক্তন দুর্বোধ্য স্তবকের জায়গায় এলো আন্তরিক জটিলতা সত্ত্বেও অধিকতর বাহ্য সরলতা। তিনি নিজেকে অবচেতনে আত্মসমর্পণকারী সুররিয়ালিস্ট বলে মেনে নিতে আর প্রস্তুত নন। তিনি এখন বলেন 'the arts of the poet is to make comprehensible and articulate what might emerge from subconscious sources..' মৃত্যুর পূর্বে তিনি চারটি অংশ সম্বলিত 'In Country Heaven' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনায় হাত দিয়েছিলেন এবং তার প্রথম তিনটি অংশ 'In Country Sleeps', 'Over Sir John's Hill' এবং 'In the White Giant's Thigh' সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন, শেষটি, নামকবিতাটি আর লেখা হয় নি। সেই তাঁর দীর্ঘতম এবং পরিকল্পনার সম্ভাবনায় মহত্তম কবিতাটি লেখা হলে তাঁকে হয়তো 'second eleven' বা নিতান্ত মাইনরের দলে পড়ে থাকতে হতো না। তা হয় নি, কিন্তু তিনিও যে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি গুরুত্বের কথা বলার জন্য দীর্ঘ কবিতা রচনায় প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন, সেইটিই লক্ষণীয়।

তারাপদ রায়ের 'সপ্তদশ অশ্বারোহী'-র দ্বিতীয়টি উদ্ধৃত করছি।

> জীবনানন্দ দাশ, ১৯৬২। স্যার, বারান্দায় একটু অপেক্ষা করুন।
> দুলাইন লিখে নিতে দিন, একটু লিখতে দিন
> আপনার উৎপাতে বড়ো ব্যতিব্যস্ত আছি।
> আট বছর আগেকার লাশকাটা ঘর থেকে রক্তমাখা ঠোঁটে
> প্রত্যেক রাত্রিতে কেন, প্রত্যেক রাত্রিতে
> কোনো পরিচয় নেই, কোনো আত্মীয়তা নেই—কেন
> আমার ঘরের মধ্যে কেন?
> দয়া করে বারান্দায় অপেক্ষা করুন।

কিন্তু তাঁর আত্মা ঘরে না ঢুকুক বারান্দায় অপেক্ষা করতেই থাকে—যতই তফাৎ যাও তফাৎ যাও বলে আবেদন করা হোক না কেন। কারণ গোগোলের ওভারকোট থেকে যেমন আধুনিক রুশ বাস্তববাদী কথাসাহিত্যের জন্ম, তেমনি জীবনানন্দের 'লাশকাটা ঘর' থেকেই সম্প্রতি-কালের বাংলা কবিতা—'জীবনানন্দের স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন' এখনো তার শেষ হয় নি। চেতন ও অবচেতন জগতের সীমারেখা ঘুচিয়ে দিয়ে তিনি কবিতায় পরা-বাস্তবের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন শেষ পর্যায়ে—'দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মত' তিনি প্রবেশ করেছেন সেই অচেনা জগতে। তাঁর কবিতায় আপাত অসংলগ্ন প্রস্রুতি উঠে এসে মুগ্ধ করে দিয়েছে নবীনদের, যাঁরা উদ্ভ্রান্ত মোহে অবচেতনে নিরঙ্কুশ আস্থা রাখাই যথেষ্ট বলে মনে করছেন। অবচেতনে নির্ভরশীল পরাবাস্তবের সন্ধান আজ এতো সর্বব্যাপী বলেই যুক্তিকে চিন্তা ও তত্ত্বকে আজ এতোটা অবিশ্বাস এবং অবচেতনও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক বলে, সাম্প্রতিক কবিতার এমন ক্রমহ্রস্বমান আয়তন। অথচ 'আট বছর আগের একদিন'ও মোটামুটি একটি দীর্ঘ কবিতা এবং প্রস্রুতি থেকে উঠে আসা উট, গলিত স্থবির ব্যাং, দুরন্ত অন্ধ পেঁচা, বুড়ি চাঁদ, ধাড়ী ইঁদুর, এই সব কুশীলবের উপস্থিতি সত্ত্বেও এই কবিতা অবচেতনায় নির্ভরশীল কোনো উন্মার্গগামী উৎকেন্দ্রিকতা

নয়—তার মধ্যে ভাবকল্পনার ঐক্য, বক্তব্যের সুস্পষ্ট পরম্পরা বর্তমান। পেঁচা ব্যাং মশা মাছি ফড়িং যে প্রাণের উৎসাহে জীবিত, সেই সব জীবনধারণের জৈবিক উপকরণ থাকা সত্ত্বেও কবিতার নায়ক আত্মহত্যা করেছিল, কারণ 'নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি',

আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে...।

'রক্তের ভিতরে সেই বিপন্ন বিস্ময়ের' সঙ্গে কবিও পরিচিত, কিন্তু তিনি সেই আত্মঘাতী মানুষটির মত আত্মহনন করতে পারেন নি। থুরথুরে পেঁচার মত তিনিও বুড়ো হবেন এবং যথারীতি 'আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'—এর মধ্যে যেন কবির নিজের প্রতি বিদ্রূপ পাচ্ছি। যে লাশকাটা ঘরে ক্লান্তি নেই সেখানে টেবিলে চিৎ হয়ে শোয়া লোকটিকে কবি যেন ঈর্ষা করছেন।

জীবনানন্দ নিজে আরো বহু দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন—"ধূসর পাণ্ডুলিপি" এবং "বেলা অবেলা কালবেলা" গ্রন্থে সেগুলির বেশির ভাগ সংকলিত হয়েছে এবং দীর্ঘ কবিতা লিখতে গেলে যা হয়, আকাট গদ্যকেও তত্ত্বকথাকেও তিনি কবিতার সামগ্রিক উদ্দেশ্যে কবিতার অন্তর্গত করতে অপ্রস্তুত বোধ করেন নি। দু-একটি অস্ফুট ইশারা অগ্রাহ্য করলে 'বোধ' কবিতার প্রথম স্তবকে কোনো ইমেজ বা উপমা পাই না, পুরো স্তবকটিই স্টেটমেন্টে ভরা—

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়,—কোন্ এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়, পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়!

অর্থাৎ পরাবাস্তবের আলো-অন্ধকারে প্রবেশের সময়ও তিনি অনুকারী তরুণদের মতো যুক্তি ও বোধকে অনাবশ্যক বিবেচনায় বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

যে তরুণেরা বাধা এবং বোঝা বিবেচনায় সে বালাই বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের কাব্য-চেষ্টাকে জীবনানন্দ বড়ো জোর প্রথম স্তরের কবিতা বলতেন। সে কবিতাকে তিনি বেশি মূল্যবান মনে করতে পারেন নি—'যে কোনো সৎ কবিতাই স্বভাবকবিতা, কিন্তু যেখানে কবির অভিজ্ঞতা কম, দু-চারটের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতার ভার বহন করবার শক্তি নেই কিংবা দু-চারটে অভিজ্ঞতাকে দেশকালের ভিতর তলিয়ে অল্প-বেশি স্পষ্টতায় দেখবার ক্ষমতা নেই —সেখানে স্বভাবকবিতা তার প্রথম স্তরে...।' সমসাময়িককালের কবিদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও স্বকীয় কাল সম্বন্ধে জীবনানন্দের সংশয় ঘোচে নি। মৃত্যুর সামান্য কয়েক বছর আগে তিনি 'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ' নামে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'এ সময়টায় খুব দীর্ঘ কবিতা রচিত হয় নি, কাব্যনাট্যও না, কোনও মহান কবিতা হয়ে উঠতে পারে নি।... কেবলই খণ্ড কবিতায় সিদ্ধি নিয়ে দূরতর ভবিষ্যৎ তৃপ্ত হয়ে থাকবে বলে মনে হয় না।'

নিজের কাল সম্বন্ধে সংশয়াক্রান্ত হয়ে তিনি আশা করেছিলেন পরবর্তী দশ-পনেরো বছরে কবিরা সেই দিকে নজর দেবেন। তাঁর সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় নি; আর জীবনানন্দের কাল যদি তাঁদেরও অবস্থায় ভাবিত হয়, তাহলে সাম্প্রতিকের কী দশা হবে! অবশ্য দশক দিয়ে যে সময়ের কবিরা চিহ্নিত হন, এক দশকের বেশি আয়ুষ্কাল কামনাও করেন না, তাঁরা হয়তো মহাকালের কাছে দীর্ঘায়ুর দাবি উপস্থিত করতেও উৎসুক নন, আর তাই দাবি জোরালো করার জন্য নথিপত্র প্রস্তুতেও নারাজ। বলা হবে, বাতাসে যখন তেজস্ক্রিয় ভস্ম সামূহিক বিনাশের বার্তা নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে তখন দূরতর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কী হবে। তেজস্ক্রিয় ভস্ম চিরকাল ছিল না, মৃত্যু কিন্তু চিরকালই আছে—উপায়ের রূপান্তর হয়, পরিণাম একই থাকে। বীজাণু, গরল ক্ষুর, হাইড্রজন, এক ফোঁটা বিষ। এবং প্রভাবে তার নেই কোনো বিশ কি উনিশ...। সুতরাং ক্রান্তদর্শী কবি তাঁর দুরূহ দায়িত্ব এ অজুহাতে পালন করবেন না কেন?

প্রেম পত্র

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

জানি আমাকে তোমার মনে নেই। আমি তিনি। আমার একটা পোশাকী নামও আছে—অনিতা। তখন তোমার বয়স বোধহয় চোদ্দ, আমার আট কি নয়। সে সময়ে আমাদের ছোট্ট রেল কলোনীর শহর ছেড়ে তোমার বাবা বদলী হয়ে গেল। সেই আমাদের শেষ দেখা, তারপর আজ পনেরো বছর দেখা নেই আমাদের। ভেবে দেখলে তিনি নামে কাউকে তোমার মনে থাকার কথা নয়। এখন তুমি তিরিশের কাছাকাছি, গত জুন মাসে আমিও তেইশ পেরিয়ে এলুম। এতদিনে কতকিছু ঘটে যাওয়ার কথা, যা ছেলেবেলায় দেখা মুখগুলিকে ম্লান করে দেয়। তাই ভাবি হয়ত তুমি ভুলে গেছ। হয়ত যা ঘটবার তা সবই ঘটে গেছে তোমার জীবনে। কী জানি কেন আমি এখনো মনে মনে তোমাকে খুঁজে বেড়াই। কেমন হয়েছ তুমি তা খুব জানতে ইচ্ছে করে। শুনে তুমি কি ভাববে কে জানে! অত ছেলেবেলার কথা আজও কেউ বুকে পুষে রাখে? আমার লজ্জা সেইখানেই, আর সেটুকুই আমার আনন্দ। তুমি টুকুর বুকে গুলতি মেরেছিলে, তুমি তোমার মায়ের ওপর রাগ করে উপড়ে ফেলেছিলে তোমাদের বাগানের পপি ফুলের চাড়া, আর একবার তুমি তোমাদের বাসা থেকে খালাশীপাড়া পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ তৈরী করবে বলে বাবুর্চিখানার পিছনে একটা প্রকাণ্ড গর্ত খুঁড়তে শুরু করেছিলে—শেষ পর্যন্ত সেই গর্তে তোমাদের টমি কুকুরটা বাচ্চা দিয়েছিল। মনে পড়ে? আমার কিন্তু সব মনে আছে। এত মনে আছে যে এখনো ভাবতে বসলে আমি ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হয়ে যাই, মনে হয় আমি পিছুটানে আমার তেইশ বছর বয়স ফেলে রেখে কোথায় চলে গেছি—আমার চুল দুই বিনুনিতে বাঁধা, বুকে কুঁচি দেওয়া ফ্রক পরনে, হাতে হানিকম্ব্ করা, বারান্দায় খড়ির দাগ পেতে এক্কা দোক্কা খেলছি। যেন ছেলেবেলার পর আমার আর বয়স বাড়েনি, এতদিন পর্যন্ত আমি কেবলই আমার সেই ছেলেবেলাকে টেনে বড় করে চলেছি। যত বয়স বাড়ে তত আরো বেশী সেই ছেলেবেলার নানা তুচ্ছ ঘটনা, স্মৃতি, ভাঙা কথা, দৃশ্য, কিংবা পাখীর ডাক মনে পড়ে যায়। ঘুমের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে, কাজের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ চমকে উঠি। তোমার কি এমন হয়? জানি হয় না। সুমন, আমার মতো করে সেই ছেলেবেলাকে আর কে ভালবেসেছে? সেই ছোট্ট রেল কলোনীতে কয়েক বছর—তারপর আমার জীবনে আর কিছুই ঘটেনি। কতো জায়গা থেকে কতো জায়গায় গেলুম, বয়স বাড়ল, কত নতুনকে চিনলুম, কত পুরোনোকে ভুলে গেলুম, কিন্তু কেবলই মনে হয় সেই কবে এক ছোট্ট রেল কলোনীতে কয়েক বছর—ঐটুকুই আমার জন্ম, আমার কৈশোর যৌবন, আমার প্রেম। আজও আমি যে হাসি কাঁদি গান গাই, বর্ষায় ব্যাঙ ডাকলে গায়ে যে কাঁটা দেয়, কিংবা আমার যে বেঁচে থাকার জীবনীশক্তি তার সবটুকুই আমি পাই রেল কলোনীর ঐ ক' বছরের স্মৃতি থেকে। এসব কথা বিশ্বাস কোরো, সুমন। হয়ত তোমার মনে নেই, হয়ত তুমি আরো অনেক সুন্দর জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছো, হয়ত ভাল লাগার নানা মুহূর্ত তোমার জীবনে এসেছে, কিন্তু ঐটুকু ছাড়া আমি আর সুন্দর সময়ের দেখা পেলুম না। না পেলুম ওর চেয়ে সুন্দর একটা জায়গার সন্ধান।

তোমরা চলে যাওয়ার পর আমরা তোমাদের খালি বাড়িটায় মাঝে মাঝে যেতুম। যে সব

কৌটো, পিরিচ, পুতুলের খেলনা, ছেঁড়া বই, প্যাকিং বাক্স তোমরা ফেলে রেখে গিয়েছিলে তার সব জড়ো করে নিয়ে গেল তোমাদের পাচু খানসামার তিন ছেলে। শূন্য বাড়িটায় আমরা চোর চোর খেলতুম, 'কু' দিলে কতটা 'কু' ফিরে আসত, কী যে মন খারাপ হয়ে যেত আমার! খুব বেশীদিন বাড়িটা খালি থাকেনি, দিন দশেক পর এলো পেরেরা সাহেবরা। তোমাদের বাড়িটা অন্যরকম হয়ে গেল। আমি মাঝে মাঝে কাঁদতুম। স্কুলে যাওয়ার সময় বা ফিরবার সময় তোমাদের বাড়িটার দিকে চোখ পড়লে মনে হত তুমি কত ভাল ছিলে। ডানপিটে, ডাকাত ছিলে তুমি, তোমার পকেটে থাকত গুলতি আর বাছাই করা পাথর, কোমরে টিনের ছোরা, হাতে সব সময়ে হয় লাঠি নয়ত ক্রিকেটের ব্যাট বা হকি স্টিক। তোমার বয়সী এমন ছেলে ছিল না যে তোমার হাতে মার খায়নি। তুমি অসভ্য গালাগাল শিখেছিলে, তুমি কাক বক পায়রা মারতে। তবু তোমরা চলে গেলে আমি তোমার জন্য, তোমাদের জন্য কেঁদেছিলুম।

সুমন, মনে পড়ে না? মনে পড়ে না সেই লালচে আভার পপী ফুলের বাগান? ফাল্গুনে ফোটা শিমুল ফুল? শীতকালে শুকনো পাতা পোড়ানোর গন্ধ? তোমাদের প্রকাণ্ড একতলা বাড়িটাকে ঘিরে কী বিশাল কম্পাউন্ড ছিল! বাবুর্চিখানার পিছনে ছিল কয়েকটা আমগাছ, একবার ঝড়ে সে সব গাছের ডাল ভেঙে অনেক বক মারা পড়েছিল। বাসার পিছন দিকে ছিল ভাটফুলের জঙ্গল, সেই জঙ্গল কেটে তোমরা ভুট্টার ক্ষেত করেছিলে। সেই ক্ষেতে গাছগুলি বড় হলে আমরা তার ভিতরে রান্না-বান্না খেলতুম। পাতার আগুনে ভুট্টা পুড়িয়ে খেয়েছিলুম কতদিন! মনে পড়ে না? একদিন সত্যিকারের ভাত রেঁধেছিলুম, সেদিন তোমারও ছিল নিমন্ত্রণ। মনে পড়ে?

তোমরা চলে যাওয়ার এক বছর পর আমরাও ছাড়লুম সেই জায়গা। তখন আমার বয়স নয় কি দশ। শীতের এক অন্ধকার রাতে একটা কালো রেলগাড়ী হু-হু করে আমাদের অচেনা অজানার দিকে টেনে নিয়ে গেল। তোমাকে নিয়েছিল তার আগেই। তারপর বহুদিন ধরে আমার মনের ভিতরে রেল-লাইন পাতা হতে লাগল, তৈরী হতে লাগল রেল কলোনীর ঘরবাড়ি, ভাট ফুলের জঙ্গল, ভুট্টা ক্ষেত আর ভালবাসা। হায় মনের কলোনী থেকে আর দূরে বদলীতে যাওয়া গেল না, সুমন। আমি চিরকালের মতো বাঁধা পড়ে গেলুম। অথচ আর কোনোদিন সেখানে ফিরে যাওয়া হয়নি।

এতদিনে তুমি কেমন হয়েছ কে জানে! খুব জানতে ইচ্ছে করে। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে সেই আমার বালিকা বয়স থেকে কেউ আসুক। একদিন দেখা হয়ে যাক রাস্তার মোড়ে কি দোকানে কি ট্রেনের কামরায়। দেখা হয় না। কিংবা দেখা হয় হয়তো, চিনতে পারি না। কতদিন মনে হয়েছে আমাদের এখনকার বাসার কাছেই যে মনোহারী দোকান তার বেচাকেনা যে করে সে হয়ত টুকু, কিংবা যে লোকটা এইমাত্র রাস্তার আমার উল্টোদিকে হেঁটে গেল সে হয়ত সন্টু, সুন্দর চেহারার কোনো পুরুষকে দেখে ভেবেছি—এ যদি আমাদের সুমন হত! হ্যাঁ, তুমি সুন্দর ছিলে সুমন—রোগা, ফর্সা, একটু উঁচু নাক, চাপা গাল, অহংকারী নিষ্ঠুর চোখ। একটুও ভুলিনি তোমাকে। সে আমলের অ্যামেরিকা ফেরৎ এক সন্ন্যাসী তোমাকে দেখে বলেছিল—এ ছেলে হবে দার্শনিক, খুব ভাল ছবিও আঁকবে। তোমার মাকে বলেছিল—ছেলের বিয়ে যখন দেবেন তখন দেখবেন মেয়ে যেন সুন্দরী হয়। বৌ সুন্দরী না হলে এর জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আর একে খুব সবুজের মধ্যে রাখবেন—সবুজ খাবার খেতে দেবেন, সবুজ পোশাক পরাবেন, গাছপালা প্রকৃতির মধ্যে যেন ও থাকে দেখবেন। তারপর থেকে রাতারাতি রং সাবানে তোমার জামাপ্যান্ট হল সবুজ, তুমি ডাল ভাত ডিম

খেতে ভালবাসতে সে জায়গায় তোমার পাতে শাক চচ্চড়ি পরিমাণ রেখে দেখা, মায়ের দেখতে বলেছি—তোমার মা এসে বলল—সুমন, তুই সবুজ খা দে। তুমি হেসে ফেলতে। কিংবা সেই যে দাতাবাবা, কোথাকার এক রাজাকে ফাঁসির হাত থেকে কীভাবে যেন বাঁচিয়েছিল বলে যার খুব খ্যাতি ছিল, যাকে তোমার বাবা খুব মানতেন, সেই কাঁকড়া চুল আর ছুঁচিওলা লোকটার কথা মনে নেই? সে লোকটা তোমাদের বাসায় এলে দুপুরটো মুর্গী কাটা হত, বাজার থেকে আনা হত এক ঝুড়ি পান। লোকটা ছিল মুসলমান, তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েও তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে। তোমার বাবা তোমাকে প্রণাম করতে শিখিয়েছিলেন, কিন্তু তুমি প্রণাম করতে অনিচ্ছায়—আমি জানি। সেই দাতাবাবা তোমার হাত দেখে বলেছিল—এ ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে। একে বেঁধে রাখা দরকার। পৈতে দেওয়ার সময় নজর রাখবেন। বেশী ভাবনা চিন্তা করতে দেবেন না। তোমার জন্ম হয়েছিল শনিবারে, কী কী যেন গ্রহদোষ ছিল তোমার। সেসব কাটানোর জন্য দাতাবাবা তোমার জন্য যে ব্যবস্থা করে গিয়েছিল তার কথা ভেবে আজও আমি আপনমনে হাসি। তেলেভাজা একটা আটার লুচিতে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে শনিবার দুপুরবেলা একটা নিখুঁত কালো কুকুরকে খাওয়াতে সেই লুচি খাওয়াতে হবে আট কি দশ সপ্তাহ। প্রতি শনিবার দুপুরে তাই আমরা ঝাঁক বেঁধে তোমাদের বাড়ীতে যেতুম। তোমাদের চাকর টুনটুনিয়া কোথা থেকে খুঁজে পেতে একটা কালো কুকুরকে নারকোলের দড়িতে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসত, ডুমুরগাছের গোড়ায় বাঁধা হত সেটাকে। তুমি লজ্জায় রাগে রাঙা হয়ে বাঁ হাতের সেই রহস্যময় সিঁদুরের টিপ পরানো লুচিটা নিয়ে কুকুরের মুখের কাছে ফেলে দিতে। কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করে চেঁচাতো, আমরা হৈ হৈ করতুম। কুকুরটা খেতে চাইতো না বলে অনেক সাধ্যসাধনা করা হ'ত, শেষে দেওয়া হত মার। লজ্জায় তুমি যে কোথায় পালিয়ে যেতে!

শীতকালে বগরী পাখী খাঁচায় নিয়ে আসত পাখীওয়ালা। টাকায় কুড়িটা। কেটে পালক ছাড়িয়ে দিয়ে যেত, ছোট্টো পাখী—এক একটায় হত এক এক টুকরো মাংস। তুমি ঐ পাখী খেতে ভালবাসতে। আমরা খেতুম না। তোমার মা আচাড় রোদে দিলে তুমি চুরি করতে, তোমার প্রিয় খাবার ছিল পাঁপড় আর ডিম। তুমি বলতে—আমি এক ঘর ডিম খেতে পারি। তোমাদের জালের আলমারী ভর্তি কমলালেবু পচে যেত, তুমি খেতে চাইতে না। মনে পড়ে?

দেখ তোমাকে কত মনে রেখেছি আমি! আমাকে তোমার মনে আছে কি? অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে আমাকে তুমি দেখেছিলে, হয়ত তোমার সঙ্গে তিনচার দিন মাত্র কথা হয়েছিল, কোনোদিন হয়ত বিনুনি ধরে টেনেছিল, কিংবা এক-আধটা অঙ্ক কষে দিয়েছিলে। তার বেশী কিছুনা। কী বলে যে চেনাই তোমাকে! লজ্জায় মরে যাই, তবু বলি ওই রেল কলোনীতে সবচেয়ে ফর্সা ছিলুম আমি। কী বলব সুমন, আমিই ছিলুম সবচেয়ে সুন্দর। তাই বলি—ডলিকে তোমার মনে নেই? বড় ভয় হয়—যদি সত্যিই মনে না পড়ে তোমার! আমার ওপরের ঠোঁটে ডানধারে একটা আঁচিল ছিল। মনে পড়ে?

বড় ভিখিরির মতো মনে হচ্ছে আমাকে, না? তা নয় সুমন, আমি খুব অহংকারী। এই বয়সে এখন আমি নিস্তব্ধ এক যৌবনে পৌঁছেছি। যেন বাগান আলো করে ফুল ফুটেছে—কিন্তু জালে ঘেরা বাগান—একটিও পোকা ওড়ার শব্দ নেই। কিংবা পোকাদের ওড়াওড়ি আছে জালের বাইরে, আমার কানে তা আসছে না। থাকগে—তুমি হয়ত কী সব ভেবে বলবে!

মনে পড়ে তোমাদের পাশার আসত আই সি বি মোহন মজুমদারের তিন মেয়ে। উমা, ঝুমা আর সুষমা। সবচেয়ে বড় ছিল উমা, তোমার বয়সীই। সবসময়ে সাজগোজ করে থাকত বলে তাকে সুন্দর দেখাতো। আসলে তারা পাউডার না মেখে বাথরুম থেকে বেরোতো না। উমা শাড়ি পরতো, অনর্গল ইংরেজী বলতে পারতো। অতবড় মেয়ের ছিল বব-করা চুল আর মেম হাটের ফ্রক। তুমি তাদের দেখলে পালাতে। কেন? ওরকম ডানপিটে ছিলে তুমি—বল খেলতে, খুব জোরে ছুটতে পারতে, গুলতিতে অত টিপ ছিল হাতের, তবু অত ভয় কেন? তুমি সাঁতার জানতে না, তার কারণ আমাদের সেই রেল কলোনীতে নদী পুকুর ছিল না। তুমি সাইকেল চড়া জানতে না, তার কারণ তোমাদের সাইকেল ছিল না। কিন্তু যা ডানপিটে ছিলে তুমি! আমি ঠিক জানি তুমি কখনো না কখনো সাইকেল আর সাঁতার শিখে নিয়েছিলে। ঠিক না? তবু তুমি উমাকে দেখে পালাতে কেন? আমি মনে মনে ভগবানকে ডাকতুম—যেন এই রেল কলোনীর বাইরে অন্য কোথাও বড় হয়ে ওদের দেখা না হয়! দেখা কি হয়েছিল, সুমন? হয়নি—তাই না! আমরা একবার স্টেজ খাড়া করেছিলুম টুকুদের ড্রইংরুমে, তুমি 'পদ্মনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে......' আবৃত্তি করেছিলে, 'টুইংকল, টুইংকল, লিটল স্টার......' আমি গান গেয়েছিলুম 'দেবতার মন্দিরে অঙ্গনতলে' —মনে পড়ে? সে রাতে তোমাকে এত ক্যাবলার মতো দেখাচ্ছিল, উমার কাছাকাছি তোমাকে একেবারে মানায়নি। মনে মনে আমি খুশী হয়েছিলুম। তখন আমার বুকে কুঁচি দেওয়া সাদা ফ্রক—হাতে হানিকম্ব করা, ডবল টিকির মতো দুই বিনুনি, সস্তা পাউডারে খড়িওঠা মুখ, তোমাকে দূরে থেকে বড় ভয় পেতুম। বুঝতে এবং বিশ্বাস করতে অনেকদিন সময় লেগেছিল যে আমিই ছিলুম সবচেয়ে সুন্দর। ততদিনে তোমরা চলে গেছ।

মনে পড়ে না? আমাকে মনে পড়ে না?

বছর দুই আগে হঠাৎ তোমার ছবি দেখলুম কাগজে। বিলেত যাচ্ছো। খবরে কাগজে ছবি ভাল ছাপা হয় না। তবু বোঝা যাচ্ছিল তোমার চোখে মুখে লজ্জা আর সঙ্কোচ। চশমা নিয়েছো। গলায় টাই আর সুট। কত বদলে গেছে চেহারা! তবু মনে হল এ চেহারাও সুন্দর। ভয়ও হল সুমন সান্যাল আরো ত কত থাকতে পারে! ভাল করে দেখলুম ছোট্ট খবরে তোমার বাবার নাম, পরিচয়। তোমার দার্শনিক হওয়ার কথা ছিল, দেখলুম তুমি টেকনোলজি পড়তে যাচ্ছো। মন খারাপ হয়ে গেল। বিলেত ফেরত এক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে তখন আমার বিয়ের কথা চলছে। সেই বিয়ে ভেঙে দিলুম। কেন যে তা জানি না। শুধু এটুকু জানি যে তোমার ছবি দেখে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি কেঁদেছিলুম। এর চেয়ে সুমন সন্ন্যাসী হলে ভাল ছিল। আমি ইঞ্জিনীয়ারের ঘর করতে পারবো না। ছেলেবেলা থেকেই আমার বিশ্বাস আমি একজন উদাস দার্শনিকের ঘর করবো।

হায়, অথচ জানি আমাকে হয়ত তোমার মনে নেই। কিংবা কে জানে জীবনে যা যা ঘটবার তা সবই তোমার জীবনে ঘটে গেছে কিনা!

হতে পারে আমি ছেলেবেলা থেকেই তোমাকে ভালবেসে এসেছি। হতে পারে আমি বরাবর ছেলেবেলাকেই ভালবেসে এসেছি, আর সেই ভালবাসার মধ্যেই তুমি ছিলে! কোনটা ঠিক তা আমি জানি না। একবার যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়, যদি কথা বলতে পারি তবে আমি তা ঠিকঠিক বুঝতে পারবো। তার আগে হয়ত আমার মুক্তি নেই।

বিলেত থেকে ফিরেছো জানি। কত কষ্টে যে এ খবর আর তোমার ঠিকানা যোগাড় করেছি তা বলার নয়। যোগাড় করার পর একা একা সিঁড়িঘরে বসে কেঁদেছি। যার জন্য

এত কষ্ট করলুম সে কেমন কে জানে! এত অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা যায়? পারো না আমার শতপ্রশ্নের ক্লান্তিতে ম্লান হয়ে যায় কয়েকটা দিন! এমনিতেই ত আমি অলক্ষ্মী— যার ইহকাল বলতে সেই ছেলেবেলা, যার নেই ভবিষ্যতের চেষ্টা, বর্তমানের প্রতি আকর্ষণ তার তো এমনিতেই যৌবনের দিন ফুরিয়েছে। সে গেছে বুড়িয়ে। তোমাদের দাদাবাবা সেই ছেলেবেলায় বলেছিল—আমার জীবন হবে দুখে একরস। তাইতেই ভয় আতঙ্কে আছে। ভয় হয় যদি সত্যিই ফলে যায় সেই কথা! তাই হাত বাড়িয়ে কিছু ধরতে বড় ভয় করে। যদি ফসকে যায় তবে আর বাঁচবো না। দু'বছর আগে তুমি বিলেত গেলে আমি বিয়ে ভেঙে দিলুম, তারপর মনে মনে সঙ্গ ধরলুম তোমার। মনে মনে বলতুম—সুমন, আমার ছেলেবেলার সুমন, আমার গোপন কথা, তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো অচেনা লোকজনের মধ্যে, সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের ওপর, জাহাজে, উড়োজাহাজে কোথায় কোথায় চলে গেছ তুমি! মনে মনে আমি তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম লন্ডনের শীতে আর কুয়াশায়, কত কথা হত আমাদের।

হায়, তুমি সেসব টেরও পাওনি। হয়ত বিশ্বাসও হচ্ছে না তোমার, না? যদি বিশ্বাস না হয় তবে বুঝবো সত্যিই আমার দিন ফুরিয়েছে।

সুমন, বলতে ইচ্ছে করে যে আমি দেখতে বড় সুন্দর। কিন্তু দোহাই তুমি যেন সুন্দর বলে আমাকে ভালবেসো না। সে ভালবাসা আমি অনেক পাই। পেয়েছি। প্রেমপত্র আমি জমিয়ে রাখি না, রাগে বিরক্তিতে ছিঁড়ে ফেলে দিই। জমিয়ে রাখলে পাহাড় হয়ে যেত। আত্মরক্ষা করে থাকা যে কত শক্ত সুমন, তুমি পুরুষ—তুমি ঠিক বুঝবে না। মাঝে মাঝে ভেবে দেখি আত্মরক্ষার দরকারই বা কী ছিল—কার জন্য নিজেকে এই অহরহ পবিত্র রাখা? যার জন্য সে যদি আমার পবিত্রতার দাম না নেয় তবে আমার কী হবে? তাই বলি সুন্দর শরীর, সুন্দর মুখ যদি তোমার লোভ জাগিয়ে দেয় তুমি তখন অনায়াসে সব বাধা ভেঙে পাগল হয়ে ছুটে আসবে। আমি তা চাই না। আমি চাই আমার ছেলেবেলার সেই স্বপ্নের মতো স্মৃতি থেকে কেউ উঠে আসুক, আমার স্মৃতির জীবনে একজন সঙ্গী হোক, তাহলেই সুখে কাটিয়ে দেওয়া যাবে এ জীবনে। তুমি কি বুঝবে এসব কথা, সুমন?

জানি না তুমি কি, তুমি কে, তুমি কেমন, তবু তোমার দিকে আত্মসমর্পণের দুটি হাত তুলে রাখলুম.....

কাল তোমার চিঠি পেলুম। অচেনা হাতের লেখায় খামের ওপর আমার নাম ঠিকানা। বুক কেঁপে উঠল। সকালে হাতে এল চিঠি, খুলতে খুলতে দুপুর হয়ে গেল। বন্ধ চিঠিটা বুকে রেখে সারাদিন অন্যমনে হাতের কাজ সারলুম। তারপর......

মনে মনে কিন্তু জানতুম যে তুমিও একা। আসলে এতদিন তোমাকে একা রেখেছিলুম আমিই। আমার প্রার্থনা আর চোখের জল তোমাকে ঘিরে রেখেছিল। লিখেছো আসবে। জানতুম তুমি আসবে।

একটি ভাষায় জন্মানো আর সচেতন প্রচেষ্টায় একটি ভাষা শেখার মধ্যে আকাশজমিন ফারাক যে ভাষায় জন্মাই নি তার বিবর্তন সম্বন্ধে অনুধাবন করা যায়, সেই ভাষা আজ এই মুহূর্তে কোথায় পৌঁছেছে তার খবর সাধনা থাকলে নখদর্পণে রাখা যায়, সেই ভাষায় সাংবাদিকতা সহজেই হতে পারে, প্রবন্ধরচনাও সম্ভব, মনপ্রাণ ঢেলে সেই ভাষাকে ভালবাসাও যায়। কিন্তু সযত্ন প্রচেষ্টায় আয়ত্ত ভাষায় গল্পউপন্যাস কবিতা রচনা বিষয়ে আমার চিরকাল কেমন সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত দ্বিধা ছিল। 'জীবন প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়'—এর জায়গায় 'জীবনতরঙ্গ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়' বললে আমরা যে খুন করতে উদ্যত হই সে শুধু এতদিন ধরে 'প্রবাহ' কথাটি ওই পঙক্তিতে সংযুক্ত রয়েছে বলেই নয়, অনুষঙ্গ ছাড়াও গভীর কিছু অবশ্যই রয়েছে। অথচ বাঙলা ভাষায় জন্মান নি কিন্তু সযত্ন প্রচেষ্টায় বাঙলা চমৎকার শিখেছেন এমন ব্যক্তির কাছে প্রবাহের জায়গায় তরঙ্গ এলে মোটেই দই কেটে যায় না। এই সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে বলা যায়, মৌল মানবিক অনুভব, ভাবনা, বাসনা পৃথিবীর সব দেশে একই এবং এইগুলিই সাহিত্যের উপকরণ। তাহলে সেই উপকরণ উপস্থাপনার অস্ত্রটি ধারাল হলে লক্ষ্যভেদ অনিবার্য। কিন্তু অস্ত্রটি কোথায় আঘাত করছে, লক্ষ্যটি আসলে কী, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। তাছাড়া, বলা বাহুল্য, উপকরণ ও উপস্থাপনার অভিন্নহৃদয়তা থেকে সুন্দরের শরীর জন্ম নেয় এবং তা না হলে নিশ্চয়ই শিল্প হল না। কোনো ভারতীয় ঔপন্যাসিক যখন লেখেন, 'She was staring daggers at me', আমার মর্মের মূলে আঘাত লাগে না। লাগে না যে সে শুধু আমেরিকার চালু পত্রিকা থেকে তুলে নেওয়া ওই অভিব্যক্তিটি কিশোরোচিত বলেই নয়, অবশ্যই অন্য গভীরতর কারণ আছে। অথচ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লেখেন, 'মেয়েটার দৃষ্টি সারাদিন লঙ্কাবাটার মতো গায়ে লেগে আছে', তখন আমরা তীরবিদ্ধ। ওই ইংরেজি অভিব্যক্তিটি সেটুকু আঘাতই করে যেটুকু আঘাত করবার যোগ্যতা অনুবাদের আছে। গল্পউপন্যাসকে কবিতার মতো শিল্পের মর্যাদা না দিলে অবশ্য এসব কথা আসে না। এবং গল্পউপন্যাসকে শিল্পের মর্যাদা বিন্দুমাত্র না দিয়ে, গরম ডালবড়া বানিয়ে, আসর জমিয়ে বসেছেন এমন লেখকের সংখ্যা আমাদের ও অন্য দেশে প্রচুর। এছাড়া বাঙলা গল্পউপন্যাসের কিছু খ্যাতিমান লেখকও সম্ভবত নিজেদের বিবেককে সর্বজনীন মৌল মানবিক অনুভব ভাবনা বাসনার দোহাই দিয়ে একটি তাজ্জব কাজ করছেন। The High and the Mighty ছবিটি দেখে এসে আস্ত একখানি বাঙলা উপন্যাস লিখে দিয়েছেন, বিরাট প্রকাশভবন সুন্দর করে ছাপছেন, আমরা পড়ছি। সত্যিই শক্তিমান তরুণ লেখক Somebody Up There Loves Me ছবিটি দেখে মুষ্টিযোদ্ধার দুঃখ বিষয়ে বাঙলা গল্প লিখছেন, প্রচুর প্রচারিত পত্রিকার বিশেষসংখ্যায় ছাপা হচ্ছে, আমরা পড়ছি। আমরা মাত্র অনুবাদের স্বাদ পাচ্ছি, যদিও, আবারও বলছি বলা বাহুল্য, অনুবাদকের ঋণ-স্বীকারের বালাই নেই। এর প্রতিবাদে বলা হবে, তবে কি আত্তীকরণ বলে কিছু হতে পারে না? হতে পারে। তার জন্য অসাধারণ ক্ষমতা থাকা চাই। যেমন লেখকের সেই ক্ষমতা থাকায় সম্প্রতি আঁদ্রে জীদের একটি ছোট উপন্যাস বাঙলায় রূপান্তরিত হয়ে

সুন্দরের নতুন শরীর পেয়েছে। অবশ্য লেখক পটভূমি বাংলাদেশ থেকে দূরে সরিয়ে না নিলে কী হত বলা কঠিন। দূর বড় সুন্দর।

ভি. এস. ন্যেপলের সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস 'দি মিমিক মেন' প্রসঙ্গে এসব কথা আসছে, কারণ তিনি বৃটিশ শাসিত ত্রিনিদাদে এক অর্থে ইংরেজি ভাষাতে জন্মালেও তাঁর মনের পশ্চাদ্‌ভূমিতে রয়েছে আর্যাবর্ত, অশ্বমেধ, বীর রাজপুত, সন্ন্যাসীর শরীরের অতীন্দ্রিয় দ্যুতি। তাঁর উপন্যাসের নায়ক রণজিৎ কৃপাল সিং পৃথিবীর কোনো নিসর্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারছে না। তার পূর্বপুরুষেরা ভারত থেকে এসেছিলেন। অনেক-দিন হয়ে গেলেও নতুন জমিতে ভাল করে শিকড় প্রবেশ করে নি। তাই রণজিতের বাবা একবার ক্রিশ্চিয়ান মিশনারির অনুবর্তী, একবার নগ্ন নারীদেহের ছবি লুকিয়ে দেখেন, এবং একবার সব ছেড়ে হিন্দু সন্ন্যাসী, আর রণজিৎ নিজে ছিন্নমূল, শূন্যতায় ভাসছে। বৃটিশ শাসিত দ্বীপে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির এক শিশুসংস্করণের (শিশু বলেই উজ্জ্বল রঙের চিৎকার বেশি) আবহাওয়ায় রণজিৎ মানুষ। সে লন্ডন শহরের এবং তার উপকণ্ঠের গলির অন্ধকার বারবার শরীরমনে মেখেছে, ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করে দুচার দিনের বেশি ঘর করতে পারে নি, তার জীবন শুধুই ভান, অনুকৃতি, জীবন-জীবন খেলা। এমন একটি মানুষের একান্ত অনুভব আবার মারাত্মক তীক্ষ্ণ। ফলে অনিবার্যরূপে তার দৃষ্টিভঙ্গীতে করুণামিশ্রিত তীব্র ব্যঙ্গ এসেছে। লেখক এমন একটি মানুষের পরিপার্শ্ব, কাহিনী ও চরিত্র উপস্থাপনের অস্ত্রে প্রচুর ধার আনতে পেরেছেন সন্দেহ নেই, সন্দেহ নেই কারণ রণজিতের জীবনের ভানই প্রধানত উপস্থাপিত। তার গভীরে যে সত্যিকার জীবন সেখানে অন্তত এই উপন্যাসে বিশেষ আলোকপাতের দরকার হয় নি। কিন্তু লেখক যখনই পশ্চাদ্‌-ভূমি আলোকিত করতে চেয়েছেন, অথবা যখনই পশ্চাদ্‌ভূমি পুরোভূমিতে আসতে চেয়েছে, তা যতই তীব্র ব্যঙ্গের প্রয়োজনে হোক না কেন, তখনই মনে হয়েছে অস্ত্র আর মর্মে আঘাত করছে না, লক্ষ্য ছুঁতে পারছে না। একটি দৃষ্টান্ত : The man took my overcoat, folded it and put it on a chair, below a Kalighat painting, momentarily disturbing because so unexpected : Krishna, the blue god, upright, left leg crossed in front of right, flute at his lips, wooing a white milkmaid. নীল দেবতাটি যে কৃষ্ণ তা তো লেখাই রয়েছে এবং লেখা না থাকলেও white milkmaidটি যে রাধা তা-ও বুঝতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু শিল্প শুধু বোঝায় না।

Anthropological psychology, archetypal imagery যখন শিল্পের বাগানে এত ডানা ঝাপটাচ্ছে ('সমগ্র ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মতন'), তখন মাত্র কয়েক পুরুষ আগে দেশ ছেড়ে এসে ইংরেজি ভাষাতে জন্মেও সেই অস্ত্র নিয়ে শিল্পকর্মে হাত দিলে বারভেজাল আসবে, এমন সন্দেহ আমার ছিল। *The Mimic Men* পড়ে সেই সন্দেহ গেল না। তথাপি লেখকের সুদূর প্রসারিত দৃষ্টি, অনুভবের তীক্ষ্ণতা, এবং অন্তত ইঙ্গিতে অতীতরোমন্থন পাঠককে তৃপ্তি দেবে। অজস্র বিপরীতমুখী মনোভাবের মিশেল লেখক একটি চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর উপন্যাসে এনেছেন। যেমন তীব্র ব্যঙ্গ ও সিনিসিজমের সঙ্গে মেলোড্রামা ও সেন্টিমেন্টালিটি। তারপর নিজেই বুঝতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরে খুব দার্শনিকের মতো বলেছেন, এসবের দরকার আছে, মানুষের জীবনের জন্যই এসবের দরকার। অথচ তাঁর নায়কের কাছে জীবন তো খেলা, শুধুই ভান, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়োয় উঠেও সে খেলছে এবং মনে হয়, তার চোখে সব রাজনীতিকই খেলোয়াড়,

কোনো রাজনীতিকই তার পেশাকে গুরুত্বের কিছু মনে করে না। মুখরোচক উপন্যাসের লেখকেরা এই সব কৌশল, যাকে device বলে, ভি এস নোপলের সম্পূর্ণ আয়ত্ত। আবার তাঁর উপন্যাসটিকে শুধু মুখরোচক বলা খুব অন্যায়। এক-একটি অনুচ্ছেদ প্রচুর ভাবনার। বইটি স্বীকারোক্তির রীতিতে লেখা বলেই হয়ত এমন হয়।

উপন্যাসটিতে লেখকের যে মেজাজের আঁচ পাওয়া যায় তা কিছু নতুন নয়। লরেন্স, কনরাড, ক্যামু, কাফকা, এডউইন মিউর প্রায় সব দেশের লেখকদের ছুঁয়ে গেছেন। ফলে একালের পাঠকদের সেই মেজাজের আঁচ পেতেই হয়। জীবনে ঘুন ধরেছে, যাকে এলিয়ট বলেছেন, 'Life is a drifting boat with a slow leakage.' জীবনের এই অসুখ সারাবার দাওয়াই লরেন্স বা এডউইন মিউরের মতো সব লেখককে স্পষ্ট বাতলে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। উপন্যাস লেখকের কাছে তেমন দাবি করা বাতুলতা। এই উপন্যাসের লেখক তেমন কোনো দাবির অস্তিত্ব গ্রহণযোগ্য যুক্তিতেই অস্বীকার করেন। তিনি শুধু দেখিয়েছেন, ফুটো নৌকোটা ঢেউয়ের ওপর নাচছে। ডুবতে দেরি নেই। ডুবে যাবার আগে সেই নাচ ছাড়া অস্তিত্বের আর কোন মানে নেই। তাহলে তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয়াঘাত ছাড়া আর কিছু চাই না। এবং দেহসম্ভোগ হাতের কাছের তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয়াঘাতের একমাত্র উপকরণ। হয়ত পাঠকরাও মজেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, বুঝেছি, এ তো the absurd human condition. ঔপন্যাসিকের কাছে দাওয়াই চাওয়া বাতুলতা সন্দেহ নেই, তবু সব বাষ্প, সব সিনিসিজমের পরেও তিনি কোন্ মাটিতে পা রাখছেন তার সামান্যতম ইঙ্গিতও থাকা দরকার। এই উপন্যাসটিতে তেমন কিছু নেই।

ফুটো নৌকোর নাচ উপস্থাপনে লেখকের অস্ত্রে দারুণ তীক্ষ্ণতা এসেছে, তাঁর শব্দ প্রয়োগের স্বাচ্ছন্দ্য স্মরণীয়। বিশেষ করে কয়েকটি জায়গায় তাঁর নির্মম মিতভাষিতা বিস্ময়কর। যেমন, বইটির শুরুতেই লন্ডন শহরের উপকণ্ঠের হোটেলের মালিক মিঃ শাইলকের মৃত্যুর খবর। এমন নিষ্ঠুর মিতভাষিতার তুলনা আমাদের দেশের একালের লেখকদের মধ্যে একমাত্র মানিক বন্দোপাধ্যায়ের গল্পউপন্যাসে মাঝে মাঝে মেলে। শব্দ প্রয়োগে নোপলের মৌলিকতাও লক্ষণীয়। একটি শব্দ তিনি যেমন ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহার করেছেন, তেমন আমি অন্তত এর আগে কোথাও দেখি নি। শব্দটির বিশেষ্য ও বিশেষণ-রূপে প্রয়োগ দেখতেই সবাই অভ্যস্ত।

এই উপন্যাসে বারভেজালের কৈফিয়ত পাওয়া যায়। লেখকের নিকট পূর্বপুরুষদের ইতিহাস এবং তাঁর নিজের পরিপার্শ্বের সঙ্গে প্রশ্নটি জড়িত। কিন্তু কিছু লেখকের বাঙলা গল্পউপন্যাসেও সেই বারভেজালের কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। তাঁদের লেখায় বিপরীতমুখী মনোভাবগুলির শিল্পসম্মত মিশেলে সুন্দরের শরীর তৈরি না হয়ে, গরম চর্বির বড়া তৈরি হলেও তাঁরা যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলবেন, চর্বির বড়া সুন্দর নয় কেন? তার তো কাটতি আছে! তা অবশ্য আছে। যেমন, হাজরা পার্কের রেলিংয়ে নরম সাদা কাপড়ের বালিশের ওয়াড় এবং লাল সবুজ সুতোর 'ভুলো না মোরে' লেখা বালিশের ওয়াড় ঝুলিয়ে রাখলে, এখনো প্রথমটা দিনে পাঁচটা কাটলে দ্বিতীয়টা কাটবে পঞ্চাশটা। তবে যে লোকটি ওগুলো বেচবে সে নিজেকে শিল্পী বলে না, সে জানে এবং বলে—সে ব্যবসায়ী।

The Mimic Men বইটিতে লেখকের যে মেজাজ তার আঁচ একালের কিছু বাঙলা উপন্যাসে পাওয়া যায়। তবে নোপলের দৃষ্টির প্রসার এবং বিশেষ করে তাঁর ইতিহাসচেতনা

সেই সব বাঙলা উপন্যাসে অনুপস্থিত। সেই সব বাঙলা উপন্যাসের পরিধি বড় সংকীর্ণ মহলে সীমিত। হয়ত একটি পুরো উপন্যাসে শুধু দেখানো হল, আমরা কয়েকজন বন্ধু যৌন ও অন্য কয়েকটি ছুৎমার্গে পদাঘাত করতে সর্বদা উদ্যত। প্রথম পাতায় লেখক বললেন, আমি জীবনে কোনো পাপ করি নি। দ্বিতীয় পাতায় লেখক সদ্যবিবাহিত বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর শরীর ব্যবহার করলেন। বাকের পাতাগুলোয় বলা হল, এই উৎকট মানসিক আন্তরে কিছুই কিছু নয়। সুতরাং তাৎকালিক ইন্দ্রিয়াঘাত চাই এবং কয়েকজন মিলে নানা প্রক্রিয়ায় সেই আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করলেন। আমাদের দেশে এখনো মূলত অর্থনৈতিক কারণে মদ্যপান বিষয়ে ছুৎমার্গ রয়ে গেছে। অতএব ছুৎমার্গে পদাঘাতের নামে সেই ছুৎমার্গকেই পায়ের কাঁড় করে উপন্যাসের শেষ পাতায় লেখক সদ্যবিবাহিত সেই বন্ধুর সঙ্গে মদ্যপান করে শ্মশানে গড়াগড়ি দিয়ে পাঠককে চমকে দিলেন। এই চমক দেবার লোভ থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রয়োজনীয় মনের বয়সে লেখক কোনদিন পৌঁছলেন না, কারণ তাহলে তো আর বালবড়া বানানো যায় না। অবশ্য এই প্যাটার্নের উপন্যাসে অব্যক্ত ইঙ্গিত রয়ে গেছে, পাত্রপাত্রীরা শুদ্ধ শুভ্র হতে চায়, সমাজ তাদের হতে দিচ্ছে না। এই বন্ধুমহলটির বাইরে সমাজটি কেমন তার কোন খবর কিন্তু কোথাও নেই।

এই জাতের সংকীর্ণ দৃষ্টির সমর্থনে extensive, intensive ইত্যাদি কথা টেনে আনা হবে। বলা হবে, ওই সংকীর্ণ বৃত্তেই চামচে সমুদ্র ধরে রাখার মতো একাল এবং চিরকাল বিধৃত। কথা অমন অনেক আসে, তবে শুধু কূটকৌশলী কথায় আরো কত দিন চিড়ে ভিজবে সেটাই প্রশ্ন।

সুধাংশু ঘোষ

The Mimic Men. *By* V. S. Naipaul. Andre Deutsch. London. 25*s*.

The New Writing in the U.S.A. Edited By Donald Allen and Robert Greeley. Penguin. London. 7*s.* 6*d.*

যে-সব মার্কিন লেখকদের রচনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের, এমনকি ১৯৫০ সালেরও পরে প্রথম পুস্তকাকারে বেরিয়েছে তাঁদেরই বিশেষ এক শ্রেণীর লেখা নিয়ে এই সংকলন। তিরিশ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে এইসব লেখকদের অনেকেই তাঁদের বাল্যকাল কাটিয়েছেন। জন এ্যাশবেরি, রবিন ব্লেজার, গ্রেগরি করসো, এডোয়ার্ড ডর্ন, রিচার্ড ডুরের্ডেন, এ্যালেন গিন্সবার্গ, ফ্রাঙ্ক ওহারা, মাইকেল রিউমেকার, হিউবর্ট সেল্বি, গ্যারি স্নাইডার, গিল্বর্ট সোরেন্টিনো, এবং জিউ ওয়েলচ্—এদের সবাই জন্মেছিলেন সেই বিখ্যাত বিভ্রাটের বিকেল-বেলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্ধকারে এঁদের কৈশোর কেটেছে এবং প্রথম যৌবন বিধ্বস্ত হয়েছে দারিদ্র্যে, নেশায়, কারো বা জেলখানায়। পঞ্চাশের আগেও এঁদের কারো কারো লেখা এখানে সেখানে ছাপা হয়ে থাকবে। কিন্তু এঁদের অস্তিত্বের বিষয়ে পাঠকসমাজ প্রথম সচেতন হলেন ১৯৫৬ সালেরও পরে, সানফ্রান্সিস্কোতে যখন গিন্সবার্গের প্রথম কবিতার বই "হাউল"-এর 'অশ্লীলতা' নিয়ে এক হাস্যকর বিচারের অনুষ্ঠান অভিনীত হোলো। লোকেরা জানলো বীট্ সম্প্রদায় নামে এক নবীন লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে যাদের সঙ্গে সামাজিক কিংবা সাহিত্যিক কোনো সংস্কারেরই তেমন যোগ নেই। অশ্লীলতার অভিযোগ এসেছিল মার্কিন কাস্টম্স্ বিভাগ থেকে, আর অভিযোগের হেতু ছিল এই যে গিন্সবার্গের উক্ত কাব্যখানি নাকি সরলমতি বালক-বালিকাদের নৈতিকস্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকর। বলা বাহুল্য, সে অভিযোগ টেঁকেনি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপকেরা পর্যন্ত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সে অভিযোগের অযৌক্তিকতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন। 'হাউল'-এর স্বপক্ষে বিচারকের রায় নিয়ে বীট্ সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বীট্-রা আজ এতোটাই প্রতিষ্ঠিত যে তাঁদের রচনার সটিক সংস্করণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ পাঠ্য। ক্যাম্পাসের যুবতীকুল হরেকৃষ্ণ গীতরত গিন্সবার্গকে একবারের তরে স্পর্শ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পেঙ্গুইন সংস্করণের এই প্রকাশ থেকে অনুমান হয় যে বৃহত্তর পাঠকসমাজেও এই লেখার সমাদর হবে বলেই প্রকাশকের বিশ্বাস।

বর্তমান সংকলনের প্রত্যেকটি লেখকই যে বীট্ সম্প্রদায়ভুক্ত তা নয়। কিন্তু এঁদেরই সমসাময়িক ব্লাই, রাইট বা স্নডগ্রাসের মতো অন্য অনেককে বর্জন করে বিশেষ করে এঁদেরই যে একত্রিত করা হয়েছে তার প্রধান যুক্তি বোধ করি এই যে, যাকে বলা হয় একাডেমিক অর্থাৎ 'পণ্ডিতী' কাব্যসাহিত্যের ঐতিহ্য, যার বিষয়ে প্রভূত পরিমাণ গবেষণা গ্রন্থের উৎপাদন শীল, এবং ইংরেজি ভাষায় যার আরম্ভ হয়েছিল টমাস স্টার্ন এলিয়ট থেকে, বর্তমান সংকলনের কবি এবং লেখকগণ সেই ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের অন্যতম লক্ষণ আয়াম্বিক পংক্তির উপর বীতরাগ, পীঠস্থানে হুইটম্যানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এবং মারিহুয়ানা কিংবা ঐরকম নানাবিধ মাদকদ্রব্যের আনুকূল্যে রূপান্তরিত চৈতন্যের দরজা দিয়ে

ছন্দকে আরো-সত্যের অনুশীলন। যুগান্তরিত চৈতন্যকে সম্বল করে যে-দিব্যদর্শন ঘটে, সাহিত্যে তার স্থায়ীমূল্য আছে কিনা তা আমি ঠিক জানি না, তবে এই অভিজ্ঞতার ফলে রচনাক্রিয়ার প্রতি শিল্পীর মনোভাবের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে তা সহজেই অনুমেয়। শুধু মেধা নয়, প্রতিভা নয়, শিল্পক্রিয়ার ধৈর্য এবং পরিশ্রমের মূল্যও অপরিমীম—এই রকম ধারণায় এই প্রায়-উত্তীর্ণ-যৌবন নবীন কবি সাহিত্যিকদের তিলমাত্র আস্থা নেই। এঁদের আস্থা রোমান্টিকরচিত প্রেরণায়। প্রেরণার মুহূর্তে গিন্সবার্গ তাই মিনিট কুড়ির মধ্যে টাইপরাইটার যন্ত্রে 'সানফ্লাওয়ার সূত্রে'র মতো মোটামুটি লম্বা কবিতা লিখে ফেলতে পারেন, এবং কেরুয়াক উপদেশ দেন যে গদ্য লেখার পূর্বে কিছুমাত্র ভাবনা-চিন্তা করাটাও উৎকর্ষ-মণ্ডিত রচনা সৃষ্টির ঘোরতর পরিপন্থী।

আমি সাহিত্যরচনায় শ্রমশীলতারই স্বপক্ষে, কাজেই আলোচ্য লেখকদের সাহিত্যিক মতামত বিষয়ে খুব বেশি উদ্দীপনা দেখানো আমার পক্ষে কঠিন। কিন্তু সাহিত্য জিনিসটা এমন যে তা সব সময় রচয়িতার বিজ্ঞাপিত মতামতের খুব একটা তোয়াক্কা করে না, কিম্বা করলেও কোনো এক গূঢ়তর নিয়মের বলে সুশ্রী এবং বলবান হয়ে ওঠে। তাই গিন্সবার্গের কবিতা আমার ভালো লাগে, এবং মোটামুটিভাবে কেরুয়াকের গদ্যও। কিন্তু তদতিরিক্ত অনেক গদ্য এবং পদ্যই এখন পর্যন্ত আমার কাছে বন্ধ দরজার প্রতীক। অথচ এরাই হচ্ছেন তরুণতর পাঠকদের প্রিয় লেখক।

ইংরেজকবি জন ওয়েইন তাঁর এক সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন ব্রিটিশ কবিদের কাছে বর্তমানে তাঁদের কিছুই নাকি শেখার নেই, যা আছে জন্ ক্রো র‍্যানসম্ প্রমুখ মার্কিন কবিদের কাছে। র‍্যানসম্-রা তো বিশ্ববিদ্যালয় ঘেঁসা পণ্ডিত কবি, কাজেই আলোচ্য লেখক-গোষ্ঠীর নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য। জন ওয়েইন-এর চাইতে তরুণতর যারা সেইসব ইংরেজ কবিও কি গিন্সবার্গদেরই গুরু বলে মানছেন আজকাল? তুলনামূলক সাহিত্যে যাঁদের উৎসাহ আছে তাঁরা হালের বাংলা সাহিত্যেও বীট্ কবি লেখকদের ইতস্তত পদক্ষেপ বিষয়ে বোধ করি অবহিত হতে পারেন।

নরেশ গুহ

The Autography of Alice B. Toklas. *By* Gertrude Stein. Penguin Books. London. 6*s*.

গার্ট্রুড্ স্টাইন বিংশ শতকীয় উপন্যাসের নব-রূপায়নের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁকে বলা চলে লেখকদের লেখিকা; কারণ এই শতকের লেখকদের তিন পুরুষের উপর তাঁর অসামান্য প্রভাব অনুভব করা যায়। কিন্তু তিনি খুব স্বল্প-পঠিত লেখিকা। কারণ তাঁর রচনা খুব সহজ-পাঠ্য নয়। এবং সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে তিনি জেমস্ জয়েসের সমগোত্রীয়া।

আলোচ্য বইখানি অবশ্য তাঁর উপন্যাসগুলির মত নয়। সাংবাদিকের কায়দায় সহজ ভাষায় তিনি নিজের জীবনের কয়েকটি অধ্যায় বর্ণনা করেছেন। বইখানি রচনায় তিনি একটু লুকোচুরির আশ্রয় নিয়েছেন, একেবারে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত না পড়লে সে লুকোচুরিটুকু ধরা পড়ে না। এলিস টক্লাস্ ছিলেন স্টাইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁর

লেখার নক্সা-নবীশ। শুরু থেকেই মনে হয় টকলাসই বুঝি স্টাইনের সঙ্গে তাঁর জীবনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের অধ্যায়টি বর্ণনা করছেন। অবশ্য যদিও মনে হয় টকলাস্ তাঁর আত্ম-জীবনী লিখতে বসেছেন; কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় টকলাস নিজের কথা খুব সামান্যই বলেছেন, শুধু স্টাইনের অভিজ্ঞতা, মতামত, উপন্যাস-প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি ও বিড়ম্বনার কাহিনী বর্ণনাতেই তিনি তৎপর। বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় এসে আমরা জানতে পারি, টকলাস আদৌ এ বইয়ের রচয়িত্রী নন, স্টাইন টকলাসের জবানীতে নিজের আত্ম-জীবনী রচনার এই পরোক্ষ ভঙ্গী আমার কাছে অভিনব বলে মনে হয়নি। অবশ্য এই কৌশল অবলম্বন করতে পারার ফলে লেখিকা নিজেকে নিজের বাইরে স্থাপন করতে পেরেছেন এবং বিষয়-নির্লিপ্তভাবে আবেগবর্জিত চোখে নিজেকে অপরপক্ষ হিসাবে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছেন।

স্টাইন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথম জীবন অতিবাহিত করেন অস্ট্রিয়াতে। ১৮৯৮-তে গ্রাজুয়েট হয়ে তিনি হপ্‌কিনস মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। চিকিৎসা-বিদ্যা তাঁর কাছে এতই নীরস বিষয়বস্তু বলে প্রতিভাত হয় যে পাঠ সমাপন না করেই তিনি পলায়ন করেন। ১৯০৩ সালে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি স্থায়ীভাবে প্যারিসে বসবাস শুরু করেন। তৎকালীন প্যারিসের তরুণ লেখক ও চিত্রকর-সমাজ তাঁর ঘরে এসে আড্ডা জমাতেন। টকলাস এই সময়ে এঁদের দলে যোগদান করেছিলেন এবং শীঘ্রই তিনি স্টাইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন এবং তাঁর রচনাসমূহ পুনর্লিখনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করে স্টাইন ১৯৪৬ সালে বাহাত্তর বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

স্টাইনের প্যারিসের জীবনের লিপিচিত্র বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাঁর জীবন খুব ঘটনাবহুল নয়; কিন্তু পিকাসো-মাতিসে-হোয়াইট্‌হেড্‌-হেমিংওয়ে প্রমুখ বিশ শতকের বিখ্যাত চিত্রকর লেখকদের সাহচর্য লাভ করেছিলেন বলে তাঁর জীবন-চিত্র ঐতিহাসিক গুরুত্ব-লাভ করেছে। বিশেষ করে চিত্রসংগ্রহ এবং চিত্র সমালোচনার দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল বলে সম-সাময়িক ফরাসী চিত্রকরদের সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য এবং মন্তব্য বইখানিকে চিত্তাকর্ষক করেছে। বহু চিত্রকর এবং লেখক সম্পর্কে প্রচুর তথ্য এবং আলোচনা স্টাইন এত সংক্ষিপ্ত যথাযথতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন যে তা বিস্ময় উদ্রেক করে। বোঝা যায় ফরাসী না হয়েও ফরাসীসুলভ সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনার গুণ তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। মনে হয় স্টাইন্ আর একটু ঢিলে-ঢালাভাবে লিখলে যেন ভাল হ'ত।

তিনটি কারণে বইখানি মূল্যবান। প্রথমতঃ বহু বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও লেখকের পরিচয়দান। দ্বিতীয়তঃ চিত্র ও সাধারণভাবে শিল্পকর্ম সম্পর্কে নানা মূল্যবান মন্তব্য। তৃতীয়তঃ, স্টাইনের মত লেখিকাকেও বই প্রকাশকের ব্যাপারে যে বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছিল তার বিবরণ। স্থানে স্থানে স্টাইন পরিহাস-প্রিয়তার পরিচয় দেখেছেন। ঘন-নিবদ্ধ তথ্যপুঞ্জের মধ্যে এই পরিহাস-প্রিয়তা পাঠকের আকর্ষণকে ধরে রাখে।

চিত্রব্যবসায়ী ভল্লার্ডের সঙ্গে স্টাইনের প্রথম সাক্ষাৎকার কৌতূহলোদ্দীপক। ভাই-বোন একসঙ্গে সেজানের একটি চিত্র ক্রয় করার জন্য তাঁরা ভল্লার্ডের কাছে যান। আধ ঘণ্টাখানেক পরে ভল্লার্ড একটি চিত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানা পছন্দ না হওয়ায় ভল্লার্ড আবার আর আধঘণ্টা পর আর একখানি চিত্র নিয়ে এলেন। এইভাবে তিন চারবার

যাওয়া আসার পর তাঁরা কয়েকজন বৃদ্ধা মহিলাকে দেখে বুঝতে পারলেন অ্যালার্ড এই শিল্পীদের দিয়ে তখন তখনই আঁকিয়ে নিজাদের চিত্র বলে চালাতে চেষ্টা করছেন।

ফরাসী শিল্পীদের জীবনের অনেক খুঁটিনাটি অথচ তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনী বইখানিকে সমৃদ্ধ করেছে। বস্তুতঃ স্টাইনের সঙ্গে লেখকদের অপেক্ষা শিল্পীদের ঘনিষ্ঠতাই ছিল বেশী। মনের মত কোন ছবি সামনে রেখে তিনি লিখতে ভালবাসতেন। এক চিত্র প্রদর্শনী থেকে মাতিসের একটি চিত্র কেনার কাহিনী চিত্তাকর্ষক। মাতিসে তখনও স্টাইনের নিকট অপরিজ্ঞাত। ছবিটি ছিল একটি মেয়ের; তার বিচিত্র আলখাল্লা দেখে দর্শকরা হেসে আকুল। অথচ স্টাইনের কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে বোধ হওয়ায় তিনি ছবিটি ক্রয় করেন। একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক চিত্র সেদিন কেন দর্শকদের কাছে হাস্যকর বলে বোধ হয়েছিল তা তিনি বুঝতে পারেন নি; যেমন পরবর্তীকালে তাঁর নিজের অত্যন্ত সহজ লেখা পাঠকদের কাছে কেন সহজ লাগেনি তা তিনি বুঝতে পারেননি।

পিকাশো গার্ট্রুড স্টাইনের একটি পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন। স্টাইনকে আশী-নব্বইটা সিটিং দিতে হয়েছিল। তখনকার চিত্রজগতে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এপলিনেয়ার। স্টাইনের সঙ্গে এপলিনেয়ারের যখন মমার্তে পরিচয় হয়, তখন তিনি এক প্রতিপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। দ্বন্দ্বযুদ্ধটি শেষ পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। যদিও তা তখন প্যারিসে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এইভাবে অনেক ফরাসী চিত্রকর ও কতিপয় লেখকের টুকরো টুকরো কাহিনীর ভিতর দিয়ে স্টাইন পৃথিবীর শিল্পজগতের রাজধানীর এক অন্তরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছেন যার মূল্য অসাধারণ।

এই সব বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে স্টাইনের শিল্প সম্পর্কে দু'একটি ছোট্ট মন্তব্য আমাদের চমকিত করে, 'Sentences not only words but sentences and always sentences have been Gertrude Stein's life-long passion.' (পৃঃ ৪৭) হেমিংওয়ের একটি মন্তব্যের জবাবে স্টাইন তাঁকে সংক্ষেপে বলেছিলেন : 'Hemingway, remarks are not literature'. (পৃঃ ৪৫) স্টাইনের একটি সিদ্ধান্ত এইরূপ : 'The Surrealists are the vulgarization of Picabia as Delaunay and his followers and the futwrists were the vulgarization of Picasso.' (পৃঃ ২২৭) সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর একটি মূল্যবান মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে : 'Gertrude Stein never corrects any detail of any body's writing, she sticks strictly to general principles, the way of seeing what the writer chooses to see, and the relation between the vision and the way it gets down. When the vision is not complete, the words are flat.' পৃঃ ২০২) এইসব উক্তি থেকে গার্ট্রুড স্টাইনের শিল্প সম্পর্কে সম্পূর্ণ মতবাদ উদ্ধার করা সম্ভব কিনা জানি না; কিন্তু এসব কথাগুলি যাঁর তিনি যে শিল্প সম্পর্কে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করতেন তা অনস্বীকার্য।

স্টাইন খুব স্বল্পবাক লেখিকা, বিশেষ করে নিজের রচনা সম্পর্কে। তিনি আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করেন, কিন্তু পুরোপুরি নিবৃত্ত করেন না। তবু তাঁর নিজের বই সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৌতূহলোদ্দীপকও বটে। তাঁর প্রথম উপন্যাস *The Three Lives*—প্রকাশের জন্য কোন প্রকাশক না পেয়ে তিনি আমেরিকার গ্রাফটন প্রেসকে নিজের খরচে ছেপে দেওয়ার ভার দেন। কিছুকাল পরে প্রেসের একজন প্রতিনিধি এসে তাঁকে জানান যে প্রেসের কর্তা তাঁর ইংরাজী জ্ঞান সম্পর্কে সন্দিহান।

রাখে দেন যে তারা যেমন আছে তেমনি অবিকৃতভাবে ছেপে দিতে হবে। ভদ্রলোক বইখানির সমাদর দেখে বইখানি মুদ্রণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে পরে আনন্দ প্রকাশ করেন। *The Making of Americans* সম্পর্কে স্টাইন জানিয়েছেন: 'It had changed from being a history of a family to being a history of everybody the family knew and then it became the history of every kind and of every individual human being. But inspite of all this there was a hero and he was to die.' (পৃঃ ১২৪) হাজার পৃষ্ঠা দীর্ঘ এই উপন্যাসখানির রচনার পশ্চাৎ ইতিহাসের আমরা এইটুকুই জানতে পারি। স্টাইন আমাদের এ-কথা জানিয়েছেন যে তিনি মানুষের অন্তর্লোক এবং বহির্লোকের সমস্যা নিয়ে চিরকাল বিব্রত বোধ করেছেন। তাঁর রচনায় যে বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়, তার প্রধান বিশেষত্ব হল, তাঁর প্রথম দিকের রচনায় মানুষের অন্তর্লোকই নিরঙ্কুশ গুরুত্ব লাভ করেছে, কিন্তু পরবর্তী কালের রচনায় বহির্বিশ্বের ছন্দের প্রতিও তিনি মনোযোগ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে আরও অনেক কথা আমাদের জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু স্টাইন একটি অনাবশ্যক কথাও বলতে অনিচ্ছুক।

অচ্যুত গোস্বামী

রাত ভ'রে বৃষ্টি—বুদ্ধদেব বসু। এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

"রাত ভ'রে বৃষ্টি"-র নায়ক তার স্ত্রীকে বলেছিল, 'ভালোবাসারও পরীক্ষা হওয়া দরকার, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না-থাকলে তা সম্ভব হয় না; যেহেতু অমুক মানুষটা কারো স্বামী অথবা স্ত্রী, শুধু সেইজন্যেই তাকে নিয়েই জীবন কাটাতে বাধ্য নয় কেউ; সম্পর্কটা যদি ব্যক্তিগত না হয়, যদি হয় মুখস্থ করা নামতার মতো, কিংবা যদি অন্য কোনো উপায়ের অভাবেই তা আঁকড়ে থাকে লোকেরা, তাহ'লে সেটাকে লোকেদের ওপর চাপানোর নাম জুলুম, আর তা মেনে নেওয়ার নাম ভণ্ডামি।' নয়নাংশুর এই কথাগুলি যেন শেখা-কথা। "ঘরে-বাইরে"র নায়ক নিখিলেশের কথাগুলি হয়তো নয়নাংশুর মনে ছিল। নিখিলেশ বলেছিলেন, 'আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেই জন্যেই আমি তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিস চাইনি, আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনোমতেই ধরা যায় না। স্মৃতিসংহিতার পুঁথির কাগজের কাটাফুলে আমি ঘর সাজাতে চাইনি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল।' অবশ্য দুই উপন্যাসের নায়কের উক্তি উদ্ধৃত করে উপন্যাস দুটির সাদৃশ্য কল্পনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। "ঘরে-বাইরে" সংক্রান্ত বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ যে কথাটি বলেছিলেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'একই ঘটনা দুই জায়গায় ঠিক একই রকমে ঘটে না'। কাজেই "ঘরে-বাইরে" এবং "রাত ভরে বৃষ্টি"তে স্বামী-স্ত্রী ও তৃতীয় ব্যক্তিস্থাপনের যে ছক ব্যবহার করা হয়েছে সেই ছকটির ব্যবহারিকতা ও কার্যকরতা কতখানি তা আলোচনা করলেই বইটি সম্বন্ধে সব কথা বলা শেষ হয় না। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা জানি, 'মানব

চরিত্রের প্রতিই লেখক দৃষ্টি রাখেন, কোনো ঘটনার নকল করার প্রতি নয়।'

"রাত ভ'রে বৃষ্টি"-র লেখক তাঁর উপন্যাসের চরিত্র-পরিকল্পনায় পুরুষার্থের কোন্ তাৎপর্যকে রূপান্বিত করেছেন? বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমস্যার পারস্পরিক টানাপোড়েন, বিশিষ্ট টেনশন, একটা অস্তীতি-সংক্রান্ত প্রশ্ন "নির্জন স্বাক্ষরে"র আগে বিশেষ অনুভূত হয়নি। প্রতি মুহূর্তের সৌন্দর্য-বেদনায় কবি বুদ্ধদেব রজনীর গন্ধে শীলিত কাহিনী লিখতেন একসময়—প্রত্যহের জলকাদাকে সন্তর্পণে এড়িয়ে। "রাত ভ'রে বৃষ্টি"তে যেন সেই নায়কদেরই কোনো একজনকে ভাঙনের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে—যে ভাঙন শুধু সময়ের হাতেই সম্ভব। এই গ্রন্থে নয়নাংশুর আত্মকথায় ধ্বনিত হয়েছে, 'আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগলো দু-জন রুশ লেখককে—টুর্গেনিভ আর চেখভ, এঁদের বই থেকে যেন উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়ালো আমার কৈশোরের স্বপ্ন—হাওয়ার মতো সুরের মতো সুগন্ধের মতো—মধুর, মধুর মেয়ে; পুরোনো বাড়ির বড়ো-বড়ো অন্ধকার ঘরে সে বসে থাকে শাদা পোশাক প'রে আমার জন্য;'—বস্তুত এইসব কথা শুধু নয়নাংশুর প্রথম যুবক হবার গল্প নয়—বুদ্ধদেব বসুর প্রথম নায়কদের মনের কথাই ছিল এগুলো। নাম-রূপটুকু বাদ দিলে এই তাদের সাধারণ অভিজ্ঞান।

কিন্তু আজ অনেকদিন বাদে যখন গত শতাব্দীর মৃত নায়কদের শবে পৃথিবীর সাহিত্য পরিকীর্ণ তখন নয়নাংশুর চোখে বুদ্ধদেব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁরই নায়কদের মৃত্যুর নিষ্প্রভতা। নয়নাংশুর কৈশোর-যৌবন কল্পনায় যে গঠন আমরা প্রত্যক্ষ করি তার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা আত্মনিমগ্নতা প্রধান হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্যজীবী সেই সব অচির-যুবকদের স্বার্থপর পরিণতি অনিবার্য। এই স্বার্থপরতাকে শিল্পীর স্বার্থপরতা বলে ব্যাখ্যা করার একটা প্রবণতা বুদ্ধদেবের পুরোনো নায়কদের প্রসঙ্গে লক্ষিত হয়. বর্তমান উপন্যাসে তাদের শৈল্পিকতার দিকটিকে গৌণ করে তাদের ব্যক্তিত্বের অপূর্ণতাকে লেখক তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। নয়নাংশুর আত্মকথনের মূল সুর সেই অপূর্ণতা-বোধের দান। নয়নাংশুর অহমিকা বা আত্মসর্বস্বতা তার স্ত্রী মালতীর কাছে প্রতিভাত। আর নয়নাংশুর কাছে ধরা পড়েছে মালতীর স্থূলতা। এরই ফলে একে অন্যের কাছে ক্লান্ত হতে শুরু করেছে—জ্বলন্ত সেই দুঃসময়ের দুর্গ্রহ। কিন্তু নয়নাংশুর অপূর্ণতা শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল নাবালকত্বের নামান্তর।

নয়নাংশু যা বলতে চায় তার মূলকথা হল এই যে মালতী অতি সাধারণ। সাধারণ তার চাওয়া, তার রক্তের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের তাগিদ। সে জায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে যেতে ভালো-বাসে, শাশুড়ীর কাছে রান্না শিখতে। অথচ নয়নাংশু শেখায়, 'যৌথ পরিবারের মতো কুৎসিত ব্যাপার আর নেই, ওতে মানুষগুলো পরস্পরের মধ্যে লেপটে পিণ্ড পাকিয়ে যায়।' নয়নাংশু মালতীকে বোঝাতে চায় 'প্রত্যেক সাবালক মানুষই আলাদা, আলাদা এক-একজন ব্যক্তি, তোমার ভিতরকার সেই ব্যক্তিত্বকে তুমি ফুটিয়ে তুলবে—অন্যদের ছাঁচে গড়া হবে না।' মালতী ঠিকই বোঝে যে অন্যদের ছাঁচে গড়া হবে না একথার অর্থ মালতী কেবল নয়নাংশুর ছাঁচে গড়া হোক। মালতী সম্বন্ধে নয়নাংশুর যে স্বার্থপর উদাসীনতা তারই অভিঘাতে মালতী জয়ন্তকে আত্মদান করেছে।

'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশের ছিল ভিক্টোরীয় নীতি শুদ্ধতা—নয়নাংশুর আছে বুটো-রাবীন্দ্রিক শীলবত্তা। তাই ঘুমন্ত মালতীর অনাবৃত স্তন দেখে সে লাজুক সুজনতায় তা ঢেকে দেয়—পাছে হঠাৎ জেগে উঠে মালতী লজ্জা পায়। অর্থাৎ নয়নাংশু যা ছিল প্রথমে,

তাই থেকে গেল শেষেও। সে কিশোর থেকে যুবক হলো না—যুবক থেকে প্রৌঢ় হবে না। টুর্গেনিভের কোমল গভীর মানবিক অনুভব নয়নাংশুর কল্পনায় হয়ে উঠল শুধুই পেলব শূন্য। তাই কুন্দুর সঙ্গে বালপ্রেম হঠাৎ চমকে ওঠে এই কথা ভেবে যে বাধ্য হয়ে কুন্দুকেও শারীরিক প্রয়োজন মেটাতে হয়। লেখক নয়নাংশুর বিষয়ে যদি আরো মনোযোগী হতেন তা হলে দেখাতে পারতেন নয়নাংশুর আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা কেমন করে স্বার্থপর জীবনা-চরণের জন্ম দিল। কিন্তু তা হয়নি। লেখক নয়নাংশুকে কোনো নির্দিষ্ট জীবনবৃত্তের মধ্যে স্থাপন করেননি। তার বৌদ্ধিক জীবনের পরিচয় স্পষ্ট নয়—স্পষ্ট নয় তার জীবিকার কল্পনা। ফলে বস্তুময় সম্পর্কগুলির অভাবে নয়নাংশুর ব্যক্তিত্ব রূপ ধরেনি। অথচ লেখক যদি পরম প্রয়াসে নয়নাংশুকে নিয়ে যেতে পারতেন চরম সাধারণত্বে, যদি তার এ্যাভারেজ মনপ্রাণকেই ফুটিয়ে তুলতেন অকরুণ বিশ্বস্ততায় তাহলে একরকম হত। এ্যাভারেজ না-হবার জন্য নয়নাংশুর কোনো গরজ বস্তুতঃ নেই—তবু তাকে এ্যাভারেজ বললে সে ক্ষুব্ধ হয়। এও আর এক প্রমাণ যে সে পরম 'রামশ্যাম-যদু-মধু', কিন্তু লেখকের প্রয়াসের অন্ত নেই—ছোপ ধরে না এমন পটে রঙ লাগাতে হবেই। তাই বয়ঃসন্ধির যৌন অভিজ্ঞতার অতি-সাধারণ, বহুশ্রুত বিবরণের ডাক পড়ে। তাই স্বাদগন্ধহীন এই ব্যঞ্জনে উগ্রকারি পাউডার ছাড়া হল বাজার বুঝে—বেশ্যাবাড়ির ঐ অপ্রাসঙ্গিক অংশটিতে। বাজার গরম করার প্রবৃত্তি ছেলেপিলেদেরই মানায়। এবং এই সমস্ত উদ্দেশ্যহারা ইতস্ততঃ পরিক্রমণের ফলেই আমরা এ উপন্যাসের নায়ককে না-পেলাম অনির্দিষ্ট দুঃখের রোমান্টিক আর্তিতে, না-পেলাম অস্তিত্ব সংক্রান্ত নিগূঢ় যন্ত্রণায়, উদ্বেগে বা বিচ্ছিন্নের অনুভূতিতে।

এমনিভাবেই মালতীও শৈল্পিক উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হয়েছে। মালতী সাধারণ মেয়ে। সাধারণ মেয়ে হলেই তার বাসনা কামনা স্থূল হবে এমন ধারণা সঙ্গত কি অসঙ্গত সে বিতর্ক মুলতুবি রেখেও বলা চলে মালতী এবং জয়ন্তের সম্পর্ককে লেখক জীবন এবং শিল্পের ন্যায়ক্রমে ধারণ করেননি। 'হয়ে গেছে—ওটা হয়ে গেছে'—এই বলে মালতী এবং জয়ন্তের দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের যে ইঙ্গিত লেখক মালতীর জবানীতে দিয়েছেন তা আমাদের কাছে অনিবার্য বলে মনে হয়নি। মালতীর মতো মেয়ে যৌন ব্যভিচারের দিকে গেলে যে সমস্ত মানসিক ভাঙাগড়াগুলি পেরিয়ে যাবার কথা, সেগুলিকে আলগোছে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে মালতীর ব্যাপারটি আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে বড়ই ক্ষুদ্র। স্বামীর অবহেলায় দাম্পত্য আনুগত্যে ফাটল ধরল—এই যদি হয় এই গল্পের সব কথা তাহলে আর ঐসব দুঃসাহসিক বর্ণনার প্রয়োজন কী? 'জীবন অফুরন্ত সুখ অন্তহীন'—এই বক্তব্যের জন্য যে পট-প্রসঙ্গ-প্রকরণের দরকার তার একটিও ব্যবহৃত হয়নি। আর মৃত্যুই জীবনকে গ্রাস করছে একথা বলার মতো নায়ক নয়নাংশু নয়। কেননা নয়নাংশুর জীবনে যে ঝামেলা ('সমস্যা'-শব্দটি এ উপন্যাসে কোনো ক্ষেত্রেই ব্যবহার্য নয়) তা তো বৌদ্ধিক জীবন-সম্ভূত নয়। তাই উপন্যাসের সিদ্ধান্ত বাক্যগুলি চরিত্রের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে উঠতে পারেনি।

আর জয়ন্ত নয়নাংশুর কাছে যে 'স্থূল অশিক্ষিত বেপরোয়া,' মালতীর কাছে যে 'মিনিমুখো' নয় বলে আদৃত সে যে প্রকৃতপক্ষে কী, প্রকৃতই কিছু কি না, তা বোঝার দরকারই হল না। কেননা সে তো শুধু একটা উপাদান বা উপায় মাত্র। সব মিলিয়ে এটি হয়েছে তাৎপর্যহীন দাম্পত্যঝঞ্ঝাটের অর্থহীন কাহিনী।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুষ্পিত ইমেজ—অমিয় চক্রবর্তী। কবি ও কবিতা। কলিকাতা ৬। মূল্য দুই টাকা।

চার্লস্ নদীর ধার, বে-স্টেট রোড, সান্টা-বার্বারা দ্বীপ, পর্তুগীজ আন্দোলা,—আদিঅন্তহীন প্যাসিফিক—বিশাল মানচিত্রে ছড়ানো এইরকম কতো যে নদী-নগর-সমুদ্র-পর্বতের হাওয়া বয়ে যায় অমিয় চক্রবর্তীর রচনায়, সে-কথা সকলেরই সুপরিচিত। তিনি ভ্রমণে অক্লান্ত এবং কবিতায় ইমেজ-সৃষ্টিতে বিশেষ আগ্রহী। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে সুদূর নিউমেক্সিকোতে তিনি একদিন অন্য এক যুগের এই কলকাতাবাসী শৌখীন মানুষের উটরাম-ঘাটে বৈকালিক হাওয়া খাওয়ার স্মৃতিগুঞ্জনের মধ্যেই জানিয়েছিলেন—

বসন্ত আজো সেই পুষ্পবেশের
বক-দোলানি আনে অন্যদেশের
ইদানীং মার্কিন;

সম্প্রতি সেই মার্কিন মুলুকেই তাঁর এই প্রেমানুভূতির ইমেজগুলি পুষ্পিত। গীত-বিতানের বিষয়-বিভাগ স্মরণ করে পাঠককে তিনি জানিয়েছেন—'এমন কি যাকে কায়িক দৈহিক আখ্যা দেওয়া হয়' সেরকম ক্ষেত্রেও প্রেম, পূজা, প্রকৃতি ইত্যাদি সংকেত তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। এই অবস্থায়—'লৌকিক পদাবলি, প্যান্টোরাল, পুরানো এলিজাবেথান লিরিক এবং আধুনিক প্রত্যক্ষ ও প্রতীকে মিশিয়ে কিছু সাময়িক প্রেমের কবিতা পরিবেশিত হয়েছে তাঁর এই "পুষ্পিত ইমেজ" নামে বারোটি রচনার গুচ্ছে। এই স্তবকে একটি রচনার নাম 'যুগের পথ'। তাতে তিনি লিখেছেন—

আমি যে প্রেমের যাত্রী, চলেছি কোথায়
ভুলে যাই আর সব, শুধু জানি বুকের পকেটে
তার শাদা কাগজের চিঠি আছে, এ জীবনে
পেয়েছি সে ডাক-চিঠি, যেতে হবে শুধু
অনির্দিষ্ট যুগ্ম পথে, হোক্ দুঃখে, হোক্ সুখে জাগা।

অর্থাৎ, এ-চেতনায় সমস্ত জীবনপরিক্রমাই প্রেমাগ্নিদীপন! 'উদ্দেশ' কবিতাটির শেষ দুই ছত্রে নিজেকে এবং নিজের বাঞ্ছিতা সেই 'উত্তমা'-কে একযোগে বলা হয়েছে—

সেই লগ্ন আছে জেগে, অচিন্ত্য মিলন
অন্তিমের পরিণয়ে ভরুক গগন।

'দ্বৈত'-তে রূপক হয়েছে পাথর আর জল। পাথর 'স্থিত' এবং 'অপেক্ষাকৃত অক্ষর'; তাঁর উক্তি—

প্রিয় জল,
শুকনো অবর্ণ আমি
সমস্ত ক্ষুধায় তোমার স্বামী
চাই তোমার রঙ, যৌবন, আসক্তি
সাধ্বী তুমি, মধুর নিরসৃত শক্তি
লহরী, স্নাত, পরিমল।

অচির মিলন আর কেবলি বিচ্ছেদ প্রেমানুভূতির এই দীর্ঘশ্বাসই এই রূপক-যোগে ধ্বনিত। এখানকার শেষ কথা হোলো—

কবে

রৌদ্র সমুদ্রে দুজনার সত্তা এক হবে?

বইয়ের নাম-কবিতা 'পুষ্পিত ইমেজ'ও ইমেজ-প্রধান রচনা। একই দীর্ঘশ্বাস অনুভব করা যায় এটিতেও—সেই গ্রীষ্মবেলা—সেই রঙে রঙে মেলা ফুল প্রদর্শনী ভিড়ে—চোখ বুক শরীরের শ্রম—একেবারে ঝাঁপ দেয়া প্রাণ চিরন্তন!

বইখানির প্রথম রচনাতেও দেখা গেছে গীতিরস-প্রয়াসী প্রেমের একই কুসুমকান্তি—'রোমান্টিকপুষ্প অবর্ত শালায়'। দ্বিতীয় রচনাটিতে এই গীতিরস কিঞ্চিৎ নাট্যমুখী, ঈষৎ কাহিনী-আশ্রয়ী। তিনটি সঙ্গী একসঙ্গে পিৎসা খেতে ঢুকেছিলেন এক হোটেলে। সেখানে

ভাবে জন্, আত্মসুখ সামান্য জিনিস
কয়ূণা-নিঃসৃত ধন্য সারা প্রাণ ছেয়ে
যে-আনন্দ পরমার, তারি স্পর্শ পেয়ে
স্নাত আমি

জন এই অবস্থায় ওয়েট্রেসকে ডেকে—'চার পিৎসা, 'আরো আছে? প্লেটে যাবে রেখে?'

১৯৬৭-র বাংলাদেশে যাঁরা বাস করছেন, তাঁদের কাছে এ দৃশ্য প্রবাসসুলভ মনে হলেও রবীন্দ্র-অনুভাবনার অধিকারী যাঁরা তাঁরা একে দুরাকাঙ্ক্ষা বলবেন কিনা জানি না, তবে এ যে বৃথা ভ্রমণ নয়, তাতে আশা করি কাব্যামোদীর দ্বিমত ঘটবে না। তথাপি দ্বিধা, সংশয়, অনতিমুখর প্রতিবাদও অনিবার্য। এসব রচনাতে পণ্ডিত, বহু ভ্রমণশীল শিল্প-সচেতন কবির প্রয়াস সন্দেহাতীত বটে, কিন্তু প্রেম বলতে আমরা যে বিস্ময়, যে উত্তাপ, যে নৈসর্গিক চিত্তব্যাকুলতা বুঝি, "পুষ্পিত ইমেজে" তা সত্যিই অনুপস্থিত। এই ফুল দেখে দর্শনের ফুল মনে পড়ে—স্বচ্ছ স্ফটিকের কাছে রক্তজবা ধরলে স্ফটিক রক্তবর্ণ হয়, কিন্তু সেই জবা সরিয়ে নিলে আবার সেই সনাতন স্বচ্ছতাই প্রকট হয়। পুষ্পিত ইমেজ দেখে কপিল ও শঙ্করাচার্যের কথা মনে এলো।

হরপ্রসাদ মিত্র

আমার প্রভুর জন্য - বিজয়া দাশগুপ্ত। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

প্রথম কবিতার বই, কিছু শ্রদ্ধা, কিছু মমতা মাখিয়ে গ্রহণ করা সমালোচকের কর্তব্য। অবশ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আপত্তি সত্ত্বেও তারিখের মাপে মেপে আমি যাদের বলবো ষাটের কবি, তাঁদের অনেকেরই প্রথম প্রকাশিত বই মমতা-ছোঁওয়া অভ্যর্থনা বাঞ্ছা করে না, সেরকম কোনো মাথাব্যথা কবিদের নেই। কিন্তু বিজয়া দাশগুপ্তের প্রারম্ভিক কাব্যে অন্য সুরের দোলা। সবচেয়ে আগে যা মনে হয়, বিজয়া দাশগুপ্ত অত্যন্ত পরিশ্রম করে কবিতা লেখেন। কবিতা এখনো পরিণত নয়, হরেকরকম ভঙ্গি নিয়ে এখনো তাঁর পরীক্ষা চলছে। এটা স্বাভাবিক, এ ধরনের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতেই হঠাৎ একদিন নিজের স্বভাবের সঙ্গে নিটোলভাবে মিশে-যাওয়া শৈলীর, তথা ভঙ্গির, দেখা পাবেন। তবে আমি আশা করবো পরীক্ষাগুলি মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে যাবে না. বিশেষ করে কাব্যছন্দে এবং কখনো-কখনো মিলন, যে-কটি কবিতা বইটিতে গ্রন্থিত, তারা এত বেশি অন্যদের রচনা স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিজয়া দাশগুপ্তের আলাদা চরিত্র ঢেকে-মুছে একাকার। ঈষৎ লোভ-

সংবরণ করতে পারলেই এই ঝোঁক তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

আমার এই আস্তিকতার কারণ দুটো। প্রথমত, বিজয়া দাশগুপ্তের কবিতার পরিচ্ছন্নবোধের প্রধান কারণ তাঁর অপ্রমত্ত ভক্তিরস, যা আজকের আবিলতার মধ্যে হঠাৎ চকিত করে তোলে। অন্যদের থেকে তাই তাঁকে সচেষ্ট প্রয়াসে আলাদা হতে হবে না, নিজের স্বভাবকে বিকশিত হতে দিলেই কাব্যে অচিরে সুঠাম গভীরতা আসবে। অনেকগুলি বিন্যাসে তাঁর ভক্তি আপাতত ভাগ হয়ে যাচ্ছে : প্রেমে, সমর্পণে, স্বপ্নশিহরণে, প্রতীক্ষার কোমলতায়, ব্যথাভরা স্মৃতি রোমন্থনে। কী অপাপবিদ্ধ সাহসের সঙ্গে এই ১৯৬৭ সালের উত্তরোল বাংলাদেশের সংস্থানে দাঁড়িয়েও তিনি উপবাচিকা হতে পারছেন :

আমি মৃত্যুতে আছি
আমাকে ডাকো
আকাশে
ঐশ্বর্যে
জীবনে।
আমি গুহাহিত
আমাকে নাও
প্রান্তরে
প্রসারে
মোচনে।
আমি অন্ধ,
আমাকে সূর্যসনাথ করো
আমি অচল
পবনপদবী দাও
অনন্বিত
আমাকে সমগ্রে রাখো।
প্রশ্ন ও পরিত্যাগ থেকে
আমাকে পরাবৃত্ত করো
উত্তরে অঙ্গীকারে
আমাকে আবৃত্ত করো
অঙ্গীকারে।
('আমাকে আবৃত্ত করো', পৃষ্ঠা ২০)

প্রেমের ব্যঞ্জনাতেও ভক্তির সমপ্রতিস্বর ·

আশ্চর্য তোমার প্রেম যদি তার এই নাম বলো
ছুঁয়ে গেলে চম্পক আঙুলে
শরীর কণ্টকে দোলে
যদি হাসে চোখে জ্বলে আলো।
চারুকণ্ঠে ভাসে যদি নাম
অঙ্গে অঙ্গে কলতান আনন্দ বীণায়।
('এই নাম যদি বলো তার', পৃষ্ঠা ২৪)

আমার আন্দাজ অন্য রকম, মনে হয় বিজয়া দাশগুপ্ত বাংলা ব্যাকরণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পেরেছেন। মিলের অভাব নয়, শব্দ পদাবলীকে অন্তর সঙ্গীতে সাজানো নয়, বাক্য এবং আঙ্গিকে বিন্যাস ঘটিয়ে তবে কাব্যে পদের মুক্তি। এই বইয়ের অনেক ক'টি কবিতাতেই ('আমার প্রচুর রক্ত', 'পালকে আমার', 'স্বপ্নে রাখো', প্রত্যয় ইত্যাদি) এই বিশেষ বিন্যাসের প্রতিশ্রুতি চোখে পড়লো। বিজয়া দাশগুপ্তকে শুধু অনুরোধ করবো: বিশেষণের আগে ক্রিয়াপদের ব্যবহারের চটুলতা তাঁকে সাজে না।

আমার আরো যা ভালো লাগলো তা তৎসম শব্দের অকুণ্ঠ, গভীর প্রত্যয়ের ব্যবহার: বাংলা কবিতায় এমন শুচিস্মিত রূপের সঙ্গে পরিচয়ে আমরা বহুদিন অনভ্যস্ত।

অশোক মিত্র

"Do you know about Oberoi Hotels' Instant Reservation Service?"

With the Compliments of

UNION CARBIDE INDIA LIMITED

জামশেদপুরে কাজের একটি দিক হল নিরাপত্তা

কলকারখানার শতকরা পঁচাত্তরটি দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা যায় কারণ, দেখা গেছে, কর্মীদের অসাবধানে ঝুঁকি নেওয়ার ফলেই বেশীর ভাগ দুর্ঘটনা ঘটে। তাই টাটা স্টীলে খুব কড়াকড়ি বন্দোবস্ত, প্রত্যেক কর্মীকে নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিয়মিত তালিম দিয়ে নেওয়া হয়।

ইস্পাত কারখানায় ঢোকার পর প্রথমে যা শিখতে হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে নিরাপত্তার খুঁটিনাটি শিক্ষা। শুরু থেকে একের পর এক কতকগুলো পর্যায়ে তালিম দিয়ে হাতে-কলমে যাচিয়ে নেওয়া হয়। নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তার যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো এবং সেই সঙ্গে সেফটি কমিটির বাছা লোকেদের হুঁশিয়ার দৃষ্টি এই সব মিলিয়ে দুর্ঘটনার মূলোচ্ছেদ সম্ভব হয়, কর্মীরা নিরাপদে কাজ করতে পারেন। এ ছাড়া যাঁরা রটিয়ে পড়ানো, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা এ সবেরও সব সময় বন্দোবস্ত করা হয় যাতে বিপদ এড়িয়ে কাজ করা কর্মীদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের হিসেব একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এ সব প্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে। টাটার কারখানায় দুর্ঘটনার হার গড়ে প্রতিমাসে ২৪১ থেকে ৬৪তে নেমে এসেছে। আর ১৯৬৬ সালের ১লা জুন থেকে ১৪ই জুনের হিসেব দেখলে তাজ্জব হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই —এই ক'দিনে চব্বিশ লক্ষ শ্রমঘণ্টা কাজ হয়েছে অথচ একটিও দুর্ঘটনা ঘটেনি। নিরাপত্তায় টাটা স্টীল ভারতের ভারী শিল্পে একটি সর্বকালের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

জামশেদপুরে কাজের একটা দিক হল নিরাপত্তা —এখানে শিল্প শুধু জীবিকা নয়, জীবনের অঙ্গ।

টাটা স্টীল

Sulekha drawing ink
AVAILABLE IN EIGHT DIFFERENT COLOURS.
SULEKHA WORKS LTD.
SULEKHA PARK.
CALCUTTA - 32

ওয়েস্ট বেঙ্গল
স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯১৮

ফোন : ২৩-৮৪১১/২ (সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক) গ্রাম : Provbank

রেজিস্টার্ড অফিস : ২৪/এ, ওয়াটার্লু স্ট্রীট, কলিকাতা-১

শাখা : ২৮/এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫

আদায়ীকৃত মূলধন	টাকা	১,১০·৩২	লক্ষের ঊর্ধ্বে
লগ্নীকৃত মূলধন	টাকা	১৫,৪০·৩৮	" "
সংরক্ষিত তহবিল এবং অন্যান্য মূলধন ...	টাকা	২,৯৮·০০	" "
সরকার এবং অন্যান্য ট্রাস্টীর আমানত ...	টাকা	২,২৬·০০	" "

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গৃহীত শেয়ার—টাকা ২১,০০,০০০·০০ লক্ষ

জনসাধারণের সুবিধার্থে সর্বপ্রকার লেনদেন করা হয়

জমার হার

সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট	৪%	বার্ষিক
স্থায়ী আমানত : ১৫ দিন হইতে ৪৫ দিন ..	২½%	"
" ৪৬ " " ৯০ " ..	৩%	"
" ৯১ দিন ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫%	"
" ৬ মাস " " " ১ বছরের কম	৫½%	"
" ১ বছর " " " ২ " "	৬%	"
" ২ " " " " ৩ " "	৬½%	"
" ৩ " " " " ৫ " "	৬½%	"
" ৫ " " " " ৭ " "	৭%	"
" ৭ " " " " ৯ " "	৭½%	"
" ৯ " " " ...	৭½%	"
বিভিন্ন সমবায় সমিতির সংরক্ষিত তহবিল ..	৬½%	"

এ. সি. চৌধুরী	বি. মজুমদার	এম্. সেনগুপ্ত
ম্যানেজার	চেয়ারম্যান	সেক্রেটারী

যত বেশি পরবেন
তত বেশি
আরাম পাবেন
Bata

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪

॥ সূচীপত্র ॥

মেরী ম্যাকার্থী ॥ ভিয়েতনাম ১০৫

যুবনাশ্ব ॥ বুদ্‌বুদ ১২৪

অরুণ মিত্র ॥ এবার দূরের জন্যে ১২৮

হরপ্রসাদ মিত্র ॥ বাইশে শ্রাবণ-নির্জনতার জন্য ১২৯

আবদুল কাদির ॥ উত্তর বসন্ত ১৩১

হুমায়ুন কবির ॥ ভারতীয় ঐতিহ্য ১৩৩

অসীম রায় ॥ শব্দের খাঁচায় ১৩৯

অশোক মিত্র ॥ একটি বাঙালি প্রবন্ধ ১৫৩

মিহির মুখোপাধ্যায় ॥ ফসলের জ্যোৎস্নার ভিতর ১৬৪

অমলেন্দু বসু ॥ আধুনিক সাহিত্য ১৭৬

সমালোচনা—নিত্যপ্রিয় ঘোষ, নৃপেন্দ্র সান্যাল, হরপ্রসাদ মিত্র ২০১

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥
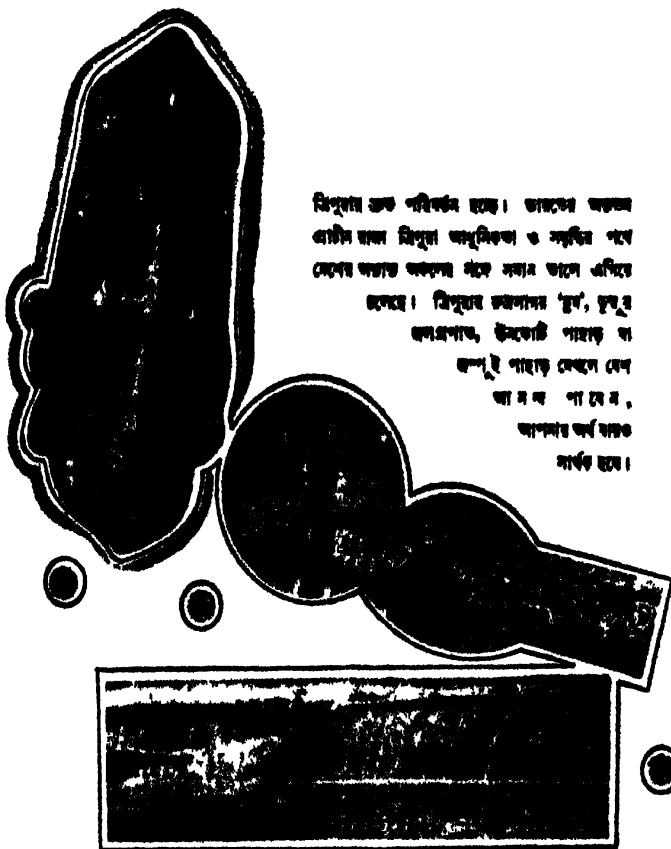
আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।
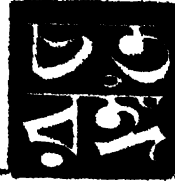
ভিয়েতনাম

মেরী ম্যাকার্থি

এই বছর ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে যখন ভিয়েতনামে যাই, তখন আমেরিকার স্বার্থবিরোধী বিষয়ের প্রতি আমার নজর ছিল। অবশ্য বিশেষভাবে নজর দেবার দরকার ছিল না, দৃষ্টান্ত ছড়ান রয়েছে। মার্কিনিরা ভিয়েতনামে কী করছে তারা তা লুকোতে চায় না। কথার কারসাজি ছাড়া আর কিছু দিয়ে আসল উদ্দেশ্য ঢাকবার প্রয়োজন তারা বোধ করে না। কথায় প্রচুর চালাকি। যেমন, এক-একটি পুরো অঞ্চলের গাছগাছালি নিশ্চিহ্ন করাকে বলবে 'আগাছা সাফ করা, যেন চলাচলের পথ সুগম করছে। এই কথার কারসাজির আড়াল খোঁজার পেছনে পাপবোধ রয়েছে। তথাপি তাদের কার্যকলাপ সাধারণের কাছে কেমন দেখাবে সে-বিষয়ে তাদের কোনো চেতনা নেই। সায়গনে নবাগতের কাছে এটাই সব থেকে আশ্চর্য লাগে।

ব্যাঙ্কক বিমানঘাঁটিতে পৌঁছেই আমরা- এয়ার ফ্রান্সের যাত্রীরা—পেট্রলের তীব্র গন্ধে যুদ্ধের আঁচ পেলাম। লম্বা টেবিলে প্রাতঃরাশ সাজিয়ে রেস্টরান্টের জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, সারি সারি ঝকঝকে নতুন মার্কিন বোমারু বিমানের কাছে বিরাট 'এসো' ট্যাঙ্কগুলো ওপর, ওপরে হেলিকপ্টার ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির মতো উড়ছে।

এমন খোলাখুলি ব্যাপার একটু হচকচিয়ে দিল। কারণ উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণের জন্য আমেরিকা যে থাইল্যান্ডকে ঘাঁটী হিসেবে ব্যবহার করছে সেকথা তখনো সরকারীভাবে স্বীকৃত হয় নি। সেই কারণেই মার্কিনিরাও ব্যাপারটা একটু ঢেকেঢুকে রাখবে ভেবেছিলাম। কথাটা আমি জনৈক জার্মান সাংবাদিককে মুখ ফুটে বলেই ফেললাম। আমাদের বিমান সায়গনের দিকে উড়লে এয়ার হোস্টেসের দেওয়া ঠান্ডা পানীয় চাখতে চাখতে সবাই দেখতে পেলাম, দক্ষিণ ভিয়েতনামের পাহাড়ঘেরা এক বনাঞ্চল পুড়ে ছাই হচ্ছে। ওপর থেকে সেই দাউ দাউ আগুন গ্রীষ্মের দাবানলের মতো দেখাচ্ছিল, ভাবাই যাচ্ছিল না যে একটু আগে বিমানগুলো কাজ সেরে ফিরে গেছে।

সায়গন বিমানঘাঁটিতে অজস্র সামরিক বিমান। যে কোনো দিকে তাকালেই চোখ পড়বে যুদ্ধে লিপ্ত মার্কিনিদের ওপর। একটা যুদ্ধ চলছে জানা থাকলেও বিদেশের মাটিতে আমেরিকার শক্তির এমন বেপরোয়া প্রকাশ দেখলে নবাগতের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। 'তারা

ব্যাপারটা লুকোতে চায় না!' আমি বারবার নিজেকে একথা বলছিলাম। শক্তির এমন নগ্ন প্রকাশের ওপর বিনয়ের একটা আবরণ কেন দরকার ছিল!

গাড়ির জঙ্গল ঠেলে সায়গন শহরের মধ্যে ঢুকে আমার এক নতুন চমক লাগল। মনে হয় সায়গন আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের এক চটকদার শহর। নানা নক্শার সামরিক যান ছাড়াও যে দিকে চোখ যায় শুধু শেভ্রলে, ক্রাইস্লার, মার্সিডিজ বেন্জ্, ফক্স্ওয়্যাগন, ট্রায়াম্ফ্ আর তার সঙ্গে স্পোর্টস শার্ট ও ডিপড্রাই প্যান্টপরা সাদা আদমি। যোদ্ধা মার্কিন থেকে অযোদ্ধা মার্কিনরা বেশি বিস্ময়কর।

সস্তা ছাদের নক্শার অফিসবাড়ির সার। তার মধ্যে লজ্জা পাবার মতো সেক্রেটারীরা ওয়াশিংটন থেকে আসা তাদের 'বস্'-দের ঘিরে গিজগিজ করছে, মস্করায় মজে আছে। অফিসবাড়িগুলোর বাইরে বালির বস্তার বেষ্টনি, মিলিটারী পুলিসের পাহারা। বালির বস্তা আর মেশিনগান সরিয়ে নিলেও, বিমানঘাঁটীতে যাওয়া আসার পথ প্রশস্ত করার জন্য কেটে ফেলা গাছগুলোকে ফিরিয়ে আনলেও, অতীতের সায়গনকে তার কবর থেকে আর তুলে আনা যাবে না। কাতারে কাতারে সাদা আদমির হাতে বাদামী কাগজের থলে, তার মধ্য থেকে নানা জিনিসের সঙ্গে হুইস্কির বোতল উঁকি দিচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের ডোরাকাটা শার্টের বুকপকেট থেকে এক সার করে বলপয়েন্টের ক্লিপ আলোয় ঝলসাচ্ছে।

দেশে ছুটির সময়--যেমন, সায়গনেও ঠিক তেমনি ইয়াঙ্কিদের গায়ে যেমন-খুশি পোশাক : এশিয়ার দুচার জন লোক ছাড়া আর কেউ টাই অথবা সাদা শার্ট পরে না। ভিয়েত নামী বৃদ্ধ ও বালকরা ছড়ানো চূড়োর মতো টুপি মাথায় সাইকেল রিকশ চালায়, মেয়েরা নানা রঙের ফিল্মি পোশাক পরে। এই সব স্থানীয় রঙের ছোঁয়া থাকলেও সায়গনকে মনে হয় সান ফ্রান্সিসকোর কোনো চীনা রেস্টরান্ট অথবা কাগজের লণ্ঠন ঝোলানো কোনো জাপানী সরাইখানা।

সায়গনের সব থেকে বেশী মিল বোধ হয় লস্ এঞ্জেলেসের সঙ্গে, তার ওপর হলিউডের কিছু রঙবাহার। ফুল, সাঁজ ও আতশবাজি ছাড়া কিনবার মতো দেশী জিনিস তেমন কিছু নেই। অবশ্য স্থানীয় পুতুল আছে। আমেরিকান সিগারেট, মদ, গাড়ি, ফোটো-ফিল্ম, রেডিও, টি-ভি মেরামতের দোকান, ফ্রিজ, টাইপরাইটার, খেলনা, ওষুধ, টুথপেস্ট এ সব সায়গনে অঢেল। রাত্রির সায়গন যে কোনো মার্কিন শহরে বিশ্বমেলার মতো। নাইট ক্লাবে ঢুকলে মনে হয়, সমুদ্রের ওপর কোনো জাহাজের প্রমোদকক্ষে এসেছি।

এক রবিবারে জন. এফ. কেনেডি স্কোয়ারে একটা ক্যাথিড্রালে গিয়েছিলাম, আশা করেছিলাম, ভিয়েতনামী ভাষা ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত হবে। তার বদলে এক আইরিশ-আমেরিকান যাজক মার্কিন ইংরেজিতে স্কার্ট জানুর ওপরে কতটা উঠবে অথবা কতটা নিচে নামবে সে-বিষয়ে ধর্মশিক্ষা দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, সান ফ্রান্সিস্কো ইত্যাদি আধুনিক ফ্যাশন কেন্দ্রের সঙ্গে প্রাচীন ফ্যাশন কেন্দ্র রোম, জেরুজালেম ইত্যাদির তুলনা করলেন।

সায়গনে ধোঁয়া-কুয়াশা, যানচলাচল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, মুদ্রাস্ফীতি, শিশু অপরাধী নানা সমস্যা রয়েছে। এক কথায় আধুনিক পশ্চিমী শহরের সব লক্ষণ এখানে প্রকট। নবাগত সাংবাদিক দেখলেই যোগাযোগরক্ষাকারী মার্কিন অফিসারের মুখ থেকে মুখস্থ বুলি বেরিয়ে আসে : 'সায়গনের বাইরে যান। চলে যান বাইরের খোলামেলায়।' যেন বাইরের যুদ্ধক্ষেত্রে বাতাসে বিষ কম!

এক দিক দিয়ে কথাটা ঠিক। সায়গনে বোমার গন্ধ থাকলেও বাইরের মার্কিনিকরণ পশ্চাত মার্কিনিদের কাছে অপেক্ষাকৃত ভাল লাগে। সেখানে অন্তত এমন এক শত্রু আছে যাকে মানুষ শ্রদ্ধা করতে পারে। বস্তুত অনেক মার্কিন সৈন্যের কাছে, বিশেষ করে তরুণ অফিসারদের চোখে ভিয়েতকংরাই একমাত্র ভিয়েতনামী যারা শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। 'ভিয়েতনামী রিপাবলিকের সেনাদলের বদলে ভিয়েতকংরা আমাদের পক্ষে থাকলে আমরা এই যুদ্ধ জিততাম।'—এই মনোভাব মার্কিন সৈন্য মহলে পরিব্যাপ্ত।

অধিকাংশ মার্কিন সৈন্য ভিয়েতকংদের সামরিক দক্ষতার প্রশংসা করে। মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে যারা বেশী চিন্তাশীল তারা ভিয়েতকংদের প্রশংসা করে তাদের উদ্দেশ্যের জন্য। আমেরিকানদের কৌতূহল নেই, কিন্তু তাদের শত্রু ভিয়েতকংরা তাদের কৌতূহল জাগিয়েছে। কাঁটা তার আর বালির বস্তার আড়ালে তাঁবুতে বসে মার্কিন সৈন্যরা কিছু মজা কিছু প্রশংসার মনোভাব নিয়ে ভিয়েতকংদের স্বভাব পর্যবেক্ষণ করতে উৎসুক। সতর্ক দূরত্বে থেকেও এইভাবে অদৃশ্য শত্রুদের সঙ্গে তাদের এক বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভিয়েতকংরা হয়ত তখন ধ্বংসাত্মক কিছু করার জন্য তাদের তাঁবুর মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে মারাত্মক জাল পাতছে কিন্তু ভিয়েতকংদের আঘাতে টহলদার সৈন্যরা আহত না হলে অথবা পাশের লোকটি নিহত না হলে মার্কিন সৈন্যরা কাল পাজামা পরা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ভিয়েতকংদের 'দানব' আখ্যা দেয় না। অথচ কথাটা সায়গনের অফিসগুলোর খুব চালু।

আসল যুদ্ধক্ষেত্রে এই যুদ্ধের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় না। যুদ্ধ সেখানে শুধু একটা বাস্তব অবস্থা। কাজটা শেষ করতে হবে এটাই সবাই ভাবছে। সায়গনে কিন্তু এই যুদ্ধ কখনো শেষ হতে পারে এমন চিন্তা করাই যায় না। মনে হয়, মার্কিনিরা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। নাহলে অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। মার্কিন কংগ্রেসে গৃহীত কোনো যুদ্ধোত্তর সাহায্য পরিকল্পনাই বেলুনে বাতাস ভরে রাখতে পারবে না। বেলুন ফুটো হয়ে চুপসে যাবেই। আর সায়গনের ভিয়েতনামী মধ্যবিত্তরা ভাবে, আমেরিকানরা চলে গেলে আজ হোক কাল হোক ভিয়েতকংরা ফিরে আসবেই। কিন্তু যুদ্ধ চলার ফলে অথবা মার্কিনিদের উপস্থিতির ফলে জীবন প্রতিদিন কেমন কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে তা সবাই দেখছে।

ক্যাডিলাকের স্টিয়ারিং ধরা এশিয়াবাসীকে দেখলে মার্কিন সৈন্যরা রেগে যায়। তারা জানে, মার্কিনিদেরই যোগসাজসে চোরাকারবার করে এশিয়ার ওই লোকগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে। তবু তাদের দ্রুত ধাবমান দামী গাড়িতে আরামে বসে থাকতে দেখলে, জীপ অথবা মিলিটারি ট্রাকে ঝাঁকুনি খেতে খেতে মার্কিন সৈন্যরা রেগে যায়। তাদের ক্রোধের আরও কারণ ওই চোরাকারবারিরা মুনাফা সুইৎসারল্যান্ড অথবা ফ্রান্সে সরিয়ে ফেলছে যেখানে দ্য গল ভিয়েতনামে মার্কিনিদের সুনজরে দেখেন না।

অবশ্য যুদ্ধ বাধলেই মুনাফাখোররা মওকা পেয়ে যায়। কিন্তু ভিয়েতনামে যেমন হয়েছে তেমন আর কোথাও দেখা যায় নি। যুদ্ধের সময় অসামরিক জনসাধারণ অনেক ত্যাগ স্বীকার করে। রেশনিং প্রথা প্রবর্তিত হয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়, শহরগুলো নিষ্প্রদীপ হয়। (পঁচিশ বছর আগের যুদ্ধের সময়ের লন্ডন অথবা এমনকি নিউ ইয়র্ক শহরের কথা মনে করা যেতে পারে)। ভিয়েতনামের যুদ্ধে অসামরিক নাগরিকদের তেমন কোনো ত্যাগ স্বীকারের বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। ফলে এই যুদ্ধে যাদের মরবার সম্ভাবনা তাদের কাছে এই যুদ্ধ বিশেষভাবে নীতিবিরুদ্ধ ও বীরত্ববর্জিত মনে হয়। তারা হয়ত মরবে, কিন্তু কিসের জন্য? সায়গন এবং অন্যান্য জায়গায় অসামরিক নাগরিকরা যাতে

বিলাসের স্রোতে ভাসতে পারে তার জন্য কি তারা লড়বে? সাধারণ সৈন্য এবং অফিসারেরাও স্বার্থান্বেষী ও লোভী নাগরিকদের সমান সুখ প্রাত্যহিক জীবনে খুঁজেছে। তথাপি তাদের পক্ষে সায়গনের প্রাচুর্য ও বিলাসের স্রোত মেনে নেওয়া কঠিন।

তা ছাড়া ত্যাগের পরিবেশ উত্তেজক নেশার মতো। ত্যাগের পরিবেশ এবং সত্যিকার বিপদ যুদ্ধকালীন রাজধানীগুলিতে উদ্দাস এনেছিল। সায়গনে উদ্দাস নেই। এত তরুণ সৈন্য, এত তরুণ সাংবাদিক ঘুরছে ফিরছে, তবু সায়গন যেন মধ্যবয়সী, ক্লান্ত, অলস, নিষ্প্রাণ। আমার মনে হয়, তার কারণ এখানে সবার মূল লক্ষ্য অর্থ। হোটেল ও অফিসগুলোর সিলিং ফ্যানের বাসি হাওয়ায় শুধু অর্থের গন্ধ।

ওরা বলে সায়গনে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ জয় করা যাবে না। এ যুদ্ধে ওরা জিতবে ছোটবড় গ্রামগুলোতে। এই ধারণা ভালভাবে দানা বেঁধেছে। এবং এই ধারণাই সামরিক ও অসামরিক মিশনারি দলগুলোর প্রেরণার প্রধান উৎস। ওই দলগুলো ভাবে ওরা এক ক্রুসেডে যোগ দিয়েছে। এ শুধু কমিউনিজম-বিরোধী অভিযান নয়, ওদের বিশ্বাস এর মধ্যে আরও প্রত্যক্ষ কিছু রয়েছে।

পঞ্চাশের দশকে এবং ষাটের দশকের শুরুতে যুদ্ধকে এক ধরনের অর্থনিয়োগ রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। করদাতাকে বোঝান হয়েছে যে, সে যদি এখনই ভিয়েতনামে কমিউনিজম রোধ করে তাহলে তাকে আর থাইল্যান্ড, ব্রহ্ম ইত্যাদি দেশে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অভিযান চালিয়ে যেতে হবে না। আমেরিকার নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকরা এই নীতি খণ্ডন করতে এখন এতই ব্যস্ত যে, হঠাৎ একদিন এই নীতি কখনো যে গ্রহণ করা হয়েছিল তা-ই অস্বীকার করা হবে। এখন প্রচুর অর্থব্যয় করলে এক সময় অর্থ বাঁচবে এই নীতি মার্কিনিদের মনে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ভিয়েতনামে খুব জোরের সঙ্গে উপস্থাপিত মার্কিন 'স্বার্থ' বড় বেশী কাটকাবাজি বলে মনে হচ্ছে। ঝুঁকি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রতিদিন এই যুদ্ধ আরও বর্বর ও ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠায় এই ব্যাপারে অর্থ-নিয়োগের ফল পেতে আরও কত দেরি হবে সে প্রশ্ন এসে যাচ্ছে।

এইসব কারণেই ছোটবড় গ্রামগুলোতে অন্য এক যুদ্ধ। নানা দেশের মিশনারি দলগুলো সেই যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। সেই যুদ্ধ বিষয়ে মার্কিনিরাও খুব উৎসাহী। আকাশ থেকে বোমা ফেলে যে যুদ্ধ তারা করছে তার থেকে সেই যুদ্ধ তাদের বেশী পছন্দ।

সেই যুদ্ধ দেখতে হলে সায়গনের বাইরে যেতে হবে এবং যাবার আগে কী দেখতে পাওয়া যাবে সে-বিষয়ে নতুন অফিসবাড়িগুলোর একটিতে অফিসারদের বাণী শুনতে হবে। বাইরে গিয়ে জেলা অথবা প্রাদেশিক প্রধান কার্যালয়ে আবার একজন সামরিক অফিসারের বাণী শুনতে হবে। এখানে নতুন গ্রামজীবনের, পুনর্গঠিত গ্রামজীবনের এবং সুসংহত গ্রাম-জীবনের যত কিছু দেখা যাবে তা হল প্রচুর নক্‌শা, মানচিত্র ও প্রতীক। কোনো উৎসাহী কর্ণেল অথবা তৎপর আমলা সরু ছড়ির মতো একটা কিছু দিয়ে দেয়ালে ঝোলানো কাগজে নক্‌শাগুলো দেখাবে। সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাতত্ত্ব ও ভিয়েতকংদের ধ্বংসাত্মক কাজের ভয়ঙ্কর বিবরণ হাতে আসবে। এসবই প্রশংসনীয় মনে হবে যদি বি-৫২ থেকে বোমাবর্ষণের ফলে জানলার প্রচণ্ড কম্পন এবং নকশা আঁকা মোটাকাগজের দাপাদাপি উপেক্ষা করা যায়। আসল কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে পুনর্গঠন-দলগুলির নাম বারবার বদলে যাচ্ছে, অথচ নাম বদলের সব খবর কর্মীরা নিজেরাই জানে না, অনেকে আবার ছমাসের মাইনে না পেয়ে ক্ষিপ্ত।

নতুন গ্রামজীবনে জনস্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে সায়গনে অনেক তথ্য মিলবে। হাসপাতাল

প্রতিষেধ, ওষুধ বিতরণ, ম্যালেরিয়া নিরোধ, স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি শিক্ষা দান ইত্যাদি অনেক খবর হতে আসবে। (অন্য সূত্রে জেনেছি স্থানীয় নার্সরা ওই ওষুধ রোগীদের কাছে বিক্রী করে।) মার্কিন এবং তাদের মিত্রপক্ষের মিশনারি দলগুলি সরকার পরিচালিত গ্রামে জল ফোটাতে এবং শিশুদের দাঁতের যত্ন নিতে শেখাচ্ছে। দাঁতের ব্রাশ বিতরণ করা হচ্ছে এবং সেগুলোর ব্যবহারবিধি শেখান হচ্ছে। পরে জেনেছি, ওগুলোকে বাচ্চারা খেলনা করেছে।

আসল কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসকদলের কাজ দেখলাম। নতুন গ্রামে গাছের ছায়ায় তাঁবু। সপ্তাহে একবার অথবা কোথাও দুবার যে রোগীরা এলো তাদের অধিকাংশ যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত বলে সন্দেহ করা হল। তে নিন প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি গ্রামে ফিলিপিনসের একটি চিকিৎসক দলের কাজ দেখলাম। আদুড়-গা এক বৃদ্ধকে জনৈক ডাক্তার পরীক্ষা করছিলেন। পরীক্ষার পর কার্ডে কিছু লিখে লোকটির হাতে দিয়ে ডাক্তার আমাকে বললেন, সম্ভবত যক্ষ্মা হয়েছে। 'এর পর কী হবে?' জানতে চাইলাম। শুনলাম, কোনো প্রাদেশিক হাসপাতালে গিয়ে বৃদ্ধটিকে এক্সরে করাতে হবে, রোগনির্ণয় ঠিক হয়ে থাকলে সেখানে তার চিকিৎসা হবে। শুনে ভালো লাগলো। কিন্তু পরে জেনেছি, দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক কোটি ষাট লক্ষ লোকের জন্য মাত্র ষাটটি অসামরিক হাসপাতাল। সুতরাং গাছের ছায়ায় তাঁবুতে এসে তার সম্ভবত যক্ষ্মা হয়েছে এই খবর বিনামূল্যে জেনে নেওয়া ছাড়া বৃদ্ধের হয়ত আর কোনোই লাভ হবে না।

রাস্তার ওপাশে খুব দক্ষতার সঙ্গে সব বয়েসের মেয়েদের এবং শিশুদের দাঁত তোলা হচ্ছিল। ফিলিপিনসের জেনারেলটিকে দেখলাম, সুদীর্ঘ, পৌরুষদীপ্ত, ন্যাড়ামাথা যুদ্ধ জিনারের মতো। অনাথ আশ্রমের শিশুদের মধ্যে মিষ্টির টুকরো বিলি করে একটি ছোট্ট অন্ধ মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ফোটো তোলালেন। কয়েক ঘণ্টা আগে একটি পুনর্গঠিত ক্যাথলিক গ্রামে খাদ্য ('স্বাধীন বিশ্বের বিচিত্র উচ্ছিষ্ট') বিতরণের সময়ও তিনি ফোটো তুলিয়েছিলেন। আলোকচিত্রগুলি আইনসভায় পেশ করা হবে। সেখানে আবার বামপন্থীরা মিশনারিদের এই ধরনের কাজ পছন্দ করছে না।

জেনারেলের সৈনারা একটি জঙ্গলের বিরাট এক অংশ গাছ কেটে পরিষ্কার করেছিল। শরণার্থীদের জন্য সেখানে গ্রাম গড়ে উঠবে আশা ছিল। সৈনারা একটি স্কুলবাড়িও তৈরি করেছিল। ভিয়েতকংদের ভয়ে বুলেট-প্রুফ জামা পরে লম্বা একসার জীপ ও মিলিটারি ট্রাকের সঙ্গে রাইফেল ও মেসিনগানের প্রহরায় আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। জেনারেল সবিস্ময়ে দেখলেন, জেলা অধিকর্তা স্কুলবাড়িটিকে তাঁর হেড অফিস করে নিয়েছেন।

নিজেদের শান্তিবাদী ভূমিকা নিয়ে জেনারেলের সৈনাদের বিশেষ আবেগ নেই। উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে তাদের কোনো সেনাদল যুদ্ধে লিপ্ত নেই বলেই হয়ত তারা এমন আবেগহীন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সেনাদল সক্রিয় থাকলে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে ভিয়েতনামের জনসাধারণের রক্ষাকর্তার ভূমিকা তাদের নিতে হত। এই কারণে নতুন গ্রামজীবন গঠনে মার্কিন কর্মীরা উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু তারা সত্যি কী কাজ করছে তা জানবার উপায় নেই। জনৈক আত্মতুষ্ট মার্কিন কর্ণেল ভিয়েতনামীদের বাসনাকামনার কথা বললেন, কিন্তু তাঁর এলাকায় কোনো ভূমি সংস্কার হয়েছে কিনা তা তিনি বলতে পারলেন না। বস্তুত তাঁর এলাকার জমির মালিকানা সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা নেই। আমেরিকায় টাকা সংগ্রহের জন্য কলেজ-প্রেসিডেন্টরা যে-মেজাজে কথা বলেন, এখানে মার্কিনদের সেই মেজাজ। তারা নিজেদের ভাবে শিক্ষাদাতা, মার্কিন জীবনযাত্রার আদর্শ তুলে ধরাই তাদের

প্রধান কাজ। একজন অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর কর্মীরা ভিয়েতনামী গ্রাম-বাসীদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করতে গিয়ে কী করেছে। জবাবে জানলাম, ভিয়েতনামীদের নাগরিকের কর্তব্য শেখানো হয়েছে।

যে মার্কিন করদাতা মনে করে সাহায্য মানে সাহায্য, সে আসল ব্যাপারটাই বুঝতে পারে নি। সাহায্য মানে বর্তমান কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করা, অর্থাৎ বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা। ভিয়েতনামীরা যাতে মার্কিন মূল্যবান যন্ত্রপাতি আমদানী করতে পারে তার জন্য ঋণ দেওয়া হয়। অর্থাৎ ভিয়েতনামকে সাহায্য দান মানে পরোক্ষে মার্কিন কলকারখানাকে সাহায্য দান। এর পর দ্বিতীয় সাহায্য দান শিক্ষা ক্ষেত্রে। তৃতীয়, কৌটোর খাদ্য বিতরণ (নতুন অভ্যেস তৈরি করা), বীজ, সার, চুইংগাম ও মিঠাই বিতরণ। ভিয়েতনামীদের অভিযোগ, ইয়াঙ্কি সৈনারা তাদের শিশুদের দেখলেই বুলেটের মতো মার্কিন মিঠাই দানা ছুঁড়ে মারে। এছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শুয়োর-পালন পদ্ধতি ইত্যাদি শেখানো হচ্ছে। জনৈক অফিসার উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আমরা ওদের পুরনো সংস্কারে নাড়া দিয়ে, বিনিময় প্রথার বদলে আর্থিক লেনদেন প্রথা শেখাচ্ছি।

ফু কুয়ং শহরে উত্তেজনায় রুদ্ধশ্বাস আর একজন অফিসার বললেন, আমরা ওদের অবাধ বাণিজ্য শেখাচ্ছি। তিনি এমন সব শরণার্থীদের সম্বন্ধে কথা বলছিলেন যাদের নিজেদের গ্রাম থেকে জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে এবং পরে তাদের গ্রামগুলো পুড়িয়ে, পিষে সমতলে পরিণত করা হয়েছে। তাড়াহুড়োয় তৈরি টিনের ছাতের এক ক্যাম্পে তাদের রাখা হয়েছে। ক্যাম্পে স্ত্রীলোকের সংখ্যা দু'হাজারের কাছাকাছি, শিশু প্রায় চার হাজার, কিন্তু পুরুষ পাঁচ শ'র সামান্য বেশী, তার অধিকাংশ বৃদ্ধ, অথর্ব। কিছু আসবাব, থালা-বাটি, শুয়োর-মুরগী, জমানো চাল দয়া করে তাদের সঙ্গে আনতে দেওয়া হয়েছে। তাদের বলদগুলো পরে আনা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো এখন বালির মাঠে শুকিয়ে মরছে। এই ক্যাম্পবাসীদের প্রসঙ্গে রুদ্ধশ্বাস অফিসারটি বললেন, আমরা বন্দী শ্রোতা পেয়েছি। এটা আমাদের এক বিরাট সুযোগ।

এদের অবাধ বাণিজ্য শেখানো হবে এবং ধরে নেওয়া যায় এরা তৈরি হলে নাগরিকের কর্তব্যও শেখানো হবে। এখন কিন্তু সরকার এদের শত্রুভাবাপন্ন নাগরিক বলে মনে করে। কারণ কয়েক সপ্তাহ আগেও এরা ভিয়েতকংদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের ঘরের বউ, ছেলে-মেয়ে ও বাপ ঠাকুরদা ছিল। ধান চাষী ছিল এরা, এখন এদের সবজির চাষ শিখতে হবে। কারণ পরে যেখানে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে সে-জায়গা ধানচাষের উপযুক্ত নয়।

একটি স্কুলঘর তোলা হয়েছে। বয়স্কদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, ওরা সব থেকে বেশী ভাবছে শিশুদের শিক্ষার বিষয়। পাঁচ বছর তারা কোনো স্কুলে যায় নি। আমার কাছে ব্যাপারটি একটু বিস্ময়কর বলে মনে হল, কারণ শিক্ষার দিকে কমিউনিস্টদের দৃষ্টি এতই কড়া যে পাঁচ বছর স্কুলের ব্যবস্থা না থাকা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু শিবিরে কর্মরত একটি তরুণ মার্কিণ কর্মচারী আমাকে বলেছিল, বাচ্চাগুলো নামতা জানে এবং প্রথম ভাগ তাদের মুখস্ত। তাছাড়া ভিয়েতকংদের তাড়িয়ে একটি গ্রামকে ধূলিসাৎ করার সময় মার্কিনরা ছোট ছেলেদের স্কুলের খাতা পায়, যা দেখে বোঝা যায় তাদের ইংরেজি ব্যাকরণের ক্রিয়াপদের ব্যবহার শেখানো হচ্ছিল। ভিয়েতকংদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এমন এক ভিয়েতনামী মার্কিনদের বলে যে, হানয় থেকে আসা একজন পি.এইচ.ডি ওই অঞ্চলে হাই স্কুলে পড়াচ্ছিলেন। পাঁচ বছর ভিয়েতকংদের এলাকায় স্কুলের ব্যবস্থা হয়নি—মার্কিনরা

একবারই শুধুকে ভয় ভেবে ।। লোকগুলো এই মিথ্যে কথাগুলো সাজিয়ে বলেছিল।

সারা ভিয়েতনামে যেখানেই সাময়িকভাবে যুদ্ধ থেমেছে—যেসব গ্রামে মার্কিন সেনারা রাইফেল কাঁধে টহল দিচ্ছে—সেখানেই নৌ ও স্থল বাহিনীর অফিসাররা তাদের সেনারা কেমন স্কুলবাড়ি বানিয়েছে তা সগর্বে দেখাতে ব্যস্ত। জানুয়ারি মাসে ঔপন্যাসিক স্টাইনবেক রাচকিনের যে ছোট স্কুলবাড়ির কথা লিখেছিলেন, সেই স্কুলের নীল ডেস্কগুলো দেখলাম ফেব্রুয়ারিতেও বাইরে পড়ে আছে। বাড়িটা তৈরি তখনো শেষ হয়নি, সেনারা বাড়ি তৈরির মালমশলার জন্য অপেক্ষা করছে। এই গ্রামে সব কাজ যেন হঠাৎ থেমে গেছে স্টাইনবেক চলে যাবার পর সব যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। স্টাইনবেক একটি মৃত নগরে প্রাণ সঞ্চারের কাহিনী লিখেছেন। যে-সব অফিসার তাঁকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন তাঁরা আমার প্রশ্নের জবাবে হাসি চেপে বললেন, স্টাইনবেক তাঁর কল্পনাশক্তি ব্যবহার করেছেন।

এক তরুণ ভিয়েতনামী সমাজসেবী বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, 'মার্কিনদের স্কুলবাড়ি বানানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত। স্কুলে পড়াবার মতো শিক্ষক আমাদের নেই এই সরল কথাটা এরা বোঝে না কেন?' কিন্তু ভিয়েতনামে আমরা কী করছি মার্কিনদের এই সুখ স্বপ্নের অবিচ্ছেদ্য অংশ ওই ছোটছোট বাদামী রঙের স্কুলবাড়িগুলো। ওগুলো সেনাদের চোখের সামনে থাকা খুব দরকার কারণ তারা ভাবতে চায় যে ভিয়েতকংদের গ্রামে স্কুলের ব্যবস্থা ছিল না।

কোনো আমেরিকান জুনিয়র অফিসারকে এই যুদ্ধের লক্ষ্য কী জিজ্ঞেস করলে সে নির্দ্বিধায় বলবে, আক্রমণকারীকে শাস্তি দান। কোনটা আক্রমণ আর কোনটা আত্মরক্ষা এ প্রশ্ন তাকে করলে নিষ্ঠুরতা হবে কারণ সত্যিই সে এবিষয়ে আর কিছু জানে না। তাকে ওই কথা বলতে শেখানো হয়েছে, যেমন উত্তর ভিয়েতনামের যুদ্ধবন্দীরাও শেখানো কথা বলে। জেরার জবাবে তারা বলে দেশকে মার্কিন আক্রমণ থেকে মুক্ত করার জন্য তারা লড়ছে। উত্তর ভিয়েতনামী যুদ্ধবন্দীরা হয়ত আরও কিছু কথা বলে। মার্কিন অফিসারটি কিন্তু মনে করে, সে নিজে ভেবে ওই কথা বলছে, শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে না। সে মনে করে, মার্কিন জীবনযাত্রার আদর্শ তুলে ধরা তার কর্তব্য। সে বিশ্বাস করে, মার্কিন জীবনের কাঠামো ভাল, যেমন তার দেশের শুয়োর ভাল।

ভিয়েতনামে যুদ্ধরত ছোটবড় মার্কিন অফিসারদের বিষয়ে এত লেখা হয়েছে, টেলিভিশনে তাদের এত দেখানো হয়েছে যে তারা নিজেদের অভিনেতা ভাবে, মনে করে বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় তারা অভিনয় করছে। ফলে তাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করতে হয়। মার্কিন অফিসার ও সেনারা ভাবে, ব্যক্তিগতভাবে তাদের কিছু কিছু দোষ থাকলেও, তাদের পারিবারিক পরিবেশ, তাদের টেলিভিশন সেট, তাদের রেফ্রিজারেটর, তাদের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এইসব মিলে তারা শ্রেষ্ঠতর। সুতরাং মার্কিন বোমা অসামরিক ভিয়েতনামীদের ওপর পড়ায় যে সাময়িক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় তা দূর করতে হবে, যেসব জায়গায় কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ থেমেছে, সেখানে অন্য এক যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের ভালত্বের প্রমাণ দিতে হবে।

মার্কিন সৈন্যদের দানে তৈরি একটি শিশু হাসপাতালে দেখলাম এক সুদর্শন তরুণ ডাক্তার ধবধবে বেড থেকে বেডে ঘুরছে। মার্কিন বাহিনীর আক্রমণে আহত মাত্র একটি মেয়ে সেখানে ছিল, আর প্রায় সব শিশুই পুষ্টির অভাবে নানা রোগে ভুগছে। যতদিন হাসপাতালে আছে ভাল আছে, কিন্তু এই শিশুরা বাড়ি ফিরে গেলে কে তাদের পুষ্টিকর খাদ্য জোগাবে

—আমি জানতে চাইলাম। সুদর্শন ডাক্তারটি ভুরু কুঁচকে বলল, যতদিন পারি আমরা ওদের এখানে রাখি।

জন ঘর্গান "সান্‌ডে টাইমসে" মার্কিন বুলেটে আহত আর একটি ছোট মেয়ের কথা লিখেছেন। জাহাজে অসুস্থ সৈনাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি ঘরে এক মন্যপানের আসরে আহত মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং সেখানে তার ব্যান্ডেজ করা শরীরের ওপর তীব্র আলো ফেলা হয়। সৈন্যরা তার হাতে চকোলেট, মিষ্টি এবং ডলার নোট গুঁজে দিয়ে তার সঙ্গে ফোটো তোলে। এছাড়া রকমারি পুতুল দিয়ে মেয়েটির মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এত আহ্লাদ দিয়ে মেয়েটাকে আবার তার বাড়ির জঘন্য পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়া, হাসপাতালে কিছুদিন রাখার পর অন্যান্য শিশুদের আবার তাদের নিজেদের বাড়ির অনাহারক্লিষ্ট জীবনে ফিরে যেতে বাধ্য করার মধ্যে একটা নির্মম ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। সুদর্শন ডাক্তারটি তা বুঝেছিল বলেই হয়ত তার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল।

সায়গন থেকে হেলিকপ্‌টারে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য আকাশবিহারে বেরোলেই চারদিকে মার্কিনদের বোমাবর্ষণের দৃশ্য চোখে পড়বে। শহরতলী ছাড়িয়ে গিয়ে নিচের দিকে তাকালে মনে হবে চারদিকে দাবানল। পশ্চিম দিকে বিস্তৃত কাল-পিঙ্গল অঞ্চলে বোমা ফেলে বনজঙ্গল পুড়িয়ে সাফ করা হয়েছে। গত বছর যে-অঞ্চলে আকাশ থেকে আগুন ঢালা হয়েছে তার এখন খয়েরী রঙ। হেলিকপ্‌টার প্রায় গাছের মাথায় নেমে এলে আরও কাছ থেকে দেখা যায়, আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। দেখা যায়, পোড়া ধানক্ষেত থেকে ধোঁয়া পাক দিয়ে উঠছে।

একদিন সকালে বদ্বীপের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় দেখলাম, নিচের বিস্তৃত অঞ্চল থেকে ধোঁয়ার অলস কুণ্ডলী উপড়ের দিকে উঠে আসছে। একটি ছোট বিমান ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ বিমানটি নিচে ছোঁ মেরে বোমার ভার নামিয়ে দিল, লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে সুন্দর ভঙ্গীতে ঘুরে এসে অদৃশ্য হয়ে গেল, নতুন ঘন কাল ধোঁয়ার ফণা মাথা তুলল। অনেকটা দূরে এক জোড়া বিমান ঘুরছিল, সিলিং ফ্যানের কাছে মশার মতো, এখনই নেমে এসে হুল ফোটাবে। বিমান দুটো এফ. বি. আই এজেন্টদের মনে করিয়ে দেয়, তাদের মতো জোড়ায় জোড়ায় চলে।

সায়গনে ফিরে এসে লক্ষ্য করলাম, এই বোমাবর্ষণের খবর সাংবাদিকদের কাছে গোপন করা হল। একজনকে প্রশ্ন করে জানলাম, অমন সামান্য ঘটনা অনুল্লেখ্য। উল্লেখযোগ্য বোমাবর্ষণের হিসেব নেবার জন্য যে-কোনো একটা দিন বেছে নিলাম। দেখলাম, ২২শে ফেব্রুয়ারী (ওয়াশিংটনের জন্মদিন) বিমানবহর চারশ' বাট দফায় আক্রমণ চালিয়েছে।

সায়গনবাসীরা নিজেরা জানে না, তাদের দেশের কী হচ্ছে। কারণ তারা সামরিক বিমানে উড়ে দেখবার সুযোগ পায় না। তারা দেখতে পায় শুধু রাস্তায় ঘুমন্ত শরণার্থীদের আর শুনতে পায় কয়েক মাইল দূরে বি-৫২ থেকে বর্ষিত বোমা বিস্ফোরণের শব্দ। আকাশ থেকে দেখলে, নানা নকশার, নানা নামের দ্রুত ধাবমান মার্কিন বিমান লক্ষ্য করলে, আরও কতকাল ভিয়েতকংরা প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাবে সে-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসবে। দেশটা এতই ছোট যে এই হারে ধ্বংসের কাজ চললে ভিয়েতকংরা আর লুকোবার জায়গা পাবে না, জলের তলায় লুকিয়ে পাটকাঠি দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়েও রক্ষা পাবে না। শস্যক্ষেত্রে, বনাঞ্চলে অথবা নদীর মোহানায় গতিবিধির বিন্দুমাত্র আঁচ পেলেই আমেরিকা আকাশ থেকে বোমার ভার নামিয়ে দিচ্ছে। বিমানবহরের চোখ ঈশ্বরের চোখের মতো। সেই দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার

সাধ্য কারও নেই। সেই ভয়ঙ্কর সন্ধানী দৃষ্টি সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে।

জনৈক সাংবাদিক একবার বোমারু বিমানের সম্মুখবর্তী একটি ছোট বিমানে বসে-ছিলেন। নিচে তাকিয়ে দেখলেন, একজন ভিয়েতনামী সাইকেল থেকে নামল, সাইকেল হাতে নিয়ে ওপর দিকে গুলী ছুঁড়ল। একটি মার্কিন বিমানে যত নাপাম বোমা ছিল সব সাইকেল আরোহীটির মাথায় ঢেলে দেওয়া হল। অত নাপাম একটা পুরো প্লেটুন ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট। স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন যে-কোনো ব্যক্তি এক্ষেত্রে সাইকেল আরোহীটির পক্ষ নিতে চাইবেন। এ্যাংলো-স্যাক্সনদের নাকি স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি ছিল, কিন্তু অভ্যেসের অভাবে মার্কিনদের সেই স্বাভাবিক প্রবণতার ওপর কিছু ভর করেছে। ভিয়েতকংদের ধ্বংসাত্মক কাজের ফিরিস্তি দেখে আমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়, কিন্তু আমরা কেউ মনে রাখি না যে ভিয়েতকংদের বিমানবহর নেই। অন্তত দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন বিমানবহরের ধ্বংসাত্মক কাজে সত্যিকার বাধা দেবার মত কেউ নেই। এই যুদ্ধ জয় করা আমেরিকার পক্ষে সব থেকে লজ্জার ব্যাপার হবে।

ফেব্রুয়ারীর শেষে প্রেসিডেন্ট জনসনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি সায়গনে সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করলেন, দশমাস আগে আমেরিকাকে ব্যর্থতার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এখন দশ মাস পরে ভিয়েতনামে আমেরিকার সামনে সাফল্যের সমস্যা। তিনি জানালেন, সাফল্যের অন্যতম সমস্যা সৃষ্টি করেছে শরণার্থীরা।

একথা সত্যি, হেরে যাওয়ার ফরাসীদের এই সমস্যা ছিল না। জনৈক মার্কিন কর্নেল কথাটা খুব সরল করে বলেছিলেন, 'আমরাই শরণার্থী সমস্যা তৈরি করেছি। ফরাসীদের যুদ্ধের সময় এই সমস্যা ছিল না। তখন যুদ্ধটুদ্ধ করে সবাই রাত্তিরে বাড়ি ফিরে যেত।'

কিন্তু ফু কুয়ং ও অন্যান্য ক্যাম্পে যাদের রাখা হয়েছে তারা কথাটির আভিধানিক অর্থে কখনোই শরণার্থী নয়। যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদির সময় যে-ব্যক্তি তার বাড়ি অথবা দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় খুঁজতে যায়, অভিধানে তাকে শরণার্থী বলে। খবরের কাগজ এবং টেলিভিশনই প্রমাণ করেছে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকান ক্যাম্পে যাদের রাখা হয়েছে তাদের কেউ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে 'স্বাধীন বিশ্বে' চলে আসবার পক্ষে ভোট দেয়নি। বস্তুত তারা কেউ নিজের পায়ের ওপর নির্ভর করার সুযোগ পায়নি, মিলিটারি ট্রাক অথবা নৌকোয় ঠেলেগুঁতিয়ে ঢুকিয়ে তাদের গ্রাম থেকে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়েছে। এটাই অন্য এক যুদ্ধের কাহিনীর প্রথম দৃশ্য। এই দৃশ্য টেলিভিশনে বারবার দেখানো হয়েছে। এবং দৃশ্যটিতে যথারীতি কিছু মজাদার রঙ ছড়ানো হয়েছে। যেমন, ট্রাকে-নৌকোয় শরণার্থীদের তোলার সময় তাদের শুয়োর-মুরগীর চিৎকার, হয়ত তখনই একটি ভিয়েতনামী স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করল এবং যুদ্ধক্লান্ত এক মার্কিন সার্জেন্ট ধাইমার কাজ করছে।

"নিউ ইয়র্ক টাইমসে"র এক প্রতিনিধির কাছে ফু কুয়ং ক্যাম্পের জনৈকা স্ত্রীলোক বলেছিল, মরতে পারলে সে বেঁচে যেত। খুবই স্বাভাবিক। তার স্বামীকে মার্কিনরা মেরেছে, তার ঘরবাড়ি সব কিছু নষ্ট হয়েছে, সে তো এমন কথা বলবেই। প্রতি পাঁচজন স্ত্রীলোকের মধ্যে মাত্র একজন ওই কথা বললে মার্কিনরা ভাগ্যবান ধরে নিতে হবে। মার্কিনরা অবশ্য ভাবতে চায়, ক্যাম্পের বাসিন্দারা সুখে আছে।

এই উন্মাদ বাসনা খুবই ব্যাপক, যদিও এ বাসনা সব সময় প্রকাশ করা হয় না। মার্কিনরা চায় স্থানীয় লোকরা তাদের পছন্দ করুক এবং তারা দেখায় যে তারাও স্থানীয়

লোকদের পছন্দ করে। আসলে কিন্তু ভিয়েতকং ছাড়া আর কোনো ভিয়েতনামীদের প্রতি মার্কিনদের শ্রদ্ধা নেই। অবশ্য নিজেদের বন্ধু হিসেবে জাহির করার এবং স্থানীয় লোকদের মধ্যে বন্ধু খোঁজার পিছনে মার্কিনদের গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে। সজ্জন মার্কিন সেনাপতি আশা করেন, গ্রামবাসীরা ছুটে এসে তাঁকে ভিয়েতকং আক্রমণের আয়োজনের গোপন খবর দেবে এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে কারা ভিয়েতকংদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তা-ও জানিয়ে দেবে। কোনো কোনো করুণ মার্কিন অফিসারকে বলতে শুনেছি, তাদের এলাকার গ্রামবাসীরা মার্কিনদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। হয়ত গ্রামের কোনো বুড়ো অনেক কালের ব্যক্তিগত শত্রুতার দরুণ তার কোনো প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করেছে। শুধুমাত্র এই কারণে মার্কিন অফিসারটি খুশী হয়ে ওঠেনি। সে ভাবছে, সে ভাল, সে সজ্জন, তাই সে সহযোগিতা পাচ্ছে। এই আত্মপ্রতারণা বহু দিনের পুরোন।

ভিয়েতনামে আর এক ধরনের মার্কিন আছে যাদের কাছে মৃত ছাড়া আর কোনো ভিয়েতনামী ভাল না। তারা বন্ধু খোঁজে না, বন্ধুত্ব বিলোয় না। তারা সেই জাতের মার্কিন যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখে একটি বন্দী মেয়েকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্যরা নির্যাতন করছে। যুদ্ধের ছবি আঁকার জন্য প্রেরিত একজন শিল্পী আমার কাছে একটি দৃশ্য বর্ণনা করে : এক বিকেলবেলায় দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যরা একটি বন্দী মেয়েকে প্রহার করছিল আর দু'পা দূরে উদাসীন মার্কিন সৈন্যরা গাম চিবোতে চিবোতে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী শিল্পীটি মার্কিনদের চোখে ভিয়েতনামীদের প্রতি নিখাদ ঘৃণা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায়নি।

ফু কুয়ং ক্যাম্প যে অনেকটাই লোক দেখানো সেকথা বললে মার্কিন অফিসাররা অসন্তুষ্ট হয়। ফু কুয়ংকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বললেও তাদের আপত্তি, যদিও ওটা তা-ই। ক্যাম্পের বাসিন্দাদের জোর করে ধরে এনে ওখানে আটকে রাখা হয়েছে, ওদের প্রায়ই জেরা করা হয়, ওদের মধ্যে গোয়েন্দাদের চারিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাঁটা তার দিয়ে পুরো জায়গাটা ঘেরা। তবু মার্কিন অফিসাররা মনে করে 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' কথাটির সর্বস্বত্ব নাৎসীদের দ্বারা সংরক্ষিত। কথাটি জেলরক্ষীদের এমন মূর্তি চোখের সামনে তুলে ধরে যারা মানুষের চামড়া দিয়ে আলোর ঢাকনা তৈরি করতে অভ্যস্ত। ফু কুয়ং-এ তেমন কিছু করা হচ্ছে না, সুতরাং মার্কিন অফিসাররা বলবে, ফু কুয়ং বন্দীশিবির নাৎসী সংস্করণ নয়।

এই ধরনের ক্যাম্প হয়ত আরও আছে, আমি সেগুলো দেখিনি। আমি যা দেখেছি শুধু তার কথা বলতে পারি। উত্তরাঞ্চলের হোই আন-এ একদল জার্মান স্বেচ্ছাসেবক আমাকে এক শরণার্থী শিবির দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস এইগুলোই খাঁটি শরণার্থী শিবির।

এক রবিবার সকালে সেই তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের দল আমাকে হিউ-এ কুষ্ঠরোগীদের আবাস দেখাতে নিয়ে গেল। জায়গাটা ওরা পরিচ্ছন্ন ও মানুষের বাসোপযোগী করবার চেষ্টা করছিল। একটা একতলা বাড়ি, চারদিকে কাদার বেষ্টনী, একসময় হয়ত শুয়োরের আস্তানা ছিল, এখন কুষ্ঠরোগী ও তাদের পরিবারের লোক মিলে সত্তর জনের বাসস্থান। জার্মানরা ওখানে বৈদ্যুতিক আলো এনেছে, গুহার মতো জায়গাটার সামনের নোংরা পথটা বাঁধিয়েছে, ভেতরের দেওয়ালগুলো পরিষ্কার করেছে। তারা বলল, রোগীরা যতদিন ওখানে আছে, এর বেশী কিছু করা সম্ভব না। জংধরা লোহার জাল অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে, দেওয়ালে এখনও প্রচুর নোংরা দাগ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা কিছুটা ব্যাহত হওয়ায় অন্ধকার

হয়ে-আসা একজাতি শোবার ঘরে স্ত্রীলোকগুলো ভিড় করছিল, মেঝেতেও প্রচুর নোংরা। কলোন থেকে আগত ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার উল্‌ফ্‌গ্যাং আমাকে সব দেখাচ্ছিল। ওকে বড় বিমর্ষ মনে হচ্ছিল।

ছোট খাবারঘরের পাশেই যেখানে ড্রেনের ময়লা গিয়ে পড়ছিল সেই জায়গাটা দেখলাম। অসহ্য দুর্গন্ধ। ডোবাটার পাশে ময়লার পাহাড়, কয়েকটা মুর্গী ঘুরছিল, উঠোনের পাঁকে কিছু হাঁস। উল্‌ফ্‌গ্যাং ও তার সহকর্মীরা উৎসাহহীন ভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। হিউ হাসপাতালের কর্মসচিব তাদের কাজ পছন্দ করেন না। তিনি তাদের বলেছিলেন, 'কুষ্ঠ-রোগীদের জন্য এসব করছো কেন? ওরা সবাই ভিয়েতকং।'

জার্মান তরুণ-তরুণীদের এই দলটি কুষ্ঠরোগীদের একটা ভাল বাড়িতে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল। হাসপাতালের একটা পরিত্যক্ত বাড়ি তারা নিয়েছিল। সেখানে তারা কাঠের কাজ, বৈদ্যুতিক তার লাগানো, হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা ইত্যাদি করেছিল। হাসপাতালটির কর্তব্য তাদের কাছে কিছু পুরোন জিনিসপত্র চড়া দামে বেচবার চেষ্টা করেছিল। তারা যেসব জিনিস সংগ্রহ করেছিল, সেগুলো হাসপাতালের কর্মীরাই চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। তারা নতুন করে আবার সব কিছু সংগ্রহের চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে নোংরা গুহার মতো জায়গাটাতেই কুষ্ঠরোগী ও তাদের পরিবারের লোকদের থাকতে হচ্ছে। এদের মধ্যে এমন সব শিশু রয়েছে যাদের এখনো ওই রোগ হয়নি। উল্‌ফ্‌গ্যাং আমাকে গোপনে বলল, ওখানে এমন দু'একজন আছে যারা ওই রোগাক্রান্ত নয় বলে তার ধারণা। নিজেদের বাড়ি ভাড়া দিয়ে তারা এখানে এসে রয়েছে। ব্যাপারটা আমার কাছে মিথ্যা পরিচয়ে অর্থ উপার্জনের ভয়ঙ্কর করুণ পন্থা বলে মনে হল।

একটা ছোট কারখানায় ক্যাম্পের বাসিন্দারা চুড়োর মতো টুপী তৈরি করে। শুনেলাম, বাজারে এই রকম টুপীর চাহিদা আছে। ছুটির দিনে আমি গিয়েছিলাম, কেউ কাজ করছিল না। পুরুষরা তক্তপোশে বসে তাস খেলছিল। তক্তপোশের কাঠের ওপর তারা বসেছিল, কোনো চাদর বিছানো ছিল না। যে-হাতে তাস তার দু'একটি করে আঙুল খসে গেছে। স্ত্রীলোকরা শুয়ে-বসে কাটাচ্ছিল। একটি স্ত্রীলোক তখন মৃত্যুর পথে।

স্বেচ্ছাসেবকরা আমাকে পাগলা গারদ দেখাতে নিয়ে গেল। সেখানকার অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। কিছু সুস্থ মস্তিষ্ক শিশু তাদের উন্মাদ জননীদের চারপাশে ঘুরছিল, একটি স্ত্রীলোক চিৎকার করছিল পশুর মতো। নোংরা ছেঁড়া পর্দা, দেওয়ালে মাছির আস্তরণ। কোথাও একটি নার্স দেখলাম না। কোনো রোগীকে স্নান করানো হয়নি, কারও মাথা আঁচড়ানো হয়নি। বিপজ্জনক ওয়ার্ডের সামনে কাদার মধ্যে পুরোন টিনের ছোটবড় পাত্র ছড়ানো। একটা তালাবন্ধ ঘরের দেওয়ালের ঘুলঘুলির মধ্যে একটি উন্মাদের বিস্ফারিত চোখ শুধু দেখা গেল।

পরের দিন হোই আন-এর বাইরে ক্যাম চো-এর অস্থায়ী শরণার্থী ক্যাম্পে ওরা আমাকে নিয়ে গেল। প্রথম ক্যাম্পটি ছ'মাসের পুরোন। দেড় হাজার লোক ওখানে রয়েছে। দশ-পনের ফুট চওড়া একটা ডোবা দেখলাম, কাদাজলে হাঁস সাঁতার কাটছিল, ক্যানেস্তারা ইত্যাদি ভাসছিল। সাতশ' লোকের জন্য জল একমাত্র ওখান থেকেই আসে। ক্যাম্পের অপর পাশের আর একটি সামান্য বড় ডোবা বাকী আটশ' লোকের জলের সর্ববিধ প্রয়োজন মেটায়। আমাদের সামনেই খোলা আকাশের নিচে বসে স্ত্রীলোক ও শিশুরদল প্রাতঃকৃত্য সারছিল, কোনো আবরু নেই। মাটির মেঝে ও খড়ের চালের কুঁড়েগুলোর সামনে ময়লা ছড়ানো।

ঘনিষ্ঠতর বিবরণ দেওয়া কঠিন, কারণ কাছে গেলে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। স্ত্রীলোকরা দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা যে তাদের দেখছি তাই দেখছিল। কয়েকজন এগিয়ে এসে ওষুধ চাইল। শিশুদের মধ্যে চর্মরোগ, চোখের অসুখ, পুষ্টির অভাব, দাঁতের অসুখ চোখে লাগছিল। ওদের কালচে দাগধরা দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার গোড়াগুলো সামান্য দেখা যায়।

শরণার্থীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধ। এদের কোনো কাজ নেই, কোনো কাজ দেওয়া হয়নি। কয়েকজন এখানে-ওখানে সামান্য কিছু সবজি ফলিয়েছে। দু'চারটে শুয়োর, মুর্গী, হাঁস রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকরা সমর্থ বৃদ্ধ ও বালকদের কাঠচেরাই শেখাবার জন্য একটা করাত যোগাড় করেছিল। কিন্তু ভিয়েতনামী আমলাতন্ত্র শরণার্থীদের কাজ শেখাবার অনুমতি দেয়নি। যে জার্মান মিস্ত্রীটি এই উদ্দেশ্যে এসেছিল সে একা-একা কাঠ চিরে সুন্দর তক্তা বানাচ্ছে।

এইসব ক্যাম্প দেখতে যাবার এবং ফিরে আসবার পথে একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছিল। আমার মনে হয়েছিল, ভিয়েতনামের নিসর্গ আমূল বদলে গেছে। মার্কিনরা আসবার আগে কোকা-কোলা আর বিয়ারের জংধরা টিনের ক্যান আর খালি হুইস্কির বোতলে দেশটা ঢেকে যায়নি। মাঠে, ডোবায়, খালে, নদীতে, রাস্তার পাশে যেখানেই চোখ যায় শুধু এই জিনিসগুলোই দৃশ্যমান। মার্কিনরা আসবার আগে মানুষ এবং জন্তুজানোয়ার যত-রকম ময়লা ফেলতো, যেমন মাছের কাঁটা, মুর্গীর হাড়, ধানের খোসা, শুকনো গাছগাছালি ডিমের খোসা, তরকারির খোসা সবই প্রাকৃতিক নিয়মে মাটি আত্মসাৎ করতো। কিন্তু মার্কিন জীবনের আদল এশিয়ার এই দেশটিকে শিল্প-পণ্যের উচ্ছিষ্ট দিয়ে এমনভাবে ঢেকেছে যা আত্মসাৎ করার শক্তি মাটির নেই।

ভিয়েতনামে যে কোনো বড় মার্কিন ঘাঁটীর নিকটবর্তী অঞ্চলকে কুষ্ঠাশ্রমের শুয়োর-চরা উঠোনের থেকে ভাল মনে হয় না। শুধু পার্থক্য এই কুষ্ঠরোগীরা এত দরিদ্র যে তাদের উঠোনে দামী বিয়ারের খালি বোতল আশা করা যায় না। তাদের রাজনৈতিক অভিমত সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের এত সন্দেহ যে কৌটোর উদ্বৃত্ত খাদ্য তাদের ভাগ্যে জোটে না এবং তাদের উঠোনে কৌটো ছড়ানো দেখা যায় না।

পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট সমরোপকরণ আরও নানাভাবে দেশটাকে ঢাকছে। দা নাঙ-এর কাছাকাছি রাস্তার কয়েক গজ দূরে একটা মার্কিন বোমারু বিমান ভেঙে পড়ে আছে দেখলাম। কয়েক মাস আগে বিমানটি যান্ত্রিক গোলযোগের ফলে ভেঙে পড়লে আশি জনের মৃত্যু হয়। ওই আশি জন যুদ্ধে নিহত বলা হবে না বলা হবে ওরা দুর্ঘটনায় মরেছে। কয়েক মাইল দূরে আরও একটা বিমান ভেঙে পড়ে আছে। সেখানে ক'জন মরেছে জানতে পারিনি।

আমি দেখলাম, সায়গনের আমলারা শরণার্থী ক্যাম্পের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু শুনতে অনিচ্ছুক। দু'একটি কথার পরই তারা আর কিছু শোনে না টেলিফোন তুলে অন্য কারও সঙ্গে গুরুত্বের আলোচনায় ডুবে যায়। তাদের আলোচ্য হয়ত ভিয়েতকং সন্ত্রাসের সাপ্তাহিক খতিয়ান। ভিয়েতকং সন্ত্রাস বিষয়ে মার্কিনদের মনোভাবের একটি দৃষ্টান্ত দিই। সায়গনে ভিয়েতকংদের গত সপ্তাহের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের একটি ফিরিস্তি আমাকে সাগ্রহে দেওয়া হল। পড়ে দেখলাম, মার্কিন সৈনাদের ঘাঁটির ওপর ভিয়েতকংদের আক্রমণও ওই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তালিকার অন্তর্ভুক্ত। সবিস্ময়ে বললাম, 'একেও আপনারা সন্ত্রাসবাদ বলেন?' অফিসারটি ভাল করে পড়ে বললেন, 'না। ভুল শোধরাতে হবে।' মনে হল তিনি স্বপ্নের জগৎ থেকে এইমাত্র ফিরে এলেন। আমাকে কিন্তু ওই তালিকা দেখে-

শুনে নির্ভুল বিবেচনায়ই দেওয়া হয়েছিল। মার্কিনিদের কাছে তাদের সেনাদলের ওপর হানাও ভিয়েতকং সন্ত্রাসবাদ।

আসলে এ এমন এক যুদ্ধ যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অথবা কোরিয়ার যুদ্ধের মতো নয়। এই যুদ্ধ বিষয়ে সত্যি কথা বলা চলবে না। কখনো সত্যি বলতে বাধ্য হলে তাকে পুরোপুরি বিকৃত করে দিতে হবে।

ভাং তাউ-এ একটি স্কুলের ছোট ক্লাস ঘরে মেজর বি গম্ভীর গলায় বললেন, সারা দেশে একটা বিপ্লব দরকার। এই ভিয়েতনামী মেজর জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সেনাধ্যক্ষ নন, তিনি কমিউনিস্ট-বিরোধী কর্মীদের ট্রেনিং দেবার উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারী স্কুলের কর্মসচিব।

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ইতালিয়ান জেনারেল ও আমাকে মেজর বি তাঁর কর্মসূচী বোঝাচ্ছিলেন। তাঁর স্কুলে এখন ছাত্রের সংখ্যা তিন হাজার। শিক্ষা সমাপ্ত হলে তারা গ্রাম গঠনের কাজ শুরু করবে। মেজর বি যখন বললেন, তাঁর দেশে বিপ্লব হওয়া প্রয়োজন, তখন তাঁর মনে কী ছিল আমি বুঝতে পারিনি, তবু আমিও মেনে নিলাম যে বিপ্লব প্রয়োজন।

অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন, চুরি ও দরিদ্রকে ঠকানোর এক পুরোন কাহিনী সর্বত্র শুনে যাওয়া বড় ক্লান্তিকর। মাত্র একদিন আগে একজন স্পষ্টভাষী অফিসার বলছিলেন, যে-সব কর্মকর্তাদের হাতে পোশাক বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারাই ভাল পোশাকগুলো চুরি করে। সরকারী কর্তাদের ঘুষ না দিলে কোনো পরিবার সাহায্য পাবার পক্ষে যথেষ্ট দরিদ্র বিবেচিত হয় না।

এ-সব অনেক শোনা থাকলেও মেজর বি-র মতো তত্ত্বজ্ঞানীর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় হয়নি। তিনি বললেন, ভিয়েতনামী সমাজ দুর্নীতিপরায়ণ। শাসকশ্রেণী সব সময় নিজেদের স্বার্থে আইনের অপপ্রয়োগ করে। কমিউনিস্ট-বিরোধী মেজরের মুখ থেকে এই ধরনের কথা শুনে ইতালিয়ান জেনারেলের চোখ বিস্ফারিত হল। ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মেজর বি আমাদের সামনে পরিসংখ্যান পেশ করলেন। বছর দুই আগে তাঁর স্কুলে কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যে আঠাশ হাজার কর্মী গ্রামাঞ্চলে কাজে লেগে গেছে। স্কুলে ট্রেনিংয়ের সময় তিন মাস। তিন মাসে বারটি পর্যায়ে তারা এগারটি পাঠক্রম শেষ করে। এখনো সুফল কিছু পাওয়া যায়নি তবে কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ চলছে।

ইতালিয়ান জেনারেল এই দেশের কথার মারপ্যাঁচ এখনো ঠিক আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাঁর সুবিধের জন্য আমি বুঝিয়ে বললাম, গ্রাম গঠন মানে একটি নতুন গ্রাম তৈরি করা নয়। আগে ভিয়েতকংদের প্রভাবে ছিল এমন গ্রামকে রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে সরকারপন্থী করে তোলার নাম গ্রাম গঠন। একটি গ্রাম এইভাবে গঠনের পর আবার ভিয়েতকংদের দ্বারা প্রভাবিত হলে সেই গ্রামকে আবার ভিয়েতকং প্রভাবমুক্ত করার নতুন গঠন প্রচেষ্টার নাম গ্রাম পুনর্গঠন। ইদানীং পুনর্গঠিত গ্রাম কথাটি আর ভাল লাগছে না, সুসংগঠিত গ্রাম কথাটি বেশী পছন্দ। মাঝে মাঝে পুনর্গঠিত গ্রাম আবার ভিয়েতকংদের তাঁবে চলে যায়, কারণ ভিয়েতকংদের শিকড় উপড়ে ফেলা সম্ভব হয় নি।

মেজর বি ও তাঁর সহকর্মীরা মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দোসর। আমেরিকার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শেখানো হয়, তা এখানে এই প্রথম যুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে। অথচ ব্যাপারটা মনে হয় বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-উপন্যাসের মতো। পরিস্থিতি নতুন-

ভাবে বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারলেন সম্পূর্ণ নতুন কৌশল দরকার, পাল্টা বিদ্রোহ দরকার। সেনাদল বিশেষ বাহিনী গঠন করল। এই বিশেষ বাহিনীকে রাজনৈতিক জ্ঞান দেওয়া হল এবং সেই জ্ঞান নিয়ে তারা পাল্টা গেরিলা-যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করল। এই পাল্টা সন্ত্রাসবাদী দলগুলির জামার চিতাবাঘের গায়ের দাগ এবং বুকপকেটে বাঘের মাথা আঁকা। তারা এখনো তৎপর রয়েছে, এখনো ভিয়েতকং গেরিলার অথবা গেরিলা বলে সন্দেহ-ভাজন ভিয়েতনামীর গলা কাটতে পারলে মুণ্ডুটা মার্কিন কর্নেলকে দেখাতে আনে।

১৯৬১ সালে এই বিশেষ বাহিনী তৈরি হয়েছিল। ওই বছরেই স্ট্যানফোর্ডের অর্থ-নীতিবিদ ইউজিন স্টেলী গ্রাম গঠনের একটি পরিকল্পনা করেন। জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলরের সাগ্রহ সহযোগিতায় আড়াই হাজার গ্রামে সেই পরিকল্পনা প্রয়োগও করা হয়েছিল। ভিয়েতকং-প্রভাবিত পুরানো বসতি ভেঙে জ্বালিয়ে ভিয়েতনামীদের স্টেলী-পরিকল্পিত গ্রামে নিয়ে আসা হয়। কিছু অনিচ্ছুক চাষী ও প্রবীণ গ্রামবাসীকে দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যরা প্রতিরোধের শাস্তির নিদর্শন হিসেবে খুন করে। পরিকল্পিত গ্রামগুলির অভ্যন্তরে কঠোর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চলতে থাকে। সেখানে আরও কিছু গ্রামবাসীকে গুমখুন করা হয়। কমিউনিস্ট-প্রভাবিত অঞ্চল থেকে তাদের আত্মীয়স্বজনদের তিন মাসের মধ্যে নিয়ে আসবার জন্য গ্রামবাসীদের প্রতি আদেশ দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে তারা ব্যর্থ হলে নতুন নির্যাতন।

স্টেলী-পরিকল্পনা প্রয়োগের ফলে সব থেকে বেশী সুবিধে হয় ভিয়েতকংদের। সম্ভবত কারণেই ওই সব গ্রামে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে, বিদ্রোহীরা কোনো কোনো গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। পরে ওই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। গ্রাম গঠন ও পুনর্গঠনের নামে সেই পরিকল্পনা আবার নতুনরূপে দেখা দিয়েছে।

বস্তুত প্রেসিডেন্ট জনসন হনোলুলুতে নাটকীয়ভাবে অন্য এক যুদ্ধ বিষয়ে যে ঘোষণা করেছিলেন তা ভিয়েতকংদেরই সতর্ক অনুকৃতি। মার্কিনীদের মাথায় এ সব আসবার অনেক আগে থেকেই ভিয়েতকংরা চাষীদের জন্য স্কুল তৈরি করছিল, কূপ খুঁড়ছিল, চাষের উন্নত পন্থা শেখাচ্ছিল। কিন্তু ভিয়েতকংদের হাতে প্রচারযন্ত্র না থাকায় তাদের সাফল্যের গোপন চাবিকাঠি গোপনই রয়ে গেছে অন্তত সেনাবাহিনী কিছু জানতে পারে নি। সেনাধ্যক্ষরা জানেন যে তাঁরা তাঁদের শত্রুর ব্যর্থ অনুকরণ করে চলেছেন।

স্টেলী পরিকল্পনা বাতিল হবার পর গ্রাম গঠন ও পুনর্গঠনের বৈপ্লবিক কর্মসূচী নিয়ে মেজর বি ও তাঁর সহকর্মীরা মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন। ব্যাপারটি হয়েছে প্রহসন নাটকের মতো জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের লক্ষ্য সমাজবিপ্লব অথচ তারা এ কর্মসূচী ঘোষণা করে না আর দক্ষিণ ভিয়েতনামী কর্তৃপক্ষ বৈপ্লবিক কর্মসূচী বারংবার ঘোষণা করেও সামান্যতম সমাজ সংস্কার করে না।

মার্কিনীদের ও তাদের ভিয়েতনামী ভাবশিষ্যদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কারের স্থান কোথায় জানতে ইচ্ছে হল। মেজর বি আমাকে বোঝালেন, সাংস্কৃতিক [illegible] ভূমিসংস্কার অর্থহীন। পশ্চিমী চিন্তাধারা দরকার এবং পশ্চিমী কারিগরি বিদ্যা। অপর দিকে ভিয়েতনামী জনসাধারণ ভিক্ষুকের স্তরে নেমে গেলে চলবে না। প্রত্যেকটি গ্রামে একটি করে ট্রাক্টর হবে আধুনিক সভ্যতার সুন্দরতম প্রতীক। এ সব কথা ইতালিয়ান জেনারেলের মনে দাগ কেটেছে দেখলাম। মেজর বি কোথায় পড়াশুনো করেছেন তিনি জানতে চাইলেন। মেজর অবশ্য তাঁর অতীত সম্পর্কে কিছু

ভেঙে বললেন না।

মেজর বি-র ছাত্রদের দেখতে আমাদের বনের মধ্যে যেতে হল। বেঞ্চের ওপর ছাত্রদের দল বসেছিল। একজন ভিয়েতনামী শিক্ষক তাদের পড়াচ্ছিলেন। তারা চিৎকার করে যেটুকু শিখলো তার প্রমাণ দিচ্ছিল। অনেকটা শিশুদের প্রশ্নোত্তরে বিদ্যাভ্যাসের মতো। যেমন, 'এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা কে?' 'ঈশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা।'

প্রশ্ন ও চিৎকার করে উত্তর দানের মাধ্যমে কমিউনিস্ট-বিরোধী বৈপ্লবিক শিক্ষাদানের দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই। প্রশ্ন · আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে কেন? উত্তর : আমেরিকা মোটেই তা করছে না। আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীন সরকার ও জনগণকে উত্তর ভিয়েতনামের আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে সাহায্য করছে। প্রশ্ন : দক্ষিণ ভিয়েতনামের কিছু কিছু অংশ ভিয়েতকংরা কেমন করে দখল করলো? উত্তর · ভিয়েতকংদের হিংসাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। হত্যা ও অপহরণ তাদের নীতি।

এই ধরনের প্রশ্ন ও উত্তরের ধ্বনিতরঙ্গ বনের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল। প্রশ্ন ও উত্তরের পরে ছাত্ররা সামরিক কেতায় দাঁড়িয়ে ড্রিল শুরু করল। ড্রিলের সময় প্রত্যেকটি আদেশের জবাবে তারা পশুর মতো চিৎকার করছিল। ব্যাপার স্যাপার দেখে ইতালিয়ান জেনারেলের উৎসাহ নিভে গেল। আমাকে বললেন, সামরিক কাঁচামাল হিসেবে বড়ই নিরেস।

শিক্ষার্থীদের সবারই সৈন্য হবার বয়েস হয়েছে, কিন্তু অন্য কোথাও তারা সেনাদলে যোগ দেওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হত না। তাদের মধ্যে কিছু পাকাচুল, বিষণ্ণ, ঘুমঘুম-চোখ ঠাকুরদা'ও ছিলেন। বিপ্লবী যুবকদের এই করুণ ব্রিগেডে তাঁরা কেন এসেছেন ভেবে দেখবার মতো।

শিক্ষা শেষ হবার পর এরা গ্রামে যায়, আমি অবশ্য সেখানে এদের কখনো কিছু করতে দেখিনি। অস্ত্র হাতে নিয়ে দল বেঁধে গুলতানি করতে অথবা শুধু খেতে দেখেছি। অথচ এই ট্রেনিং ওদের মনে এই ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে ওরা সমাজের উঁচু স্তরের। সরকারী রিপোর্টেও ওদের ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতার উল্লেখ দেখা যায়।

মেজর বি ও তাঁর সহকর্মীদের মতো ব্যক্তিদের নিয়ে সি আই. এ কেন কাজ করছে তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। আমেরিকায় সি. আই. এ এবং বুদ্ধিজীবী মহলের মধ্যে সম্পর্কের যে চেহারা দেখা গিয়েছে, ভিয়েতনামে তার বিস্ময়কর প্রতিবিম্ব চোখে পড়ে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে সি. আই এ নানাবিধ গণতান্ত্রিকতা-বিরোধী প্রচেষ্টা পরিচালনা করেছে। শুধু অর্থ ও কর্মী দেয় নি, উন্মত্ততার দোসর যে-প্রতিভা তার আলোকচ্ছটাও বিকীর্ণ করেছে। ভিয়েতনাম সম্পর্কে কত বই, লেখকদেরও অজানতে অথবা জ্ঞাতসারে, সি. আই. এ র অর্থে প্রকাশিত হয়েছে তার হিসেব দেওয়া অসম্ভব।

আমেরিকায় যেমন ঠিক তেমনই ভিয়েতনামে প্রকাশ্য সরকারী সংস্থাগুলির চেয়ে সি আই. এ-র পৃষ্ঠপোষকতা অনেক বেশী উদার। মার্কিন কংগ্রেসের পক্ষে বৈপ্লবিক ধ্বনি কম্পিত পরিকল্পনার জন্য অর্থ অনুমোদন করা হাস্যকর। মার্কিন কংগ্রেসের পক্ষে মেজর বি-কে হাতিয়ার করা স্বাভাবিক নয়। তা করতে হলে মেজর বি-র বৈপ্লবিক ধ্বনিগুলির তীব্রতা কমিয়ে ফেলতে হবে। সেই হেতুই মেজর বি-র মতো ব্যক্তির সঙ্গে সি. আই. এ র স্বাভাবিক সম্পর্ক। নানা বর্ণ ও আদলের প্রাক্তন বামপন্থী, নকল বামপন্থী ও র‍্যাডিক্যাল দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সি. আই. এ-র ঘনিষ্ঠতম আঁতাত। সি. আই. এ বুদ্ধিজীবীদের বড়

ভালবাসে। ভিয়েতনামে একজন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি সি. আই. এ-র এজেন্ট না সি. আই. এ-র চষা জমিতে গজানো চারা বুঝতে পারা যায় না।

ভিয়েতনামে সি. আই. এ-র ফসলের অজস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে একটির উল্লেখ করছি। কর্নেল কর্সন মার্কিন সাঁজোয়াবাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন। এখন তিনি দা নাং-এর উত্তরে পাহাড় অঞ্চলে গ্রাম গঠনের কাজে নিযুক্ত। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, করজিবস্কির সঙ্গে পড়াশুনো করেছেন, ফ্লোরিডার একটি কলেজে পড়িয়েছেন, চীনে কাজ করেছেন, বর্তমানে এগার হাজার ভিয়েতনামী চাষীর মধ্যে কর্মরত, তিনি তাঁর পদ্ধতির নাম দিয়েছেন, 'প্রায়োগিক কারণতা', লেনিনের কথা তাঁর মুখে : 'চাষীর গায়ে আঁচড় কাটুন, বুর্জোয়ার দেখা পাবেন।' কর্নেল কর্সন আমাকে বললেন, তিনি আঁচড় কেটেই চলেছেন।

কর্নেল কর্সন কূটকৌশলী। তিনি স্থানীয় অবস্থার উপযোগী একটা বিরাট শুয়োরের আস্তানার নক্‌শা করেছেন। সৈন্যদের খাদ্যের উচ্ছিষ্ট জমানো ময়লা চাষীদের শুয়োরদের দান করেছেন। কর্নেল এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছেন। তাঁর আদেশে ওই অঞ্চলের জন্য জনৈক সামরিক ইঞ্জিনীয়ার একটি সর্বাধুনিক মিলের নক্‌শা তৈরি করেছিল। সেটি বাতিল করে তিনি ইঞ্জিনীয়ারকে বলেন, তোমার শৈশবে অথবা তোমার বাবার শৈশবে মিল যেমন ছিল, তেমন একটি আমাকে তৈরি করে দাও।

কর্সন সাবধানী ব্যক্তি। চাষীদের বীজধান দিয়ে তারা ওগুলো বাজারে বেচে দেয় কিনা লক্ষ্য রাখছিলেন। তাঁর বুদ্ধিও প্রচুর। ডিনামাইট ফাটিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে চাষীরা জাল দিয়ে যে-মাছ ধরে তার থেকে বড় মাছ নদীতে আছে। আমি বললাম, 'আপনি নিশ্চয়ই এখানে ডিনামাইট দিয়ে মাছ ধরার পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চাইছেন না?' তেমন কিছু তিনি চাইছেন না, তিনি শুধু একবার দেখিয়েছেন যে বড় মাছ আছে এবং সেই মাছ বাজারে বেচবার জন্য চাষীদের দিয়েছেন। বড় মাছ বাজারে বেচে চাষীরা বড় মাছ ধরবার জন্য আরও বড় জাল কিনছে।

কর্সন সিনিক। তাঁর বিশ্বাস, অর্থ সব কাজের একমাত্র প্রেরণা। আমাকে বললেন, আপনি "দি গ্রুপ" বইটি নিশ্চয়ই অর্থ উপার্জনের জন্য লিখেছিলেন, তাই না? আমি বললাম, না, বইটা আমাকে এত অর্থ দেওয়ায় আমি নিজেই অবাক হয়েছি। কর্সন সবিস্ময়ে বললেন, আপনি তাহলে কিসের জন্য লেখেন? তিনি আদর্শ গ্রামের যে নক্‌শা করেছেন তার কেন্দ্রবিন্দুতে একটা বিরাট ডলার চিহ্ন ব্রোঞ্জ রঙে আঁকা।

ভিয়েতনামে কর্মরত অন্যান্য মার্কিন তত্ত্বজ্ঞানীদের সম্পর্কে কর্সনের উক্তিগুলো বাঁকা। তিনি বললেন, কেনেডির সময়ে এক মার্কিন গবেষক দল ভিয়েতনামের এক গ্রামে কাজ করেছিল। তাদের কাজ ছিল জনমত বিশ্লেষণ। সেই কাজে দু'লক্ষ ডলার খরচ হয়। গবেষক দলটি সর্বসাকুল্যে মাত্র ছ'জন ভিয়েতনামীর সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য কথা বলেছিল।

গ্রাম গঠন পরিকল্পনার মধ্যে চিউ হোই কর্মসূচী জঘন্যতম বলে আমার ধারণা। এই কর্মসূচী সম্বন্ধে আমি কর্সনের অভিমত জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আমরা বিশ্বাস-ঘাতকদের লালন করছি।' তিনি অবশ্য নৈতিক কারণে আমার সঙ্গে একমত হন নি। তাঁর ধারণা বিশ্বাসঘাতকদের দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা বাতুলতা।

আমার সবক্ষণ মনে হচ্ছিল, কর্নেল কর্সন কিছুটা দক্ষিণপন্থী। তবু আমি জোর করে এই ভাবনার দরজা বন্ধ করে দিলাম। বুক ভরে নিশ্বাস টেনে, গোল্ডওয়াটার সম্বন্ধে তিনি কি ভাবেন জানতে চাইলাম। পাশের টেবিলে দুটো টাইপরাইটারের চাবির ওপর

ক্যাপ্টেন এবং লেফ্‌টেন্যান্টের আঙুল খেয়ে গেল, দ্রুত দৃষ্টি-বিনিময় করে তাঁরা হাসলেন। কর্নেল বিয়ারের পাত্রটি টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন। তারপর দাঁতের সার বিকশিত করে বললেন,—মনে মনে আপনিও জানেন, গোল্ডওয়াটার নির্বোধ।

আমার প্রশ্নের ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে কর্নেল শিকাগোর এক হাত অথবা এক পা কাটা এক সাংবাদিককে সিঁড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার গল্প বললেন। বললেন, 'সে আমাকে একনিশ্বাসে ফ্যাসিস্ট এবং কমিউনিস্ট বলে ফেলেছিল।' মার্কিন রাজনৈতিক আকাশের কোনো তারকাকেই তিনি সমর্থন করলেন না। তবে সেনেটর জ্যাক্‌সনের অফিসের এক মহিলার কথা তিনি উল্লেখ করলেন। প্রায়োগিক কারণতার অস্ত্র হিসেবে একমাত্র ডলারের ওপর তাঁর আস্থা। কিন্তু এই আস্থা প্রকাশের মধ্যে বিষন্ন আত্মধিক্কারের ইঙ্গিত রয়েছে।

আমি বললাম, আপনার গ্রাম গঠনের পরিকল্পনা সমাজতন্ত্রী কাঠামোতেও কাজে লাগতে পারে। সৈন্যদের খাদ্যের উচ্ছিষ্ট চাষীদের শুয়োরদের খাওয়ানোর মধ্যে কোনো পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য নেই। তিনি বললেন, খোলা বাজারের বিষয়টিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাই মার্ক্স বুঝতে পারেন নি। কর্নেলের বক্তব্য আর আমার বোধগম্য হল না। তাঁর সব কথা কেমন আকস্মিকভাবে এক জটিল অন্ধকারের অরণ্যে হারিয়ে গেল।

অন্যের মনোভাব বুঝতে কর্নেল ওস্তাদ। একটু পরে যেন অলসভাবে বললেন, 'আমার ব্যাটেলিয়নে কোনো সমকামী নেই। কখনো তেমন কাউকে দেখলে আমি তাড়িয়ে দেব। আমার সঙ্গে যারা কাজ করবে তাদের মেয়েদেরই পছন্দ করতে হবে।'

কর্নেলের ডলার চিহ্ন এবং মেজর বি-র ট্রাক্টরের প্রতীক আমার একসঙ্গে মনে পড়লো।

সি. আই. এ এবং বিশ্বাসঘাতকদের আঁতাত পুলিসের সঙ্গে দুষ্কৃতকারীদের বিচিত্র সম্পর্কের মতো। যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকদের কাজে লাগানো অবশ্য নতুন নয়। কিন্তু ঠাণ্ডা লড়াই ও কিউবার অভিজ্ঞতা দলত্যাগীদের কাজে লাগানোর ব্যাপারে মার্কিনিদের চোখ খুলে দিয়েছে। শরণার্থী অথবা নির্বাসিত হওয়াটা পেশা নয়, কিন্তু দল ত্যাগ করাটা পেশা।

বিমান ও হেলিকপ্টার থেকে লাউড-স্পীকারে বক্তৃতা এবং প্রচারপত্র-বৃষ্টি করে ব্যাপকভাবে ভিয়েৎকংদের দলছাড়া আর চিউ হোই কর্মসূচীর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেকটি দলত্যাগীকে একটি ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে 'নতুন শিক্ষাদান'ও এই কর্মসূচীর অন্তর্গত। চিউ হোই কেন্দ্রগুলি শরণার্থী শিবির থেকে আরও বেশী নৈরাশ্যজনক। এই সব কেন্দ্রে অবশ্য ভিড় কম এবং জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। একজন ভিয়েৎকং দলত্যাগী এমন একটি কেন্দ্রে এলে তাকে পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট দিন কয়েদী হয়ে থাকতে হয়। স্বাধীনতা বেছে নেবার জন্য তাকে কয়েদী হতে হয়। তার আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়, তাকে জেরা করা হয় (মার্কিনিরা দাবি করে—দলত্যাগীরা স্বেচ্ছায় ভিয়েৎকংদের বিষয়ে খোঁজখবর দেয়), তাকে রাজনৈতিক তত্ত্ব বোঝানো হয় এবং সব শেষে পরিচয়পত্র ইত্যাদি দিয়ে তাকে সমাজে চারিয়ে দেওয়া হয়।

এইসব কেন্দ্রে আমি দেখেছি, বাসিন্দারা বিমনা হয়ে উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথবা অলসভাবে বেঞ্চে শুয়ে আছে, দু-এক জনকে চিঠি লিখতে দেখেছি. তত্ত্বগতভাবে প্রত্যেক দলত্যাগীকে একটা কোনা কাজ শেখানো হয়। শুধু একটি কেন্দ্রে আমি দেখেছি, একজন দলত্যাগী আর একজনের চুল কাটছে এবং আরও দুজন মিলে একটা পাজামা সেলাই করছে। এছাড়া আমি কাজের আর কোনো নমুনা কোনো কেন্দ্রে দেখি নি। মার্কিনিরা স্বীকার করে

যে কাজ শেখানোর ব্যাপারটা ঠিক চলছে না, তার একটা কারণ, দলত্যাগীরা বেশী সংখ্যায় আসছে এবং পেশা শেখাবার ব্যবস্থার ওপর বেশী চাপ পড়ছে।

বস্তুত এদের চাকরি পাবার সম্ভাবনা খুবই সীমাবদ্ধ। এরা এই ছাপ নিয়ে আবার সমাজে প্রবেশ করে যে এরা ভিয়েতকং ছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। মার্কিনিরা এক সময় দলত্যাগীদের নিয়ে একটা সেনাদল গঠনের কথা ভেবেছিল, যাদের মধ্যে কর্নেল, ক্যাপ্টেন ইত্যাদি সামরিক অফিসার থাকবে। এইভাবে তাদের 'মর্যাদা' দেবার কথা মার্কিনিরা ভেবেছিল। কিন্তু পরিকল্পনাটি দক্ষিণ ভিয়েতনামী বাহিনীর পছন্দ হয় নি।

রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্লাসে দলত্যাগীরা অনেকেই প্রথম ভিয়েতকংদের কর্মসূচী জানতে পারে। জানার পর যে দল ছেড়ে তারা এসেছিল সেখানেই আবার ফিরে যায়। যারা থেকে যায় তারা সশস্ত্র প্রচার বাহিনীতে যোগ দিতে পাবা সব চেয়ে ভাল চাকরি বলে মনে করে। ছত্রিশ জন করে দলত্যাগী নিয়ে এক-একটি সশস্ত্র দল গঠন করা হয়। তারা দক্ষিণ ভিয়েতনামী ও মার্কিনি সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে থাকে। কোনো গ্রাম দখল করলে এই বাহিনী সন্দেহভাজনদের জেরা করে। জেরার নামে গ্রামবাসীদের নির্যাতন করা হয়। এইভাবে নির্যাতন করার হীন প্রবণতা দেখিয়েই হয়ত এরা সশস্ত্র প্রচার বাহিনীতে চাকরি পায়।

ফেব্রুয়ারীতে চিউ হোই কেন্দ্রে বাসিন্দাদের সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছিল। এর জন্য ভিয়েতকংদের একটি চালের গোপন গুদোম ধ্বংস করতে পারলে অথবা উত্তর ভিয়েতনামে একদফা বোমাবর্ষণ সফল হলে মার্কিনি প্রভুদের যত আনন্দ হয়, তার থেকেও তারা বেশী ফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তাদের কাছে লাউডস্পীকার ও প্রচারপত্রের সফলতা যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্যের চেয়ে বেশী দামী হয়েছিল। অথচ পরে জেনেছি, উত্তর ভিয়েতনাম থেকে অনুপ্রবেশ কমে গেলেও আগাগোড়াই ভিয়েতকংদের সংখ্যা বহসাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছিল।

চিউ হোই কর্মসূচীতে দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের বিশেষ কোন আগ্রহ নেই। তারা বরং দলত্যাগী ভিয়েতকংরা এসে পৌঁছলেই গুলি করে তাদের মেরে ফেলা পছন্দ করে। সাংবাদিকদের ধারণা সাধারণ মার্কিনি সৈন্যরাও দলত্যাগীদের পছন্দ করে না। মারাত্মকভাবে বিকৃত ও এই মানুষগুলোকে নিয়ে সমাজ গড়ার চেষ্টা হলে সেই সমাজের বুনিয়াদ হবে ফাটল ধরা এবং যখন তখন তার রঙ বদলাবে। ভয় অথবা অর্ধাহারের দরুন তারা দলত্যাগ করে এসে থাকলে তাদের আনুগত্যের শিথিলতা করুণা করার মতন। চাকরি এবং অর্থের আশায় তারা এসে থাকলে খুবই দুঃখের বিষয়। মার্কিনিদের প্রচার তাদের এনেছে বলা ভাঁড়ামি।

চিউ হোই কর্মসূচী বলা বাহুল্য হাস্যকর প্রচারপত্র ও 'বমান-বক্তৃতার ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে সামরিক চাপের ওপর, বিশেষত বোমাবর্ষণ গাছপালা জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করা, ফসল ধ্বংস করা ইত্যাদির ওপর ভিয়েতকংদের অনাহারে মারা এবং ওষুধ ডাক্তার ও নার্সের অভাব তৈরি করে মারা ঘোষিত নীতির মধ্যে রয়েছে। কোনো ভিয়েতনামী নার্স আহত অথবা অসুস্থ ভিয়েতকংদের শুশ্রূষা করেছে সন্দেহ হলে তাকে সামরিক [illegible] অথচ কোনো মার্কিনি অথবা দক্ষিণ ভিয়েতনামী সরকার পক্ষের নার্স ভিয়েতকংদের দ্বারা নিহত অথবা অপহৃত হলে ভিয়েতকংরা অসামরিক নাগরিকের ওপর হামলা করেছে বলে নিন্দে করা হবে।

ভিয়েতকংদের অনাহারে মারতে গিয়ে মার্কিনিরা বেশী মারছে ভিয়েতকং-প্রভাবিত গ্রামাঞ্চলের সাধারণ চাষীদের। অথচ ওই সাধারণ চাষীরা সাধারণ বলেই, সমরকৌশল দেখে [illegible] সম্বন্ধে সি আই. এ-র কোনো আগ্রহ নেই। তারা দলত্যাগী হলে তাদের

নিয়ে সি. আই. এ-র কোনো কাজই হবে না. চিউ হোই কেন্দ্র থেকে সুযোগে পালিয়ে ফিরে অনেক ভিয়েতনামী হিসেব করে বলেছে, এইভাবে চলতে থাকলে ভিয়েতনামের জনসংখ্যার সিকি ভাগ নিহত হবে অথবা খাদ্য ও ওষুধের অভাবে মরবে। অথচ গণহত্যা কথাটি মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মোটেই পছন্দ নয়।*

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : সুধাংশু ঘোষ

* *New York Review of Books* এর সৌজন্যে।

বদরুল

যুবনাশ্ব

বদরুলের নাম এখন বদিবাবু। সে নিজে বদলায় নি, দেশ ভাগ হবার পর আপনা থেকেই নাম পালটে গেছে। তার শুধু বদলেছে পোশাক-আসাক। নীল লুঙ্গি, গোলাপী গেঞ্জি গলায় তক্তি। কুচকুচে কালো বাবরী, সরু লম্বা গোঁফের দুদিক ঝোলা, কবে উধাও হয়ে গেছে। এখন পরছে ঢিলে পাজামা, সাদা হাওয়াই সার্ট। ছোট করে ছাঁটা চুল কিন্তু আশ্চর্য, দাড়ি কামানো সরু গোঁফের জায়গায় এখন মুখভরা জঙ্গুলে দাড়িগোঁফ।

দিনকাল বদলে গেছে। বদরুলের ভাগ্য দেবতাও ওর ওপর একটার পর একটা বদলের পালা চালিয়ে গেছেন। প্রথমে ছিল পকেটমার পটলডাঙার আস্তানায়, তার পর হোলো গুন্ডার সর্দার রাজাবাজারে, এখন হয়েছে বাড়িওয়ালা বন্ডেলে।

এক ফালি জলাজমির ওপর মাটির আর খাপ্‌রার দোতলা বাড়ি রেললাইন ঘেঁসে। আশেপাশে সবই জলা ছিল এখন কারখানায় কারখানায় ভরে উঠেছে। কিন্তু কোনো মালিকই বদিবাবুর ডেরায় হামালা করতে সাহস করে নি। গুন্ডামি করে ছেড়ে দিয়েছে বদরুল কিন্তু হাঁ, নাম ডাক আছে এখনো। এখনো তাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না কেউ, আর আজও তেমন তেমন যদি দরকার হয়, সে গিয়ে আসরে নামলে অগুনতি দুর্ধর্ষ চ্যালাচামুন্ডা জুটে যাবে তার। তার সাবেক কালের সাকরেদরাই এখনো কলকাতার নানা অঞ্চলে সর্দার।

দিন চলে খুপরি ভাড়া দিয়ে। কিন্তু হুঁশিয়ার বদরুল তার ফেলে আসা জীবনের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চায়। তার থাকবার মধ্যে আছে এক ছেলে মনারুল আর সে আমলের অতি বিশ্বস্ত চ্যালা লটকা। লট্‌কার নাম নটবর, রেশমের দড়ির ফাঁস দিয়ে লোক খুন করতে ওস্তাদ ছিল সে। লট্‌কাও বদলেছে। তার গানের গলা ছিল ভাল। গলায় কণ্ঠি ফোঁটা তিলক এঁকে গেরুয়া আলখাল্লা পরে সে মাধুকরীতে বেরোয়। দিনমানে রোজগার কম করে না, টাকার অঙ্ক আট-দশ গড়ে।

ভাড়াটেদের মধ্যে হরকিসিমের চিড়িয়া। খবরের কাগজে কাজ করে হরিলাল দিনভর ঘুমোয় রাতে ছাপাখানায় যায়। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছে বনমালী, আটটা বাজলেই কোট-পাৎলুন এঁটে গড়িয়াহাটের মোড়ে একটা দাওয়াখানায় গিয়ে বসে ফেরে দুটো আড়াইটেয়। ব্যস্‌। তারও রোজগার মাস গেলে শ'খানেক হয়। কোলেবাজারের ঝাঁকা-মুটেদের সর্দার ভিখন, ন রুপেয়া সীটরেন্ট দেয়। সীট মানে নিজের পয়সায় কেনা দড়ির খাটিয়া একটা, দিনের বেলা খাড়া করে ওঠানো থাকে দালানের গায়ে, রাতে বাসার সামনে রাস্তায় সেটা পেতে ঘুম লাগায় ভিখন।

এই কজনই স্থায়ী সদস্য। আজ আছে কাল নেই এমন অনেক জনা রাত কাটাতে আসে ঐ বাসায়। তাদের কাছ থেকেও খুচরো আদায় মন্দ হয় না বদরুলের।

নাঃ, মন্দ নেই বদরুল। খালি ভাবে মানারুলটাকে মানুষ করা যায় কি করে। বাজে লাইনে দিতে মন সরে না, বনমালী ডাক্তারের কাছে এ বি সি ডি শিখে ছেলেটা আংরেজীতে লায়েক হয়ে উঠেছে। এখুনি শিস্‌ দেয়, বোল রাধা বোল তান ছাড়ে, বদরুলের এসব ভালো লাগে না। জোয়ান হলে ছেলে ঘরে বসে খাবে ভাবতেও পারে না সে, অথচ

কোন লাইনে যে দেবে ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। এক একবার ভাবে, ছেলেটা বিগড়ে যাচ্ছে না ত। তার পর ভাবে, নাঃ, বদরু সর্দারের রক্ত আছে ওর গায়ে, তাকদ খাটিয়ে খাবে, বাড়ুক আর একটু।

খুন জখম চুরি—এই ছিল পেশা—কিন্তু সে ত শুধু রুজি রোজগারের ধান্দা। তাই বলে ছোটো কখনো হয়নি নিজের ইমানের কাছে। যে তাকে বিশ্বাস করেছে, সে কখনো ঠকে নি। কতো সপাই, কতো ইনাম, কতো প্রলোভন, জীবনে এসেছে ও গেছে—টলাতে পারে নি বদরুলকে। খাঁটি মরদের বাচ্চা সে, আজও মাথা উঁচু আছে নিজের জগতে।

ওপরটপ্‌কা চটকে মানারুলের মন ভোলে দেখে তবুও মাঝে মাঝে ঘাব্‌ড়ায় বদরুল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে সুরু করলে হয়ত সেরে যাবে, কিন্তু কোন খাটুনির কাজে লাগাবে ওকে। ভিখনের দলে ভিড়িয়ে ঝাঁকা মুটে করে দেবে? না, আস্‌গরকে ডেকে মৌলালিতে সাবেক পৈতৃক পেশায় লাগাবে? স্থির করে উঠ্‌তে পারে না। বাপের কলিজা বোধ হয় পায় নি ছেলেটা,—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বদরুল।

সেদিন বেলা বারোটা নাগাদ, যখন বাড়ীতে কেউ নেই, সিরাজ এসে নীচতলার আঙিনায় ঢুকল। কি চেহারা হয়েছে সিরাজের! চুল উস্ক খুস্ক, বাঁ গালের খানিকটা কেটে গেছে, কোমরের গ্যাঁজে ঢোকানো লিক্‌লিকে ছোরাটার রক্ত তখনো শুকোয় নি।

সিরাজ আস্‌গরের দলের ছোকরা খুনে। পাকা হাত। মানারুল একা বাড়ীতে, সে সিরাজকে চেনে না।

সর্দার -সর্দার কোথা? বলল সিরাজ।

মানারুল বলল, বা'জান বাড়ী নেই।

শিগ্‌গির, শিগ্‌গির কোনো জায়গা দেখা। পুলিশ পেছনে। দু'টো সেপাই ঘায়েল করে পালিয়েছি, কিন্তু ওরা পেছন ছাড়ে নি। মৌলালি থেকে সি আই. টি. রোড ধরে কংগ্রেস বাগিচা পেরিয়ে এই রাস্তা ধরেছি, কিন্তু নজর এড়াতে পারি নি। তুই বুঝি সর্দারের ছেলে? সর্দার আমাকে চেনে। শিগ্‌গির জায়গা দেখা।

মানারুল থতমত খায়। জায়গা কোথায়? সবই ত ঘর আর বারান্দা আর লাইনের ধারের ডোবা। পুলিশ এলে ত খোলা মেলা সবই দেখতে পাবে।

ভাবছিস্ কি? ওঃ মাথায় আসছে না বুঝি কিছু, আচ্ছা দাঁড়া। আমিই দেখছি।

সিরাজ এদিক ওদিক চুঁড়ে ভিখনের খাটিয়ার তলা থেকে পোড়া মাটির হাঁড়ি বার করল একটা। মাথায় টুপির মত বসিয়ে দেখে নিল মাপে ঠিক আছে কি না।

দেখল যে ঠিকই আছে। বরং ঢলঢলে হচ্ছে একটু। তাতে আসে যায় না। মানারুলকে বলল- দ্যাখ্‌,—এই দুটো টাকা রাখ্‌। পুলিশ চলে গেলে সিনেমা দেখিস্‌। আমি হাঁড়ি মাথায় ওই ডোবাতে গা ঢাকা দিচ্ছি। শয়তানগুলো গেলে সিটি দিস্‌। বুঝলি?

বলে জবাবের অপেক্ষা না করে সিরাজ কেটে পড়ল।

বুক দুরু দুরু, গা ঘেমে উঠেছে মানারুলের। এ জীবনের সাথে একটুও পরিচয় নেই তার। দুটো একটাকার নোট হাতের মুঠোয় চেপে হতভম্ব হয়ে বসে রইল সে।

সত্যিই সত্যিই মিনিট বিশেকের মধ্যে পুলিশ এসে পড়ল। পেছনে ছোটখাটো একটা ভিড়, তাদের কাউকেই মানারুল চেনে না। তাদের বাড়ীর কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছে না পুলিশ।

দু'জন সিপাই সমেত একজন দারোগা ঘরে ঢুকে মানারুলকে বলল, তুই কেরে?

—মানু।

—মানুটা আবার কে হলি বটে। এ বাড়ীর মালিক ত বদি বাবু, সে তোর কে হয়?

—বাবা।

— আচ্ছা মানুবাবু—একটা গুণ্ডা ক্লাশের লোককে এদিকে আসতে দেখেছ? ছোকরা মতো, লুঙি পরা, কোমরে গামছা বাঁধা। মুখ কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে?

—না।

—সে কি বাপধন, এই ত এখানে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ দেখছি। বল কোথায় লুকিয়েছে খুনেটা—

—আমি জানি না।

—আলবৎ জানিস হারামির বাচ্চা—না বললে তোর জান ধড় আলাদা করে দেব মেরে—

—গালমন্দ করবে না সাহেব। আমি বদ্‌রু-সর্দারের ছেলে।

ভিড়ের মধ্যে একজন বলে উঠল,—জবান সামাল দারোগা সাব্, বদ্‌রু শুনলে এ দুনিয়ায় আর বেশীদিন দারোগাগিরি করতে হবে না।

বুড়া কনেস্টবল ছিল একজন। সেও বলল,—ঠিক বাত আছে। বদিয়া উম্‌দা আদ্‌মি, ইমানদার আদ্‌মি। উন্‌কা নাম মাৎ লেনা দারোগা সাব্।

—আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই ছোঁড়া, তুই না হয় খুব পীর প্যাগম্বরের ছেলে, মানলাম, কিন্তু এখন বল ত খুনেটা কোথায় লুকোল? সেটা দুষ্মনি করে পালাচ্ছে, আর তুই এত বড় লোকের ছেলে হয়ে জেনে শুনেও বলবি না?

আমতা আমতা করে মানারুল। দারোগা বোঝে ছেলেটা জানে। অন্য কায়দা ধরে এবার।

তুই ত বেশ চালাক চতুর আছিস রে ছোঁড়া। কি খেতে ইচ্ছে করে তোর? চপ কাট্‌লেট্? না মিষ্টি চল বাবা চল, পেট ভরে খাইয়ে দিচ্ছি তোকে।

মানারুল ঘাড় নেড়ে বলে তার খাওয়ার সখ নেই।

তবে কিসের সখ আছে বল? ভালো জামা ও সিনেমা দেখা? সব পাবি, সব পাবি বলে ফেল সন্ধানটা।

চট্ করে টাকার কথা মনে হয় মানারুলের। টাকা দিয়ে ত সব কেনা যায়। ও ত হাতে নগদ কিছু পায়ই না কোন দিন। তার ওপর জলজ্যান্ত দু দুখানা একটাকার নোট ওর জিম্মায়।

কিন্তু খুলে বলতে পারে না কথাটা।

বলে বুড়ো কনেস্টবল।

দশটো রুপেয়া ইনাম দে দেও সাব, লেড়কা কবুল কর সেক্‌তে।

আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। দশটা টাকাই দেব তোকে। এই নে, এই নে—

বলে একখানা দশটাকার নোট পকেট থেকে বার করে দেয় মানারুলকে।

কথা বলতে বলতে দু'জনে আর সবায়ের চোখের আড়ালে অন্দর বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। খোলা উঠোন, তার পর ডোবা তার পর রেল লাইন। আশেপাশে কচু ঘেঁচুর জঙ্গল।

দশটাকায় মানারুলের মন টলেছে। সে শুধু তাকায় ডোবায় ভাসা কালো হাঁড়িটার

দিকে। আর কিছু বলে দিতে হয় না দারোগা বাবুকে।

বদরুদ্দিনের ফিরতে সেদিন রাত হোলো। দোতলায় নিজের খুপ্‌রিতে ঢুকতে গিয়ে দেখে দোর খোলা, ঘর অন্ধকার। ডাকল—মানু, মানারুল—

ভারী গলার আওয়াজ এল ভেতর থেকে।

—মানারুল নেই। আমি আছি সরদার। আমি আস্‌গর।

—কে, আস্‌গর—কি বেটা, কি মনে করে রে--

—আলো জেলো না সর্দার। আমি শাস্তি নিতে এসেছি।

—কিসের শাস্তি রে বেটা।

আস্‌গর অন্ধকারে এগিয়ে এসে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বদিবাবুর কানে কানে কথা কয়।

- ইয়া আল্লা বলে বদ্‌রুল ধপ্‌ করে বসে পড়ে খাটে।

—এই নাও ছোরা, সর্দার। এইতেই মানারুলকে খতম করেছি আমি। আমি জানি তুমি থাকলেও তাই করতে। বদ্‌রু সর্দারের নাম না হলে মাটি হয়ে যেত পাড়ায় বে-পাড়ায়। কিন্তু, কিন্তু—আমাকেও তুমি খতম করো সর্দার।

সেই অন্ধকার কুঠরিতে চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগল বদ্‌রুলের, মুখ দিয়ে একটিও কথা বেরোল না।

এমনি করে একটির পর একটি ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল। রাত যখন নিশুতি, অন্ধকার থমথমে হয়ে এসেছে, বদ্‌রুলের কান্না থামা গলার আওয়াজ শোনা গেল,

লাস নিয়ে যা আসগর। ভাগাড়ে ফেলিস্‌ নি, গোর দিস্‌।
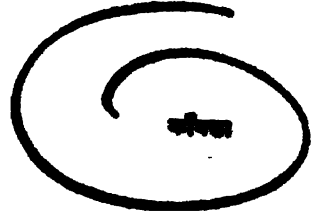
এবার দূরের জন্যে

অরুণ মিত্র

মা'র পা বাড়ানোটা এবার দূরের জন্যে, সে-কথা মাটিই ব'লে দেয়, সন্ধের ছায়াও। অমনি রঙবেরঙের ছবিগুলো ফুরোয়, মুখখানা নিবে আসে। ভোর থেকে রাত্তির পর্যন্ত একটা গান ছিল যা শুনতে শুনতে ঘুমোনো, শুনতে শুনতে জাগা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাজার বার শোনা। নানান্ পর্দায় একই শব্দের ওঠানামা, আলো আঁধারির বুলা। সেই গানটা মা সঙ্গে নিয়ে চ'লে যাবে। এঘর ওঘর চলতে ফিরতে ঘুঙুরের মতো বুলা। সেই নাচটা মা সঙ্গে নিয়ে চ'লে যাবে। চারদিকে অনবরত জল ঝরাবার বাতাস।

কিন্তু মা'র চ'লে যাওয়ার মধ্যে কোনো জাদু আছে। পা এগুতেই ঘরে ফেরবার ঢোলক বাজে। গা-শিউরোনো ঝোপগুলো দাউ-দাউ পুড়তে শুরু করে। এক ঝলকানিতে সকালটা দেখা যায়। সেখান থেকে পরিষ্কার গলা এসে পোঁছয় বুলা। নিবন্ত মুখখানা অন্য এক দিনের ভেতরে ফোটে। দূরে সরাবার বিশ্রী হাতগুলো সেখানে নেই, গরগরানি নেই। সেখানে হাসিতে টইটম্বুর মা। এখন মোটেই কান্না নয়, কেবল বিভোর হ'য়ে থাকা।

বাইশে শ্রাবণ—নির্মলার জন্য

হরপ্রসাদ মিত্র

ঢেউ লাগুক, ঢেউ লাগুক,
হালকা যার চাল
সহজে কে সে সরাতে পারে সমূহ জঞ্জাল?
মনের সেই নারীর নাম
রেখেছি 'নির্মলা'।
সময় নামে নদীতে তার অবগাহন-কলা
দেখেছি, আর ডেকেছি সেই নির্লাজ সরলাকে।
এ কালবেলা কাটাতে হলে
তাকেই চাই,
তাকে।

জোয়ার নেই, কী তোলপাড়,
গোমড়া মুখে মেঘ,
এ কী ভয়াল প্রেতের চোখ,
হাওয়াও নির্বেগ।
ধনপতির আর্তনাদ, শ্রমপতির রোষ—
উজাড় হয় ক্ষেতখামার
কারখানার ঝাঁপ
বন্ধ হয় -
এবং তবে
কী তারপর - এই
প্রশ্ন জাগে মনে-মনেই, বন্ধ হয় গান।
কে দেবে তবে কালের রথে রশিতে ঠিক টান?

হলধরের মাতলামি ও বলরামের বল
'আনবে ঢেউ' বলেছে কেউ,
কেউ বা বলে 'না'।
ঘুরবে চাকা কবির ফুঁয়ে, নামুক করুণা।
বলেছে কেউ 'সকাল হোলো', কেউ বা বলে 'না'।

একা আমার কাটে না দিন
দলে হাঁটার ছল
খুঁজিনি, তাই সঙ্গীহীন,—বুঝি-বা দুর্বল।

ঢেউ লাগ্‌ক, ঢেউ লাগ্‌ক, সময়-জলে-জলে
    দ্‌রে টান্‌ক,—তীর-ধন্‌ক ইচ্ছে আর কাজ।
    দ্‌রে মিল্‌ক তীর-ধন্‌ক হোক্‌ দ্‌রের প্রেম।
    লক্ষ্যভেদে উপায়ভেদ ঘটলে—কী হারায়
        তুমিও জানো, আমিও জানি, অনেকে জানে না।
'সকাল হোলো' বলেছে কেউ, কেউ বা বলে 'না'।

    সময় নামে নদী-ই যার হামাম,
                                সেই মন
    নিজেই তার শোধন জানে—কী বলো তুমি মন?
    মনের এক নারীর নাম রেখেছি 'নির্মলা'
    একা-একাই দেখি কী তার অবগাহন-কলা!

উত্তর বসন্ত

আবদুল কাদির

বনবধূ শুনিয়াছে কোকিলের বিদায়-কূজন—
ফুলেরা ঝরিয়া গেছে শূন্য করি' বাসন্তী-দুকূল;
কর্ণ-দুল হরে আর নাহি শোভে শালের মুকুল;
মেখলা পড়েছে খুলে,' নাহি বাজে নূপুরে নিক্কণ॥

জ্যোৎস্না-বারাণসী খুলি' চৈত্র নিশি পরে নীলাম্বরী,
অর্ক-কুণ্ডে অবগাহি' রৌদ্র-কান্তি আসিছে নিদাঘ।
বৈশাখী-নিঃশ্বাসে শেষ মধুচক্র ফাগুনের ফাগ,
আনন্দের তীর্থে বাজে ক্লান্ত সুরে বিদায়-বাঁশরী॥

কল্পনার মণিহারে সাজায়েছি প্রিয়ার প্রতিমা,
ওষ্ঠাধরে ফুটায়েছি স্বপনের রক্ত পারিজাত।
বাসনার শিখা হায়, ধূমম্লান না পোহাতে রাত,
মদনের ভস্মতলে সমাহিত মর্ত্যের মহিমা॥

মিলনের নাটমঞ্চে নামিল কি সুচির বিরহ?
রূপোন্মাদ প্রেমিকের জীবন সে দুরন্ত দুঃসহ॥

আমন্ত্রণ পেয়েছিনু বসন্তের পূর্ণিমা-বাসরে,
বাঁশীখানি হাতে লয়ে এসেছিনু চুপে সন্তর্পণে।
স্বর্ণ-কুরঙ্গিণী ছোটে স্বপ্ন-ধূলি ছিটাইয়া মনে,
কস্তুরী-সুবাসে তারি রচিলাম সঙ্গীত আসরে।

হাসি যেন জ্যোৎস্না-জ্বালা, অশ্রু যেন কুসুমে শিশির,
সে সৌন্দর্যে ফুটায়েছি দুচারিটি প্রণয়ের শ্লোক।
বাহুলগ্না প্রিয়া মোর গান শুনি' ছলছল-চোখ,
সহসা অঞ্চলে তার আন্দোলিত ঊর্মির নিশির॥

এবারের মতো শেষ যৌবনের আনন্দ-উৎসব।—
বৈশাখী-দাহনে যবে বেদনায় ফুটিবে কদম,

উল্লাসে ময়ূরী পুনঃ মেঘ হেরি' মেলিবে পেখম,
সেদিন আসিব ফিরে' ভুঞ্জিবারে আত্মার আসব॥

বাসন্তী বিহার স্মরি' কামনার উন্মাদিনী নদী
জীবনের খর-তটে তরঙ্গিবে মরণ অবধি॥

ভারতীয় ঐতিহ্য

হুমায়ুন কবির

ঐক্য এবং ধারাবাহিকতার জন্য ভারতবাসীর যে অনুরাগ, ভারতীয় চারুকলার বিভিন্ন প্রকাশেও তার স্পষ্ট পরিচয় মেলে। বিবিধকে একত্রিত করেই ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তার ফলে ধর্মজগতে ভারতীয় সাধক বহির্জগতের প্রকাশ হতে নিজেকে নিবৃত্ত করে অধ্যাত্মলোকে ব্যক্তি ও ব্রহ্মের একাত্মবোধের মধ্যে চরম সত্যের সন্ধান খুঁজেছেন। এই একাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাঁরা আবার সংসারের স্রোতে মন নিয়োগ করেছেন, তাঁদের কাছে দৃশ্যস্পর্শশব্দময় জগতের বিচিত্র অভিব্যক্তি একটি চরম ঐক্যের সাক্ষাৎ প্রকাশ হিসাবে ধরা দিয়েছে। শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপত্যই এই অনুভূতি সবচেয়ে বেশী সক্রিয়, বস্তুর বিরাট সমাবেশের মধ্যে শিল্পীর ঐক্যবোধ সেখানে বাস্তব রূপ নিয়েছে। ভারতীয় মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে দেয়ালে প্রাচীরে তাই প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি। সেখানে ইঞ্চিপরিমাণ শূন্য স্থানের পরিচয় মেলে না। অলঙ্কার ও আভরণের এ সীমাহীন ঐশ্বর্যের মধ্যে অভিজ্ঞতার জগতের অনন্তঃ প্রকাশের ইঙ্গিত মেলে এবং তাদের সমাবেশে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে নিগূঢ় ঐক্য, তার কথা মনে করিয়ে দেয়। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে গর্ভগৃহে কিন্তু এ ঐশ্বর্য বা সমারোহের স্থান নেই, সেখানে নিস্পন্দ অন্ধকারে স্বল্পপরিসর কক্ষে ব্যক্তিকে এককভাবে সৃষ্টির অনন্ত রহস্যের সামনে মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়।

হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন প্রধানত দক্ষিণ ভারতেই মেলে। তার অর্থ এ নয় যে দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যে বাইরের প্রভাব পড়েনি অথবা দক্ষিণ ভারতীয় বলে কোন একটি বিশেষ বা নির্দিষ্ট স্থাপত্যধারার পরিচয় মিলবে। ভারতবর্ষের একান্ত দক্ষিণে একদিকে চীনের প্রভাবের চিহ্ন রয়েছে অন্যদিকে আরব স্থাপত্যের সংকেতও অস্বীকার করা চলে না। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন যুগে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মধ্যেও তারতম্যের পরিচয় মেলে। কঠিন গ্রানাইট পাথরে যাঁরা নিজেদের প্রতিভার বিকাশ খুঁজেছেন, অপেক্ষাকৃত নমনীয় চুনমেশানো বা বালীময় পাথরের শিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য স্পষ্ট হতে বাধ্য। তবু বলা চলে যে শৈলীর বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন ধরনের উপাদানের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ঐক্যের পরিচয় মেলে। উত্তর ভারতের স্থাপত্যের বৈচিত্র্য ও ঐক্য সম্বন্ধেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। সেখানেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে স্থাপত্য-শিল্পের নতুন নতুন বিকাশ হয়েছে কিন্তু শত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও উত্তর ভারতের স্থাপত্যে যে নিগূঢ় ঐক্য, তার প্রকাশে তা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্থাপত্যের অভিব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র। মধ্যযুগে উত্তর ভারতে যে সমস্ত প্রাসাদ দুর্গ এবং সমাধি রচিত হয়েছে, পারস্য এবং তুর্ক প্রভাব থেকে তারা মুক্ত নয়। কিন্তু বাইরের সমস্ত প্রভাবকে আত্মসাৎ করে তারা ভারতীয় প্রতিভার প্রতীক এবং পারস্য বা তুর্ক স্থাপত্যের সঙ্গে সমধর্মী হয়েও তারা স্বতন্ত্র। গ্রীক ও আসিরীয় প্রভাব যেমন এককালে প্রাচীন ভারতের স্থপতির সামনে নতুন আদর্শ স্থাপন করে তাদের নবসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সেই নতুন

সৃষ্টির মধ্যে আসিরীয় বা ইউনানী প্রভাব এক নতুন ভারতীয় রূপ পেয়েছে, মধ্যযুগেও ঠিক সেই একইভাবে বহিরাগত প্রভাবকে আত্মসাৎ করে এক নতুন ভারতীয় স্থাপত্যশৈলী গড়ে উঠেছে। তাই পারসিক বা তুর্ক প্রভাব সত্ত্বেও মধ্যযুগের ভারতীয় স্থাপত্য ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই নিজের প্রাণশক্তি আহরণ করেছে।

এটা লক্ষণীয় যে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে সরল রেখারই প্রাধান্য। যত কারুকার্য, যত রূপবৈচিত্র্য, সবই রেখা এবং কোণভিত্তিক। গম্বুজ বা খিলানে যেখানে বৃত্তের ব্যবহার, তার পরিচয় দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যে নেই বললেই চলে। ভাস্কর্যের ব্যাপক ব্যবহারে অলঙ্করণের আতিশয্য এই মন্দির স্থাপত্যের আর একটি বিশেষত্ব। নিরেট পাথর খুঁদে এক একটি স্তম্ভ রচিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি স্তম্ভে নানা রকমের কারুকার্য। ভাস্করের কল্পনা এত শক্তিশালী যে স্তম্ভগুলির প্রত্যেকটির রূপসজ্জা স্বতন্ত্র, কোন মূর্তি বা জ্যামিতিক রেখাঙ্কনের পুনরাবৃত্তির দৃষ্টান্ত বিরল। কাঞ্জিভরমের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরে প্রায় একসহস্র স্তম্ভ রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটি স্তম্ভ আকৃতি এবং অলঙ্করণে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সিংহাচলমের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দিরেও স্তম্ভগুলির বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে হয় যে রূপ এবং অলঙ্করণের প্রাচুর্যে আমাদের মনকে অভিভূত করাই এ মন্দিরস্থাপত্যে স্থপতির লক্ষ্য।

দক্ষিণ ভারতের মন্দির স্থাপত্যের সঙ্গে উত্তর ভারতের স্থাপত্যের পার্থক্য এত প্রবল যে বিশেষজ্ঞের কথা ছেড়ে দিলেও সাধারণ মানুষের চোখেও তা সহজে ধরা পড়ে। দক্ষিণ ভারতে মন্দিরকে কেন্দ্র করেই স্থাপত্য গড়ে উঠেছে। উত্তর ভারতে ধর্মজীবনের আহ্বানের সঙ্গে সামাজিক ও রাজসিক জীবনের আহ্বানও প্রবলভাবে আমাদের মনকে নাড়া দেয়। ধর্মভিত্তিক স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে অনেক প্রভেদ। মসজিদ এবং মন্দিরের স্থাপত্যদৃষ্টি স্বতন্ত্র কিন্তু উত্তর ভারতে মন্দিরের স্থাপত্যেও সরলরেখার প্রাধান্য ব্যাহত হয়েছে, বৃত্ত এবং খিলানের সমন্বয়ে স্থপতি যে পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে উত্তর ভারতের মন্দির দক্ষিণ ভারতের মন্দির থেকে স্বতন্ত্র। একথা সত্য যে গম্বুজের ব্যবহার মন্দিরে প্রায় নেই কিন্তু মন্দিরের চূড়া এবং স্তম্ভগুলিতে দক্ষিণ ভারতের দৃঢ় সরলরেখার ব্যতিক্রম সহজেই চোখে পড়ে। যাঁরা কেবল উত্তর ভারতের স্থাপত্যের সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের চোখে মন্দির এবং মসজিদের পার্থক্যই যে বড় হয়ে ধরা দেবে এটা বোধ হয় স্বাভাবিক কিন্তু যাঁরা কেবল দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের অনেকের মনে হয় যে উত্তর ভারতের সকল স্থাপত্যের মধ্যেই মসজিদের রূপায়ণের আভাস রয়েছে। জনৈক ফরাসী বিশেষজ্ঞ কয়েক বৎসর দক্ষিণ ভারতে কাটিয়ে প্রথম যখন উত্তর ভারতে এলেন, তখন তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে উত্তর ভারতে হিন্দু মন্দিরও কি মসজিদের আদর্শে গঠিত হয়েছে? উত্তর ভারতের মন্দিরের এ রূপান্তরে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কারণ উত্তর ভারতের মসজিদেও মন্দিরের আভাস মিলবে। বস্তুতপক্ষে উত্তর ভারতে স্থাপত্যের যেগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, মন্দির হোক আর মসজিদ হোক, প্রাসাদ হোক অথবা সমাধি হোক, তাদের সকলের মধ্যেই ভারতবর্ষের সনাতন ও ভারতবর্ষের বহিরাগত এই দুই গঠনশৈলীর সমাবেশ ও সমন্বয়ের পরিচয় মেলে।

উত্তর ভারতের স্থাপত্যে যে ভাস্কর্যের প্রাচুর্য নেই, তাও আকস্মিক নয়। বস্তুপুঞ্জের সমাবেশ এবং ভারসাম্য ও বিভিন্ন ধরনের রেখার সমন্বয়ই উত্তর ভারতের স্থপতির লক্ষ্য। বিরাট জড়পিণ্ডকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে তাদের বিশালতার চেয়ে তাদের সমন্বয়ই

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাজমহলের প্রশস্ত দালানের ঠিক নীচে দাঁড়ালে তার বিশালতা উপলব্ধি হয়, একটু দূরে গেলেই মনে হয় সমস্ত ইমারত যেন হাওয়ায় ভাসছে। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যে বৈচিত্র্য ও অলঙ্করণের শেষ নেই, উত্তর ভারতের স্থাপত্যে কেন্দ্রীয় একটি ধারণাকে ভিত্তি করেই শিল্পের সার্থকতা। সৌধের সামগ্রিক বিকাশের আভ্যন্তরীণ সমন্বয়েই স্থপতির কৃতিত্ব। বিভিন্ন অংশের কারুকার্য ও অলঙ্করণের বৈচিত্র্য তার প্রধান লক্ষ্য নয়। মন্দির স্থাপত্যেও যে সমন্বয়ের এ আদর্শ উত্তর ভারতে স্বীকৃত হয়েছিল, তৎকালীন হিন্দুমানসের জীবনশক্তি ও গ্রহণশীলতার এই বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে বহিরাগত প্রভাবকে স্বীকার করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণতঃ তাকে আমল দেয় না। উত্তর ভারতের স্থপতি যে মন্দির রচনায় ক্ষেত্রেও বহিরাগত মুসলীম দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শকে স্বীকার করে তার বিভিন্ন উপাদান নিজের প্রয়োজনে নিজের ইচ্ছামত প্রয়োগ করেছেন, ভারতীয় মনীষার প্রাণশক্তি ও গ্রহণশীলতার এত বড় প্রমাণ বোধ হয় অভিজ্ঞতার অন্য কোন ক্ষেত্রে মিলবে না।

সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রেই প্রভাব একতরফা হয় না, হতে পারে না। বহিরাগত মুসলীম শৈলীর বিভিন্ন প্রকাশ ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পআদর্শকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসে মুসলমান শিল্পরীতিও এদেশে নতুন নতুন রূপ নিয়েছে। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে পাঠান মোগল রাজাবাদশা যেসব ইমারত তৈরী করেছেন, তাদের নির্মাণ-পদ্ধতি এবং বিভিন্ন অবয়বে হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন সুস্পষ্ট। প্রাক পাঠান যুগের ভারতবর্ষে হিন্দুস্থপতিরা পদ্ম ও কলসের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন, মধ্যযুগের ভারতবর্ষে মুসলমানের কবরে পর্যন্ত তাদের আবির্ভাব ঘটেছে। অনাড়ম্বর শক্তি ও দার্ঢ্য প্রাথমিক যুগের মুসলমান স্থাপত্যের বিশেষ লক্ষণ, রেখার সঙ্গে রেখার মিলনে সেখানে যে সৌষ্ঠবের সৃষ্টি, তার মধ্যে অনাবশ্যক অলংকারের স্থান নেই। মানুষের মন খানিকটা প্রাচুর্য খানিকটা আভরণ প্রায় সর্বত্রই চায়। বহুক্ষেত্রে জ্যামিতিক নকসা অথবা অক্ষরলিপির উৎকর্ষ মুসলমান স্থাপত্যে সে চাহিদা পূর্ণ করেছে। উত্তর ভারতের স্থাপত্যে মুসলিম শিল্পাদর্শের প্রকৃতি ধীরে ধীরে আমূল বদলে গেল, হিন্দু এবং মুসলিমশৈলীর সমন্বয়ে যে নতুন শিল্পসৃষ্টি গড়ে উঠল তাতে মুসলমান স্থাপত্যের কঠিন দার্ঢ্য নমনীয় হয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু স্থাপত্যের যে প্রাচুর্যবিলাস তা নতুন সংযমের বাঁধনে নিয়ন্ত্রিত হল। সমন্বয় ও সমগ্ররূপের উপর সারাসেনিক স্থাপত্যের যে ঝোঁক তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের ঐশ্বর্য ও অলংকারপ্রিয়তার মিলনে এদেশে স্থাপত্যের এক অপরূপ বিকাশ দেখা দিল। যাঁরা খিলজী বা তুগলক মসজিদ ও কবরের সঙ্গে পরবর্তী যুগের মোগল মসজিদ ও কবরের তুলনা করেছেন, তাঁরা একথা সহজেই স্বীকার করবেন। পরিবর্তনের গতি যে কত দ্রুত, দিল্লীর পুরানা কিল্লায় শের শা'র মসজিদের গম্বুজের সঙ্গে মাত্র কয়েক বৎসর পরে নির্মিত হুমায়ুনের কবরের গম্বুজের তুলনা করলেই কারো মনে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিভিন্ন শৈলীর সমন্বয় যেখানে সফল, সেখানে তাজমহলের মতন অনবদ্যসৃষ্টিতে স্থপতির প্রতিভা সার্থক। বহুক্ষেত্রে কিন্তু এ সমন্বয় পরিপূর্ণ হয়নি, ফলে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে এমন বহু স্থাপত্যের নিদর্শন মেলে যেখানে একটি শৈলী অন্য শৈলীর উপর সজ্ঞানে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে। শিল্পে কিন্তু সজ্ঞান চেষ্টায় সার্থকতা আসে না, তাই এ ধরনের প্রয়াস আমাদের বুদ্ধি ও চেতনাকে স্পর্শ করলেও সমগ্র হৃদয় মনকে নাড়া দেয় না। ফতেহপুর সিক্রীতে হিন্দু স্থাপত্যের উপর সজ্ঞান মুসলমান রচনারীতি

প্রয়োগ করার চেষ্টা অথবা ইতমদদৌলাতে হিন্দুস্থাপত্যের আলঙ্কারিক প্রাচুর্যে মুসলমান স্থাপত্যের সহজশক্তির লোপ তাই আমাদিগকে বিস্মিত করে কিন্তু শ্রেষ্ঠশিল্পে দর্শকের যে আত্মঅবলুপ্তি তার অবকাশ দেয় না।

শিল্পকলার অভিব্যক্তির মধ্যেই ব্যক্তির আত্মা অমরত্ব লাভ করে। রাজনৈতিক পটভূমি নিত্য পরিবর্তনশীল এবং সে অদলবদলের পালা বহুক্ষেত্রেই মানুষের মনে কোন স্থায়ী দাগ কাটে না। দর্শনেও অনেক সময় বিভিন্ন খণ্ডিত অংশের দাবী সমূহকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ফলে বুদ্ধির গোলকধাঁধায় মানুষের আত্মা আত্মসম্বিত হারিয়ে ফেলে। শিল্প-কলার ক্ষেত্রে বাহুল্য ও অবান্তর বেশীদিন টেকে না, শাশ্বত এবং সনাতন তাই জাতির চেতন এবং অবচেতন মানসে স্থায়ীত্ব লাভ করে। শিল্পকলার মধ্যেই ব্যক্তি এবং গোষ্ঠির সত্যিকার পরিচয় মেলে এবং যুগ পরম্পরা বিভিন্ন জাতির স্বরূপ উপলব্ধি করে।

বিভিন্ন শিল্পকলার মধ্যে চিত্রকলার স্থান বিশিষ্ট। দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে চিত্রকলা যেভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠির স্বরূপ প্রকাশ করে, অন্যান্য চারুকলায় তা বোধ হয় সম্ভব নয়। সাহিত্য বাকসর্বস্ব। শব্দের ধ্বনি ছাড়াও তাৎপর্য আছে এবং এই তাৎপর্য প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সমাজ নির্ভর। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই শব্দার্থেরও বদল হয় এবং তাই এক দেশের ভাষা, এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশের মানুষ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে না। সঙ্গীতে মানুষের আদিম আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপ পায়, তাই তা দেশকালের বাধা অতিক্রম করে কিন্তু সঙ্গীতের অস্থায়ী আবেদন আমাদিগকে আকুল করলেও আমাদের আকুতিকে স্থায়ী রূপ দিতে পারে না। সঙ্গীত তাই মনকে নাড়া দেয় কিন্তু সেই অনির্বচনীয় উন্মাদনাকে অভিজ্ঞতার স্থায়ী সম্পদ করা চলে না। জাতির চরিত্রের ছায়া হয়তো সঙ্গীতেও মেলে কিন্তু সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা সুনির্দিষ্ট নয় বলে একদিকে যেমন তার আবেদন দূরপ্রসারী অন্যদিকে তার প্রকাশভঙ্গীতে জাতির বৈশিষ্ট্যের স্থান পরিমিত।

চিত্রকলায় প্রত্যয়ের স্থান গৌণ বলে দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করা সহজ, মানুষের আদিম বৃত্তি সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার সুনির্দিষ্ট প্রকাশে বিশেষ দেশ বা কালের বিশেষ ভঙ্গী ধরা দেয় বলে চিত্রকলার মধ্যে জাতির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা সম্ভব। পারসিক চিত্রকলার স্বল্পায়তন পরিসরে যে নিখুঁত কারুকার্য তার সঙ্গে চৈনিক চিত্রকলার অনাড়ম্বর নিরাভরণ শৈলীর তুলনা করলে দুইটি সমৃদ্ধ সভ্যতার সাদৃশ্য ও বৈপরিত্য সহজেই ধরা পড়ে। ওলন্দাজ চিত্রকরের দৃঢ় ও সুস্পষ্ট অঙ্কনরীতি ও বিচিত্র এবং সমৃদ্ধ বর্ণবিন্যাসের মধ্যে সে যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীর আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠেছে। সাম্প্রতিক ইয়োরোপিয় চিত্রকলায় বর্তমান যুগের প্রাশ্চাত্যের মানুষের অনিশ্চয়তা ও সন্দেহ, আত্মবিশ্বাস ও লক্ষ্যহীন জিজ্ঞাসা ঠিক তেমনি স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। বোধ হয় চারুকলার অন্য কোন প্রকাশে বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন জাতির মনোভাব এত সুস্পষ্ট-ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে ধরা দেয় না। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন যুগে চিত্রকলার বিভিন্ন অভিব্যক্তি যুগমানসকে আমাদের চোখে মূর্ত করে তোলে।

আদিম কালের ভারতবর্ষে চিত্রকলার যে বিকাশ, তার দীর্ঘ ইতিহাস আজো আমাদের অজানা বললেই চলে। আবহাওয়ায় চিত্রকলাকে রক্ষা করা এমনিতেই কঠিন, তার উপর যুগে যুগে যে সমস্ত অভিযাত্রী গত তিন-চার হাজার বৎসর ধরে ভারতবর্ষে এসেছে, তারাও বহুক্ষেত্রে চিত্রকলা লুণ্ঠন বা নষ্ট করেছে। হয়তো আবহাওয়া এবং অভিযাত্রীদের দৌরাত্ম [illegible] তাই অজন্তার গুহার অন্ধকারে সে যুগের চিত্রকর অমর শিল্পের

নমুনা রেখে গেছেন। বহুদিন তাদের কথা পৃথিবী জানে নি কিন্তু যেদিন তাদের পুনরাবিষ্কার হল, সেদিন মৃত্যুহীন শিল্পকলার দেশকালাতীত আবির্ভাব সমস্ত পৃথিবীকে বিস্মিত করেছে। জীবনের বিচিত্র প্রকাশের যে ঐশ্বর্যময় প্রকাশ এ চিত্রকলায় মেলে, তার সামনে আমাদের বিচারবুদ্ধি হার মানে। গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষে সূর্য যেভাবে আলো এবং তাপ বিকীরণ করে, তাতে আলোর প্রাচুর্যে বিশিষ্ট বস্তুর সত্তা এক বিরাট প্রকাশের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। কুয়াসায় যেমন বিভিন্ন দৃশ্যমান জিনিষের উপর পর্দা নেমে আসে, মনে হয় আলোর আতিশয্যেও ঠিক সেই ধরনের অনুভূতি আমাদের মনে জাগে। অজন্তার যে প্রাচীরচিত্র, বহুযুগের বহু মানুষের অভিজ্ঞতা সেখানে সঞ্চিত ও সঞ্জীবিত, সেই ঐশ্বর্যের মধ্যেও ভারতবর্ষের বিচিত্রকে সম্মিলিত করবার সমন্বয়ধর্মী প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট।

অজন্তার গুহার প্রাচীরে এবং ছাদে যে সমস্ত ছবি, তাদের বিষয় কখনো মানুষের সাংসারিক জীবন থেকে, কখনো সন্ন্যাসী শ্রমণের কার্যকলাপ থেকে নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনের যেসব ছবি সেখানে রয়েছে, তাদের মধ্যে জীবনের আনন্দ ও উৎসাহ দেদীপ্যমান, ক্ষমতা ও খ্যাতি, যৌবন ও প্রেমের উদ্বেলতরঙ্গ চিত্রকলায় রেখায় ও বর্ণে অমর রূপ পেয়েছে। আধ্যাত্মিক জীবনের ছবিগুলির দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেখানে ধ্যানধারণার নিস্তাপ ও শান্ত জীবনধারা সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রতীক হিসাবে আমাদের আকর্ষণ করে, ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের মধ্যে ব্যক্তি মুক্তি খোঁজে। অজন্তার চিত্র-শিল্পীরা কিন্তু জীবনের ভোগ এবং ত্যাগের দিককে স্বতন্ত্র করে দেখেন নি, বরং তাদের অন্তর্নিহিত ঐক্যকেই বারবার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যে এবং ভাস্কর্যে জীবনের যে সমৃদ্ধ প্রকাশ, অজন্তার চিত্রশিল্পেও প্রাণশক্তির সেই ঐশ্বর্য এবং আবেগ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত ছবিগুলিতে বহুব্যক্তির সমারোহ, সে জন-স্রোতের মধ্যে নরনারী বালক বালিকার সংখ্যা ও সমাবেশ আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও অভিভূত করে। যুগ যুগ ধরে জীবনের যে ধারা, তার সীমাহীন প্রকাশকে শিল্পরীতির ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যের মাধ্যমে রূপ দেবার সাধনায় শিল্পী উদ্‌গ্রীব। এ অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও শিল্পীর মমত্ববোধ ও অন্তর্লীন সংহতি শক্তি লোপ পায় নি। শিল্পীর বলিষ্ঠ কল্পনায় নশ্বর ও শাশ্বত, আদি ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মিলনসূত্রের সন্ধান মেলে। ফলে মানবিক, অতি মানবিক ও বাস্তব যে সমস্ত মূর্তি এই বিস্ময়কর চিত্রাবলীর মধ্যে সমাবিষ্ট, তাদের সকলের মধ্যেই এক আদি ও অনন্ত প্রাণশক্তির স্পন্দন। অজন্তার চিত্র-শিল্পে বর্ণ সমারোহের অভাব নেই কিন্তু তবু এ চিত্রাবলীর পরাকাষ্ঠা প্রধানত রেখার মাধ্যমেই সম্পন্ন। অভিজ্ঞতার অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে ঐক্য নিহিত, দৃশ্যমান জগতে তার এত সার্থক প্রকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও মিলবে কিনা সন্দেহ।

অজন্তার ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের সঙ্গে মোগল এবং রাজপুত স্বল্পায়তন প্রতিচ্ছবির পার্থক্যকে প্রতিদ্বন্দ্ব বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। এ পরিবর্তনকে আকস্মিক বা অকারণ মনে করলে কিন্তু ভুল হবে। বাবর এবং তাঁর বংশধরেরা ইরাণ থেকে যে চিত্রশৈলী এদেশে এনেছিলেন, তা একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। জনতা বা সাধারণ মানুষের প্রতি এ চিত্রকলার অনুরাগ অপ্রবল এবং বহুমানুষ বা বহুজিনিষের সমাবেশ যেখানে রয়েছে, সেখানেই এ চিত্রশৈলীর তার প্রতি বিশেষ আগ্রহ নেই। প্রত্যেকটি ব্যক্তির খুঁটিনাটিকে তীক্ষ্ণ আলোকে প্রকাশ করে এ চিত্রকলা ব্যক্তিকেই মর্যাদা দিতে চেয়েছে, সমাজকে নয়। চেঙ্গিস খাঁ এবং তৈমুরের রাজদরবারে উদ্ভব বলে এ চিত্রকলায় কোমল ভাবপ্রবণতার বিশেষ

স্থান নেই। মধ্য এশিয়ার প্রান্তরের রুক্ষ পৌরুষ ইরাণে এসে খানিকটা শিথিল হয়েছে বটে কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে যে বিদ্রোহের আভাষ, তাকে কখনো পরিত্যাগ করেনি। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এ চিত্রশৈলী স্বভাবতই প্রতিকৃতি অঙ্কনের দিকে ঝুঁকেছে কিন্তু প্রতিকৃতিগুলিতে যে সত্যনিষ্ঠা ও কৌশলের পরিচয় মেলে, তা আজও বিদগ্ধজনকে মুগ্ধ করে।

তুর্ক-ইরাণী প্রতিকৃতি অঙ্কণের রীতি ভারতবর্ষে এসে অনেকখানি বদলেছে। বহিরা-গত চিত্রশৈলীতে পৌরুষের প্রাধান্য, ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই তার প্রকাশ। ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবনদৃষ্টিতে ব্যক্তি বহুক্ষেত্রে গৌণ, সমাজকেই সেখানে বড় করে দেখা হয়েছে। তাই এই দুই বিপরীতধর্মী মনোবৃত্তির সংস্পর্শে মোগল পরবর্তী যুগের ভারতবর্ষে এক নতুন চিত্রশৈলী গড়ে উঠল। অজন্তার প্রাচুর্যের সঙ্গে মিলল তুর্ক-ইরাণী পদ্ধতির সামঞ্জস্য, অবকাশ ও সংযম। প্রাচীন ভারতের চিত্রকলায় যে অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করবার আকুতি, আদর্শের প্রেরণায় দৈনন্দিনকে অতিক্রম করবার সাধনা, তার বদলে মোগল ও রাজপুত চিত্রাঙ্কনে মেলে এক নতুন দরবারী কায়দা ও সৌষ্ঠববোধ। প্রাচীন ভারতের চিত্রকলায় অভিজ্ঞতার অতীত এক চরম সত্তার প্রতি আকুতি চিত্রশিল্পকে সহজ মহিমা দিয়েছে। মধ্য-যুগে মোগল ও রাজপুত চিত্রকলার মহিমার ভিত্তি আত্মপ্রত্যয় ও সংযম। অজন্তার শিল্পের অস্থির উন্মাদনার বদলে মোগল-রাজপুত চিত্রকলায় এক নতুন স্থিতিশীলতার আভাষ। কিন্তু সেই স্থিতির মধ্যেও প্রাচীন উন্মাদনার স্মৃতি একেবারে লোপ পায়নি।

দক্ষিণ ভারতের দ্রুপদী সঙ্গীত প্রতিপদে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরশিল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। সংগঠনের দৃঢ়তা এবং বৈচিত্র্যের বাহুল্য দুটি শিল্পরীতিতেই সমান প্রবল। উত্তর ভারতের সঙ্গীতের কাঠামো দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতের সঙ্গে স্বতন্ত্র নয় কিন্তু তাদের প্রকাশভঙ্গির তফাৎ এত বেশী যে অনেকক্ষেত্রে দুই সঙ্গীত পদ্ধতি একই রাগকে সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত করে। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতের সুদৃঢ় সংগঠনের বদলে উত্তর ভারতের সঙ্গীতে মেলে এক অপরূপ লালিত্য ও সুষমা। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে স্বর ও ব্যঞ্জনার অফুরন্ত প্রকাশ। উত্তর ভারতের সঙ্গীতে অবকাশ ও সামঞ্জস্যের প্রতি অধিকতর ঝোঁক। উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতে স্থাপত্যে ভাস্কর্যে যে পার্থক্য, পৃথিবীর সকল দেশে সকল চারুশিল্পেই তার ইঙ্গিত মেলে। শিল্পকলার একটি ধারায় অলঙ্করণ, প্রাচুর্য এবং ঐশ্বর্যের বিকাশ। অন্যধারায় সারল্য, সংযম ও মিতাচারের প্রাধান্য। রূপায়ণের বৈচিত্র্য ও বিষয়বস্তুর আতিশয্যে একটি ধারা আমাদের অভিভূত করতে চায়, অন্যধারা প্রকাশভঙ্গীর সংযম ও বস্তুর স্বল্পতা দিয়ে আমাদের কল্পনাকে উজ্জীবিত করতে সচেষ্ট। প্রথম ধারা কিছুই গোপন বা উহ্য রাখতে চায় না, সবকিছুকেই প্রকাশ করে অতিরিক্ততাকে উজাড় করে দিতে চায়। অন্য ধারায় যা ব্যক্ত তার চেয়ে অব্যক্তের আবেদনই বেশী এবং ইঙ্গিতে আভাসে আমাদের মনকে দুলিয়ে দিতে চায়। প্রথম শিল্পরীতিতে সিন্ধুকে আয়ত্তের মধ্যে আনবার সাধনা, দ্বিতীয় রীতিতে কেবলমাত্র পশ্চাদপট সৃষ্টি করে কল্পনার স্বাধীন বিচরণই শিল্পসৃষ্টির লক্ষ্য।

দুটি শিল্পরীতিরই প্রয়োজন এবং সার্থকতা রয়েছে। একটি ধারাকে আমরা বলি ধ্রুপদী, অন্যটিকে খেয়ালী বা রোমান্টিক বললে অন্যায় হবে না। দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর যেখানে সমন্বয়, সেখানে শিল্পের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু সকল শিল্পেই কমবেশী দুটি ধারারই পরিচয় মিলবে। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে এই দুটি জীবনদৃষ্টির সংযোগ ও সমন্বয় হয়েছিল বলে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

[ক্রমশঃ]

শব্দের খাঁচায়

।পার্ক স্ট্রীট।

অসীম রায়

সুবোধ ডাক্তার নিভছেন। বাগজোলা ক্যাম্প থেকে ফেরার পর প্রায় পাঁচমাস শেষ হতে চলেছে। বাহির থেকে যে খুব বেশী পরিবর্তন হয়েছে তা ঠাওর করা যায় না। নির্মল তো অনেকসময় বুঝতেই পারে না। কোন কোন দিন ভাবেও যে আরও চার পাঁচটা বছর তার বাবা সকালে থলি হাতে বাজারে বেরোবেন, বিকেলে ডিস্‌পেন্সারীতে বসবেন। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই তাঁর চোখের দুপাশে গভীর কালো ছাপ, কর্কশ শুকনো মুখ, আর তার মাঝখানে বড় বড় চোখে থেকে থেকে স্থির দৃষ্টি নজর এড়ায় না।

আর এই কয়েকমাসে বাপ ছেলের মধ্যে বন্ধনটা যেন আগের চেয়ে দৃঢ় হয়েছে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে যেমন বিদায়ী অতিথির সঙ্গে আলাপ আরও জমে তেমনি হার্টের রুগী হবার পর নির্মলের সঙ্গে তার বাপের যোগাযোগ বেড়েছে। নির্মল অবশ্য তার বাপের ক্ষোভ এবং হতাশা প্রশ্রয় দেয় না। দেশ ভাগ নিয়ে কথা উঠলে নির্মল বরাবর বলে, তা যখন দুটো দেশ হয়েই গেছে তখন তা নিয়ে মাথা চাপড়ে কি লাভ? আগে যেমন হোত সেরকম নিজে আর উত্তেজিত হয় না।

কলেজ করে আড্ডা দিয়ে সন্ধ্যের পর ফিরলে সুবোধ ডাক্তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন তাঁর ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে, 'কিরে, কি ভাবছিস?'

'ভাবছি এই পয়সার টানাটানি' নির্মল লাইব্রেরী থেকে আনা ফিল্মের ওপর একখানা বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলে। সম্প্রতি সহরের সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে বইখানা মার মার করে পড়া হচ্ছে।

'টুইশানি করবি? কোচিং ক্লাস? প্রণব বোসের সঙ্গে স্কুলে পড়তাম। টিউটোরিয়াল হোম খুলেছে। একেবারে গ্যারান্টি। যা পরীক্ষায় আসবে তার তিনভাগ কোয়েশ্চান ছেলেদের মুখস্থ করিয়ে দেবে।'

'ওর মধ্যে আর যাচ্ছি না বাবা,' নির্মল হেসে বললে।

সুবোধ ডাক্তার উদ্বিগ্ন ভাবে বললেন, 'তোর জ্যাঠামণি তোকে কিছু আবার বলে নি তো?'

'না না জ্যাঠামণি কিছু বলে নি। আর বললেই দোষ কি! আমার তো তোমার মতো কোন আদর্শ নেই। পলিটিক্সও বুঝি না। আমি সাধারণ লোক।'

'মানে ওপরচুনিস্ট।'

'ঐ সব শব্দগুলোর মানে আমি বুঝি না। ওগুলো সুব্রতকে বোল, বুঝবে।'

'কারণ সুব্রতর প্রিন্সিপল্‌ আছে, তোর নেই।'

'হয়তো তাই।' নির্মল অন্যমনস্ক ভাবে বলে।

এরপর তর্ক চলে না। সুবোধ ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'যাক, এরকম কিছু ছেলে এখনও আছে। দেশটা একেবারে মরে নি।' তারপর তাঁর ভাইপোর সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করেন, 'সুব্রত কি কোথায় গ্রামে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, বাঁকুড়ায়'। বেশ ছিল কয়েকদিন। গ্রাম থেকে ফিরে আবার সেই। তক্কাতক্কি—

অপচুনিস্ট, রিভিশনিস্ট, রিফরমিস্ট।'

'তর্ক তো হবেই। তার মানে সে চিন্তা করছে।'

'জানি না, আমার মনে হয় আমরা সবাই কথার জালে জড়িয়ে পড়ছি। তুমি, জ্যাঠামণি, সুব্রত, আমাদের কলেজের পান্ডা গৌতম, সবাই।'

'শুধু তুই এর থেকে আলাদা, না? তুই বেশ এদের থেকে আলাদা হয়ে মোড়লি করছিস!'

'হয়তো তাই,' নির্মল ম্লানভাবে হাসে। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে, 'কথা কথা কথা। এই বিপ্লব, ভালবাসা, দেশ, কাল, কমিউনিজম্, যা বল, সব কথার তোড়ে ভেসে চলেছে।'

সুবোধ ডাক্তার ছেলের উত্তেজনায় হেসে ফেলেন। এই উত্তেজনাটা মন্দ লাগে না তাঁর। মাথা নেড়ে বলেন, 'আমি যা শুনেছি, সবটা কথা নয় রে!'

'তা হবে।'...নির্মলের হঠাৎ চোখ পড়ে তার বাবার রাতজাগা চোখ দুটোর ওপর। বলে, 'তোমার খিদেটা এ বেলা একটু হয়েছে? এক কাপ হরলিক্স খাবে?'

'না না, ওসব খাওয়া থাক। কথা বল, কথা বল। কথা হোল এক একটা হাতিয়ার।'

'সুব্রত, গৌতমও তাই বলে।' তারপর একটু হেসে বললে, 'কিন্তু এতরকম কথার হাতিয়ার বেরিয়েছে যে যুদ্ধে কেউ কারুর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। কাটাকাটি হয়ে যায় শুন্যে। শেষপর্যন্ত সবাই হেরে যায়।'

দুই

যতই দিন যাচ্ছে ততই নির্মলের মনে হচ্ছে, আর যাসব তা ফাঁকা আওয়াজ, সত্য কেবল জ্যাঠামণির প্রস্তাব। সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে সেই এক লক্ষ্যে শরণ নেবার জন্যে তার চারপাশের ঘটনা তৈরী হচ্ছে আর সে যেন ভেতরে ভেতরে জানে এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাবে, কেবল নিজের দাম বাড়াবার জন্যে একটু দেরী করছে।

বাস্তবিক কলেজে ইংরেজী সাহিত্য মন দিয়ে পড়ানো ক্রমশই কেবল এক রূপকথার রাজ্যে ঘোরাফেরার মত ঠেকছে। এ রূপকথার ফাঁকি কোনরকমে ঢাকা পড়ছে তাঁদের কাছে যাঁরা সাহিত্যচর্চার নামে একবার বিলেত আমেরিকা ঘুরে আসছেন। এক ফিরিঙ্গি আবহাওয়ায় একাত্মতা বোধ করছেন, কিংবা আর একটু নীচু স্তরে থিসিস হাঁকিয়ে বা কোচিং ক্লাস খুলে ইংরেজী সাহিত্য একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। কিন্তু সাহিত্য যে কথা বলে' ধ্যান করে, রোজকার ভাতডাল থেয়ে বোঝা এবং বোঝানোর ব্যাপার এই বোধের তাগিদ প্রায় অনুপস্থিত থাকায় সংঘবদ্ধ সাহিত্যপাঠ কিংবা চর্চা আসলে সাহিত্য থেকে মানুষের মন অনেক দূরে সরিয়ে দেওয়ার নামান্তর। এলিয়ট রীচার্ডস ইত্যাদি পড়ে কিংবা পড়িয়ে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো শক্তিশালী করার চেষ্টা মন্দ না, কিন্তু তারপর? একটা শক্তিশালী যন্ত্র হাতে তুলে দিয়ে কি লাভ যদি তা কুলুপ-আঁটা থাকে?

নির্মল অনেকবার ভেবেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চর্চা করলে সাহিত্য পাঠ ও চর্চার এই সৌখীন দিকটা কাটানো যায় কি না। কিন্তু এ বিষয়ে সে মন স্থির করে উঠতে পারে নি। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথকে ঋষি-ফিষি বলে এমন এক কেল্লার অবস্থা যে তাঁকে আপনার ভাবতে অসুবিধে হয় পাঠকের। তা ছাড়া দেশ স্বাধীন হবার কিছুকাল আগে থেকে আজ পর্যন্ত

দেশের চেহারাটা এমন পাল্টে গেছে যে নির্মলের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কিংবা রেজাকের ছায়াপথ বাংলাদেশের সাহিত্যে কিংবা মেজাজে আর প্রতিভাত নয়। তিনি যেন বিদ্যাসাগরের মতো এক, কিংবা একলাই একটা উপাখ্যান। তাঁকে নিয়ে সভা করা যায় কিন্তু ক্লান্তি কিংবা নৈরাশ্যের অন্ধকার থেকে মুখ ফেরাতে তিনি আর সাহায্য করেন না। কয়েকটা গান মন্দ লাগে না এই পর্যন্ত। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের লেখা যেন তার জ্যাঠামণির আমেনরী ভাষণের মতো, গৌতমের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মতো, অথবা তার বাবার হতাশা আর উদ্দীপনার তাড়নায় বক্তৃতার মতো শব্দের সম্ভার। এ শব্দগুলোর পেছনে মেরুদণ্ডটা কোথায় হারিয়ে গেছে তাই বিরাট শব্দের চেহারাটা প্রকাণ্ড একতাল মাংসের মতো থলথলে কাদা, তাকে চাপড়ে চাপড়ে যেরকম অবয়ব দেবে সেই অবয়বে ঢালা যায়। এই শব্দের অত্যাচার থেকে বিশুদ্ধ সত্তার গর্বে দূরে দাঁড়িয়ে না থেকে সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই বিরাট মাংসের তাল চাপড়ালে কিরকম হয়? তখন তো আর শব্দকে পুনর্জীবিত করার ব্রত মনের পেছনে থাকবে না, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এই পুরনো প্রশ্নের চাপ থাকবে না। এই নঞর্থক দ্রষ্টার বদলে গৌতমের ভাষায় সেও জীবনের শরিক হবে। সেও ভিড়ে যাবে সকলের সঙ্গে প্রাণপণে এই মেরুদণ্ডহীন শব্দের দুনিয়াজোড়া দেহখানা চাপড়ে চাপড়ে আরও ফাঁপানো ফোলানোর জন্যে।

নির্মল গত পাঁচ ছ' মাসে কলেজে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করেছে। সাহিত্য বোঝাব এই ধরণের ডন কুইক্সোটি বাসনা ত্যাগ করায় আজকাল তর তর করে সে পড়িয়ে যায়। এমনকি গৌতমেরও সে প্রিয়পাত্র হয়ে পড়ছে, প্রিন্সিপাল একটু বেশী স্নেহ করছেন, ছাত্রেরা কেউ কেউ বাড়িতে আসতে সুরু করেছে, এবং তার মধ্যে আবার কেউ খপ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেলছে। ডক্টরেট হয়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রীডার' হওয়া যায় কি না এ ধরণের ইচ্ছাও তার মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছে।

আর রীডারই যদি লক্ষ্য তাহলে জ্যাঠামণির প্রস্তাবমতো পাবলিসিটি ফার্মে নয় কেন? দ্বিতীয়টাতে আরও অনেক বেশী পয়সা। এ ব্যাপারে নির্মলের মস্তিষ্ক কাজ করে স্বাধীনতাপরবর্তী মুনাফাস্ফীত ভারতীয় ব্যবসায়ীর মস্তিষ্কের মতো—কোনটাতে টাকা ঢালব—খবরের কাগজ না সিমেন্ট কারখানা?

তিন

নির্মল,　　　　ঢাকা

কারো মনের ওপর হাত দেওয়া যায় না—একথা লিখেছো কেন? একটু বুঝিয়ে দিও।

তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হোক তা আমি চাইনে কারণ দেখে মন ভরে এমন কিছুই আর আমার মধ্যে নেই। আমাকে একটুও বুঝতে পারলে না। দেখ না যে আমার নিজের কোন ঢং নেই, কোন ভঙ্গী নেই। আমি ইমোশানের দাস, এহেন অবস্থায় আমাকে ভাল লাগে না এটা তো সব সময় খুব স্পষ্ট ছিল তোমার চিঠিতে, কথায়। আমিই স্বয়ং নিজেকে এই বলে ঠকিয়েছি যে তুমি বিদ্রূপ করতে ভালবাসো।

আশ্চর্য, প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বললে আমার ক্ষেত্রে ইংরেজী এসে পড়বেই। বলতে পারো এটা breeding-এর দোষ। আমি কিন্তু নাচার। এদেশে থেকে ইংরেজীর কোন উন্নতি না হোক বাংলাটা দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে। একেবারে পুরোদস্তুর hybrid হয়ে গেলাম। কলকাতায় গিয়ে 'জল' বলতে আপত্তি করি, এখানে 'পানি' বলতে মুখে বাধে। আর দেশভাগের পরে দেশছাড়া ভাবটা আরও তীব্র হয়। ভেতরটা কেবল খচখচায় where do I belong? কোথায়? আজও

তার মীমাংসো হোল না।

একটা অনবরতে sentence এতক্ষণ চোখেই পড়ে নি। তুমি জানতে চাও কোথায় দাঁড়িয়ে আছো। দূর থেকে নিজের মনোভাবের কথা বলেছি, কাছে থেকে দেখলে, তারপরও লিখলাম— এখন একটা বারোয়ারী sentence-এ আমি এই স্পষ্ট প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেব কি করে। বেশ বুঝতে পারছি আমার কাণ্ড থেকে তোমার বিদ্রূপের প্রতি আকর্ষণ আরও বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তোমার বিদ্রূপ বাড়ানো ছাড়া উপায়ান্তর দেখছিনে।

হয়তো তোমার মনে হচ্ছে আমার তোমাকে এ ধরনের ছাড়া ছাড়া চিঠি লেখার কোন মানে হয় না। তবে শুধু বিশেষ ধরনের ভালবাসার ভিত্তিতে আমাদের চিঠি লেখা শুরু হয় নি। আমার দিক থেকে যদি সেই বিশেষ ধরনের ভালবাসার ধারা আরও শুকিয়ে আসে তাতে চিঠি লেখা বন্ধ করবার দরকার হয়েছে বলে আমি ভাবি নি।

আশ্চর্য, গত এক বছরে যা কিছু হয়েছে কেন যেন মনে হয় সব আমার একার লাভ, আমার একার ক্ষতি। তুমি যে কদিনের জন্যে আমাকে জীবনের শিখরে তুলে এনেছিলে তাও, তারপর আমার প্রাণমন যে শুকিয়ে গেল তাও। মনে হয় সব আমার একার। তুমি সব সময় এমন একটা নৈর্ব্যক্তিক সুর বজায় রেখেছিলে, কিংবা আমি crude যে তোমার প্রকাশের ক্ষীণ ধারাকে সকলময় চোখে চোখে রাখতে পারি নি। নিজের আবেগে নিজেকে সেঁকেছি, পুড়িয়েছি।

আগেও তো কম খেয়েছি, সাত আট রাত অন্তর ঘুমিয়েছি। কিন্তু এমন হয় নি। হয়ত এবার পুরোপুরি পাগলামি আমাকে পেয়ে বসবে, নির্মল, তুমি তখন সকলকে বোল, আমি সব সময় এমন ছিলাম না। কিন্তু তুমি কি পারবে বলতে? তুমি তো আমাকে স্বাভাবিক ভাবে হাসতে দেখো নি। তুমি যখন আমার সাহচর্য চেয়েছিলে তখন মনে হয়েছিল মাটিতে আমার একটা স্থান হোল। সেটা হারিয়ে গেল কেন এমন করে? কেমন উৎসাহে ভরে গিয়েছিল মনপ্রাণ। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দে তোমার শক্তমুঠির দৃঢ়তার আভাস পেতাম। আসলে ভুল হয়েছিল। আমি esentially পূর্বকল্পনীয় emotion-এর দাস, তুমি compusure-এর। এই ব্যাপার যদি কিছুর নিষ্পত্তি হোত! আর আমি নিষ্পত্তি চাইওনে। দরকার হলে তুমি তার ব্যবস্থা কোর, আমাকে সহযোগিতা করতে হবে।

আমি তোমাকে disgest-এর drug খাওয়াচ্ছি একটু একটু করে, এতে আমার উল্লাস নেই। I can't help my nature, অথচ আমি খুব ভাল করে জানি তোমার চিঠিতে তোমার চারপাশের লোকজন সম্পর্কে যেরকম বিদ্রূপ করে লেখো, আমাকেও মনে মনে তেমনি একটা টাইপ চরিত্রে দাঁড় করাচ্ছো, হাসছো, করুণা করছো ভগবানের মতো। And to be sure, I hate god for this very reason.

চার

রোজ শেষ রাত্তিরে ঘাম দিয়ে ঘুম ভাঙে সুবোধ ডাক্তারের। শেষ রাত্তির মানে তিনটে। কোনদিন তিনটে, কোনদিন তিনটে-দশ- একেবারে ঠিক বাঁধা নিয়ম। মাথার ওপরে সবচেয়ে উঁচু কাঠিতে ফ্যান ঘুরছে আর নীচে তিনি কুল কুল করে ঘামছেন। টেম্পারেচার নামছে, বোধহয় ছিয়ানব্বই। রাস্তার আলোয় ঘরের ভেতরটা ফর্সা লাগে, পাশে শোয়া প্রমদার চুলের গুছি ওড়ে ফ্যানের হাওয়ায়। এই কি তাঁর পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পরিবেশ? সুবোধ ডাক্তার এ প্রশ্নটা নিজের মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেন।

ঠিক আর একটু পরেই গঙ্গা থেকে জাহাজ ভোঁ দেয় আর কতগুলো চকিত কাক একসঙ্গে কা-কা করে হঠাৎ চুপ করে যায়। নির্মল পাশের ঘরে ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করে ওঠে, প্রমদা অঘোরে ঘুমায়। আর সুবোধ ডাক্তারের ছেলেবেলায় পড়া যুধিষ্ঠিরের সেই বহু পুরণো প্রশ্নটা মনে আসে। সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা কী?—সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা— নিয়ত চারপাশে মৃত্যু দেখেও মানুষ যে মরণশীল এ কথার বিস্মরণ। এ সব চিন্তা তাঁর কোনকালে আসে নি। পরপার নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামান নি।

সুবোধ ডাক্তার হঠাৎ বালিশের নীচে একটা হাত চালিয়ে হাতড়াতে থাকেন। তারপর কি একটা না পেয়ে অবসাদে হাঁফাতে থাকেন। মাথাটা বালিশে হেলিয়ে আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। কানের পাশে ঘাম জমছে টের পান। দুবার মৃদু ঢেকুর তোলেন। গলার কাছে শ্লেষ্মার মতো কি একটা জমে আছে সেটাকে নামাতে কয়েকবার চেষ্টা করেন কিন্তু তা যেন গলা বুক চেপে বসে। উঠে বসেন সুবোধ ডাক্তার। এসবার ভাবেন স্ত্রীকে জাগাবেন কি না। কিন্তু সারাদিন হাঁড়ি হেঁসেল সামলিয়ে, পয়সার অপ্রতুলতার সঙ্গে সমস্তদিন প্রতিযোগিতায় ক্লান্ত প্রমদাকে আর জাগাতে ইচ্ছে করে না। হঠাৎ জানুর নীচে ছোট আয়নাটা ঠেকে। আস্তে আস্তে আয়নাটা তুলে চোখের সামনে ধরেন। আলোনেভানো ঘরেও আশ্চর্য পরিষ্কার বোঝা যায় তাঁর মুখখানা। এ মুখের সঙ্গে মাত্র দশ বছর আগে দেয়ালে টাঙানো ফটোর মুখখানার কোন সাদৃশ্য নেই। নাঃ, এ আর নির্মলের সেই ছুঁচলো দাড়িওয়ালা রিমলেস চশমা-আঁটা কার্ডিয়াক্ স্পেশালিস্টের কম্ম নয়।

আশ্চর্য, শ্লেষ্মাটা নেমে গেছে! সুবোধ ডাক্তার আরামে চোখ বোজেন, বালিশে আলগোছে পিঠ হেলান। তাহলে শ্লেষ্মা সাইকোলজিকাল্ যেমন হাঁপানিটাও সাইকো-লজিকাল, চামড়ার রোগ কেউ কেউ বলছেন আজকাল সাইকোলজিকাল। সুবোধ ডাক্তার পেটটা বাঁ হাতে টিপতে থাকেন। লীভারটা হাতে লাগে, এটাও কি সাইকোলজিকাল?

এই লীভার নিয়েই বেধেছে কার্ডিয়াক্ স্পেশালিস্টের সঙ্গে। লীভার পাঁচ ইঞ্চি বাড়লে ওষুধ দিয়ে সারে না, একথাটা ছুঁচলো দাড়িকে বলাতে সে তাঁকে মডার্ন সায়েন্সের কথা বোঝালে। সুবোধ ডাক্তার আগেকার মতো চেঁচাতে পারেন না, আহত জন্তুর মতো চোখ বড় বড় করে সেই বক্তৃতা শুনেছিলেন।

ভোঁ বাজছে। কাকগুলো ঠিক আগের মতো ডেকে উঠল। গত তিনমাস না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুবোধ-ডাক্তারের এ পৃথিবীর গতানুগতিকতার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ জেগে উঠেছে। সারা জীবন এই গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এসেছেন। যা রোজই ঘটে তা মনে হয়েছে ঘটনা নয়, যা সচরাচর ঘটে না সেইটাই মনে হয়েছে ঘটনা। এখন এই-ভাবে রাতের পর রাতের নৈঃশব্দ্য এবং শব্দের আদান-প্রদানে, অন্ধকার ও আলোর এই সহ-অবস্থানে যা রোজ ঘটে সেইটার জন্যে তিনি উৎসুক হয়ে থাকেন। বস্তুত এখন যদি গঙ্গা থেকে ভোঁ না বাজত, যদি সচকিত কাক ডেকে না উঠত, নির্মল ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় না করত, কিংবা ফ্যানের হাওয়ায় প্রমদার চুলের ছোট ছোট গুছি খাড়া হয়ে না উঠত তাহলে তিনি যেন বঞ্চিত হতেন। এইরকম ছোট ছোট নাটকহীন ঘটনা জুড়ে জুড়েই কি জীবন?

সুব্রত কাল এসেছিল। তাকে দেখে সুবোধ-ডাক্তারের একটু কষ্টই হয়েছে। আগে হয় নি। আগে সুবোধের লক্ষ্য বেশ স্পষ্ট ছিল, এখন ঠিক লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলেও নানারকম বাধাবিপত্তির কথাই সে বললে। তাদের পার্টির ভেতর মনান্তর কি বিশ্রী পর্যায়ে এসেছে। পার্টি হয় তো ভেঙে যেতে পারে এই ধরনের কথা। যতক্ষণ এসেছিল প্রায় সারাক্ষণই বলে গেল। বললে, 'আপনাদের সময় ইংরেজ ছিল, তাই ইংরেজ তাড়ানোই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সেইটাই সবাইকে মেলাত।' সুবোধ-ডাক্তার কিছু বলেন নি, স্পেশালিস্টের কথা, ভাইপোর কথা একভাবেই শুনে গেছেন। কি করে ভাইপোকে বোঝাবেন যে এই ধরনের আইডিয়লজির নামে দল-উপদলের কোন্দল আজীবন দেখে এসেছেন চোখের সামনে, সেই সি. আর. দাশ, জে. এম সেনগুপ্তের সময় থেকে। এখন হয়ত আন্তর্জাতিক কথাবার্তা অনেক এসে যাচ্ছে, কিন্তু কোন্দল মানেই কোন্দল তা স্বাদেশিকতার জন্যেই হোক বা সমাজ-

অন্যের জন্যেই হোক এ কথাটা মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে জলের মতো পরিষ্কার লাগছে তাঁর কাছে।

ঘুমের ঘোরে নির্মল পাশ ফেরে। ছেলের দিকে চেয়ে মৃদু হাসেন সুবোধ ডাক্তার। নির্মল যেন তার পিতার প্রতি আজীবন বীতরাগের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। স্পেশালিস্ট ডাকার কারণও তাই। এই বারে বারে তাঁকে খাবার জন্যে প্রায় উৎপীড়ন করার পেছনেও বোধহয় একই মনোভাব। নির্মল মনে মনে তার জ্যাঠাকে তার বাবার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করে এটা সুবোধডাক্তার টের পান আর সেই জন্যেই এত দেরীতে তাঁকে নিয়ে ছেলের এভাবে পড়াতে তিনি বিরক্ত হন। নির্মল তার কলেজ স্ট্রীটের সান্ধ্য আড্ডাটা ছেড়ে দিয়েছে। বাড়িতে এসেই ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে। টেম্পারেচার নাও, দই খাও, ডাব খাও আর স্পেশালিস্টের ছুঁচলো দাড়ি আর কথাবার্তা তাকেও প্রভাবিত করেছে। সেও বিশ্বাস করছে পাঁচ ইঞ্চি লিভার বাড়লেও খিদে থাকবে, বমি হবে না, সমস্ত কিছু শারীরিক ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ থাকবে আগের মতো। এটা হয় না, হয় না—সুবোধ ডাক্তার হাত আলগা করে আয়নাটা বিছানায় ফেলে দেন।

অনেকক্ষণ আওয়াজ করে মিত্তিরদের বাড়ির সামনে পেট্রোল পাম্প থেকে বাস বেরোয়, বড় রাস্তায় ট্রাম চলার শব্দ আসে। এবার প্রচণ্ড আওয়াজ করতে করতে সরকারী দুধের গাড়িটা চলে যায় পাড়া কাঁপিয়ে, কলতলায় ছর ছর করে জল পড়ার শব্দ আসে। একটু চা পেলে ভাল হত। প্রমদা ভোরের হাওয়ায় কুঁকড়ে মুকড়ে ঘুমোচ্ছে। আবার সুবোধ ডাক্তারের কপালের ওপর ঘাম জমে। চিন্তাশক্তিটা তাঁর চোখের দৃষ্টির মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভোরের আলোয় বিছানার ওপর প্রায় উবু হয়ে বসে থাকা একটা মূর্তির মতো সুবোধ ডাক্তার বসে থাকেন। কানের পাশে লম্বা চুলের গুছিটা ফ্যানের হাওয়ায় একবার ওঠে একবার নামে।

কতক্ষণ পর পাশের বারান্দার দিকে যেতে গিয়ে নির্মল চমকে ওঠে বাপের দিকে চেয়ে। প্রমদা দেবী তখনও ঘুমোচ্ছেন। নির্মল দৌড়ে যায় বাপের কাছে। নিঃশ্বাস এখনও পড়ছে। বাবাকে শুইয়ে দিয়েই সে নীচে দৌড়য় ফোন করতে।

সাড়ে এগারোটায় স্পেশালিস্ট আসেন। হাতে অনেক জরুরী কেস, বললেন তা সত্ত্বেও এসেছেন। রুগীর তখন জ্ঞান ফিরেছে। একটা ইনজেকশান দেওয়া হোল, তার আগে অবশ্য তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে স্টেথিসকোপ দিয়ে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন স্পেশালিস্ট। অবসন্ন প্রমদা দেবীর দিকে চেয়ে বললেন, ভাববেন না, ভাল হয়ে যাবে। এ'র চেয়েও অনেক সীরিয়াস কেস আজকাল ভাল হচ্ছে। একবার মেডিকাল কলেজে ভর্তি করাতে পারলে ভাল হোত।

'যা হবার এখানেই হোক,' প্রমদা দেবী ভয়ে ভয়ে বললেন।

ছোকরা ডাক্তার মধুর হাসলেন, 'ডাক্তারের বাড়িতে এরকম সুপারস্টিশান ঠিক না।' নির্মলের দিকে চেয়ে বললেন।

যখন সিঁড়িতে নামছেন তখন নির্মল কিঞ্চিৎ বিহ্বলভাবেই জিজ্ঞেস করলে, 'কোন ওষুধ বাড়বে না?'

স্পেশালিস্ট আবার হাসলেন। 'ওষুধ?' একটু ভুরু কুঁচকালেন যেন অনধিকার চর্চা হচ্ছে। তারপর নির্মল হয়তো ঠিক ধরতে পারলো না কিন্তু শুনলো অনেকটা এই রকম : আগে কি দিয়েছেন?...পেনাসিরিন?...আচ্ছা এবারে ট্রাই করুন টেনাসিরিন। ওটা আগের প্রেসক্রিপশানেই আছে। একবার ট্রাই করুন।'

'ট্রাই করব?' নির্মল স্বগতোক্তি করলে।

'হ্যাঁ, হাই হাই, হাই এসেল!' ও'র মাঝবার আওয়াজের সঙ্গে উত্তর মিলিয়ে যায়।

পাঁচ

লক্ষ্মীপুর থেকে ফেরার পর সুব্রতর ক্রমশ মনে হতে থাকে বয়স বড্ড বেড়ে গেছে।

লক্ষ্মীপুরের অ্যাগ্রিকালচার অফিসারের 'টেরাস কালটিভেশান' কথার ব্যবহারে তার আপত্তি ছিল কিন্তু যে পার্টির কার্ডে সে তার কৈশোর যৌবন গচ্ছিত রেখেছে সে কার্ডখানা কি আরও অগুনতি বিবাহ-নববর্ষ-বড়দিনের কার্ডের সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে না? তার পার্টিও কি অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির মতো শেষপর্যন্ত কতগুলো ফাঁকা শব্দের সৃষ্টিতে সাহায্য করছে না?

এ ধরনের চিন্তা কিন্তু সুব্রতকে—তার ভাই নির্মলের মতো রাজনীতিবিরোধী করে নি। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে রাজনীতির এই অসংখ্য প্রাণহীন বাক্যজাল থেকে তার পার্টি কোনদিন বেরিয়ে আসবে কিনা সে সম্পর্কে সে সন্দিহান হয়ে পড়ছে। আর তা যদি না হয় তাহলে ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশে সে যে অনেকের মতো এক প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে আসছে সে স্বপ্ন দাঁড়াবে কোথায়? তখন বাঁচতে হবে নির্মলের মতো, কেবল দর্শক হয়ে, এবং শুধু দর্শক হয়ে থাকা যায় না এ দর্শনে বিশ্বাস সুব্রত আজও হারায় নি।

ছেলেরা খুনসুটি করে এ ওর চুল ধরে ঝুলে পড়ে, এমনকি আঙুল কামড়িয়ে দেয়। কিন্তু পরে আবার ভাব হয়। আবার খেলা করে। গত পাঁচ ছ মাসে সুব্রতর পার্টি অন্ত-র্দ্বন্দ্ব ছেলেদের চুলোচুলি কামড়াকামড়িতে পরিণত। ছেলেদের ঝগড়ার সঙ্গে এক জায়গায় পার্থক্য—বড়দের এ ঝগড়া প্রকৃত সমাজতন্ত্রের নামে, মার্কস-এর নামে, কিংবা লেনিনের নামে আত্মসমালোচনা। কিন্তু এই ধরনের অর্ডার দেওয়া আত্মসমালোচনায় কিছু হয় না, বিরোধ বাড়ে। যে দুজন লোক কুড়ি বছর একসঙ্গে পাশাপাশি কাজ করে এসেছে, জেলে গিয়েছে, তারা দুজনেই দুজনকে ভাবে পুলিশের চর, তারা দুজনেই দুজনকে ধিক্কার দেয় অসংখ্য নতুন নতুন কাল্পনিক তিরস্কারে। সে সব তিরস্কার বেশীর ভাগ ইংরেজীতে, এ সব কথা প্রথম প্রথম তীরের মতো গায়ে এসে বেঁধে, তারপর আখছার ব্যবহারে এগুলোর ফলা ভোঁতা হয়ে যায়। আর এই তীরের যে ক্ষত তাতে রক্ত ক্ষরণ হয় না, মন হয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

মীর্জাপুরের মেসে সুব্রতর ডেরায় আজকাল কিছু বিহ্বল লোকজন যাতায়াত করছে। তারা সন্ধেবেলায় তক্তপোষে মুড়িপার্টি করে। তার মধ্যে একজন বর্ষীয়ান প্রেস ফটোগ্রাফার, অধ্যাপক, ছাত্র, ট্রামের বহুদিনের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ভিড় করে। ফটোগ্রাফারটি—যাঁর সম্পর্কে বলা হয় তিনি পার্টির টাকা মেরে দিয়েছেন, এবং যিনি বলেন পার্টি তাঁর সর্বনাশ করেছে--বলেন, 'আর কেন দাদা, দোকান পাট গুটোও। অনেককাল তো হোল। এখনও বয়েস আছে। চাকরী বাকরী করে একটা সংসার পাততে পারবে। আমাদের বয়েস হয়ে গেছে। পড়ে থাকব। পার্টি জোড়া পায়ে লাথি মারবে। আমরা চৌকাঠ আঁকড়ে পড়ে থাকবো। আমাদের তো অন্য গতি নেই। কিন্তু তোমরা কেন দাদা? একটা চাকরী করো। বিয়ে থা করে সংসার করো আর পাঁচজনের মতো। পাঁচ দশটাকা না হয় দিও যে ছেলেটা স্কুলে মাইনে দিতে পাচ্ছে না তাকে। গরীব আত্মীয়দের বিয়েতে না হয় একটু সাহায্য কোর। সে সাহায্যের মানে আছে। তাতে একটা গরীব ছেলে অন্তত পড়তে পারবে। একটা গরীব

মেয়ের বিয়ে টিয়ে হবে। কিন্তু এখানে? কিসের জন্যে এই আত্মত্যাগ বলতে পারো? আমার ছেলেটা টি.বি. হয়ে হাসপাতালে পড়েছিল, কেউ দেখতে গিয়েছিল পার্টি থেকে? যেখানে যাবার সেখানে ঠিক দৌড়বে। পলিটিক্স সব এক দাদা,—মিথ্যে কথাটা যেমন ভাবে চেপে যেতে পারো—এই তো পলিটিক্স?'

'তোমার কথাটা মানতে পারছি না অপূর্বদা।' সুব্রত ম্লান হেসে বলে। 'পথে চললেই পায়ে ধুলো মাখতে হবে।'

'তুমিও এরকম মন ভাঁড়ানো কথা বলছো?' অপূর্ব প্রায় রুখে উঠল।

'দশ বছর আগে এসব কথা মনে হোত না কেন? আজ কেন এগুলো মনে হচ্ছে?'

সুব্রতর প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে গিয়ে অপূর্ব বলে, 'দশ বছর আগে পার্টির মধ্যে এত বদমায়েসী ছিল না।'

'বদমাইস সৎ এইসব লোক নিয়েই মানুষ, এই নিয়েই পার্টি। পার্টির যখন জোর থাকে—যেরকম দশ বছর আগে ছিল—তখন এইসব ঠেলেঠুলে এগিয়ে যায়। আর জোর কমে এলে তখন বদমাইসী বেড়ে যায়। তখন তোমার মতো সবাই আমরা গ্রামুবল করি। পলিটিক্স বাজে বলি।...কোনটা ভাল বলো তো দাদা? পরিবার প্রতিপালন, অনেককে সাধ্যমত একটু সাহায্য করা—এতেই কি দেশ চলবে?'

'দেশের কথা জানি না। অতো দায় আর সহ্য হচ্ছে না ভাই। আমার তোমার চলবে, তাহলেই হোল।'

সুব্রত গরম হয়ে বললে, 'আমার চলবে না। পলিটিক্স ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই, আমি সে অস্তিত্বে বিশ্বেস করি না। পলিটিক্স আমাদের মেরুদণ্ড। সেইজন্যেই পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করেছি। সেইজন্যেই তোমার সঙ্গে কথা বলছি দাদা। এখন কেঁচে গণ্ডুষ করব কেন? কী হয়েছে? পলিটিক্স মানে তো কতগুলো মানুষ নয়—ডাঙ্গে জ্যোতি বোস নাম্বুদ্রিপাদ নয়, স্টালিন ক্রুশ্চভ মাওসে তুং নয়। আমি যা পলিটিক্স বলে ভাবি তাছাড়া আমার দেশ আমার নিজের ভবিষ্যত ভাবতে পারি না।'

'মরো, মরো' অপূর্ব মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলে।

ইংরেজ কবি স্টিফেন স্পেণ্ডার কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষে এসে কলকাতার এক ছোট সভায় বলেছিলেন যে সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষ যে আন্তর্জাতিক জগতে সুনাম কিনেছে তার জন্যে দায়ী তার পররাষ্ট্রনীতি নয়, এদেশের নেতাদের ইংরেজী ভাষার ওপর দখলই এ দেশের সাফল্যের কারণ। বোধহয় কলেজের মাস্টারদের জন্যেই বিশেষভাবে ডাকা কোন সভায় অম্লানবদনে বলেছিলেন স্পেণ্ডার। শুনে নির্মলের গা জ্বলেছিল। কিন্তু পরে সে ভেবে দেখেছে বোধহয় কবির অন্তর্দৃষ্টি থেকেই এ কথা বলা। কারণ সাফল্য কিংবা অসাফল্য যাই হোক স্বাধীনতা পরবর্তী এদেশের অগ্রগতির রথে ইংরেজী ভাষার বিজয়-কেতন। একটি বিদেশী ভাষাকে রপ্ত করার ব্যর্থ চেষ্টায় নিজেদের জীবনযৌবন দান করার আত্মগ্লানির কথা বাদ দিলেও দৈনন্দিন চিন্তার প্যাটার্নে ইংরেজী ভাষা যেন আধখানা অংশই জুড়ে রয়েছে। রাজনীতি কিংবা সমাজচিন্তা কেন, আমাদের রোজকার ওঠাবসায় ইংরেজী কথার কতগুলো ফরমুলার জাল আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নেই? রাজুর চিঠিতে 'গত এক বছরে যা কিছু হয়েছে যেন মনে হয় সব আমার একার লাভ, আমার একার ক্ষতি' এ [illegible] পড়তে পড়তেই নির্মলের গায়ে ইংরেজী কথার একটা আরশোলা ফর ফর করে বসতে

থাকে, আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড।

নির্মলের চিন্তা এভাবে অগ্রসর হয়। 'মেয়েটি যদি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াটা কলকাতায় বসে করতে পারত, যদি চিঠির নিরবয়ব আদানপ্রদানের চেয়েও সেই শেয়ালদার নোংরা হোটেলের আশ্চর্য সন্ধ্যেটার মতো আরও কতগুলো সন্ধ্যে তাদের জীবনে আসতো তাহলে হয়ত সে যা প্রস্তাব করে এসেছে সে প্রস্তাবে রাজু রাজী হোত। তাতে কী হোত সে জানে না। মাঝে মাঝে মনে হয় বরং এই ভাল, এইভাবে স্মরণ ফিকে হয়ে যেতে যেতে শেয়ালদার জবুজবুলে সন্ধ্যেটা ধুয়ে মুছে যাবে। আর যায় সেই আত্মবিশ্বাস, 'সারাজীবন তো সামনে পড়ে আছে' নির্মলের নেই। নির্মল বুঝতে পারছে (আবার একটা ইংরেজী ভাবার আরশোলা ফর ফর করে) একটা ক্রস্‌রোডে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে স্থির করতে হবে সে কোনদিকে যাবে. সারাজীবন তার সামনে পড়ে নেই। কয়েকটা বছরও নেই, বোধহয় কয়েকটা মাস, কিংবা তাও নেই। তাকে স্থির করতে হবে সে কোন পথ নেবে?—রাজুর জন্যে অনিশ্চিত অপেক্ষা, কলেজের দেয়ালে ছারপোকার দাগ, কলেজ স্ট্রীটের আড্ডায় হাই-চাপা আলাপ, কে কাকে ভজিয়ে আমেরিকা কি বিলেত গেল সে কথায় সাময়িক বিমর্ষতা, বাড়ি ফিরে সারাদিন পরিশ্রমে ধোকা হার্ডাগলে মায়ের ঝাঁঝ, এরই মাঝে মাঝে ডনকুইক্সোটি উচ্ছ্বাসে সাহিত্য বোঝানোর চেষ্টায় ছেলেদের টেবিল মচ্‌মচ্‌, জুতো খস্‌ খস্‌, মাঝে মাঝে বালিগঞ্জ প্লেসে জ্যাঠামণির চাপা ভর্ৎসনা। আর আছে দিশী বিদেশী বিদগ্ধ সিনেমার সময় কাটানো (নির্মল এরকম একটা সিনেমা ক্লাবের সভ্য), প্রায় ছেলেবেলা থেকে চট্‌কানো আইজেনস্টাইন গুডভাকিন ইত্যাদি সিনেমা পণ্ডিতদের প্রাণহীন পুজো, অথবা বিদেশী সংবাদপত্র জার্নালে কোন বইকে 'মার কেলাস, দে চাবি' বলায় হুকমুক করে সেই বইখানা জোগাড় করে পড়ার আত্মতৃপ্তি —এই বিরাট বৃত্তের মাঝখানে রাজু কতটুকু বিন্দু?

আর জীবন একটা বাস নয় যে যেখানে খেয়ালখুশি সেই স্টপে নেমে পড়লাম—নির্মল একথাটা ক্রমশ বুঝতে পারছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের কোন গান বিশ বছর আগে যেরকম লেগেছে তিরিশেও তেমনি লাগবে তার কোন মানে নেই, তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লাগে না। দুটি নরনারীর প্রবল আত্মমগ্নতায় পাশাপাশি বসে থাকা আর দু বছর পরে নাও ঘটতে পারে। তার এই জগৎখানাকে রাজু আঁকড়ে ধরে থাকলেও সে আঁকড়ে থাকতে পারবে না, তাকে এ জগত ছেড়ে যেতে হবে। আর বিদায়ের মুহূর্তে মন যেমন ব্যথায় ভরে ওঠে, নির্মলেরও তেমনি তার অতীত থেকে সরে আসতে আসতে বিহ্বলতায় চিত্ত আচ্ছন্ন হয়। মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে পাশের ঘরে অন্ধকারে খাটের ওপর সোজা বসে থাকতে দেখে বাবাকে। বাবা যেমন রোজ অন্ধকারে এ পৃথিবীর কাছ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছেন সেও তেমনি একটু একটু করে বিদায় নিচ্ছে তার বর্তমানের কাছ থেকে।

নির্মল রাজুকে চিঠি লেখে :

তুমি হয়তো বিরক্ত হবে। কিন্তু আমি আরেক বার জানতে চাই আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। তোমার পরীক্ষার পাশের খবর আগের একখানা চিঠিতে লিখেছিলে। এরপর কী করবে? লিখেছো, বিদেশ যাবার ইচ্ছে আছে তোমার, আমার সেরকম ইচ্ছে আছে কি না। আমার আগে ছিল না, এখন হচ্ছে। কিন্তু এই অনিশ্চিত ভাবে আমরা কতদিন থাকব?

তুমি একটু মাথা ঠান্ডা করে উত্তর দিও। আমাকে সেই মতো প্ল্যান করতে হবে। আমি টপ্‌ করে কিছু করতে পারি না। আমাকে প্ল্যান করতে হয়৳ কলকাতা কিংবা ঢাকায় যদি আমরা মিলতে না পারি, তাহলে বিলেতের আকাশের নীচে কি আমরা মিলতে পারব? তোমার শেষ চিঠির হতাশা আমার ভাল লাগে নি। আমাদের মিলনের (বিয়ে কথাটা লিখতে নির্মলের বিশ্রী

লাগল) পথে কী বাধা আর কীভাবে তা দূর করা যায় সেই সম্পর্কে তুমি ঠিক ভাবো নি। তোমাকে আমি তা ভাবতে অনুরোধ করছি।

নির্মল এ চিঠির উত্তর পায় নি। ভেবেছিল বোধহয় রাজুর কাছে চিঠিটা পৌঁছয় নি। কারণ চিঠি ছাড়ার দিন দুয়েক পরেই নির্মল কাগজে পড়ল রাজুর বিখ্যাত খাবার বাড়িতে খানাতল্লাসী হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে সদ্য প্রতিষ্ঠিত মিলিটারী রাজ তাদের অস্তিত্বের কৈফিয়ত হিসেবে এন্তার ধরপাকড় আরম্ভ করেছে। তবে আইনের ইস্পাতের মাঝখানে বে-আইনের কিছুকিছু ফোকরও থেকে যায়। অনেক কাগজপত্তর পুলিশের হাতে পড়লেও কোন ফাঁকে নির্মলের চিঠি রাজুর কাছে ঠিক সময় গিয়েই পড়েছিল। আর চিঠি পড়তে পড়তে রাজুর চোখে সেই বেয়াড়া আলো খেলেছিল। প্ল্যান করার কথায় সে প্রায় সশব্দে হেসে উঠে থমকে যায়। তারপর টপাটপ দুটো স্যারিডন গিলে সটান দৌড় দিল তার বন্ধু ফজলুর বাড়ি। সেখানে যে ধরনের কথায় ফজলু অভ্যস্ত অর্থাৎ পুরুষমাত্রই স্বার্থপর এই রকম আলোচনায় মেতে উঠল। কয়েকদিন ধরে তার ডাক্তার জামাইবাবুর বাড়িতে থেকে দিদির পাঁচ ছটা ছেলেমেয়ের চ্যাঁভ্যাঁ চেঁচামেচির মাঝখানে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু বিশেষ সুবিধে হোল না। তারপর প্রায় মাস দেড়েক লাল ডগডগে লিপস্টিক ঠোঁটে লেবড়ে রেডিও পাকিস্তানে রাজুর চাকরী। সেখানে তাকে নিয়ে এক রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়ে ছোকরা আর 'প্রোগ্রাম অ্যাসিস্টেন্ট'-এর মধ্যে মারামারি বাধবার উপক্রম হবার আগেই সে কাট মারলে। দেশভাগের পর থেকে দেশটা তার কাছে ছোট লাগছে, এখন মিলিটারী শাসন চালু হবার পর থেকে তা যেন এতটুকু হয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকে রক্তের মধ্যে মিশে যাওয়া—এই পূর্ব বাংলার মায়াটে শ্যামলা পরিবেশ তাকে আর ধরে রাখতে পারে না। আর তা ছাড়া নির্মলের সঙ্গে পত্রালাপের মতোই তার চারপাশের পাকিস্তানী যুবসমাজের গণতন্ত্রের জন্যে মাথাকোটা আন্দোলন তার শক্তিসামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তাদের সঙ্গে মানসিক একাত্মতা বোধ করলেও বছরের পর বছর এই অনির্দিষ্ট আন্দোলন, এই মিছিল আর জেল (যে অবস্থার মারফত তার পরিচিত অনেকেই চলেছে) তার কাছে কষ্টকর এবং প্রায় অসহনীয় ঠেকে। রাজুও নির্মলের মতো বিদায় নিতে চায় তার অতীত থেকে। অতীতের জন্যে এত দায় তার পোষাচ্ছে না? রাজু তাই তার পরিচিত কিছু কিছু লোকজনের মতো চায় সমস্যার পাশ কাটিয়ে যেতে। যাতে সম্ভব হয় এই বুকচাপা পরিবেশ ছেড়ে আরও কোন মুক্ত পরিবেশে সহজ ভাবে লোকের সঙ্গে মেলামেশা।

সাত

সেদিন সকালে আটদশজনের বেশী প্রার্থী আসেন নি প্রবোধ সেনের বৈঠকখানায়। প্রবোধবাবু খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা শুনলেন, ইংরেজীতে যাকে সচরাচর বলা হয় সিম্‌প্যাথেটিক্যালি কন্‌সিডার করা। গত কয়েক বছরে এই দেশের কাজের মাঝখানে তিনি বুঝতে পারছেন যে ভগবানের কাছে যেমন ভক্ত, পাব্‌লিক ম্যান-এর কাছে তেমনি প্রার্থী। মাঝে মাঝে বৈঠকখানায় লোক কম এলে হাঁক ছাড়ার বদলে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর শঙ্কা বাড়ে হয়ত তিনি বাড়তি মানুষদের দলে পড়ে যাচ্ছেন।

সেদিন প্রবোধ সেনের এককালীন সহকর্মী কেষ্টনগরের ভবনাথ যখন তাঁকে হিউমার করবার চেষ্টায় নেহরুর ডিসকভারী অফ্‌ ইণ্ডিয়া বইখানির পুরো একখানা পাতা মুখস্ত

বলে যাচ্ছিল তখন ফস্ করে প্রবোধবাবু বলে উঠলেন, 'তোমার ছেলের মেডিকেলের সীট-টা হয়ে যাবে ভব।' লাল চকচকে টাক, সিল্কের চাদর, বিদ্যাসাগরের চটি—জগনাথ সেন মুহূর্তে নেহরু তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বেঁচে থাকো।' তারপর 'তোমার আর সময় নষ্ট করব না' বলে বেরিয়ে গেলেন।

চাপা হাসি খেলে যায় প্রবোধ সেনের মুখে। বলেন, 'ভবটা সেই একই রকম থেকে গেল।' তারপর তার এক বন্ধুপুত্র যে নাকি খুব ব্রিলিয়ান্ট এবং যে তার সরকারী কলেজের চাকরীতে ঝাড়গ্রাম কলেজে বদলির কথা শুনে কাঁদোকাঁদো হয়ে ছুটে এসেছে তার দিকে সস্নেহ দৃষ্টি মেলে বললেন, 'আমরা আর কি করতে পারি বলো। আমাদের কথা কেউ রাখল, কেউ রাখল না। সবই তো চেষ্টা।'

বলে একটা চুরুট ধরিয়ে চুরুটের কৌটো সামনে সরিয়ে দিলেন। ছোকরা সলজ্জভাবে জিভ কাটল। প্রবোধ সেন বললেন, 'সর্বত্র একই ব্যাপার। এসেনসিয়ালি সেই ডিমান্ড আর কন্‌সেপ্ট। মাছের বাজার, চালের বাজার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারিতে ঢুকবার বাজার সব জায়গায় এক ছবি। ইংল্যান্ডেও তাই। আরে কি বলব। ভন্তুকে বেলিওল কলেজে ঢোকাবার জন্যে একেবারে হিমশিম খেয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত আই হ্যাড্ টু অ্যাপ্রোচ্ ইন্দিরা।'

ছোকরার পাশের ভদ্রলোক একজন অনাহারী উকিল। দেশ ভাগের অনেক আগেই পূর্ব বাংলা থেকে চলে এসেছেন সপরিবারে। এখন রেফিউজি সুবাদে ছেলের নামে একটা ট্যাক্সির পারমিটের জন্যে এসেছেন। নিজের কেস্ সম্পর্কে তাঁর যেন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নেই। কেমন গরুচোরের মতো ভয়ে ভয়ে সামনে তাকিয়ে আছেন। সেদিকে অপাঙ্গে চেয়ে প্রবোধবাবু ভবেন গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাইরে কজন?' আজ একবার নির্মলদের বাড়ি

ভবেন বললে, 'পাঁচ সাতজন আছে। একটা টি. বি, দুটো হাউস বিল্ডিং লোন, রতন-বাবুর সেই এক্সটেনশ্যান্, আর সিং এসেছে।

প্রবোধবাবু ভুরু কুঁচকালেন, 'সিং এখানে কেন, অফিসে যেতে বলে দাও। ওসব ঘুষ-টুস আমার এখানে হবে না।' তারপর কি মনে করে বললেন, আস্‌ক হিম্ টু কাম্।

লম্বা ছ'ফিট চার ইঞ্চি, ঘিয়ে স্যুট, লাল টকটকে টাই, পাগড়ী, মুখে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিনয় সিং ঢুকেই বললে, 'মিস্টার সেন যদি আগামী মঙ্গলবার রোটারী ক্লাবের লাঞ্চ-মিটিং এ ইণ্ডিয়াস্ প্ল্যান্ড ডেভালপমেন্ট সম্পর্কে কিছু বলেন।' তার কথাটাকে যেন গুরুত্ব দেবার জন্যে বললে 'এন্টরও আসছেন।'

এন্টর মানে আমেরিকান কন্সাল জেনারেল, একথাটা প্রবোধ সেনের মনে চাঁকতে খেলে গেলেও তিনি যেন এক মুহূর্তের জন্যে মোহাচ্ছন্নভাবে বসে থাকেন। ইংরাজীতে যাকে বলে ব্রাস্ সেই হঠকারিতা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে প্রবোধবাবু তার এইমাত্র প্রমাণ পেলেন। সিং পার্ক স্ট্রিটে একটা শাঁসাল রেস্তোরাঁর মালিক। একটা বার লাইসেন্স পাবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে গত একবছর। শেষ পর্যন্ত সরকার তাকে লাইসেন্সও দেবে, একথা প্রবোধবাবু স্বতঃসিদ্ধ বলেই জানেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন একটা কমিটি ভারতবর্ষে মদ্যপান সম্পর্কে খুব রগচটা রিপোর্ট দিয়েছে আর কাগজে কাগজে তা নিয়ে হৈ হৈ চলছে কাজেই প্রাদেশিক সরকার একটু ঝুলিয়ে রাখছেন ব্যাপারটা।

'তুমি আবার কবে থেকে রোটারী ক্লাবে ঢুকলে?'

সিং যেন এ প্রশ্নের জন্যে তৈরী হয়েই ছিল। বললে, নাইনটিন ফর্টি সিক্স থেকে স্যার। সেন্টজেভীয়ার্সে ক্রিকেট করতাম। তারপর বিজনেসে এলাম। কিন্তু স্যার সর্ট অফ কোওপারেটিভ লাইফ অলওয়েজ অ্যাট্রাক্টস মি। চোখা হাসি, একমুখ ঘন দাড়ির ভেতর থেকে তার ভেজাভেজা চোখ, সে দুটো বড় বড় করে মেলে সিং বললে, 'আমরা তো আপনাদের মত স্যার দশের জন্যে সাবস্ট্যানসিয়াল কিছু করতে পারব না। তবে, দে অলসো সার্ভ হু স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েট।' সিং একটু মিলটন দিলে।

পাশের ছোকরাটি হঠাৎ ঘুমের মধ্যে যেন কিড় কিড় করে উঠলে। 'আমার কেসটা স্যার।'তার মুখচোখ দেখে বোধ হল কাড়গ্রামের কাড় তার দিকে তেড়ে আসছে।

প্রবোধ সেন সেদিকে না চেয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সিং-এর দিকে চেয়ে থাকেন। তার মনে হতে থাকে যেন সিংই নবীন ভারতবর্ষের পুরুষাকার যে পুরুষকারে সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে মানুষ সিদ্ধির পথ মুক্ত করে। সিং-এর পাশে পাশে তাঁর ভাইপো, তাঁর ছেলের অস্তিত্ব প্রবোধ সেনের ভীষণ অবাস্তব ঠেকে। সমস্ত পৃথিবী তোমার পায়ের নীচে, শুধু সিংহের মতো বলিষ্ঠ পা বাড়াতে হবে (বিবেকানন্দের কয়েকটা লাইন অস্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে মনে)। তাঁর গত কয়েক বছরের অর্থনীতি ও বাণিজ্য দপ্তরের অভিজ্ঞতায় তিনি এ বিষয়ে একেবারে স্থিরমত যে তাঁদের ছেলেরা এই জগতে মিস্‌ফিট্। তিনিও গান্ধী নেহরুর ভক্ত কিন্তু এ ভক্তি দিয়ে সারা পৃথিবীর অর্থনীতি-জগতের যে ধারা তাকে তো বানচাল করা যাবে না। আর এই অর্থনীতিতে লাইসেন্স বের করবার জন্যে ক্লাবের পান্ডা হতে হবে, মেয়েমানুষ সংগ্রহ করতে হবে। দিল্লীতে কলকাতায় এ রকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। তাঁদের ছেলেরা ভাবে এ ঘটনাগুলো ব্যতিক্রম, আর সিংরা জীবনযুদ্ধে নেমেই ধরে নেয়, এগুলোই নিয়ম। বস্তুত মদ, মেয়েমানুষ, পাবলিক রিলেশানস্, সিনেমা, খবরের কাগজ এই তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি। ভারতবর্ষ যখন একবার স্থির করেছে তাকে ইংল্যান্ড আমেরিকার মতো হতে হবে তখন এগুলোও আসবে। নাচতে নেমে ঘোমটা দেওয়া কেন?

প্রবোধ সেন চুরুট ধরালেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'সিং তোমার লাইসেন্সটা কেন একটু আটকাচ্ছে বুঝতে পারছো। ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট এনাফ।'

সিং হাসে প্রচ্ছন্ন অন্তরঙ্গতায়। 'আমি ও নিয়ে আসি নি স্যার। আপনার সাউন্ড জাজমেন্ট, প্র্যাক্টিকাল সেন্স-এর ওপর আমাদের সকলের আস্থা আছে।......আপনি লাঞ্চ-মিটিংয়ে একটু বলবেন। আপনাদের ট্যাক্সেশান নিয়ে আমাদের কেউ হয়তো বলবে। ইউ কেন ইগনোর দ্যাট। উই আন্ডারস্টান্ড ইচ্ আদার।'

সিং চলে যাবার পর পাশের ছোকরাটির কাঁদো-কাঁদো মুখখানার দিকে চেয়ে প্রবোধ সেন সান্ত্বনা দেন, 'আমি তো বললাম আমি একটা কোন করে দেব।......আর দু বছর কাড়গ্রামে না হয় ঘুরেই এলে। পেটের গন্ডগোল সেরে যাবে। খিদে হবে।'

ভবেন এসে বললে, 'আপনার স্যার আজকে একসঙ্গে আমেরিকা আর রাশিয়া......'

'সে কি।' প্রবোধবাবুর গলায় কপট আতঙ্ক।

'একটা ইন্ডো-আমেরিকান সোসাইটি—সন্ধ্যে ছটা। আর সন্ধ্যে সাতটায় সোভিয়েট ইউথ্ ডেলিগেশন, স্টুডেন্টস্ হল।'

'দমদমে কিছু নেই তো কাল?' ক্লান্তভাবে বললেন প্রবোধবাবু।

'হ্যাঁ স্যার সকাল সাড়ে আটটায় যুগোস্লাভিয়ার ভাইস্ প্রিমিয়ার।'

'আবার সকালে।' মুখ বেজার করেন প্রবোধবাবু। অতো সকাল সকাল কোন্ড

[illegible] কথায় [illegible] তাঁকে একবারই [illegible] দেখায়? [illegible]
[illegible] করেন-অনেককে।

'আজকেই স্যর......'

'না আজই যেতে হবে। ডিউটি ফার্স্ট।' তারপর হঠাৎ [illegible] ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললেন, টাইপ করবেন? আপনার মেয়ে টাইপ চালাবে?'

'হ্যাঁ স্যর চালাবে,' ভদ্রলোক [illegible] মতো তাকান।

'আমি রেকমেন্ড করছি। দেখবেন দুমাস পরে যেন অন্য লোক দিয়ে আনবেন না।' তারপর সই করতে করতেই বললেন, 'সেই সেম্ ওল্ড স্টোরি। এ টাইপ থাকে নিজের কাছে। বাঙালী জাতটা শুধু মাছিমারা কেরানী হতে শিখেছে।' ভদ্রলোক সইকরা দরখাস্ত-খানা দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেন। আর দু-তিন জন যাঁরা আছেন তাঁদের সম্পর্কে অনেককে দু-চার কথা বলে দিয়ে প্রবোধ সেন রাইটার্স বিল্ডিং যাবার জন্যে তৈরী হন।

সেদিন সন্ধেবেলা প্যান্টের ওপর প্রিন্সকোট চাপিয়ে প্রবোধ সেন রুশ ও আমেরিকান-দের সভায় গেলেন। তিনি দু দেশের ছেলেমেয়েদেরই বললেন, আপনাদের মহান দেশ, আমাদেরও মহান দেশ। আমাদের এ দুই সংস্কৃতির মাঝখানে সেতু স্থাপনের প্রচেষ্টা আরও দৃঢ় করা প্রয়োজন। তারপর বিশ্বের মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষা যে শান্তি ও প্রগতি, এবং গান্ধী-নেহরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের এইপথে দৃঢ় পদক্ষেপ—এই ধরনের ইংরেজী কথার আলোচনা রোজ খবরের কাগজে যে রকম ফর-ফর করে ওড়ে সেই রকম আরশোলাগুলো ছেড়ে দিলেন। আমেরিকানরা তাও কিছুটা-পরিচিত ইংরেজী আওয়াজ শুনেছিলেন কিন্তু যে-সব রুশ নর্তক-নর্তকী শিল্পী মাত্র দু-তিন দিনের জন্যে কলকাতায় এসেছেন 'ভারত-বর্ষের সঙ্গে তাঁদের দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও দৃঢ় করার জন্য' তাঁরা সুন্দর অর্থহীন হাসিমুখে চেয়ে থাকেন। আর প্রবোধ সেন যখন তাঁর কালো-কোটে-আঁটা শরীরটা একবার এদিকে আর একবার ওদিকে হেলিয়ে, 'ইওর গ্রেট কাণ্ট্রি, ইওর গ্রেট কাণ্ট্রি' বলে চলেন তখন সেই স্তব্ধ জনতার সামনে আবেগে দোদুল্যমান বক্তাকে ছবির মতো দেখায়, যে ছবি রোজ কাগজে বেরোয় এবং যে ছবির আসলে কোন মানে নেই।

আট

শব্দের খোলস থেকে অর্থকে টেনে বার করবার সমস্যা দুজনের কাছে আসে দুভাবে। অন্তত নির্মলের কাছে এখন আর এ সমস্যা নেই। রাজুর কয়েক বছরে লেখা চিঠি নাড়াচাড়া করতে করতে কখনও কখনও তার কোন কোন অংশের সত্যতায় চমকিত হলেও সে ভাবতে থাকে যে আসলে এগুলো তাদের দুজনের যৌবনের উদ্বৃত্ত সময়ের গুনোনি। রাজু তাকে যেভাবে লিখেছে—কোন এক বিশেষ ধরনের ভালবাসার ভিত্তিতে তাদের চিঠিলেখা শুরু হয়নি, একথাটার মানে কেবল একরকমই হতে পারে, অর্থাৎ কম বয়সের খেয়ালী হাওয়ায় কথার ঘুড়ি ওড়ানো, তারা দুজনেই এই ঘুড়ি উড়িয়েছে। অবশ্য শেয়ালদার সন্ধেটা সে এভাবে ভাবতে পারে না, ভাবতে এখনও কষ্ট হয়। কিন্তু সেই কতগুলো মুহূর্তের স্তব্ধতা যা রিলকের কবিতার মতো তার জীবনে এসেছিল, অনুভূতির হীরে শব্দের বালির ভেতর থেকে ঝিকিয়ে উঠেছিল, সেই ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তকে কি রাখা যায় চারপাশের দীর্ঘস্থায়ী বিরক্তির সামনে? সেই শব্দহীন অনুভূতির ঝলমলে মরীচিকার পেছনে ধাওয়া করে কি লাভ?

আবার সেই ইংরেজী শব্দের আনাগোনায় তার অনুভূতির তীব্রতা অনুভব করতে চায়। টু পুট্ ফর হিউম্যান কেয়ার্স কোনি কাউ বেশ সাবলীলভাবে তার মনে আসে। সে আর ভাবতে চায় না মানুষের রোজকার খাদ্য কি? অথবা অনুভূতির শুদ্ধতা কি মানুষের রোজকার খাদ্য নয়?

অনুভূতির শুদ্ধতা মানুষকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে? নির্মলের প্রশ্ন এগিয়ে যায়। অনুভূতির শুদ্ধতা নিয়ে তার বাপ সারা জীবন কাটিয়েছে। এখন তাকে একটা খামখেয়ালী বুড়ো ভাবা যেতে পারে কিন্তু তাঁর অত্যন্ত রাজনীতি-ঘেঁষা-জীবনে তিনি যা ভেবেছেন তাই করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ লোক কিন্তু নিজের কাছে তাঁর কোন ফাঁকি নেই, নির্মলের একথাটা খোলাচোখে ধরা পড়ে। কিন্তু তারপরেই সে নিজেকে বলে, তাতে কি হোল? একদিকে ব্যর্থ নিঃসঙ্গ আদর্শবাদ আর সাংগঠনিক শয়তানি— কি রাস্তা নেই?

সে যেভাবে নিজেকে তৈরী করছে তাতে একসময় বেকায়দায় পড়ে যাবে যদি রাজু হঠাৎ মত পরিবর্তন করে। যদি সে হঠাৎ কলকাতায় চলে আসে এবং নির্মলের দিকে পিছনের ভালবাসার ভিত্তিতে হাত বাড়ায়। তাহলে কি হবে? তবে এ ধরনের ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা যেন ক্রমশ কমে আসছে। নির্মল আর রাজুর দূরত্ব বেড়ে যাবার সঙ্গে তাল রেখে যেন সম্প্রতি দুই বাংলার মধ্যে বিরোধ আরও বেড়ে যাচ্ছে। আবার কিছু খুচরো দাঙ্গা, প্রাণহানি, বর্ডারে সংঘর্ষ, কাগজে চেঁচামেচি দুজায়গার অধিবাসীদের তিক্ততা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর মাঝখানে রাজুর সেই আশ্চর্য চিঠির লাইনগুলো কোথায় তলিয়ে যায়। নির্মল তাদের ভোলে না।

আর সুব্রত হাড়ে-হাড়ে টের পায় শব্দ কেমনভাবে আবৃত করে সত্যের অর্থপূর্ণতা। তার ভয় হয় তার কলেজজীবনে সযত্নে পড়া অর্থনৈতিক 'টার্মস্'গুলোও আসলে অর্থহীন, বড়জোর কতগুলো আন্দাজ। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ শব্দগুলোর যতটুকু সত্যতা আছে, রাজনীতির জগতে তারা তো প্রায় ফোঁপড়া। গৌতমের সঙ্গে তার তো এইখানেই ফারাক। গৌতম মনে করছে সমাজবাদ সম্পর্কে যে-সব কথা বলা হয়ে থাকে তার সবটুকু সত্যি। প্রয়োগ ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড ফারাক বাড়ছে তা না মানতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কয়েকদিন আগে কলকাতায় রাস্তায় বিপ্লব হয়ে গেছে। আশীটা লোক মরে গেছে পুলিশের গুলি লাঠিতে। সন্ধ্যের পর রাস্তায় রাস্তায় আলো নেই, বোমার আওয়াজ, রাইফেলের শব্দ। খাদ্য-আন্দোলন নামে অভিহিত এই রোদনভরা প্রহসনে সুব্রতর মনটা একেবারে মুষড়িয়ে দিল। আন্দোলনের প্রথম দিকে কলেজে টিচার্স রুমের কাছে এগোতেই গৌতমের গদ্‌-গদ্‌ গলায় সে চমকে ওঠে থমকে দাঁড়ায় কাঠের পার্টিশনের পাশে। গৌতম আবৃত্তি করে :

> Today you already know, Russia, the solitude and the cold.
> While thousands of shells shatter your heart,
> While scorpious with crime and poison
> approach to gnaw your entrails, Stalingrad,
>
> New York dances, London thinks, and I say to you bite,
> for my heart cannot bear it and our hearts

cannot bear it, cannot bear it

in a world which lets its heroes die alone.

নির্মল ছাড়া ঘরে কেউ নেই। কিন্তু গৌতমের সেদিকে দৃষ্টি নেই, চশমার ভেতর যে উদ্দীপ্ত চোখ তার সামনে জনারণ্য। সুব্রতকে বোধহয় আশা করে নি গৌতম। একটু থতমত খেয়ে থামে। তারপর তার অপ্রস্তুত অবস্থা চাপা দেবার জন্যে আরও চেঁচিয়ে বলে, 'পাবলো নেরুদা, চমৎকার না? ছাত্রদের মিটিং-এ বলব।'

'যাতে আরও আশীটা লোক মরে।' সুব্রত বলতে বলতে ক্লান্ত গলায় বলে।

'ইউ আর এ রিভিশনিস্ট, কাওয়ার্ড! আমি তোমার ওপিনিয়ন চাই নি,' গৌতম হঠাৎ ঘেউ-ঘেউ করে উঠল।

সুব্রত অসহিষ্ণুভাবে বললে, 'ওড টু স্টালিনগ্রাড জোরাল কবিতা। কিন্তু এই ছাত্রসভায় কেন? কদিন তোমাদের এই বেঁড়োমি করে কাটবে?'

নির্মলও চমকে তাকায় সুব্রতর দিকে। এ রকম ভাষা সাধারণত গৌতমকেই মানায়। সুব্রত ঝাঁঝিয়ে বলে, 'এটা কি আন্দোলন যার কোন লক্ষ্য নেই, যেখানে পোকার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মরে?'

'এর লক্ষ্য তুমি কি করে বুঝবে? ইউ আর এ কাওয়ার্ড।' তারপর চাপা রাগে গৌতম বললে, 'তুমি এখন পার্টি ছাড়তে চাইছো যে-কোন ছুতো করে। ডেমোক্র্যাটিক রাইটস্-এর জন্যে মানুষ প্রাণ দিচ্ছে, দরকার হলে আরও দেবে। এই সাধারণ কথাটা তোমরা ভুলে যাচ্ছো।' তারপর নির্মলের দিকে চেয়ে বললে, 'আমরা এক একটা প্রতিক্রিয়ার দুর্গ ভেঙে ফেলছি।'

'তুমি কি নজরুল আওড়াচ্ছো? আমরা ছাত্র নই। কেন এ-সব নাটক করছো?' সুব্রত বললে।

'সাট আপ কাওয়ার্ড অপরচুনিস্ট,' গৌতম ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে।

'এ-সব কী হচ্ছে ছেলেমানুষী তোমাদের?' নির্মল এবার চেঁচিয়ে উঠল।

গৌতম সুব্রতর দিকে চেয়ে গর্জে ওঠে, 'তোমার পার্টি-কার্ড কি রকম থাকে আমি দেখব।'

হঠাৎ চুপ করে যায় সুব্রত। ক্লান্তভাবে বলে, 'ঐটাই তো একমাত্র পারো।'

নির্মল অনেকক্ষণ বুঝতে চেষ্টা করছিল এ দুটো লোকের বিরোধটা কোথায়? সুব্রতর রাজনীতিচর্চা সে বোঝে না কিন্তু সুব্রত যে গর্তে-ফেরা শঙ্কিত শশক নয় সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত। একটু উদ্বিগ্নভাবেই গৌতমকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কি সুব্রতকে সত্যি তাড়াবে পার্টি থেকে? কি বলে তাড়াবে?'

'এজেন্ট বলে,' গৌতমের গলায় এতক্ষণ পর তার স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস।

'এজেন্ট মানে?'

'এজেন্ট মানে বোঝ না? যেমন মনে করো অন্য পার্টির লোক, এমনকি পুলিশের লোক আমাদের পার্টিতে কাজ করে, যারা আমাদের শক্তিকে দুর্বল করবার চেষ্টা করে।'

একটা প্রবল বেদনায় আবিষ্ট হয়ে অথর্বের মত বসে থাকে সুব্রত।

আর সেদিকে চেয়ে আরও উৎসাহিত হয়ে গৌতম বলে, 'যারা আমাদের রেভল্যুশনারী পার্টি রিফর্মিস্ট বানাতে চায়, যারা আসলে অ্যাংলো-আমেরিকান ইম্পিরিয়ালিজমকে আরও

শক্তিশালী করতে চায়, যারা......'

গৌতম দম নেবার জন্যে থামে।

নির্মলের কাছে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যেতে থাকে। বলে, 'কোনো প্রমাণ আছে সুব্রতর সম্পর্কে?'

'ডকুমেন্ট?'

সুব্রতর মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। গৌতম বলে, 'এ-সব আমাদের ইনার পার্টির ব্যাপার, বাইরে বলা ঠিক না। তবে তুমি ওর ভাই, তোমার জানা দরকার। জেলে গেলেই, আর পিপ্‌ল পিপ্‌ল করলেই তো বিপ্লবী হওয়া যায় না!'

'বিপ্লবী হতে গেলে কি করতে হয়?' নির্মল জিজ্ঞেস করে।

'বিপ্লবী হতে গেলে স্ট্যামিনা-র দরকার।'

'স্ট্যামিনা তোমাদের দুজনেরই আছে।'

'তুমি এ-সব বুঝবে না। তুমি আসলে খারাপ নও, তবে নন-পলিটিক্যাল টাইপ।' তারপর যেন করুণাবশেই গৌতম বললে, 'আচ্ছা, তোমরা দু ভাই আলাপ-সালাপ করো। আমি মিটিংয়ে যাই।'

নির্মল বললে, 'তোমরা সরাসরি ব্যাপারটা কথা বলে মিটিয়ে ফেল না। এমনি রোজ রাস্তায় রাস্তায় মিছিল, আর গুলি, লাঠি, কাঁদুনে চলবে?'

'কার সঙ্গে কথা বলব? তোমার জ্যাঠামনির সঙ্গে। আমার আর তার মাঝখানে আশীটা লাশের ব্যবধান।'

'তোমায় আজ কবিতায় পেয়েছে গৌতম, তুমি মিটিংয়ে যাও।' সুব্রতর গলায় অবসাদ স্পষ্ট।

গৌতম চলে যাবার পর একেবারে চুপচাপ। দুভাই যেন হঠাৎ খুব কাছে এসে গেছে বলে বোধ হয়। যেন গত কয়েক বছরে তাদের দুটো জগত ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠিক এই মুহূর্তে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে।

কিছুক্ষণ পর নির্মল বললে, 'এবার বাড়ি ফিরবে?'

'না।'

'কোথায় যাবে?'

'আসানসোলে। আমাদের কয়লাখনির ইউনিয়নে।'

'সেখানেও. .'

'হ্যাঁ, সেখানেও গৌতমরা আছে। তবে বোধহয় এখন যা করছি, তার থেকে কিছু কাজ করা যাবে।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। পুরনো দেয়াল ঘড়ির টকটক বাসের ঘর্ঘরে মাঝে মাঝে চাপা পড়ে আবার জেগে ওঠে। বেয়ারা ফাটা পেয়ালায় চা দিয়ে যায়। চা খেতে খেতে সুব্রত নির্মলের দিকে তাকায়, 'আর তুমি, . এখানেই?'

'নাঃ। একটা বিল্ডিং পাবলিসিটি ফার্মে যাচ্ছি। এই এপ্রিলে জয়েন করব।'

নয়

দিন সাতেক পর বিকেলবেলা নির্মল নিস্পৃহভাবে তার বাপের বিগত দিনের কাহিনী

খুলেছিল। সেই একই কথা—সেই [illegible], সেই [illegible]—[illegible]
প্রায় দুঃস্বপ্ন। আর তার ব্যক্তিক সম্পর্কিত [illegible] [illegible]. [illegible] আর
ওপারে ফেউয়েদের সঙ্গে তাল দিয়ে কতক্ষণ চলতে পারা যায় না, হঠাৎ তাদের [illegible] কথা নির্মলের মনে পড়ে যায়। কলেজে চাকরী ইস্তফা দেবার পর সে কদাচিৎ সেদিকে যাতায়াত করেছে। স্নান করে চকোলেট টেরিলিনের প্যান্টের ওপর দিয়ে সিল্কের বুশশার্ট চাপিয়ে হাল্কাহাতে সিগারেট ধরিয়ে সে যখন তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নামে তখন তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখায়। সিঁড়ির নীচেই চিঠির বাক্স। সেদিকে চেয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। একটা বিলিতি এয়ার লেটারে চেনা হাতে লেখা তার নামটা প্যাটপ্যাট করে তার দিকে চেয়ে আছে কাচের ভেতর থেকে। সেই পুরনো উৎকণ্ঠায় চিঠির তালা খোলে। পেছনে দিকে ঠিকানা—মিস্ আর. খান, ৭৫ পেন্স লেন, সাটন, কোল্ডফিল্ড ওয়ারউইকশায়ার, ইংল্যান্ড।

আস্তে আস্তে চিঠিটা ছিঁড়ে নির্মল পড়তে থাকে :

বাসে যেতে যেতে সেদিন একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল—Three Nuns Tobacco! তুমি খেতে না ওই তামাক? সেই যে লিখেছিলে?

এখানে যে অজুহাত নিয়ে এসেছি তা ইংরেজীতে এম. এ. পড়ার। ডাইরেক্ট কাবিক্যুর গেলে থিসিস আঁকড়ে পড়ে থাকতে হত বলে এই সহজ পথটা বেছেছিলাম। গ্রীষ্মে একটা পরীক্ষা দেব। তারপর কিছুদিন থেকে বোধহয় 'দেশে' ফিরতে হবে। যে বিরাট হিন্দু-মুসলমান-উত্তীর্ণ ভারতবর্ষ আমার দেশ ছিল তা যাবার পর থেকে কতগুলো সমস্যা আরও জটিল হয়েছে।

ড্রাইডেনের All for love-এর অ্যান্টনির একটা কথা মনে পড়ে : My whole life has been a golden dream of love and friendship. শুধু হাল্কা হবার জন্যে নয়, জীবনকে ঐশ্বর্যে ভরে তুলবার জন্যেও পৃথিবীর অনেক কোণ থেকে নারী এবং পুরুষে দুরকম বন্ধুই পেয়েছি। কাউকে একান্ত করে পেতে চাইলে পাওয়া যায়—অনেক ল্যাঠাও চুকে যায় হয়ত, কিন্তু নিজের জীবনকে তৈরী করবার সুযোগ যখন পেয়েছি তখন সহজেই দমে যেতে নারাজ।

চোদ্দ বছর বয়সে বাবা বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বহু লোভনীয় পাত্র আমার বেয়াড়াপনার জন্যে ফস্‌কে গেল। ত্রিপলী, লন্ডন, ঢাকা, করাচী ও ওয়াশিংটনে আমার জন্যে দিন গোনা শেষ করে যার যার তার তার মতো সবাই নীড় তৈরী করেছে। এখন বাড়ি থেকেও চাপ নেই। তাই অবাধ মুক্তি।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের দৈন্যে লজ্জা পেয়ে আমি এইটুকু শিখেছি যে অটুট স্বাস্থ্য আর স্নায়ুর শক্তি ছাড়াই নিস্পৃহতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। চারদিক থেকে ক্লান্তি ছুটে এল আর কথা বললাম না, মুখ তুললাম না,—এই করে আর দৈন্যের বোঝা বাড়াব না। ক্লান্তি আর নিস্পৃহতায় কতটুকু আর খুইয়েছি—তার ভেতর থেকেও তো আমাকে খুঁজে নিয়েছে অনেকে। এবে প্রত্যেকটা মুহূর্তকে বড় করে চাইলে তার একটা দৈন্যও বারবার কাঁটার মতো বেঁধে। তেমনি একটা কাঁটা আমার বুকে আছে—ওই একটা জায়গায় নিজের কাছে কেমন ছোট হয়ে থাকি। আসলে হয়ত সমস্তটাই ছিল শব্দের খাঁচা—তুমি আমি কেউই যে শেষ পর্যন্ত তাতে ঢুকি নি সেটা পরম সৌভাগ্য। কিন্তু মমতা আছে সমস্ত কিছু ছাপিয়ে সব স্মৃতি ধরে নিতে। আজ বড় শীত। ভাল থেকো—

শব্দের খাঁচা, মনে মনে কয়েকবার আওড়ায় নির্মল। আর এই খাঁচার শিকের বাইরে একখানা কৌতূহলী সতেজ মুখ তার মনের মধ্যে জেগে উঠবার আগেই পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁর দিকে সে পা বাড়ায়।

সেদিন পানের মজলিশ জমজমাট। রুশ-চীন বিরোধ নিয়ে কোণের দুটো টেবিলে একেবারে কাটাকাটি। নির্মলকে দেখেই তার এক সাংবাদিক বন্ধু চিৎকার করে গান ধরলে :

এসেছে বিপিন সখা,
বাজে ওষুধে আর খেও না।

মার্চ, ১৯৬২—মে, ১৯৬৪ ॥ সমাপ্ত ॥

একটি বাঙালি প্রবন্ধ

অশোক মিত্র

দেশে অত্যন্ত অশান্ত সময় যাচ্ছে। অন্নাভাব, প্রায় সব-জিনিসেরই হু হু মূল্যবৃদ্ধি, শিল্প-বাণিজ্যে মন্দা, বেকার-সমস্যার সম্প্রসারণ, পল্লী-অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান দৈন্য। সব-মিলিয়ে এক ঘন-হয়ে-আসা তমিস্রা, কোনো দিকেই যেন কোনো আশার আলো নেই। দেশের সর্বত্রই এই আশাহত মনের অবস্থা, কিন্তু বাংলাদেশে আরো-একটু বেশি। শরণার্থী সমস্যার অসম্পূর্ণ সমাধান তার একমাত্র কারণ নয়। শিল্পক্ষেত্রে গত কুড়ি বছরে যথেষ্ট প্রসার অন্যান্য জায়গায় মতো বাংলাদেশেও যথেষ্ট হয়েছে, হয়তো তুলনায় অধিক মাত্রায়ই হয়েছে। কিন্তু সাধারণ বাঙালির তা থেকে তেমন-কিছু সুরাহা হয়নি। শিল্পজাত ঐশ্বর্যের বৃহদংশ অবাঙালি যাঁরা এখানে মূলধন খাটিয়েছেন, তাঁদের লভ্য হয়েছে। বাঙালি মূলধন আদৌ গড়ে ওঠেনি। সুতরাং বাংলাদেশের নানা প্রাকৃতিক ও আকস্মিক সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও, এতগুলি পরি-কল্পনার প্রসাদ-বিতরণ সত্ত্বেও, নিছক বাঙালিদের ভাগ্যে শিকে আদৌ ছেঁড়েনি। নেহাৎ যাঁরা সদাগরি চাকরি করেছেন একেবারে উপরের ধাপে, তাঁদের অবস্থা জবররকম ফিরেছে, তাঁদের সম্পদে-শ্রীতে চিক্কণতা-মসৃণতা এসেছে, কিন্তু তাঁরা তো সংখ্যায় নেহাৎই মুষ্টিমেয়, হাতের আঙুলে গোণা না-গেলেও, অন্তত হাজার পেরিয়ে লক্ষের কোঠায় তাঁরা এখনো পৌঁছননি। গ্রামাঞ্চলেও ঠিক তাই : কিছু-কিছু জোতদার এবং মহাজন গত পনেরো-কুড়ি বছরে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু ভাগচাষী-বর্গাদার-ভূমিহীন মজুরচাষীর অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে।

এমনিতেই বাংলাদেশের হাল শোচনীয়তার গা ছুঁয়ে ছিল: পুরো দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক দুর্দশার ফলে তা আরো হেলে পড়েছে। গত পাঁচ বছরে দু'দুটো যুদ্ধের ধাক্কা দেশের লোককে এখন সামলাতে হচ্ছে। যুদ্ধ যখন চলতে থাকে, উন্মাদনার অভাব হয় না। এক নিখাদ দেশপ্রেমের বন্যায় সাধারণ লোকেরা ভেসে চলে নেতারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আগে বিদেশী যাদের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে, তাঁদের সঙ্গে ফয়সালার সবগুলি দিক বিচার ক'রে দেখেছেন কিনা, তা নিয়ে কারো চিন্তাভাবনার উদ্রেক হয় না। অরাতিরক্তে স্নান করবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই তখন বড়ো হয়ে ওঠে। ফলটা ভুগতে হয় পরে, যুদ্ধ করার আপাত ফলাফলের সঙ্গে যার কোনো যোগসূত্রই নেই। চীন কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের লড়াই, দুটোর একটিও দু'তিন সপ্তাহের বেশি গড়ায়নি, কিন্তু আমাদের মতো গরিব দেশের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ভড়কে দেওয়ার মতো। তাছাড়া, আগে যেখানে প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের ব্যয় ছিল বছরে আড়াইশো কোটি টাকা কি তারো কম, এখন সেটা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে একহাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সীমিত আয়ে একদিকে খরচ ওরকম চট ক'রে বেড়ে গেলে অন্যদিকে টান পড়বেই, উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি তাই ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে থেমে এসেছে। করব্যবস্থা যেহেতু সুষ্ঠু নয়, রাষ্ট্র কর্তৃক মুদ্রাস্ফীতির বহর বেড়েছে। তার উপর পর-পর কয়েক বছর অনাবৃষ্টির ফলে, এবং কিছুটা মজুতদারদের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যও, খাদ্যাভাব বহু অঞ্চল জুড়ে দেখা দিয়েছে। গত দু'বছরে তৈজসপত্রের দাম সব-মিলিয়ে দেড়গুণ হয়েছে, গত চার বছরের হিসেব ধরলে দ্বিগুণ।

[illegible] মানুষের [illegible] অবস্থা। তবুও [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে, কিন্তু অভাবের [illegible], তার তুলনায় [illegible] ঈষৎ সীমিত।

এমনকি এই বাংলাদেশেও সীমিত। এবার বিহারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, অনাবৃষ্টিতে মাঠ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, ফসলের পরিমাণ অন্যান্য বছরের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশে, তা সত্ত্বেও ঐ রাজ্যের কোনো জেলাতেই এক কিলো চালের দাম দু'টাকা ছাড়িয়ে যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে অনেক জায়গাতেই আপাতত চাল চার, এমনকি পাঁচ, টাকায় বিক্রি হচ্ছে। লোকেরা তা-ও মেনে নিয়েছে। বিহারে কেন্দ্র থেকে যে-পরিমাণ সাহায্য এসেছে, বাংলাদেশে তার ছিটেও নয়, তেমন-কোনো প্রতিবাদ সোচ্চার হয়নি। অবশ্য বাংলাদেশে জিনিসপত্র, বিশেষ ক'রে খাদ্যদ্রব্যের, মূল্য যে ঊর্ধ্বগতি তার কারণ স্রেফ কেন্দ্রীয় অবিচারই নয়, আমাদের এখানে প্রশাসনিক নানা ত্রুটি আছে, রাজ্যসরকারের অক্ষমতা অস্বীকার করা চলে না, খাদ্য-মাটা অথবা যাদের কায়েমি স্বার্থ ব'লে অভিহিত করা হয়, তাদের দমনের বিশেষ-কোনো চেষ্টা লক্ষ হয় না। এটা লজ্জার কথা, পরিতাপের কথা : এবছরের গোড়া থেকে বাংলাদেশে কিছুটা বামপন্থা-ঘেঁষা এক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু ফটকাবাজ-মুনাফাখোরদের সংযত করবার ব্যাপারে সেই খাড়া-বড়ি-থোড়।

ইতিমধ্যে অন্য অঘটন ঘটেছে। শিল্পে মন্দার ফলে বেতন-ও-মজুরির হার মূল্যমান-বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে তো পারছেই না, উপরন্তু নতুন নিয়োগ প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম, এবং বহু কলকারখানা-দপ্তরে ছাঁটাইয়ের বহর বেড়ে চলেছে। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত বাঙালি পরিবারে দুর্দশার তাই অন্ত নেই। এই দুরবস্থার ঢেউ গ্রামাঞ্চলেও ছড়াচ্ছে, কলকাতা বা দুর্গাপুর-আসানসোল এলাকার কারখানাগুলিতে বহু গ্রামীণ যুবক নিযুক্ত ছিল, তাদের অনেককেই বেকার হ'তে হয়েছে। বৃষ্টি ভালো হওয়ার ফলে বর্তমান বছরে ফসল যথেষ্টই বাড়বে আশা করা যায়, কিন্তু জোতদার-মজুতদারদের যোগসাজস বন্ধ না-করতে পারলে সাধারণ লোকের খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে তা ভেবে নেওয়া অনুচিত হবে; মূল্যমান অপেক্ষাকৃত স্থিততায় পৌঁছুবে সেরকম আশা পর্যন্ত ছলনাময়ী হ'তে পারে। তাছাড়া শিল্পবাণিজ্যের চেহারা কেমন দাঁড়াবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিচার-বিবেচনার উপর তাঁরা যদি সাহস ক'রে বন্ধ-রাখা উন্নয়ন পরিকল্পনায় নতুন ক'রে উদ্যোগসঞ্চার করেন, তাহ'লে বাংলাদেশের লোকদেরও একটু আসান হ'তে পারে : দপ্তরে একটু বেশি পরিমাণ কেরানির কাজ, কারখানায় আরো-কিছু শ্রমিক-নিয়োগ, কয়েক হাজার ঘর বাঙালি পরিবারের কৃচ্ছ্রতার তাহ'লে খানিকটা অবসান হয়।

কিন্তু এ-সমস্তই ভবিষ্যৎ ভাবনা, ইচ্ছার শরীরে আঁকিবুকি দাগকাটা। উপস্থিত অবস্থা থমথমে। জিনিসপত্রের চড়া দাম, ভাত-ডালের পরিকীর্ণ অভাব, বেকারী, প্রশাসনিক অব্যবস্থা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। তাছাড়া, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্যই, কেন্দ্রের এবং অন্যান্য রাজ্যের, পশ্চিম বাংলা সম্বন্ধে একটা গায়ে-পড়া ভাব। এটা নেহাৎই পাড়া-বেড়ুনীর গায়ে-পড়া ভাব, যাতে অনুকম্পা কিংবা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নেই, বাংলাদেশের সমস্যাগুলি কিছুটা সময় নিয়ে বুঝে দেখবার সহিষ্ণুতা নেই, নিছক অবসরবিনোদনের মুখরোচক অতথ্য-কুতথ্য সংগ্রহের মোহে এই প্রবণতা। এ বছরের শুরু পর্যন্ত, বাইরের পত্রিকাগুলিতে বাংলাদেশ সম্বন্ধে খুব সামান্য খবরই থাকতো : এখন অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম—বাংলা-

দেশের নেতা এবং অধিবাসীদের লম্বা-চওড়া উপদেশ দিয়ে নিত্যই সম্পাদকীয় কলম ভরছে, খবরকাগজের প্রথম পৃষ্ঠার অনেকটা জায়গা জুড়ে বাংলাদেশ নিয়ে রোমহর্ষক খবর ছাপা হচ্ছে, কিন্তু আসল সমস্যার কী ক'রে সমাধান সম্ভব তা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। যাকে দেখতে পারি না, তার চলন বাঁকা : বাংলাদেশ সম্বন্ধে বিকৃত তথ্য পরিবেশন তাই সম্প্রতি বেড়ে-বেড়ে চলেছে।

বাইরের লোকের কোনো মাথাব্যথা নেই, আমাদের সমস্যা নিয়ে আমাদের নিজেদেরই ভাবতে হবে। ১৯৬২ সালের পর থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কাঠামো অনেকটাই ঢিলে হয়ে এসেছে, কেন্দ্রের ক্ষমতা-প্রতাপ-প্রভাব শীর্ণ হতে শীর্ণতর হ'তে-হ'তে চলেছে, অধিকাংশ রাজ্যের, এবং তাদের মুখ্যমন্ত্রীদের, মনের ভাব অনেকটা আমরা-সবাই-রাজা-আমাদের-এই রাজত্বে। বাংলাদেশ ধ্বসে পড়লে অন্য কেউও যে নিরাপদ রইবেন না, সে-ভাবনা এখনো অনেককেই স্পর্শ করেনি, নিজেদের নিহিত স্বার্থের প্রসারেই তাঁরা আপাতত নিয়োজিত। এই অবস্থায়—আমার নিজের প্রতীতি এটা—খুব বেশি ভারতপ্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়ে এলে অচিরে আমরা, বাঙালিরা, মারা পড়বো। ভারতীয় ঐতিহ্যে তত্ত্বগত শ্রদ্ধা ভালো কথা, তাছাড়া জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে ভারতচেতনা উদ্বোধনে বাঙালিদের তত্ত্বগত প্রয়াসের স্মৃতি অম্লান হবার নয়। ভূগোল যেমন আমরা অস্বীকার করতে পারি না, ইতিহাসকেও সেই সঙ্গে পাশ-কাটানো অসম্ভব, সাহিত্যে-আচারকলায়-ধর্মানুষ্ঠানেও অনেকগুলি সূত্র-সম্পর্ক, যাদের হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কিন্তু দেশপ্রেম, ঐতিহ্যভক্তি ইত্যাদি সব-কিছুরই উৎস ভাষার গণ্ডি, ভাষার গণ্ডিতে আবদ্ধ আমরা যারা বাঙালি হিশেবে পরস্পরকে চিনি, জানি, আত্মীয়হিসেবে বরণ করি, তাদের স্বার্থের সৌভ্রাত্র্য। ভারতবর্ষের অন্যত্র সবাই যখন নিজেদের স্বার্থ গুছোতে ব্যস্ত, পশ্চিম বাংলায় তখন অন্যতর বদান্যতায় ভেসে যাওয়ায় কোনো অর্থ হয় না। এখন থেকে তাই আমাদের আবেগকে অন্য খাতে প্রবাহিত করা প্রয়োজন। রাজনীতির চেহারা যেহেতু ঘুরে গেছে, আমাদের নিজেদের চেতনাকেও তাই পরিবর্তিত ক'রে আনতে হবে। এই পরিবর্তন কারো-কারো বিবেচনায় শোকান্তিক ব'লে মনে হ'তে পারে, ভারতবর্ষে নৈরাজ্যের সূচনা এ ধরনের খণ্ডিত রাজ্যচিন্তার মধ্যে নিহিত, এরকম অভিযোগের উত্থাপনও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দেশের অন্য-সব অঞ্চলে যে-প্রবণতা ইতিমধ্যেই অনেকদূর এগিয়ে গেছে, তার প্রতিরোধের দায়িত্ব একা এই পশ্চিম বাংলার, এই যুক্তিও সমান দুর্বল।

আসলে দেশরক্ষার, তথা দেশের সংহতিরক্ষার, দায়িত্ব উভপাক্ষিক রাজ্যের যেমন, কেন্দ্রেরও ঠিক ততটাই। সমগ্র দেশের সম্পদশ্রী বাংলাদেশের সম্পদশ্রীকে বাদ দিয়ে নয়। সুতরাং কেন্দ্র থেকে, এবং দেশের অন্যান্য নানা কোণ থেকে, যাঁরা বাংলাদেশে সর্বনাশ হচ্ছে, একটা-কিছু করতে হবে এবংবিধ ত্রাহি চীৎকার করছেন, তাঁদের নিজেদের দায়িত্বের কতটুকু তাঁরা পালন করেছেন সেটা যুক্তিসহ প্রশ্ন। ঘেরাও নিয়ে সম্প্রতি যে-চেঁচামেচি হচ্ছে, ইচ্ছা ক'রেই আমি সেই প্রসঙ্গ তুলছি। সংবাদপত্রে প্রত্যহ অজস্র অভিযোগ বাংলাদেশে ন্যায়-ও-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর যথেচ্ছাচার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, এরকম খুব বেশিদিন চললে বাংলাদেশ থেকে সবাই ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে যাবেন, তখন বাঙালিরা মজা টের পাবে, ইত্যাদি প্রচ্ছন্ন হুমকি রোজ কাগজে ছাপা হচ্ছে, আমরা পড়ছি, দেশের অন্যত্রও সবাই পড়ছেন। কিন্তু যা বলা হয় অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক তা নয়। শিল্পে এ-বছরে যে মন্দা দেখা দিয়েছে, তার জন্য শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলার নতুন সরকার দায়ী নন, শ্রমিকরাও দায়ী নয়, বাংলাদেশের জন-

সমাজতন্ত্রের পথ। কত শতাব্দীর বছর ধরে মনুষ্য হয়ত শিল্পপতিদের আবদারে উঁচু [illegible] হয়েছে, এই প্রথা তাতে বাঁধ পড়েছে। তবে এই বাঁচিকার সূত্রে উৎপাদনেরই জাতীয়, বন্দ-বাহান-খাজনা-জোয়ার-সপ্তকে-মিছিল-আন্দোলনেও তাদের পীড়ন অপসারিত হয়েছে। বেশ কিছু উদ্ধার ঘটেছে সেটা শ্রমিক-আন্দোলনেরই চরিত্র : যাঁরা এই রাজ্যে কারখানা খুলেছেন, তাঁরা ঈষৎ অনুকম্পাবশী বলে চিরাচরিত প্রথায় একদা শ্রমিকদের তাজা সংকুচিত রেখে নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা অব্যাহত রাখা মালিকদের পক্ষে এখানে সম্ভব হয়নি। শিল্প-পতিরা যে-অনায়াস নিশ্চিন্ত সম্ভোগে অভ্যস্ত, তাতে অতএব চিড় ধরেছে। এবং সেজন্যই আর্তনাদ মুখর হয়ে উঠেছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে আচরণে মাত্রাধিক্য ঘটেনি তা নয়। কিন্তু তিলকে তাল করে বলাও হয়েছে বহু জায়গায়। ক্ষমতার পুরো দায়িত্বটি পুরোপুরি শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া অদ্ভুত প্রস্তাব : এক ঢিলে দুই পাখি এভাবে ঘায়েল হবার নয়। ভৌগোলিক ও আবস্থানিক যে-যে কারণে পশ্চিম বাংলায় শিল্পের পত্তন এবং প্রসার, সেগুলি রাতারাতি উবে যাওয়ার নয়। বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিলে লাভের বহরও অন্তর্হিত হবে, মনে-মনে শিল্পপতিরা সেটা ভালোই জানেন।

তবু স্বীকার করতে হয়, এক-ধরনের কাকতালীয়তা দেখা দিয়েছে, বাইরে থেকে নতুন মূলধন বাংলাদেশে ঠিক আগের মতো বিনিয়োগ করা হচ্ছে না। জুজুবুড়ির ভয় নিশ্চয়ই এর জন্য অনেকটা দায়ী। এই অঞ্চলে বামপন্থী দলগুলি এমনিতেই বরাবর প্রভাবশালী, ইদানীং তাদের প্রভাব আরো বেড়েই চলেছে। কেন্দ্র ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে, বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে কী হবে বলা যায় না, ইত্যাকার চিন্তার ফলে কিছু-কিছু শিল্পপতি বাংলাদেশে রয়ে-সয়ে নতুন মূলধন খাটাচ্ছেন। তাঁদের মনে ভয়, অজানার ভয়, যে-ভয় স্বাভাবিক।

কিন্তু এখানেই খটকা। আমরা বাঙালিরা তাহ'লে কী করবো? বামপন্থার দিকে ঝুঁকলে পুঁজিপতিরা ঘাবড়ে যাবেন, আমাদের রাজ্যে মুনাফা পুনর্নিয়োগ করা থেকে নিবৃত্ত হবেন, আমাদের মহা অসুবিধা দেখা দেবে। কিন্তু তাব'লে কী আমরা ভালো ছেলে ব'নে যাবো, সমাজপরিবর্তনের কল্পনা বিসর্জন দেবো, বামপন্থাকে পরিত্যাগ ক'রে জনসংঘ-কিংবা-ঐ-গোছের-কোনো-রাজনৈতিক-প্রতিক্রিয়াশীল-গোষ্ঠীর ছায়ার আশ্রয় খুঁজবো, শিল্পপতিরা তখন খুশিমনে ফিরে আসবেন, আমাদের উপর দু'হাত উদার ক'রে প্রসাদ ঢালবেন? যেহেতু বাইরের লোকেরা পছন্দ করছেন না, এবং তাঁরা পছন্দ না-করলে আপাতত আমাদের বৈষয়িক ক্ষতি, অতএব আমরা আমাদের বিবেক বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ করবো, শ্রমিকদের সংগঠিত হ'তে দেবো না, আর্যাবর্তের চিন্তাধারার অষ্টাদশশতকীয়তার অংশে আমাদের 'বিপজ্জনক' চিন্তার সূত্রগুলিকে পিষ্ট ক'রে আনবো?

আমার মনে অন্তত কোনো দ্বিধা নেই। ভারতবর্ষ এগোক না-এগোক, বাংলাদেশ তার নিজের প্রতিভার ঢল বেয়ে এগোবেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের যদি বামপন্থী চিন্তা-ও-কর্মধারায় আস্থা থেকে থাকে, তাহ'লে শিল্পপতিরা রাগ করবেন, মূলধন অন্যত্র বিলি ক'রে দেবেন, এই আশঙ্কায় পিছপা হ'লে চলবে না। অবশ্য প্রাথমিক দুশ্চিন্তে কাজ না-হ'লে মালিকপক্ষের অনেকেই হয়তো সুর নরম করবেন। কিন্তু তা যদি-নাও করেন, বাংলাদেশের মানুষদেরই বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। রাষ্ট্রের সাহায্যে শিল্প-সম্প্রসারণের আয়োজনে ব্যাপৃত হ'তে হবে, এবং, তাছাড়া, শত কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে গিয়েও নিজেদের নির্ভরে সঞ্চয় সৃষ্টি ক'রে বিনিয়োগের উদ্যোগ করতে হবে। দেশে সমাজতন্ত্র

প্রতিষ্ঠা নিয়ে যাঁরা অতীতে ভেবেছেন, এই সমস্যাটির প্রতি তাঁরা আদৌ একদিন নজর দিয়েছেন ব'লে মনে হয় না। কিন্তু অতীতে কোনো-কিছু করা সম্ভব হয়নি, অতএব ভবিষ্যতেও হাত গুটিয়ে থাকতে হবে, এটা কোনো বিধানই নয়।

অবশ্য সব-গেল-সব-গেল ব'লে এখন যাঁরা চেঁচাচ্ছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমার সামান্যতম সহানুভূতিও নেই, বাঙালি হিশেবে, যেমন নেই, ধনবিজ্ঞানের ছাত্র হিশেবেও নেই। বাংলাদেশে যে-সব শিল্পপতিরা সাম্রাজ্য ফেঁদে বসেছেন, তাঁদের আচরণে ঔপনিবেশিক প্রবৃত্তি বরাবরই অত্যন্ত প্রকট। তাঁদের একমাত্র আগ্রহ আগেও যা ছিল, এখনো তাই : শোষণের অংশ বাড়িয়ে-বাড়িয়ে যাওয়া। যে-ভূমির সংস্থানে দাঁড়িয়ে তাঁরা লভ্যাংশ ঘরে তুলেছেন, তার উন্নয়নের জন্য কোনোদিন তাঁদের মাথাব্যথা দেখা দেয়নি। গবেষণার প্রসারে তাঁদের আগ্রহ প্রায় শূন্য; শ্রমিক সম্প্রদায় নতুন শৈলী আয়ত্ত ক'রে নিজেদের উৎপাদনক্ষমতা যাতে বাড়াতে পারে, সেরকম কোনো ব্যবস্থার কথাও তাঁরা কোনোদিন ভাবেননি। বাংলাদেশে যাঁরা মূলধন খাটিয়েছেন, বাংলাদেশের লোকদের সম্বন্ধে বরাবর তাঁদের বিমুক্তির সম্পর্ক : এই মূলধনখাটিয়েদের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে-ক'জন বাঙালি ছিলেন বা আছেন, তাঁদের মনোভাবেও কোনো ব্যত্যয় চোখে পড়েনি। আজ অবস্থা অন্যরকম, তাই তাঁদের আকুলি-বিকুলি : কিন্তু ইতিহাসের গতির ইশারাকে না-মেনে উপায় নেই।

কৃষির ব্যাপারেও একই ধরনের সমস্যা। ভারত সরকার কয়েক বছর আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কৃষির ক্ষেত্রে আপাতত উৎপাদন প্রধান লক্ষ্য, বণ্টনব্যবস্থা নিয়ে উপস্থিত মাথা না-ঘামালেও চলবে। এই সিদ্ধান্তেই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, ভূমিসংস্কারের প্রসঙ্গও কিছুদিনের জন্য উহ্য থাক। উৎপাদন বাড়াতে হবে; উৎপাদন বাড়ানোর জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছেন, উচ্চবিত্ত ভূস্বামী তথা জোতদারদের সর্বদিক দিয়ে মনোরঞ্জন করতে হবে—সস্তায় সার, উন্নত বীজশস্য, কীট-ও-ব্যাধি প্রতিষেধক, নামমাত্র হারে কৃষিঋণ, বিনামূল্যে কৃষিগত উপদেশ। তাছাড়া, কৃষিজাত মূল্যের দাম উঁচু পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করা হবে। জোতদার-শ্রেণীর অতএব বহুপাক্ষিক লাভ : ভূমিসংস্কারের কথাবার্তা শিকেয় তোলা, সুলভে উৎপাদন বৃদ্ধির উপচারপ্রাপ্তি, জাত পণ্যের চড়া দরে বিক্রির ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের এমনধারা সিদ্ধান্তে কৃষির হাল হয়তো ফিরবে, হয়তো ফিরবে না; আগে থেকে প্রত্যয় ক'রে কিছু বলা মুশকিল। উচ্চবিত্ত ভূস্বামীরা যে-সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন, তা যদি তাঁরা সত্যি-সত্যি সদ্ব্যবহার করেন, দু'এক বছর আগে হোক, পরে হোক, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অন্যপক্ষে যদি এই সুযোগসুবিধাগুলি নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন, সস্তায়-পাওয়া কৃষিঋণ দাদন খাটাতে কিংবা শস্য মজুত রাখতে নিয়োগ করেন, সার চড়া দামে খোলাবাজারে বিক্রি ক'রে দেন, সেচের অপব্যবহার করেন, তাহলে ফসলের পরিমাণ স্বভাবতই তেমন-একটা বাড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, আরো-একটা মস্ত প্রশ্ন থেকে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশের পল্লী-অঞ্চলে অসাম্যের মাত্রা গত কয়েক বছরে ভীষণ রকম বেড়ে গিয়েছে : জোতদাররা ফুলে কলাগাছ হচ্ছেন, বৈভবে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, কিন্তু ছোটো চাষী এবং ভূমিহীন কৃষক যে-তিমিরে সেই তিমিরে। ভারতবর্ষের গ্রামবাসীদের অন্তত তিন-চতুর্থাংশ কিংবা তারও বেশিকে বঞ্চিত রেখে কৃষি-উন্নয়ন আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়ে সংশয়বোধ আদৌ অযৌক্তিক নয়। এক বছর-দু'বছর হয়তো উচ্চবিত্ত ভূস্বামীর জমিতে ফলন বাড়তে পারে, কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যেই, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা। যাঁরা বর্ধিষ্ণু, তাঁরা সরকারের দৌলতে আরো ফেঁপে উঠবেন, ছোটো

কৃষক এবং মজুরজীবীরা এককোণে মুখ বুজে পড়ে থাকবে, এটা সহনীয় ব্যবস্থা না। প্রতিবাদ সোচ্চার হবেই। প্রতি রাজ্যে এই প্রতিবাদের রূপ একই বিন্যাসে প্রকাশ পাবে না, প্রতিবাদের গুঞ্জনেরও স্থানপাত্র-বিশেষে তফাৎ হ'তে বাধ্য; কোনো রাজ্যে হয়তো দু'দিন আগে, কোথাও দু'দিন পরে অভিযোগের রোল ধ্বনিত হবে। দিনমজুর ও নিম্নবিত্ত কৃষকদের সংগঠন যেখানে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়, সেখানে প্রতিবাদ তীক্ষ্ণতর হবে; অন্যত্র হয়তো সংগঠনের সম্প্রসারণের প্রতীক্ষায় বেশ-কিছুদিন এখনো অতিবাহন করতে হবে।

পশ্চিম বাংলায় কৃষক আন্দোলন দানা বেঁধেছে। দলগত স্বার্থে যদিও কেউ-কেউ এখানে-ওখানে এই আন্দোলনকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন, তাহ'লেও মানতেই হয় আন্দোলনের প্রধান উৎস ছোটো দাবী এবং ভূমিহীন কৃষকের পুঞ্জীভূত অভিযোগ। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি এবং ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে যে-ফতোয়াই দিন না কেন, বাংলাদেশের মানুষকে সেই অনাচারের অংশভাক্ হতেই হবে, কোনো সংহিতাতেই সেরকম অনুশাসন লিপিবদ্ধ নেই। উৎপাদন অবশ্যই জাতির উৎকীর্ণ লক্ষ্য, কিন্তু বণ্টনের জন্যই উৎপাদন, যে-উৎপাদনব্যবস্থায় দেশের অধিকাংশ মানুষ তুলনায় দীনতর হ'য়ে পড়েন, তাকে মেনে নিতে অনেকের বিবেকগত, নীতিগত, বুদ্ধিগত আপত্তি হ'তে পারে। কৃষি-উৎপাদনের দায়িত্ব আমাদের সংবিধান-অনুযায়ী প্রায়-সম্পূর্ণই রাজ্য সরকারের কুক্ষিগত : কেন্দ্রীয় বিধান পাল্টানোর প্রস্তাব তাই মোটেই অক্ষমার্হ নয়। বাংলাদেশের জনসাধারণ সমগ্রভাবে বিচার ক'রে যদি স্থির করেন, গ্রামাঞ্চলে অসাম্য বাড়তে দেওয়া হবে না, জোতদারদের প্রতাপ প্রতিহত করতে হবে, সেই বিচারকে ফলপ্রসূ করার অখণ্ড অধিকারও তাঁদের আছে, থাকবে। যদি রাজ্যের বাইরে থেকে এ-বিষয়ে কেউ নাক গলাতে আসেন, উদগ্র প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ানো তাহ'লে বাঙালিদের কর্তব্য। এই কর্তব্য থেকে আমরা যেন ভ্রান্ত না হই।

মানছি, অভিযোগ উঠবে আমি সমস্যার পুরো দায় কেন্দ্রের, এবং বাংলার বাইরে থেকে নাক-গলিয়েদের, উপর চাপিয়ে সস্তায় বাজিমাৎ করতে চাইছি। বলা হবে, নানা ধরনের যে-যে চিন্তা-উৎকণ্ঠা-বাদানুবাদ দেখা দিয়েছে, সে-সমস্তে শ্রেণীবিভাজনের সমস্যা জড়ানো, বাঙালিদের নানা সম্প্রদায়ই নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাওয়ি শুরু করেছেন, কেন্দ্র নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র : কেন্দ্রের শুধু দায়িত্ব, আইনশৃঙ্খলা যাতে ভয়ংকররকম ভেঙে না-পড়ে, এবং বহিঃশত্রুরা যাতে ভিতরের গোলযোগের সুবিধা নিতে না-পারে, সেজন্য প্রহরায় থাকা।

কিন্তু নিরপেক্ষতারও রকমফের আছে। চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে যেখানে অনেকটাই ছাড়াছাড়ি, আবেগ সেখানে এসে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে দাঁড়ায়, আচরণে-বিচরণে তার ছায়া অতএব স্বতই পড়ে। বাঙালিদের অন্তর্লীন দ্বন্দ্বের কোনো গণতান্ত্রিক সমাধান নিশ্চয়ই সম্ভব, কিন্তু সে-সমাধানের ভার বাঙালিদের উপরেই ছেড়ে দিতে হবে। অধিকাংশ বাঙালি যদি মনে করেন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিনীতি অশুদ্ধ, জোতদার-ভূস্বামীদের সংরক্ষণে যদি তাঁদের আপত্তি সোচ্চার হয়, যদি তাঁরা ভূমিসংস্কারের হেজে-যাওয়া প্রস্তাবকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে শাণিত ক'রে তুলতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহ'লে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীরা কী ভাবছেন, অথবা কেন্দ্রীয় নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রইলো কিনা, সে-সব চিন্তা অবান্তর; শুধু তা-ই নয়, গর্হিতও।

কাছাকাছি অন্য-একটি প্রসঙ্গে আসি। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ প্রবল; স্মৃতিতে-ঐতিহ্যে-সাহিত্যে-ভৌগোলিক সখ্যে আমরা পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছি। জাতীয় সংহতি অবশ্যই মহৎ লক্ষ্য, আমরা যে আলাদা হয়েও একত্র, তার

সম্পূর্ণ স্বীকৃতি সবদিক থেকেই কাম্য। কিন্তু একত্র হওয়া এবং একীভূত হওয়া এক কথা নয়। আমাদের আলাদা-আলাদা সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে এই একীকরণ সম্ভব নয়। ভাষার ব্যাপার নিয়ে আপাতত যে-শোকান্তিক পর্ব চলছে, তা থেকেই বোঝা যায় বাদবাকি করে মিলন ঘটানো যায় না, দেশের সর্বত্র যে-যে বিশেষ প্রতিভার বিচ্ছুরণ, তাদের প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য মেনে নিয়েই তবে সম্মিলিত যাত্রা সম্ভব। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রেও সেই একই যুক্তি। বাংলাদেশে যদি আমাদের আদর্শ-কল্পনা-স্বপ্ন একটু অন্যরকম হয়, সংহতির দোহাই দিয়ে তাদের মাটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা পণ্ডশ্রমে দাঁড়াবে। প্রতিভাকে ঢেকে রাখা যাবে না, শত বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও তা বিকশিত হবে, দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হবে। এই বিকাশের সুযোগ যাঁরা দিতে চান না, যাঁরা ভারতবর্ষের সব অঞ্চলের সবাইকে একই রকম ভাবতে, করতে, চলতে, চালাতে বদ্ধপরিকর, তাঁরাই আসলে দেশের সর্বনাশ ডেকে আনছেন, তাঁরাই সত্যিকারের দেশদ্রোহী।

প্রায়ই, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের বাইরে, এ'র-ও'র-তাঁর মুখে আক্ষেপ শোনা যায়, পশ্চিম বাংলায় সর্বনাশের আর বিশেষ বাকি নেই, তরুণ-ও-ছাত্রসম্প্রদায় বখে গেছে, বখে গিয়ে উগ্র রাজনৈতিক পন্থা গ্রহণ করেছে, দেশকে এরা অচিরে বিদেশী শত্রুর হাতে তুলে দেবে; এদের মধ্যে দেশপ্রেম ব'লে কিছু নেই, অন্ধ মতাদর্শের তাড়নায় এরা বিদেশী ঠাকুরকে বরণ ক'রে নিয়েছে : দেশকে যেহেতু এরা অস্বীকার করেছে, অতএব নির্মম হ'তে হবে, নির্মম হয়ে এদের ঝাড় সমূলে উৎপাটন করতে হবে। কথাগুলি বলা সহজ, বিশেষ ক'রে অন্ধ আবেগের মুহূর্তে আরো বেশি সহজ। কিন্তু কেউ-কেউ আবেগের অন্ধকার হ'তে বেরিয়ে আসতে অক্ষম ব'লে যুক্তির সততা বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয়। উগ্র মতাদর্শে ভক্তি বাংলাদেশের যুবক-কিশোরদের চিরকালীন ঐতিহ্য : দেশ, দেশের সাধারণ লোক, জাতির স্বাধীন সত্তা, জাতীয় গৌরব, এই সমস্ত-কিছু সম্বন্ধে আপ্লুত প্রেম থেকেই অধিকাংশ সময় উগ্রপন্থায় তরুণসম্প্রদায়ের আস্থার উৎস। এটা বয়সের ধর্ম : যে-আদর্শে পৌঁছুতে চাই, যথাশীঘ্র পৌঁছুতে চাই, সময়ের সঙ্গে ঢলানি নয়, শ্রেণীশত্রুর সঙ্গে সাময়িক বোঝাপড়া নয়, মধ্যপথে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নয়, একটানা সংগ্রাম, সম্মুখসংগ্রাম, যে-সংগ্রামের উপান্তে লক্ষ্যের অমরাবতীতে পৌঁছনো। আজ যাঁরা তারুণ্যের দ্বারপ্রান্তে, এমন আদর্শের অসহ্য আনন্দে তাঁদেরই পিতামহরা ক্ষুদিরাম-অরবিন্দের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁদেরই পিতারা সুভাষচন্দ্রের সম্মোহনে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। পিতা-পিতামহের ধর্ম থেকে বাংলাদেশের যুবসম্প্রদায় মোটেই বিচ্যুত হননি : দেশপ্রেম এখনো আদর্শের মধ্য-বিন্দু জুড়ে অবস্থান করছে। কিন্তু দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি তথা অভিনিবেশ বদলেছে : যা পরাধীনতাপাশ থেকে মুক্তিলাভের পিপাসায় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দোলায়িত করতো, এখন তা সমাজবিপ্লবের একাগ্র স্বপ্নে এসে স্থিত হয়েছে। অতীতে বাঙালি যুবকরা আদর্শের উৎস খুঁজেছেন গ্যারিবাল্ডি-ম্যাৎসিনির জীবনচর্চায়, ম্যাকসুইনীর আত্মত্যাগে, ডি. ভ্যালেরার বৈপ্লবিক শৌর্যে। উপস্থিত মুহূর্তে যদি আদর্শের প্রতিভূ হিসেবে অন্য কোনো দেশের সফল বিপ্লবকে তুলে ধরা হয়, তাতে দোষাবহ কিছু নেই।

কেন্দ্রের কর্তারা যা ভাবছেন, দেশের অন্যান্য জায়গায় রাম-শ্যাম-যদু যে-আদর্শ মাথায় পেতে নিয়েছেন, আমাদেরও মাথা নিচু ক'রে তা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে নিতে হবে, এই অসহিষ্ণু সূত্রের নিগড় থেকে মুক্তি প্রয়োজন, নইলে এই বিরাট দেশ ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে যাবে। আপনার দেশপ্রেমকে আমি সম্মান জানাবো, কিন্তু আমার দেশপ্রেমকেও আপনাকে সম্মান

চাইতে স্বীকার ক'রে নিতে হবে; আমি আর আপনি দু'জনেই ভারতবাসী হ'লেও আমাদের আদর্শ ভিন্ন হওয়া সব-সময়েই সম্ভব, সেই সম্ভাবনা আমার সঙ্গে আপনাকেও মানতে হবে। কী ভাবচর্চার ব্যাপারে, কী শিল্প অথবা কৃষি-উন্নয়নের প্রসঙ্গে, কী সমাজের কাঠামো পরিবর্তনের সমস্যা-চিন্তায়, আমাদের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিতে হবে : বাঙালি হয়ে আমি এই স্পষ্টভাষণ করছি, কিন্তু ভারতবাসী হিশেবেও আমার অভিমত অন্যতর হবার নয়। আমার বাঙালি সত্তা নিয়ে যদি আমি মাথা তুলে বাঁচতে না-পারি, তাহ'লে ভারতবর্ষও আমার কাছে মিথ্যে হয়ে যাবে।

হৃদয়ের জ্যোৎস্নার ভিতর

মিহির মুখোপাধ্যায়

অনেকদিনের সখ শিবুর, একটা হারমোনিয়াম কেনে। হারমোনিয়াম না হলে গান জমে না, আর গান না জমলে পয়সার হরিরলুঠ পড়ে না। অথচ যে শোনে সে-ই বলে শিবুর গলাটা নাকি ভাল। সুরের জ্ঞান টনটনে। কলের গান একবার শুনলেই তুলতে পারে শিবু। দুবার, বড়জোর তিনবার শুনতে পেলে তো কথাই নেই, সে সুর আর এ-জন্মে ভুল হবে না। কিন্তু এহেন শিবুকেও রোজ সকাল থেকে রাত দশটা ইস্তক রেলগাড়িতে ঘুরে ঘুরে গান গাইতে হয়। হারমোনিয়াম থাকলে যে কোন একটা ইস্টিশানে জমিয়ে বসো। বসে বসে গান গাও। আর এক একটা গানের পর চারপাশে টুনটুন্ পয়সার শব্দ শোনো।

ওই শব্দ শুনেই সব বলতে পারে শিবু। ক'টা পয়সা পড়ল, কোন গাড়ির ঘন্টা বাজল, কোনদিকের গাড়ি, কেমন ভীড় জমেছে ইস্টিশানে।

রোজ সকালে মা যেমন ডেকে দেয়, আজও তেমনি ডাকল --ও শিবু, ওঠ্। উঠে পড়ু আর গড়াস্ নে। শিবু উঠল। হাতমুখে জল দিয়ে হাফসার্টের উপর ছেঁড়া সোয়েটারটা চাপাল। এখনো একটু শীত শীত। ফাল্গুন মাস। আজ দোলপূর্ণিমা। আগের দিন হঠাৎ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল।

কেমন ঠাণ্ডা ভেজা ভেজা হাওয়া দিচ্ছে। টিনের কৌটো আর লাঠিটা নিয়ে বেরোবার মুখে জিজ্ঞেস করল শিবু --মা, রোদ উঠেছে --

রোজ মায়ের ওই এক কথা --ফর্সা হয়ে গেছে। কেমন ফর্সা কিছু বোঝে না শিবু, বুঝতে পারে না। লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে যেতে যেতে চারপাশে একবার মুখ ঘোরাল চারদিকেই অন্ধকার। শুধু ভোরবেলার শব্দগুলি শুনতে পেল। গাছে গাছে পাখপাখালির ডাকাডাকি। পাড়া-পড়শী বৌ-ঝিদের কলকল কথা চাপাকলে জলতোলার শব্দ।

শিবুর মনে নেই, ছোটবেলা নাকি চোখ দুটি তার ভালই ছিল। ছোটভাই হাবুর এখন যে বয়স, সেই তিন বছর বয়সে নাকি টাইফয়েড হয়েছিল।

মা বলে সান্নিপাতিক জ্বর, নকুল কবরেজের চিকিচ্ছের গুণে বাছা আমার প্রাণে বাচলো বটে, কিন্তু চোখের দিষ্টি, পোড়া-কপাল আমার

মা এখনো আফসোস করে, হায়-হায় করে। কিন্তু শিবুর কোন হায় আফসোস নেই সে-তো এই অন্ধকারেই বড় হয়েছে। সে-তো আঙুল ছুঁয়ে সব বুঝতে পারে, শব্দ শুনে সব বলে দিতে পারে। কোন্ গাড়ি আসছে, কে কথা বলছে, কোন পাখি ডাকছে।

ঘুঘুর ডাক শুনতে পাচ্ছো, কোথায় বসে ডাকছে বুঝতে পারছো না, আচ্ছা, বাঁ-দিকে একটু দূরে উঁচুমত কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই, বোধহয় কোন গাছ, সেই গাছের মগডালে খুঁজে দ্যাখো গে, শিবপদর আন্দাজ ভুল নয়। রেলস্টেশনের বন্ধুরা অবাক হয়ে হাঁ বলাবলি করে, আশ্চর্য আন্দাজ শিবুর। নগা, হরিচরণ, লখাই। নগা চিনেবাদাম ফেরি করে। আর হরিচরণ। শিবু বলে, হরিচরণ সবার চরণ ধরে আছে, অর্থাৎ জুতো-পালিশ করে। ঠাকুর-দেবতার গান গেয়ে গেয়ে অনেক ভাল ভাল কথা শিখেছে শিবু। আর লখাই, সে-যে কখন কি করে, কোন্ ধান্দায় ঘুরে বেড়ায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কখনো একবাটি

খবা নিয়ে ঘুরেছে, কোনদিন কয়লালেবু, আবার কিছুদিন হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে চাল-চিনির কালোবাজার করল। এরা সব শিবুর ইস্টিশনের বন্ধু।

ট্রেনে ট্রেনে ঘোরাঘুরির সময় কথা হয়, গল্প-গুজব হয়, হাসি-ঠাট্টাও চলে।

নগা বলে,—তোর ব্যবসা ভাই ভালরে শিবু, তোর মত গলাখান যদি পাইতাম, বইসা বইসা গান গাইতাম, আর মোরে পায় কেডা, বাস্—

লাঠি ঠুক্‌ঠুক্‌ করে আদিনাথের দোকানের সামনে এল শিবু। তাদের বস্তির ভেতর থেকে বেরিয়ে কাঁচা রাস্তাটা যেখানে পাকা পিচের রাস্তায় মিশেছে, সেখানেই আদিনাথের চায়ের দোকান। একপাশে চা-বিস্কুট, আরেকপাশে মুদি-মশলা। রোজ বেরোবার পথে আদিনাথকে গান শুনিয়ে যায় শিবু। ভক্তমানুষ আদিনাথ। ঠাকুর-দেবতার গান শুনতে ভালবাসে। শুধু হাতে শোনে না। রোজ সকালে এককাপ চা আর একখানি বিস্কুট বরাদ্দ শিবুর। লাঠিটা পাশে রেখে, দোকানের সামনে খদ্দেরদের জন্য পেতে রাখা বেঞ্চিটার উপর বসল শিবু।

ধোঁয়ার গন্ধ, তালপাতার ফট্‌ফট্‌ শব্দ। আদিনাথ বোধহয় উনুন ধরাচ্ছে।

শিবু ডাকল, ও কাকা—

—কি বল্—উনুনে হাওয়া দিতে দিতে জবাব দিল আদিনাথ।

এবার মেলায় দোকান দেবেন না?

—নারে, অনেক টাকার ব্যাপার, খরচপত্তর করে এবার আর পোষাবে না একটু সময় চুপচাপ বসে টিনের কোটোয় আঙুল ঠুকে ঠুকে তাল দিল শিবু। তারপর বারকয়েক কেশে গলাটা সাফ করে গান ধরল। ভোর-কীর্তনের গান। ভজ গৌরাঙ্গ, ভজ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে—গাইতে গাইতে মনে হল, কে যেন আলতো পায়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মৃদু মেয়েলী গন্ধ। আন্দাজ ভুল হয়নি। গান শেষ হতেই শুনল, ও শিবুদা, কেমন আছো

ছবির গলা। আদিনাথের মেয়ে ছবি। শিবুদার গানের খুব ভক্ত। দোকানের পেছনে বাসা। গান শুনেই ছুটে এসেছে।

—কে ছবি, তুমি কবে এলে মুখ তুলে একটু হাসল শিবু।

—আমি এসেছি কাল রাত্তিরে—

মামার বাড়ি ইছাপুর গিয়েছিল ছবি, প্রায় মাসখানেক পরে ফিরেছে, জিজ্ঞেস করলো, —শিবুদা, মেলা দেখতে যাবে না—

শিবু বললো—মেলায় যাবো সেই বিকেলবেলা

ঘোষপাড়ার দোলপূর্ণিমার মেলা। এ তল্লাটের বড় মেলা। সোদপুরে গোপাষ্টমীর মেলা, নবদ্বীপে রাসের মেলা আর এই ঘোষপাড়ার দোলমেলা।

আবার জিজ্ঞেস করলো ছবি নতুন বায়স্কোপের কোন গান তুলেছ নাকি শিবুদা, শোনাও না একখানা—ছবির আবদার শুনে ধমক দিল আদিনাথ যা, যা, এই সাত-সকালে আর বায়স্কোপের ফিচেল গান শুনতে হবে না, শিবুকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দে, ওই বয়ম থেকে একখানা বিস্কুট বার করে দে—

—আহা বাবার যেমন কথা, বায়স্কোপের সব গানই খারাপ নাকি—শিবুর হাতে চা-বিস্কুট দিতে দিতে বললো ছবি—সেই ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানটাও তো বায়স্কোপে বেরিয়েছে, শোনো নি—তারপর শিবুকে লক্ষ্য করে—শিবুদা, তুমি তুলেছ নাকি গানটা—

কোন কথা না বলে একটু হাসল শিবু। চায়ের কাপে চুমুক দিল। ছবির গলা কেমন বদলে গেছে। কেমন সুরেলা, কেমন মিষ্টি মনে হ'ল। দিদিমার অসুখের খবর পেয়ে মামার বাড়ি গেল ছবি। একমাসের কিছু বেশী হবে। এর মধ্যেই কত বদলে গেছে। এক একটা সময় আসে যখন মেয়েরা যেন চট্ করে বদলে যায়, হঠাৎ বড় হয়ে ওঠে। যেমন হঠাৎ কখনো ঝরা ফুলের গন্ধে মনে হয় সামনে বৃষ্টির দিন, আচমকা শিউলির গন্ধে মনে পড়ে সামনে শরতকাল, পুজোর মরশুম। তেমনি ছবির গলার এই সুর বদল শুনে মনে হ'ল। সামনে যৌবন, ভরা বয়সের কাল।

আবার জিজ্ঞেস করলো ছবি—তুমি এখন যাচ্ছো কোথায় শিবুদা'?

—একবার ইস্টিশানে যাব—উঠে দাঁড়াল শিবু।

—টুনি, হারু কেমন আছে? বুঝতে পারে না। লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে যেতে চারপাশে একবার মুখ ঘোরাল।

—ভাল—

—আর তোমার মা?

—আছে একরকম, যেও একসময় আমাদের ওখানে—বলতে বলতে বেরিয়ে এল শিবু। বেশ চনমনে রোদ উঠেছে। রোদের দিকে সোজাসুজি তাকালে কেমন আবছা আবছা মনে হয়, চোখের ভেতর টন্‌টন্ করে।

সামনে রাস্তার উপর ছেলেদের হাসির হল্লা। আবিরের উৎসব শুরু হয়েছে। রাস্তার একপাশ ধরে হাঁটছিল শিবু। আজ বেলা বারো অবধি রিকশা, মোটরগাড়ি, সব বন্ধ। তবে রেলগাড়ি চলবে। সাইকেলের ঘন্টি শোনা যাচ্ছে।

আচ্ছা ছবির বয়স কত হ'ল? টুনি আর ছবি একবয়সী। দু'চার মাসের এদিক-ওদিক হবে হয়তো। শিবুর চেয়ে দু'বছরের ছোট টুনি। তারপর আরো দুটো বোন ছিল। সবার শেষে হারু। শিবুর এখন সতেরো। তাহলে ছবি পনেরোর ঘরে। ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিল শিবু। বাবা মারা গেছে আজ তিন বছর। হারু তখন মায়ের পেটে। দরজির কাজ করতো বাবা। তখন একরকম চলে যেতো। তারপর থেকেই বড় কষ্ট। বাবার সেই সেলাইয়ের মেশিনটা বেচে দিয়েছে মা। উপায় ছিল না। অনেক ধার-দেনা জমেছিল। মা আর টুনি এখন গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেয়, ঘুঁটে বিক্রি করে আর শিবু ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে পয়সা কামায়। একটা হারমোনিয়াম থাকলে রোজগার বাড়তো। কিন্তু কেনার মত পয়সা নেই। পয়সা জমেও না। রয়েল গন্ধেশ্বরী অপেরার মালিক ভূপতিবাবু একটা পুরনো হারমোনিয়াম বেচবেন। খবর শুনে শিবু গিয়ে ধরে পড়েছিল—বড়বাবু, হারমোনিয়ামটা আমাকে দিন, আমি যা পারি দেবো আপনাকে—

—কত আর দিতে পারবি, তুই—বড়বাবুর কথায় হাসির মেজাজ টের পেয়েছিল শিবু।

—যা, আপনি বিবেচনা করে বলবেন—

—হারমোনিয়াম কিনে করবি কি তুই?

—আজ্ঞে, গানটা শিখবো ভাল করে—

—তোর গলাটি মন্দ নয়, গানটা শিখতে পারলে ভালই হ'ত, তবে একটা কথা কি জানিস—একটু ভেবে আবার বলেছিলেন ভূপতিবাবু—হারমোনিয়ামটা নামে পুরনো বটে, কিন্তু একেবারে নতুনের মত আছে আর জিনিসটাও ভাল, একশো টাকায় দিলে যে কেউ লুফে নেবে, এখন ভেবে দ্যাখ্—একশো টাকা!

শিবু ঝুকে ছিল কিছুক্ষণ, শেষে মরিয়া হয়ে বলেছিল—দেবো, বড়বাবু, ওই একশো টাকাই দেবো, তবে একসঙ্গে পারবো না, মাসে মাসে দশটাকা করে দেব, আজ এই টাকাটা রাখুন—দুখানি পাঁচটাকার নোট বার করেছিল শিবু।

—ও বাবা, দশ দশ করে দশ মাসে টাকাটা পেলে আমার কোন কাজে লাগবে—হাসির শব্দ করেছিলেন বড়বাবু—আমার একসঙ্গে চাই—

—আমি অন্ধ, আপনার ছেলের মত, এইটুকু দয়া করুন—ঘোলাটে চোখ মেলে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিল শিবু। একটু সময় কিছু যেন ভাবলেন ভূপতিবাবু, তারপর নরম গলায় বলেছিলেন,—আচ্ছা, টাকাটা রাখছি আমি, তুই যখন বলছিস এমন করে, তবে একটা কথা, বাকি টাকাটা তুই তিন কিস্তিতে তিরিশ টাকা করে দিয়ে যাবি, ওই দশ মাসের মধ্যেই দিতে হবে, জিনিসটা এখন আমার কাছেই থাকবে, তুই মাঝে মাঝে এসে বাজিয়ে যাবি, ইচ্ছে হলে আমাদের যদুমাস্টারের কাছে তালিম নিতে পারিস, সে জন্য আর কিছু দিতে হবে না তোকে, আমি মাস্টারবাবুকে বলে দেব, তবে হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখবি, ওই দশ মাসের মধ্যে পুরো টাকা না পেলে আমি অন্য জায়গায় ভাল দামে ছেড়ে দেব, তোর টাকা তুই ফেরত নিয়ে যাবি—

হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছিল শিবু। হারমোনিয়াম তো হলোই উপরিলাভ যদুমাস্টারের কাছে বিনি পয়সায় তালিম নেয়া। হিসেব করে দেখেছে সে, মাসে মাসে যদি দশটি টাকা করেও জমাতে পারে, তাহলে তিন মাস অন্তর এক এক কিস্তির টাকা শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু মাসে মাসে দশটি টাকা জমানো সহজ কথা নয়। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে শিবু। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর আড়াই থেকে তিন টাকার মধ্যে তার রোজগার ওঠানামা করে। রোজ দুটি টাকা মাকে দিতে হয়। জিনিসপত্তরের দাম বাড়ছে ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে। ঘরে চারটি প্রাণীর খোরাকি। মা, টুনি, হারু আর সে নিজে। এদিকে সারাদিন ঘুরে ঘুরে অসম্ভব খিদে পায়। চার-পাঁচ আনা পয়সা জলখাবারেই খরচ হয়ে যায়। তা-ও জমিয়েছে শিবু। পেটে গামছা বেঁধে একরকম না খেয়ে গেল আষাঢ় মাস থেকে একটি একটি করে পয়সা জমাচ্ছে। এমন কি দুই কিস্তির ষাটটি টাকা বড়বাবুর হাতে দিয়েও এসেছে। সপ্তাহে একটি দিন যদুমাস্টারের কাছে বসে বাজনা শিখছে। চমৎকার বাজনাটা। অনেকটা সড়গড় হয়েছে শিবুর। এসব কথা এক হরিচরণ ছাড়া আর কেউ জানে না। মাকে তো কিছু বলাই যাবে না। অভাবের ঘরে বিলাসি বাজনার সখ শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে মা। প্যান্টের ভেতর একটা গোপন পকেটে বরাবর খুচরো পয়সা রাখে শিবু। আগে সব পয়সাই মা দেখতো, দরকার মত নিয়ে নিত। আজকাল একটাকার খুচরো জমলেই কাগজের নোট করে জামার গুটোনো হাতার ভাঁজে লুকিয়ে রাখে শিবু। তিন-চার দিন পর পর একটাকা দুটাকা হরিচরণের কাছে জমা রেখে আসে। স্টেশনের কাছাকাছি এসে পড়েছে শিবু। সামনে বাজার, তারপরেই স্টেশন। বাজারের গোলমাল শোনা যাচ্ছে। বেশ গরম। সোয়েটার খুলে কাঁধে রেখে যেমন হাটছিল, হাটতে লাগল। হঠাৎ পেছনে পিচকিরির শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে পিঠ ভিজে গেল। সামনে আবার, বুক ভিজে গেল। একদল ছেলের হাসি। রঙ দিচ্ছে ছেলেরা। শিবু থমকে দাঁড়াল। অপ্রস্তুতের মত একবার হাসার চেষ্টা করল। পরক্ষণেই দুখানি আস্থির হাত তার সারা মুখে যেন দুমুঠো ধুলো মাখিয়ে দিল।

আবীর মাখাল কেউ। আবার হাসির হুল্লোড়। মুখ বাঁচাবার জন্য মাথা নিচু করল শিবু। দুহাতে মুখ ঢাকলো। সোয়েটারটা মাটিতে পড়ে গেল।

কে যেন বললো—যা, ওকে ছেড়ে দে, ক্যোরা চোখে দেখতে পায় না—

ছেলের দল হল্লা করতে করতে উল্টোদিকে চলে গেল। হাঁক ছেড়ে বাচ্চা শিবু, নিচু হয়ে সোয়েটারটা তুলে নিল। তারপর যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি হেঁটে স্টেশনের ভেতরে এল। প্লাটফর্মের যেদিকটায় বসে থাকে হরিচরণ, বসে বসে জুতো পালিশ করে, সেদিকে এগিয়ে গেল, ডাক দিল—হরি, আছিস নাকি—

—হ্যাঁ, এদিকে আয়—

এদিকে একটা বেঞ্চি আছে। সিমেন্টের বেঞ্চি। কাছাকাছি আসতে বিড়ির গন্ধ পেলো। হরিচরণটা ভীষণ বিড়ি খায়। হাতড়ে হাতড়ে বললো শিবু—তুই শুয়ে আছিস কেন

—এমনি, আজ তো কোন কাজ-কম্মো নেই—উঠে বসতে বসতে বললো হরিচরণ একি, তোকে যে একেবারে সঙ্ সাজিয়ে দিয়েছে—

—কি করেছে?

—তোর সারা মুখে আবীর, জামায় মেজেন্টার রঙ্—

মেজেন্টার রঙ্ কি—জিজ্ঞেস করল শিবু।

ঘন বেগুনী রঙের মত, মুখটা ধুয়ে আয়—হরিচরণের কথা শুনে একটুকাল চুপ করে রইল শিবু। ঘন বেগুনী রঙের কিছুই বুঝতে পারল না। কত রকম রঙের নাম শুনেছে শিবু। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কমলা, বেগুনী। তার জামায় বেগুনী রঙ, তার সারা মুখে আবীরের লাল রঙ। কিছুই বুঝতে পারে না সে। সব অর্থহীন অন্ধকার। সব রঙ মুছে গেলে নাকি কালো হয়, অন্ধকার হয়ে যায়। কেমন অন্ধকার? তার চোখের সামনে যেমন, ঠিক তেমন কি?

নিজের মুখে, গলায়, ঘাড়ে আস্তে আস্তে হাত বোলাল শিবু। ধুলোর মত গুড়ো গুড়ো লাগল আঙুলে। দুই হাতের দশটা আঙুলে পাউডারের মত মিহি সেই ধুলো মাখাল। এর নাম আবীর। আবীরের রঙ লাল। তার জামাটা ভেজা, ভেজা। সারা জামায়, সামনে পেছনে বেগুনী রঙ। কেমন লাল, কেমন বেগুনী।

হরিচরণ বললো হাত দিয়ে মুছলে যাবে না, তুই মুখটা ধুয়ে আয়।

মুখটা কেমন হয়েছে রে—জিজ্ঞেস করলো শিবু।

লাল হয়েছে, আবার কী

কেমন লাল?

ধুর শালা, কেমন লাল তোকে বোঝাবো কি করে-ধমকের সুরে জবাব দিল হরিচরণ। তারপর ফস্‌ফস্ দেশলাইয়ের কাঠি ঘষার শব্দ, বিড়ির শব্দ। ভীষণ বিড়ি খায় হরিটা। বলেও কোন লাভ নেই। অনেকবার বলে দেখেছে শিবু।

আস্তে আস্তে উঠল সে। সোয়েটারটা হরির পাশে রেখে মুখ ধুতে গেল। ফিরে এসে বললো -হরি, মেলায় যাবি না?

না কোথাও যাবো না, কিছু ভাল লাগছে না

কেন রে—

জ্বরজ্বর লাগছে—

কই দেখি-কাছে সরে এল শিবু, হরিচরণের কপালে বুকে হাত দিয়ে বললো—তোর গা ছ্যাক্ ছ্যাক্ করছে, বাড়ি চলে যা—

না, যাবো না—হরিচরণের বাড়ি পায়রাডাঙ্গা। মাসে দুএকবার বাড়ি যায়। এখানে এক মামা কাজ করে অবনীবাবুর পাইস হোটেলে। রাত বারোটার পর সেখানে মামার সঙ্গে

ধরতে পারে। আবার ভোর পাঁচটার সময় বেরিয়ে আসতে হয়। মামার কাছে একটা টিনের বাক্স আর একটা লক্ষ্মী আছে হরিচরণের। সেই বাক্সের মধ্যে টাকা জমায়, সিনেমার চটি চটি বই রাখে, আয়না চিরুনী রাখে। একটা ভাল প্যাণ্ট আর একটা ভাল সার্ট আছে, তা-ও ওই বাক্সের মধ্যে জমিয়ে রাখে হরিচরণ। আর সারা বছর মামার পুরনো লুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দিয়ে স্টেশনে বসে থাকে, বসে বসে জুতো পালিশ করে। এদিক দিয়ে ভাগ্য ভাল শিবুর। দরজীবাবার জন্য বরাবরই ভাল ভাল জামা, প্যাণ্ট, পায়জামা পরতে পেয়েছে। ইদানীং অবস্থা খারাপ হয়েছে বটে। তবু দু'দুটো প্যাণ্ট, পায়জামা, আর সার্ট আছে শিবুর। পালা-পার্বনে পরে বেরোয়, আজও পরবে। এখন বাড়ি ফিরবে সে।

—তোর কাছে ষোল টাকা আছে আর এই দুটো টাকা রাখ্—হাতার ভাঁজ থেকে দুটো এক টাকার নোট বার করে হরিচরণের হাতে দিল শিবু, তারপর হিসেব করে বললো—মোট জমলো আঠারো টাকা আর বারোটি টাকা হলেই হারমোনিটা নিয়ে আসতে পারবো—

হরিচরণ বললো,—হারমোনিটার জন্য দেখছি, তোর যে আর ঘুমই হচ্ছে না—

—ঠিক বলেছিস রাত্তিরে ঘুমুতে পারি না—শিবুর কথা শুনে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করলো হরিচরণ, তারপর থুক করে খানিকটা থুথু ফেলে, বিড়িটায় লম্বা একটা সুখটান নিয়ে বললো—এত কষ্ট করে তো কিনলি, শেষে তোর মা যদি গালাগালি করে—

—কিনে ফেললে পর আর কি হবে—

কিন্তু কিনেই বা তোর কি হবে, হারমোনিটা ঘাড়ে করে ঘুরতে পারবি তুই—

—তা হোক তবু গানটাতো ভাল করে শিখতে পারবো—বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল শিবু—এখন বাড়ি যাই, দুপুরে লম্বা ঘুম দেব, সন্দেবেলা ঘোষপাড়া যাব, সারারাত গান গাইব মেলায়, এ মাসের মধ্যে বাকি বারোটা টাকা তুলতে পারবো না, কি বলিস্—

—ধুৎ, তোর এই পাগলামীর কোন মানে হয় না—আবার একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করে বললো হরিচরণ—সেই যে কথায় আছে না, বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন, তোর হয়েছে সেই দশা, পেটে ভাত নেই, বাজনা কেনার সখ—

—তা' তুই যাই বলিস—একটু হাসল শিবু—বাজনাটা আমি নেবোই—

বাজারের দিক থেকে খোল-করতালের সঙ্গে গানের সুর ভেসে এল। শিবু কান পেতে শুনলো, তারপর বললো,—আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে—

বাজারের দোকানদার সমিতির লোকেরা খোল-করতাল নিয়ে শহর ঘুরতে বেরিয়েছে। পঞ্চানন ভাণ্ডারের বিধুবাবু ভরাট গলায় একএক পদ গাইছেন, চারপাঁচজন ধুয়ো ধরছে। দলটার পাশে পাশে হাঁটছিল শিবু। হঠাৎ বিধুবাবুর ডাক শুনতে পেল—এইরে, এই শিবে, সামনে আয়, বেশ গলা ছোঁড়ার, এই ওকে সামনে আসতে দাও, কাছে আয়, বুকে আয় আয় বাপধন—কাছে আসতেই দিশি মদের কটু গন্ধ নাকে এল শিবুর। এই সাত-সকালেই মাল টেনে মেজাজে আছেন বিধুবাবু, বললেন—আমার সঙ্গে সঙ্গে ধর—দুইহাতে তালি বাজিয়ে গাইলেন—আবীরে আবীরে ধুম, কেহ মাখে কুমকুম—

তখন বিকেল ফুরিয়ে গেছে। মেলার ভীড়। ভীড়ের চাপ আর গোলমালের ভেতর যেতে সাহস হ'ল না শিবুর। বাস-স্টপ থেকে কয়েক পা এগিয়ে এসে রাস্তার পাশে দাঁড়াল। বাসগুলি এই পর্যন্ত এসে ঘুরে যাচ্ছে। এঞ্জিনের শব্দ, ঘন্টির শব্দ।

শিবুর সামনে রাস্তা দিয়ে দলে দলে মানুষ যাচ্ছে। পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে।

ধুলোর গন্ধ, তেলেভাজার গন্ধ। কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে। কখনো এক এক দল মেয়ে যাচ্ছে। এক ঝাঁক পায়রা ওড়ার মত হাসির শব্দ, এক এক ঝলক সস্তা স্নো-পাউডার, এসেন্সের গন্ধ। কাছেই কেউ ধূপকাঠি পোড়াচ্ছে। এক একবার ধূপের গন্ধ আসছে। এক একবার লোকটার মোটা গলা শোনা যাচ্ছে—চন্দন ধূপ, চন্দন ধূপ, দেবদেবীর পূজো-আরাধনার জন্য—এই বিচিত্র শব্দ আর গন্ধের মধ্যে কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল শিবু। একটু সময় পরে কিছু ধাতস্থ হয়ে গান ধরল। রামপ্রসাদী গান। প্রথমে গলাটা একটু ভার ভার ছিল। সকালের দিকে ঘণ্টা দুই বিধুবাবুদের দলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছিল। তারপর বাড়ি এসে স্নান করে, কলায়ের ডাল দিয়ে একপেট ভাত খেয়ে টানা ঘুমিয়েছে সারা দুপুর। গলাটা ভার ছিল সেজন্য। গান শুরু হতেই পথ-চলতি দুচারজন দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে ছোটখাট ভীড় জমে গেল। আর চারপাশে ভীড় জমলেই কেমন কেমন করে যেন টের পায় শিবু। পা-ঘষার শব্দ, নিঃশ্বাসের শব্দ, জামাকাপড়ের গন্ধ, কলকারখানার মানুষদের গায়ে ঘামের গন্ধ, তেল-কালির গন্ধ, চাষী-মানুষদের গায়ে মাটির গন্ধ, গাছ-গাছালির বুনো গন্ধ। আর মেয়েলি গন্ধের তো কথাই নেই। স্নো-পাউডারের ভুরভুরে গন্ধ, শাড়ির গন্ধ, গয়নার ঠুনঠুন শব্দ। সাঁওতাল মেয়ে-মদ্দরা দল বেঁধে মেলায় আসে। গান বুঝুক আর না বুঝুক হেসে গড়িয়ে পড়বে। তাই যে কোন রকম ভীড় জমলেই টের পায়, উৎসাহ পায় শিবু। গান গাইতে মেজাজ আসে, মন লাগে। টিনের কৌটো বাজিয়ে পরপর দুখানি গান গাইল শিবু। তারপর কৌটোটা সামনে ধরতেই ঝুরঝুর করে কতগুলি খুচরো পয়সা পড়ল।

ভীড়ের ভেতর থেকে শোনা গেল—আরেকখানা, আরেকখানা হোক্—কৌটোর ভেতর থেকে পয়সা গুণে-গুণে পকেটে রাখার সময় একটু হাসল শিবু, বল্লো—আচ্ছা, গাইছি দশ, পাঁচ, তিন, দুই, এক পয়সার মুদ্রাগুলি গুণে গুণে মোট একাশি পয়সা পকেটে রাখল। আবার কৌটোয় তাল ঠুকে ঠুকে গান ধরল। সেই ক্ষুদিরামের ফাঁসীর গান। গানটা খুব চল্‌ছে। অনেকটা সময় নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইল শিবু। তারপর টিনের কৌটো যখন সামনে ধরেছে, ঠুনঠুন করে খুচরো পয়সা পড়ছে, ঠিক সেই সময়—শিবুদা, ও শিবুদা

—কে ছবি!—শিবু চমকে ডান পাশে মুখ ফেরাল—কখন এলে?

—এই তো একটু আগে, তোমার গান শুনছিলাম—

ছবির সামনে কৌটোর পয়সা গুণে নিতে কেমন সঙ্কোচ হ'ল শিবুর। তাড়াতাড়ি কৌটো থেকে মুঠোভর্তি পয়সা তুলে পকেটে রাখল। আবার জিজ্ঞেস করল—তোমার সঙ্গে কে এসেছে?

—আমাদের বাড়ির কেউ আসেনি, আমি পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে এসেছি—

—পাড়ার কে কে এসেছে—

—পুঁটি, শান্তি, হরিদাসী, শান্তির কাকা, কাকীমা—

—ওরা কোথায়?

—ওরা এগিয়ে গেছে, আমি তোমার গান শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, তুমি মেলার ভেতর যাবে না? ছবির কথা শুনে একটু ইতি-উতি করে জবাব দিল শিবু—যা ভীড়, ওই ঠেলাঠেলির মধ্যে—

—আমি তোমাকে নিয়ে যাব, এসো আমার সঙ্গে—খপ্ করে শিবুর হাত ধরে কাছে টানল ছবি। শিবুর সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল।

ভীড়ের মধ্যে আস্তে আস্তে পাশাপাশি যাচ্ছে দুজনে। শিবুর ডানপাশে ছবি। ছবি বাঁহাতে শিবুর ডান কনুইয়ের একটু উপরে শক্ত করে ধরে রয়েছে। শিবুর হাতে লাঠি। বাঁ-হাতে টিনের কৌটো। কিন্তু এখন আর লাঠি ঠুকে ঠুকে যেতে হচ্ছে না। সব ভার ছবির উপর ছেড়ে দিয়েছে। যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল শিবু—খুব লোক হয়েছে, না?

—উঃ কী ভীড়, রাস্তার দুপাশে দোকান, এদিকে আমবাগানের ভেতর কত লোক, ওদিকে বড় পুকুরের চারপাশে দোকান বসে গেছে—খুশিতে ডগমগ ছবি।

ছবির চুলে নারকেল তেলের গন্ধ, গায়ে পাউডারের গন্ধ, কড়া মাড় দেয়া তাঁতের শাড়ির গন্ধ। ভীড়ের চাপে একএকবার শিবুর গায়ের সঙ্গে লেপটে যাচ্ছে। সমস্ত শরীর শিরশির করছে, যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে, ভেতরে ভেতরে ঘামছে শিবু। ছবি কিন্তু আপন মনেই কলকল করছিল—পুটি, শান্তি, হরিদাসী, ওরা কোনদিকে গেল কে জানে, এই ভীড়ের মধ্যে বাপু খুঁজতে পারবো না, যেখানেই যাক, ঘুরে ফিরে বাস রাস্তার কাছে আসতেই হবে—

—এখন যাচ্ছো কোন্ দিকে—জিজ্ঞেস করলো শিবু।

—আগে চুড়ি কিনবো, সুন্দর সুন্দর চুড়ি উঠেছে, ওই দিকে চুড়ির দোকান, মা বলেছিল ভাল চিরুনী পেলে কিনতে একখানা, তারপর একটা ভ্যানিটি ব্যাগ কিনবো—কথা বলতে বলতে একবার ছবির মুখখানি শিবুর মুখের কাছাকাছি এসে পড়লো। ছবির মুখে এলাচের গন্ধ।

শিবু বললো,—খুব এলাচ খেয়েছো বুঝি—

—এলাচ নয়, মিঠে পান—হাসতে হাসতে বললো ছবি—কি করে বুঝলে—

—গন্ধ পেলাম যে—

—বাঃ, তোমার নাকের তো খুব জোর, বাস থেকে নেমেই হরিদাসী পান খাওয়াল, দুখিলি মিঠে পান একসঙ্গে—এমনভাবে বললো ছবি, যেন এই মেলায় এসে দুখিলি মিঠে পান একসঙ্গে খাওয়া খুব আশ্চর্যের ব্যাপার, যেন পৃথিবীতে এমন ঘটনা আর কোথাও ঘটে না, ঘটতে পারে না, যেন জনে জনে ডেকে ডেকে বলার মত একটা খবর।

কোন কথা না বলে একটু হাসল শিবু। ছবির খুশি যেন উছলে উঠছে। হঠাৎ যেন খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছে ছবি, খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে।

ভীড় ঠেলে ঠেলে আরো কিছুটা যাবার পর হরেক রকম ফেরিওয়ালার ডাকাডাকির মধ্যে আচমকা একটা চেনা গলা শুনতে পেল শিবু।

—আসুন, আসুন, গরম গরম পাঁপড়, গরমাগরম, চলে গেল, চলে গেল—লখাইর গলা। ওই এক পেটেন্ট বুলি লখাইর। যা-ই বেচুক, যখনই বেচুক, সব সময় "চলে গেল, চলে গেল" বলে চ্যাঁচাবে। কি গেল, কোথায় গেল, ঈশ্বর জানেন। শিবু ডাক দিল—এই লখাই।

—আরে শিবু যে, আয় আয়, তোর কথা—বলতে বলতে বোধহয় ছবিকে দেখে থমকে গেল লখাই।

—কি করছিস্ তুই—শিবু আর ছবি লখাইর দোকানের সামনে দাঁড়াল।

—পাঁপড় ভাজা নিয়ে বসেছি, খেয়ে দ্যাখ্ একখানা, ভাল পাঁপড়—লখাইর গলা কেমন শান্ত, ভদ্র হয়ে পড়ল, ছবিকে লক্ষ্য করে আপ্যায়নের সুরে বললো—আপনিও নিন্ একখানা—

—না, না, আমি খাব না—ছবি আপত্তি করল—শিবুদাকে দিন্, আমার মুখে পান, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও শিবুদা, আমি ওপাশে চুড়ির দোকানগুলি দেখে আসছি।

শিবুর হাতে একখানি পাঁপড় দিয়ে বললো লখাই,—এই টিয়ে পাখিটি পেলি কোথায়, বেড়ে জিনিস জুটিয়েছিস্, মাইরি—

শিবু শিটিয়ে গেল। লখাইর মুখ বড় খারাপ। কথায় কথায় খিস্তি দেয়, বদ-রসিকতা করে। ছবি শুনলে কি মনে করবে, ছিঃ। চাপাসুরে ধমক দিল শিবু—বাজেকথা বলিস্ না, শুনতে পাবে—

—ওতো অনেক দূরে, ওইদিকে চুড়ির দোকানের সামনে, শুনবে কি করে—

—তা'হোক, তুই চুপ কর, আমার খুব চেনাশোনা—

—চেনাশোনা তো বুঝতেই পারছি, তোদের পাড়ার জিনিস বুঝি—

—ফের বাজে কথা, ওতো আমার বোনও হতে পারে—

—ইস্রো, ন্যাকা-চৈতন আমার, বোনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে গায়ে গা লাগিয়ে কেউ মেলায় আসে না—লখাইর কথা শুনে হেসে ফেলল শিবু, একটু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো —তুই ওকে টিয়েপাখি বললি কেন?

—খুব সুন্দর সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ি পরেছে, গায়ে ওই রঙের ব্লাউজ—জবাব দিল লখাই—পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে, কপালে লাল টিপ্, পয়লা দেখেই আমার টিয়েপাখির কথা মনে পড়েছে—

—ওর গায়ের রঙ কেমন রে—

—শ্যামলা, তবে খুব পাউডার ঘষেছে, বেশ ফর্সা লাগছে—

—চোখ দুটি কেমন—

—সুন্দর, কাজল দিয়েছে, ওই আসছে—বলতে বলতে আবার চ্যাঁচাতে লাগলো লখাই, —গরম, গরম পাঁপড়, চলে গেল, চলে গেল—

—ও শিবুদা'—ছবির গলা—এখানে পছন্দসই পেলুম না, চলো আমরা আরো এগিয়ে যাই—আবার শিবুর হাত ধরলো ছবি। শিবু বললো—আমরা যাচ্ছি লখাই, একটু ঘুরে আসি, পরে দেখা হবে—আবার ভীড়। আবার পাশাপাশি যাচ্ছে দুজনে। ভীড়ের মধ্যে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে ছবি। এবার একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল শিবুর। পেছন থেকে হয়তো লক্ষ্য করছে লখাই। পরে দেখা হলে ঠাট্টা করবে। হয়তো হরির কাছে, নগার কাছে বানিয়ে বানিয়ে আজে-বাজে গল্প বলবে। খানিকটা দূরে এসে সহজ হতে পারল শিবু। লখাইর গলা আর শোনা যাচ্ছে না। আর পাঁচটা হরেক রকম শব্দের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে। চারপাশে কত রকমের ডাকাডাকি, চেঁচামেচি। কয়েকটা দোকান ঘুরে ঘুরে চুড়ি কিনল, চিরুনী কিনল ছবি। শেষে পছন্দমত একটা ব্যাগও কেনা হ'ল। চুড়ির জন্যই খুব খুশী ছবি। দুই হাতে আটগাছা করে ষোলগাছা চুড়ি পরে খুশির সুরে বললো,—কেমন সুন্দর চুড়িগুলি, টুক্‌টুকে লাল রঙ—

—কই দেখি—ছবির নিটোল নরম হাতে আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে চুড়িগুলি নেড়েচেড়ে মনে মনে দেখল শিবু, শেষে বললো—তুমি সবুজ রঙের শাড়ি পরেছ, কপালে লাল টিপ, চোখে কাজল দিয়েছ, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছ, আবার লাল রঙের চুড়িও পরলে—

—ওমা!—ছবি অবাক—তুমি বুঝলে কি করে—

—কি বুঝেছি—

—এই যে আমার চোখে কাজল, শাড়ির রঙ সবুজ, কপালে লাল টিপ—

—তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে—

—বাঃ, অসভ্য!

—সত্যি বলছি—

—কিন্তু বুঝলে কি করে তুমি তো দেখতে পাও না—

—আমি মনের মধ্যে সব দেখতে পাই, আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সব বুঝতে পারি—শিবু হঠাৎ ছবির মুখের উপর আঙুল বুলিয়ে বললো—কই, দেখি তোমার মুখখানি, এই কপাল, এই ভুরু, কেমন সুন্দর টিকলো নাক তোমার—

কয়েক পলক দমবন্ধ করে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল ছবি, তারপরেই তাড়াতাড়ি শিবুর হাতখানা ধরে নামিয়ে দিল—ছিঃ ছিঃ তুমি পাগল নাকি শিবুদা, চারপাশে লোক গিস্‌গিস্‌ করছে—শিবুর যেন হুঁশ হ'লো, যেন খেয়াল হ'লো। সত্যিই তো চারপাশে হাজার মানুষের ভীড়, হাজার মানুষের চোখ ছবিকে দেখছে, দেখতে পাচ্ছে, ছবির গায়ের রঙ, ছবির শাড়ির রঙ, ছবির সুন্দর মুখ।

শুধু সে-ই কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তার চোখের সামনেই অন্ধকার। যদি সে একবার দেখতে পেতো ছবিকে, শুধু একটিবার, শুধু এক পলকের জন্য। ওই যে, ওপাশে চোঙা মুখে দিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় একটা লোক চেঁচাচ্ছে আসুন, আসুন, দেখে যান, ম্যাজিক, আশ্চর্য ম্যাজিক, কাটামুণ্ডু কথা বলে, নরকঙ্কাল টুইস্ট নাচে—

ওই ম্যাজিকওয়ালা যদি এসে বলে—আমি ফুস্‌-মন্তরে এক মিনিটের জন্য তোমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেব, শুধু এক মিনিটের জন্য ছবিকে দেখতে পাবে তুমি, না, না, এক মিনিটও নয়, আমি মনে মনে দশ গুণব, শুধু সেই সময়টুকুর জন্য দেখতে পাবে, তাহলে তার বদলে তুমি আমাকে কি দেবে—তার বদলে শিবু সারাজীবন কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। ওই ম্যাজিকওয়ালার তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে সারাজীবন সে চাঁচাবে- আসুন, আসুন, দেখে যান, ম্যাজিক, আশ্চর্য ম্যাজিক, কাটামুণ্ডু কথা বলে, নরকঙ্কাল টুইস্ট নাচে

ছবি বললো, ও শিবুদা, কি ভাবছো, রাগ করলে নাকি

—না না, রাগ ক'রবো কেন—

—চলো, এখানে আর দাঁড়াব না—

—ছবি, ম্যাজিক দেখবে?

—তুমি তো দেখতে পাবে না।

—তা'হোক, তুমি দেখতে চাও তো চলো

—না, তার চেয়ে ওই দিকে চলো, এসো আমার সঙ্গে- ছবি শিবুর হাত ধরে এগিয়ে চললো।

—ওদিকে কি আছে—যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলো শিবু।

—ওদিকে মস্ত একটা নাগরদোলা বসেছে, চলো আমরা নাগরদোলায় উঠবো -

—হ্যাঁ, তাই চলো—শিবু খুশি হ'লো। কোনদিন সে নাগরদোলায় চড়েনি। ছোট-বেলায় বাবার সঙ্গে দু'তিনবার মেলায় এসেছিল। বাবার কাঁধে চড়ে পাঁপড় খেতে খেতে মেলার গোলমাল শুনেছে। বাবা বেলুন কিনে দিয়েছেন। ফুঁ দিয়ে বেলুন ফাটিয়েছে শিবু। বেলুন ফাটানোর শব্দ শুনে খুব হেসেছে। কিন্তু নাগরদোলায় চড়ার কথা হয়নি কোনবার। তারপর একা-একা যখন মেলায় আসতে পারার বয়স হয়েছে, তখন ভীড় আর গোলমালের জন্য ভেতরে বেশীদূর যেতে কোনবারই সাহস পায়নি শিবু।

নাগরদোলার কাছাকাছি একটা লোক চেঁচাচ্ছিল,—ঘুরপাক, ঘুরপাক, নাগরদোলা, কে

উঠবে, কে ঘুরবে, খোকা ঘুরবে, খুকু ঘুরবে, দশ পয়সা, মোটে দশ পয়সা, ঘুরঘুরঘুরপাক—

শিবু আর ছবি উঠে বসল পাশাপাশি। ঠিক একখানা চেয়ারের মত। লোকটিকে দশ দশ পয়সা দিল ছবি। শিবুই দিতে চেয়েছিল। ছবি শুনল না। নতুন কেনা ব্যাগের ভেতর থেকে পয়সা বার করে দিল।

শিবুর লাঠি আর কৌটোটা ওই লোকটির কাছে জমা রাখতে হ'ল। লোকটি বেশ ভাল। হাত ধরে শিবুকে উঠে বসতে সাহায্য করল।

তারপর গরুর গাড়ির চাকার মত ক্যাচ্‌কাচ্‌ শব্দ করে দুলে উঠল চেয়ারটা। আস্তে আস্তে উপরে উঠতে শুরু করল। তখনো খুব হাসছিল ছবি। তারপর যখন আধপাক ঘুরে জোরে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে চেয়ারটা, হঠাৎ শিবুকে জড়িয়ে ধরল ছবি—ও শিবুদা,' ভয় করছে, পড়ে যাবো না তো—

ছবির চুলের গন্ধে, গায়ের গন্ধে, নরম শরীরের ছোঁয়ায় যেন নেশার ঘোর লাগল শিবুর। মাথাটা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে উঠল। মনে হ'ল যেন হুহু করে পাতালে নেমে যাচ্ছে। ছবির পিঠের উপর বাঁ-হাতখানি রেখে বল্‌লো—ভয় নেই, কাঠের হাতলটা ধরো শক্ত করে। একপাক ঘোরার পরেই আবার উপরে উঠ্‌ছে, মনে হ'ল যেন স্বর্গে উঠে যাচ্ছে। এক একবার স্বর্গে উঠছে আবার যেন পাতালে নামছে। এক, দুই, তিন পাকের পরই চেঁচিয়ে উঠল ছবি, —আমার মাথা ঘুরছে শিবুদা, গা গুলুচ্ছে, ওয়াক্‌, ওয়াক্‌—

—এই, এই, থামাও, থামাও—শিবুর চিৎকার শুনে একটা হইচই উঠল—কি হ'ল, কি হ'ল—কঁকিয়ে ওঠার মত শব্দ করে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেকে পড়ল নাগরদোলাটা। চারপাশে ভীড় জমে গেল।

—কি হয়েছে, ভির্‌মি লেগেছে, বমি করেছে, জল দাও, হাওয়া কর, ওহে এ লোকটি আবার চোখে দেখতে পায় না, কি মুস্কিল!

এত গোলমাল শুনে ঘাবড়ে গেল শিবু। পরের মেয়ে। বাড়ি থেকে এতদূরে এসে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে। অচেনা মানুষ, অচেনা জায়গা।

ভয়ে ভয়ে ডাকল,—ছবি, ও ছবি—

শিবুর কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজেছিল ছবি। হাঁফাতে হাঁফাতে বল্‌লো, আমাকে নামতে দিন, একটু জল দিতে পারেন—

কে যেন বললো—হ্যাঁ, হ্যাঁ জল এনে দাও, আহা, ভীড় ছাড়ুন, সরে যান, সরে যান বমি তেমন হয়নি। খানিকটা জল উঠেছিল। ছবির শাড়িতে, শিবুর জামায় ছিট্‌কে এসেছে। কেমন টকটক গন্ধ। ছবির মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেছে। নাগরদোলার লোকটা শিবুর টিনের কৌটোয় করে জল নিয়ে এল। চোখে মুখে একটু জল দিল ছবি, খানিকটা মুখে নিয়ে কুলকুচো করল। একটু সুস্থির হয়ে বল্‌লো—চলো শিবুদা,' আমরা ওইদিক দিয়ে বেরিয়ে যাই, ভীড়ের মধ্যে আর যাব না—

যে পথে এসেছিল, সে পথে আর নয়। ওই ভীড় ঠেলে আর যেতে পারবে না ছবি। শিবুর ডান হাতে লাঠি, টিনের কৌটো। শিবুর বাঁপাশে, বাঁ-হাতখানি আকড়ে ধরেছে ছবি। আমবাগানের ভেতর দিয়ে অন্য দিক ঘুরে, মেলার বাইরে অনেকটা দূরে এসে পড়ল দুজনে। ফাঁকায় এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ছবি। আস্তে আস্তে পাশাপাশি হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে জিজ্ঞেস করল শিবু—ছবি, এখন কেমন লাগছে—

—ভাল—

—কি কাণ্ড করলে বলো তো—

—কি করবো, মাথাটা ঘুরে উঠেছিল—

—ঘুরেন যখন সহ্য হয় না, তখন নাগরদোলায় উঠতে গেলে কেন—

—আগে বুঝতে পারিনি—বলতে বলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ছবি—ওমা! শিবুদা আমার ব্যাগ—চমকে উঠল শিবু—কই তোমার হাতে নেই···

—না, কখন পড়ে গেছে টের পাইনি—কান্নার সুরে বললো ছবি—ইস্ নতুন কেনা কি সুন্দর ব্যাগটা, মায়ের জন্য কেনা চিরুনী ছিল ওর মধ্যে, দু'টাকার মত খুচরো পয়সা·

হতাশভাবে বললো শিবু—ও আর পাওয়া যাবে না, কোথায় গিয়ে খুঁজবে, বলো—তারপর ছবিকে আরো কাছে টেনে পিঠে হাত বুলিয়ে বললো ·কেঁদো না ছবি, আমি ওর চেয়ে অনেক ভাল ব্যাগ কিনে দেব, চলো আমরা এখন ইস্টিশানে যাই, সেখানে আমার বন্ধু হরির কাছে অনেক টাকা জমা আছে আমার, ইস্টিশানের কাছেই নগেনবাবুর মনোহারী দোকানে সুন্দর সুন্দর ব্যাগ, সুন্দর সুন্দর চিরুনী পাওয়া যায়, চলো সেখান থেকে কিনে দেব ·

ছবিকে সান্ত্বনা দিতে দিতে শিবুর বুকটা যেন ফুলে উঠল। একটি অসহায় কিশোরী মেয়েকে ভরসার কথা বলতে বলতে সে যেন পুরোপুরি পুরুষ মানুষ হয়ে উঠল।

একটু যেন আশ্বস্ত হ'ল ছবি, বললো,· আমার কাছে তো বাস ভাড়াও নেই·

—আমার কাছে আছে—পকেট থেকে একমুঠো খুচরো পয়সা তুলে দেখাল শিবু।

ছবি জিজ্ঞেস করল··কি নাম বললে তোমার বন্ধুর?

—হরিচরণ, কেন···

ছবি হঠাৎ হেসে উঠল। শিবু অবাক—হাসছো কেন?

তোমার বন্ধুর নাম হরিচরণ আর আমার বন্ধুর নাম হরিদাসী· খিলখিল করে হাসল ছবি।

অদ্ভুত মেয়ে! এই কাঁদো কাঁদো হচ্ছে, এই আবার হেসে উঠছে। সরু একটি মাটির রাস্তা ধরে যাচ্ছে দু'জনে। আমবাগান পেরিয়ে এসেছে। দু'পাশে ঝোপ জঙ্গল। দূরে থেকে মেলার গোলমাল ভেসে আসছে। দূরে কোথাও কারা যেন কীর্তন গাইছে। খোল করতালের শব্দ। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। ফুলের গন্ধ। লতাপাতা আর ভেজা মাটির গন্ধ।

ছবি বললো,—কি সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটেছে শিবুদা, কি সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, আহা তুমি দেখতে পাচ্ছো না—

শিবু দাঁড়িয়ে পড়ল, একটু ম্লান হেসে বললো···আমি কিন্তু ফুলের গন্ধ পাচ্ছি, কি ফুল বলোত—বার কয়েক জোরে জোরে শ্বাস টেনে বললো ছবি—গন্ধ আমিও পাচ্ছি, ফুলটার নাম জানি না—

—হেনা ফুলের গন্ধ···শিবু বললো—কেমন চাঁদ উঠেছে, ছবি··

—ভারী সুন্দর, ঠিক সোনার থালার মতো—

—কোন দিকে?

—এই যে, একটু এপাশে মুখটা ঘোরাও—বলতে বলতে শিবুর চিবুকের নিচে আঙুল দিয়ে মুখখানি একটু তুলে ধরলো ছবি।

সেই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যে ছবির হাত ধরে, ফুলের গন্ধ, ঝিঁঝিঁর শব্দ আর মেলার গোলমাল শুনতে শুনতে সুন্দর সোনার থালার মত চাঁদের দিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল শিবু।

"সমর সেনের কবিতা"র দ্বিতীয় সংস্করণটি আমি প্রথম সংস্করণের সঙ্গে তুলনা করে পড়তে পারিনি, প্রথম সংস্করণ আমার কাছে নেই, তবে দুয়েকটি কারণবশত মনে হয় যে গ্রন্থকার এবং প্রকাশক 'সংস্করণ' শব্দটির প্রয়োগ দ্বারা আসলে বোঝাচ্ছেন পুনর্মুদ্রণ, নতুবা দ্বিতীয় সংস্করণে যদি পরিমার্জনা কিছু হয়ে থেকে থাকে সে-বিষয়ে দু-ছত্র বিজ্ঞপ্তি কোথায়ও থাকা উচিত ছিল। গ্রন্থকার ও প্রকাশক অবশ্য কোনো রকম বিজ্ঞপ্তিই দেননি, ইদানীংকার গ্রন্থপ্রকাশন-পদ্ধতিসম্মত ন্যূনতম সম্পাদকী কর্মের পরিশ্রমেও প্রবৃত্ত হননি। কবিতাগুলি কোন্ কোন্ কাব্যগ্রন্থ (অথবা অন্য আকর) থেকে নেওয়া হয়েছে অন্তত এতটুকু তথ্যও তাঁরা পাঠককে দেননি। কবিতাগুলিকে রচনাকালের পর্ব (প্রতি পর্বে তিন চার বৎসর বিধৃত হয়েছে) হিসেবে সাজানো হয়েছে যদিও এই পর্বগুলিকে প্রথম প্রকাশ-তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হলে পাঠককে পরিশ্রম করতে হবে। তেমন পরিশ্রম আমি সামান্যই করতে পেরেছি। "কবিতা" পত্রিকার পুরোনো সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত কবিতাগুলির সঙ্গে কিছুটা মিলিয়েছি (অবশ্য "কবিতা"য় প্রকাশিত অনেক কবিতা এ-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি) এবং এই মিলিয়ে পড়ার ফলে দেখতে পেলাম সামান্য কিছু পাঠভেদ আছে। যতি-চিহ্নের পরিবর্তন (বেশির ভাগই দেখলাম কমা ও ড্যাশ্‌চিহ্নের পাল্‌টা পাল্‌টি) এবং বানান (সোনালি হয়েছে সোনালী, কি হয়েছে কী, কাবুলি হয়েছে কাবুলী, ইত্যাদি) এই কাব্যপাঠে কোনো নতুন ইশারা আনতে পারে না। বাচনিক ভেদ লক্ষ্য করলাম অল্প কয়েকটি (হয়তো আরও আছে, আমার নজরে পড়েনি)--

পৃঃ ২৩, 'মুক্তি' শেষ দুছত্র--

আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

"কবিতা" পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা--

আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

ভাবতে ইচ্ছে হয় যে পুরোনো পাঠটিই শুদ্ধ কেননা শব্দটি 'দ্বীপ' হলেই প্রায়-সমার্থ শব্দ দুটির (নির্জন, নিঃসঙ্গ) প্রয়োগ গ্রাহ্য হতে পারে—দ্বীপটি জনহীন তো বটেই, তার নিকটে কোনো সঙ্গী দ্বীপও নেই—এবং সুদূর কথাটিরও লক্ষণা গভীরতর হয়, অন্ধকারে ঘেরা দ্বীপটি যেন সুদূর মনে হয়। কবি স্মৃতিতে ম্যাথিউ আর্নল্ডের In the sea of life enisled|We mortal millions live alone এই কাব্যভাবনার সংশ্লেষ থাকা বিচিত্র নয়। সুপ্রযুক্ত আমি 'দীপ' শব্দে পাইনে। কে জানে হয়তো ব-ফলার অভাব ছাপারই ভুল। ছাপার ভুল তো কয়েকটিই পাচ্ছি'

৪৬ পৃ— বর্ষার স্নিগ্ধ পশু

৫৫ „ — আপনি বাঁচালে বাপের নাম

৫৭ „ — র-ফলা বাদ দিয়ে ছাপা হয়েছে 'বক'

৬০ „ — পাহাড়ের পাথরে আমার নাম লিখ

৭৫ „ — নব্য 'বলশেভিক' আলাপ

৯৪ „ — ভারত সীমান্তে উদ্যত,ছত্র পীত বন্ধু তার (সহস্র?)

১০৩ „ — পরিত্রাণ

আরেকটি বাচনিক ভেদ দেখতে পাচ্ছি ৪৭ পৃষ্ঠায়। 'কয়েকটি দিন' যখন "কবিতা" পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল (আষাঢ় ১৩৪৫) তখন কথাটি ছিল শৃগাল, এই গ্রন্থে বদলে হয়েছে শেয়াল : "বন্ধুর মাঠে সন্ধ্যায় শেয়াল, কোকিল ডাকে"। বদলের কারণ আমি বুঝতে পারিনি। যদি শব্দপ্রয়োগের ভংসমতা কমানোই অভিপ্রেত ছিল তাহলে 'লোহিত-হলুদ চাঁদ' হত 'লালচে-হলদে চাঁদ', 'গলিত উলঙ্গ শব' রূপান্তরিত হত। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বাচনিক প্রভেদ পাচ্ছি ২৫ পৃষ্ঠায়। নিম্নোদ্ধারে দুই বন্ধনী সীমিত ছত্র দু'টি কবিতাটির আদি রূপে ছিল, এখন নেই।

কিন্তু সাইকেলে-ফেরা কেরাণীর ক্লান্তিতে

দিনের পর দিন

ঘড়ির কাঁটার মন্থর মুহূর্তগুলি মরে :

(মৃত্যু-মুখর রক্তের কান্নায়;)—[বর্তমান সংস্করণে নেই]

ডাস্টবিনের সামনে

মরা কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়

সময় এখানে কাটে

[ছত্রটি আদিতে ছিল—মরে-যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়]

বন্ধন-সীমিত প্রথম ছত্রটির বর্জন এবং দ্বিতীয়টির পরিবর্তন সর্বতোভাবে সঙ্গত হয়েছে। তৃতীয় ছত্রের 'মুহূর্তগুলি মরে'র পরে 'মৃত্যু-মুখর রক্তের কান্নায়' বড়োই অতিকথন; 'মরে-যাওয়া কুকুরের' চেয়ে 'মরা কুকুরের' সুষ্ঠুতর বাক্‌বিধি, আমার মনে হয়, একটি মৃত কুকুরের বদনমণ্ডলে মৃত্যুযন্ত্রণার ছাপ এ হেন যে-ছবিটির রেখাঙ্কণ করা হয়তো কবির উদ্দেশ্য ছিল সে-উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

অন্য এক ধরনের পাঠভেদ শিরোনামা সংক্রান্ত। ২৩ পৃষ্ঠায় কবিতাটির বর্তমান শিরোনামা 'তুমি যেখানেই যাও' আদিতে ছিল না, তখন ছিল শুধু

Amor stands upon you

Ezra Pound

'একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি' এই শিরোনামার পরিবর্তে "কবিতা"য় প্রকাশকালে (আশ্বিন ১৩৪৫) ছিল : For thine is the Kingdom।

৩০ পৃষ্ঠার কবিতাটির বর্তমান শিরোনামা 'মৃত্যু' আদিতে ছিল না, তখন ছিল শুধু

Lo the fair dead!

Ezra Pound

তাছাড়া এই পঞ্চখণ্ডী কবিতার প্রতিখণ্ডের জন্য আলাদা শিরোনামা ছিল 'শেষ রাতে', 'ভোরের কলকাতা', 'আমন্ত্রণ', 'নাগরিক', 'মৃত্যু', এখন এসব শিরোনামা নেই : চারখণ্ডী কবিতা 'চার অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের আদিরূপে একটি সুস্পষ্ট শিরোনামা ছিল—'একটি নিউরটিক কবিতা'—এখন আর পাঠককে শিরোনামার চাবিকাঠি কবি দিচ্ছেন না।

২

সমর সেনের সমগ্র কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এহেন কয়েকটি পাঠভেদ কোনো মস্ত কথা নয়। স্পষ্টতই সমর সেনের কবিকৃতি কীট্‌স্‌ বা টেনিসন্‌ বা ইয়েট্‌স্‌ বা রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন দত্তের কবিকৃতির ধর্মাংশী নয়। এসব কবির রচনা কখনো সম্পূর্ণ হয় না, তাঁদের রচনায় সত্যিকারের কোনো definitive reading থাকে না, যদি তাঁরা সময় ও সুযোগ পেতেন তাহলে কবিতার অংশে অনেক ঘষামাজা করতেন, সুতরাং তাঁদের প্রতিটি কবিতায় (অন্তত অধিকাংশ কবিতায়) বিবর্তনশীল রূপ। এঁরা মূলত শিল্পী। সমর সেনের রচনায় তাঁর সচেতন এবং মুখ্য উদ্দেশ্য শৈল্পিক নয় যদিচ তিনি যে-কবিতাটি শেষ পর্যন্ত রচনা করলেন সেটি বাক্‌শিল্পের নিখুঁত দৃষ্টান্ত হতে পারে। (আমার বিবেচনায় তাঁর কয়েকটি কবিতাই এহেন নিখুঁত দৃষ্টান্ত।) তিনি লেখেন মূলত মনন-সঞ্জাত আবেগের তাড়নায়। একথা বলার মানে এই নয় যে সমর সেনের ধীশক্তি রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন দত্তর ধীশক্তির চেয়ে প্রখরতর। অথবা কীট্‌সের ও টেনিসনের ধীশক্তি শেলির ও ব্রাউনিংয়ের ধীশক্তির চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ। এ কথার মানে শুধু এইটুকু যে কোনো কবির সৃজনীচিত্তে আলোড়িত অজস্র উপাদানের মধ্যে ধীশক্তি অধিক ক্রিয়াশীল, অন্য কোনো কবির বেলা রূপ-ব্যাকুলতা অধিক ক্রিয়াশীল। বস্তুত আমার মনে হয় শুধু যদি ধীশক্তিরই বিচার করি (রচিত কাব্যের প্রমাণে) তাহলে রবীন্দ্রনাথ সুধীন দত্তের কথা ছেড়েই দিলাম, দিব্যদর্শী জীবনানন্দর ধীশক্তিও সমর সেনের ধীশক্তির চেয়ে গভীরতর। তথাপি এঁদের তুলনায় সমর সেনের কবিকৃতি মুখ্যত ধী-নির্ভর। একটি প্রবন্ধে সমর সেন লিখছেন

> এখনো অনেকে বিশুদ্ধ কবিতায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন।...একটি সহজ সত্য এঁরা ভুলে যান যে ভিতরের প্রেরণা যদি কবিতার মূল এবং একমাত্র উৎস হত তাহলে প্রতি বছরে, প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে মহৎ কবিতা রচিত হবার পথে কোনো অন্তরায় থাকত না। কাব্যের ইতিহাসে অন্তরায় আসে, তার কারণ কবিতা বিশুদ্ধ কল্পনা নয়, পরিবর্তনশীল শ্রেণীগতির, স্থানকালপাত্রের মুখাপেক্ষী, এবং মুখাপেক্ষী হলেও মাঝে মাঝে সমাজের মুখ বদলানোর কাজে সাহায্য করতে পারে। সামাজিক পরিস্থিতি এবং অন্তঃপ্রেরণার মধ্যকার আত্মীয়তা জটিল কিন্তু অনস্বীকার্য।...যাঁরা বিশুদ্ধ সাহিত্যে বিশ্বাস করেন, এবং তাঁদের সংখ্যা বাঙালি কবিদের মধ্যে এখনো বেশি, তাঁদের লেখায় ভারসাম্য ক্রমশই কমে আসতে থাকে, এবং তাঁদের প্রতিভা শেষ পর্যন্ত কয়েকটি ম্যানারিজমের প্রকাশে, পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়।
>
> ('বাংলা কবিতা', "কবিতা", বৈশাখ, ১৩৪৫)

এই প্রবন্ধের যুক্তি নিশ্ছিদ্র নয় কিন্তু এসব উক্তির তাত্ত্বিকতা বিচার করা আপাতত আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি বাক্য কয়টির উদ্ধার করেছি আমার উপরোক্ত ধারণার সমর্থনে।—সমর সেনের কবিতার উদ্ভব অন্তঃপ্রেরণায় নয়, উদ্ভব সমাজগতি সংক্রান্ত চিন্তায়; কবিতার পরিণতি শিল্পোত্তীর্ণ হতে পারে কিন্তু কবির মুখ্য উদ্দেশ্য শিল্পোত্তরণ নয়, কালসংবিৎ প্রকাশ। সে-সংবিতেও মহাকালের চেয়ে বরং চলিষ্ণু নিমেষই প্রবল। সব চেয়ে বড়ো কথা এই কবিতার আবেগ অন্তর্বিলাসী তো নয়ই, নির্বস্তুকও নয়, নিরালম্ব নিরাশ্রয় বায়ুভূত নয়, সদাচেতন প্রত্যক্ষতায় ওতপ্রোত, বস্তুনির্ভর। সমর সেনের প্রবন্ধটির রচনাকালে উপরোক্ত ধরনের কথা আরও অনেক শোনা গেছে। তিরিশের দশকে পশ্চিম ইওরোপের অনেক সাহিত্যিক

যে-প্রবাহে চিন্তা করতেন তাকে বলা হত প্রগতি-পন্থা, বাম-পন্থা, দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, ইত্যাদি। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও সে-প্রবাহে অগ্রসর হয়েছিলেন অনেক লেখক। সমর সেনের উক্তির নিকট-প্রতিধ্বনি পাই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে এবং সে-প্রবন্ধের যুক্তিতেও ইতস্তত ফাঁক থেকে গেছে : 'কাব্যের একমাত্র উৎস যদি শুধু অতীন্দ্রিয় অন্তঃপ্রেরণার মোহই হয়, তাহলে কবি সমাজের পক্ষে কতটা দুর্বিষহ হবে সেটো নিজেই তা ক্রমশঃ বুঝেছিলেন বলে হয়ত তাঁর আদর্শ সমাজ থেকে কবির নির্বাসন শেষ পর্যন্ত যুক্তিযুক্ত মনে করেন।......লোকায়ত রূপই যে কবির প্রকৃত রূপ, দিব্যোন্মাদ সে আসলে নয়, এ কথার দীর্ঘ প্রমাণ আজ আর বোধ হয় বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে প্রয়োজন নেই।' 'বিপ্লব ও বাংলা কবিতা", ("কবিতা", আষাঢ়, ১৩৪৬, ৮৪ পৃঃ) 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যে বিশ্বাস নিয়ে সমর সেন অন্যত্র বিদ্রূপ করেছেন : 'বাঙালী সাহিত্যিকেরা উনবিংশ শতাব্দীর স্বেচ্ছাচার-বিলাসী কবিদের আদর্শে বড়ো হয়েছেন...কাব্যকে আমরা কলের জলের মতো দেখতে অভ্যস্ত; হৃদয়ের কল একটু ঘোরালেই যা প্রবল তোড়ে বেরিয়ে আসে তার নামই আমাদের কাছে মহৎ কাব্য।' ("কবিতা", আষাঢ়, ১৩৪৬, ৯৭ পৃঃ)

হৃদয়ের প্রতি অবজ্ঞাশীল, মনন-প্রধান, স্থানকালপাত্রের মুখাপেক্ষী, সমাজগতিতে সক্রিয় অংশীদার—এ-ই হল সমর সেনের আত্মসচেতন কবিস্বরূপ, এমন কবিই তিনি হতে চেয়েছেন।

৩

কোন্ সামাজিক পরিস্থিতিতে সমর সেন কবিতা লিখতে শুরু করেন? দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে সমর সেন একদা ("কবিতা", কার্তিক, ১৩৪৭) প্রেমেন মিত্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন তার কয়েকটি বাক্য লক্ষ্য করুন :

> "প্রথমা" প্রকাশিত হয় ১৯৩২-এ : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তারিখ এটা। গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন তখন প্রায় চূড়ান্তে পৌঁছেছে এবং তার গণ-আন্দোলনে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে। ঠিক সেই সময়ে গান্ধীজীর সহসা-নির্দেশে সমস্ত আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল, অন্তত তার পেছন থেকে জনশক্তি সরিয়ে নেওয়া হ'ল। কিন্তু দেশের যুবকবৃন্দ সম্পূর্ণ সরে আসতে সম্মত হ'ল না এবং যে সন্ত্রাসবাদের বীজ ছিল দেশে, হঠাৎ তা যেন আবার চারদিকে ফেটে পড়ল। সন্ত্রাসবাদের রাজনৈতিক মূল্য নিয়ে যতই মতবিরোধ থাক না, এটা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। মোটের উপর জনগণের দৃষ্টিকে সরিয়ে রাজনীতিতে এল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টি। ... ... এ ক'বছরের মধ্যে [অর্থাৎ ১৯৪০-এর মধ্যে] বাঙালী সমাজমনের অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়ে গেল; তার রাজনৈতিক মূল্যে বাঙালী বিশ্বাস হারাল। যে সহজ মানবধর্মী বিশ্বাস প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহায় ছিল তা আজ যথেষ্ট বলে বিবেচিত নয়। মানবধর্মে বিশ্বাস আজ বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। সামাজিক বৈষম্য, অনাচার, অত্যাচার ও নানাবিধ বিড়ম্বনায় মধ্যবিত্ত কবিদের মনে বিদ্রূপ এবং বিদ্রোহ জমেছে, কাব্যে ও জীবনে মুক্তি ও প্রগতির পন্থা তাঁদের কাছে অন্য রকম।

এ-প্রবন্ধটির মূল্য প্রেমেন্দ্র-কাব্যের বিশ্লেষণ হিসেবে ততটা নয় যতটা সমর সেনের কাব্য-

চিন্তার সূচী হিসেবে। তিরিশের যুগ সম্বন্ধে লেখকদ্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গীও আমার বিবেচনায় অসম্পূর্ণ, একপেশে। সে-যুগে বাঙালী সমাজমনে অবশ্যই পরিবর্তন এসেছিল। কোন্ যুগেই বা না আসে? অতীতের ক্রমসঙ্কীর্ণ vistaর মধ্য দিয়ে দেখলে হাজার বছর আগের কোনো যুগ হয়তো আজকের দর্শকের কাছে মনে হবে স্থবির, নিশ্চল, নিরগ্রসর, কিন্তু সেই হাজার বছর আগের সমকালীন দৃষ্টিতে সেই যুগই মনে হত অস্থির, দ্রুতধাবী, বিপ্লবক্ষুব্ধ। সে হিসেবে তিরিশের যুগের উদ্ভিন্ন-প্রতিভা কবি সমর সেন যদি মনে করেন যে সে যুগের 'কবিদের মনে বিদ্রূপ এবং বিদ্রোহ জমেছে', তাহলে তাঁর মনোভঙ্গী সময়োচিত বটে কিন্তু অনিবার্য নয়, অর্থাৎ অন্য কোনও সৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবির পক্ষে বিদ্রূপ এবং বিদ্রোহমুক্ত মনোভঙ্গীর অধিকারী হওয়া অসম্ভব ছিল না। বস্তুত এহেন মনোভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন কিছু কবি, তাঁরাও সমকাল সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবেই সচেতন ছিলেন, কি জীবনে কি কাব্যচর্চায় তাঁরাও অমলিন ছিলেন, তাঁদেরও সংবেদনায় জীবন ও কাব্য অঙ্গাঙ্গীসম্পৃক্ত ছিল, তাঁদের মনোভঙ্গীর সমর্থনেও যথেষ্ট যুক্তি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। তিরিশের দশকের কাব্যে বিদ্রূপ এবং বিদ্রোহের উৎসার অরোধ্য এমন তত্ত্ব সম্পূর্ণ না মেনেও সমর সেনের কাব্য পাঠক হিসেবে একথা মানতে হবে যে তাঁর বিশিষ্ট সংবেদনায় ও তাঁর সমকাল-চেতনায় ও ঐতিহ্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পক্ষে (এবং সে যুগের আরো কিছু কবির পক্ষে) বিদ্রূপ ও বিদ্রোহ মুখ্য এবং এমনকি একমাত্র কাব্যসার হয়ে উঠেছিল। বিদ্রূপ ও বিদ্রোহ তাঁর নিজস্ব কাব্যাদর্শ, যে-কাব্যাদর্শ তিনি মনে করতেন সকল সমসাময়িকের পক্ষেই অবশ্যম্ভাবী, সে-আদর্শ অন্য অনেক কবি ও কাব্যতাত্ত্বিক মেনেছেন, এদেশে ও বিদেশে, একালে ও সেকালে।

৪

বস্তুত এই বিদ্রূপ ও বিদ্রোহের মিলিত রাগিণী সৃষ্টি বাংলা কাব্যে সমর সেনের একান্ত নিজস্ব এবং (আমার দৃঢ় বিবেচনায়) স্থায়ী অবদান। বিদ্রোহের কাব্য বাংলায় ইতিপূর্বেও ছিল। সমর সেনের নিকটবর্তী ঐতিহ্যেই ছিল নজরুল ইসলামের বহুস্পর্শী বিদ্রোহ। আরো সাম্প্রতিক বিদ্রোহ ছিল বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনায়'। বুদ্ধদেব এ-বিষয়ে লিখেছেন:

> যে-রকম বয়েসে সমর সেন এই কবিতাগুলো লিখেছেন, সেইরকম বয়েসেই আমি 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলি লিখেছিলুম; এই দুই নবযৌবনের কাব্য মনে-মনে তুলনা করতে ভালো লেগেছিল। ইতিমধ্যে আট-দশ বছর কেটে গেছে; দেশের হাওয়া আরো কিছু বদলেছে; তুলনায় এইটেই দেখা গেলো যে 'কয়েকটি কবিতা' অনেক বেশি 'আধুনিক'। 'বন্দীর বন্দনা'র বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, 'কয়েকটি কবিতা'র বিদ্রোহের উৎস সামাজিক বিরোধ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ। নিজের মুক্তির জন্য সমর সেন ব্যস্ত নন, বিধাতাকে অভিশাপ দেবার জন্যও কখনো তাঁর কাব্যে টেনে আনেননি। সৌন্দর্যের উপলব্ধির পথে যে-বাধা সেটা তাঁর পক্ষে আত্মবিরোধ মোটেও নয়; সেটা বৃহৎ সমাজ-স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধ। ("কবিতা", আষাঢ়, ১০৪৪, ৫৩ পৃঃ)

অতি সত্য কথা: "নিজের মুক্তির জন্য সমর সেন ব্যস্ত নন।" ব্যস্ত নন তার কারণ তাঁর পক্ষে কোনো নিছক নিজস্ব মুক্তির প্রয়োজন বা বাসনা নেই, তাঁর মুক্তি সমাজমুক্তির সঙ্গে একাত্ম, অচ্ছেদ্য। এবং সেজন্যই তাঁর মানসে আত্মবিরোধও নেই কেননা আত্মবিরোধ নিতান্তই

রোমান্টিক মনোবৃত্তিতে সংলগ্ন, যে-মনোবৃত্তি মানুষকে পলায়নপন্থী করে তোলে। সমর সেন এই পলায়নপন্থা নিয়ে কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন উত্তম পুরুষের জবানীতে যে-উত্তম পুরুষ আসলে কবির নিজসত্তা-বহির্ভূত মানসের নাট্যায়িত রূপ।

বর্তমানে মুক্তকচ্ছ, ভবিষ্যৎ হোঁচটে ভরা,
মাঝে মাঝে মনে হয়,
দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে
তোমাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ি। ('নিরালা')

তুমি ধন্য, সম্মুখ সমরে হত।
দুর্দিনের আগে কী করে জানাই,
পলায়নজীবিকা আমার,
পৃষ্ঠদেশে চিহ্ন অসংখ্য প্রহারের। ('অজ্ঞাতবাস')

নিজের ছায়াভীরু,
ছায়া ঘন হলে বাইরে বেরোই;
অদৃষ্ট বিরূপ হলে নিষ্ফল পুরুষকার,
* * *
তবু সাহসে বুক বেঁধে, প্রায়-খালি বাসে চেপে
ময়দানে উধাও।
* * *
পলায়ন ছাড়া বেরোবার পথ জানা নেই,
চক্রব্যূহে ঢোকা কেন প্রয়োজন। ('গ্রহণ')

এই নাট্যায়নে আমি-নয় হয়ে গেছে আমি, এবং তাতেই মিথ্যাধ্বংসী বিদ্রূপের সূচিকাভরণও হয়েছে তীক্ষ্ণ ও অব্যর্থ। যে নিজের ছায়াভীরু; পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে অসামর্থ্য ও অনিচ্ছার ফলে যে জীবনে পর্যুদস্ত; যার পৃষ্ঠদেশের প্রহারচিহ্নে তার নিরন্ত-পলায়ন-পরায়ণতার প্রমাণ; যে মুক্তকচ্ছ জীব (পর্যুদস্ত বাঙালীর সুপরিচিত আদর্শ) চক্রব্যূহ থেকে দূরে সরে (যৌবন-প্রতীক অভিমন্যু এবং প্রাণঘাতী কূট চক্রব্যূহের ভাবানুষঙ্গ) পৈত্রিক প্রাণরক্ষা করছে এবং অদৃষ্টনির্ভর হয়ে পুরুষকারকে জলাঞ্জলি দিয়েছে, সে-ব্যক্তি যে "তবু সাহসে বুক বেঁধে, প্রায়-খালি বাসে চেপে ময়দানে উধাও" হয়—সমর সেনের এই শ্লেষ তীক্ষ্ণতায় অনতিক্রম্য, প্রপার্টিয়ুস অথবা ভর্তৃহরির বক্রোক্তির মতো ব্যঙ্গ ও অবসন্নের সংযোজনায় সমৃদ্ধ। লক্ষ্য করা একান্ত দরকার যে কাব্যবস্তু হিসেবে সমর সেনের বিদ্রোহ অন্য কবিদের বিদ্রোহের তুল্য নয়। তাঁর বিদ্রোহ বলে না "ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্, কারা, আঘাতে আঘাত কর্", অথবা,

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন
ভেঙে ফেল মঠ-মন্দির-চূড়া, দারু-শিলা কর নিমজ্জন!
বলি-উপাচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জন!

অথবা, মুক্ত দস্যুবেশে তাই হাস্যমুখে ভেসে যাই উচ্ছ্বসিত স্বেচ্ছাচার-স্রোতে,
উপেক্ষিয়া চলে' যাই সংসার-সমাজ-গড়া লক্ষ-লক্ষ ক্ষুদ্র কণ্টকের

নিষ্ঠুর আঘাত।

অথবা, রুখবে কে আজ? চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার
হাতের মুঠোয় বজ্র, আমরা মিছিলে হাঁটি।
জমিজমা নেই, উপবাস পেশা, কেয়ার কার?
অগ্নিগর্ভ ভাষা আমাদের গানের ঘাটি।

অথবা, Rise like lions after slumber
In unvanquishable number!
Shake your chains to earth, like dew
Which in sleep had fall'n on you:
Ye are Many—they are Few.
(Shelley, *The Masque of Anarchy*)

অথবা,

"On we march then, we the workers, and the rumour that ye hear
Is the blended sound of battle and deliv'rance drawing near,
For the hope of every creature is the banner that we bear,
And the world is marching on."

Hark the rolling of the thunder
Lo the Sun! and lo thunder
Riseth wrath, and hope, and wonder,
And the host comes marching on.
(William Morris, *Chants for Socialists*)

এই কবিতা কয়টিতে এবং এতৎতুল্য দেশী ও বিদেশী ভাষায় রচিত আরো কিছু বিদ্রোহ বিষয়ক কবিতাতে বাক্‌ভঙ্গী ও বাক্‌প্রতিমার সাদৃশ্য লক্ষ্য করার বিষয়। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি এই 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্বন্ধে একটি আলোচনায় দেখিয়েছিলাম যে কয়েকটি বিদ্রোহাত্মক ইংরেজি কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতার বাক্‌ভঙ্গীর প্রবল সমান্তরাল লক্ষ্যযোগ্য যদিও ঐসব অখ্যাত ও বিস্মৃত কবি ও কবিতার সঙ্গে সুভাষের পরিচয় না থাকাই নিতান্ত সম্ভব এবং সে-কারণে কোনো প্রভাব বা ঋণ এক্ষেত্রে খুঁজতে যাওয়া মিথ্যা হবে। আসলে বিদ্রোহের বোধ, কাব্যবস্তু হিসেবে, বড়োই স্বল্পায়তন বোধ. এর মধ্যে বৈচিত্র্যের সুযোগ অতি সামান্য। প্রেম বা নিসর্গপ্রীতি বা মনুষ্যচেতনার মধ্যে অভিনবত্ব অপরিসীম। অপর পক্ষে দেশপ্রেম, ঈশ্বরভক্তি, বিদ্রোহেচ্ছা, এসব যতই উচ্চগ্রামের অনুভূতি হোক না কেন, সে-অনুভূতির পরিসর সঙ্কীর্ণ, তার প্রকাশভঙ্গীও অতএব সঙ্কীর্ণ। তুলনায় দেখবেন এই কাব্যবস্তু নিয়ে রচিত সব কবিতাতেই কয়েকটি ক্রিয়াপদ —ভাঙা, চূর্ণ করা, (বিষাণ) বাজে, (প্রহরী) জাগে, (বাণ) ডাকে, ইত্যাদি—কয়েকটি শব্দ-কলরোল, আওয়াজ, দুশমন, হামলা, বিক্ষোভ ইত্যাদি—কয়েকটি বাক্‌প্রতিমা—পোড়ামাটি, মুহূর্তের খড়্গ, ফণিমনসার ঝাড়, লাল ধ্বংস, বিপ্লবের ধাত্রী, ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন, ইত্যাদি কথাগুলি কবিতায় কবিতায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। (সব কয়টি কথাই সমর সেনের কবিতা থেকে সংগৃহীত, অন্যান্য কবির বিদ্রোহাত্মক বাক্‌ভঙ্গীর সঙ্গে তুলনাকৃত)। এই বাচনিক পুনরাবৃত্তি বিদ্রোহবস্তুর সীমিত পরিসরেই নিবদ্ধ। অনুরূপ পুনরাবৃত্তির যথা

পরন্তু যে দেশপ্রেমাত্মক এবং ঈশ্বরভক্তিসূচক কাব্যেও অবশ্যম্ভাবী সেকথা দক্ষ পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে প্রচুর অভিনবত্ব দেখেছেন।

৫

বাচনিক তুল্যতা সত্ত্বেও অন্যান্য বিদ্রোহাত্মক কবিতার সঙ্গে সমর সেনের কবিতার একটি মস্ত প্রভেদ আমি দেখতে পাই। সচরাচর বিদ্রোহ ক্রিয়াশীল, এনার্জি-সংক্ষুব্ধ, বেগবান, সম্মুখদৃষ্টি। ক্বচিৎ কখনো সমর সেনের কবিতায়ও এনার্জির সংক্ষোভ উত্তাল হয়।

আমাদের মতো সাধারণ লোক
আজ দেশে দেশে
মুষ্টিবদ্ধ প্রতিজ্ঞায়, আত্মদানে, আপনজনের ক্ষয়ে
জীবনের বনিয়াদ গড়ে। যেন মনে রাখি
চল্লিশ কোটি আমরা, বিরাট এ দেশ, এখানে নোকরশাহীর হবে শেষ
যদি বাজে রাম ও রহিমের কণ্ঠে আসমুদ্র-হিমাচল গান
স্বাধীন হিন্দুস্থানে আজাদ পাকিস্তান। ('লোকের হাটে')

এ বসন্ত কাদের? লক্ষ লাল সৈন্য অগ্রসর বলিষ্ঠ জয়গানে,
রক্তলোভী বন্য সৈন্য হত নয় অক্লান্ত অভিযানে,
উদয়ী সূর্যের দেশ প্রাচ্যে ছায়া ফেলে, লড়ে বীর চীনে
নির্মম সঙ্গিনে।
অসংখ্য বর্গীর গোরস্থানে
পুঁজিবাদ চূর্ণ হবে সারা দুনিয়ায়, লুপ্ত হবে এ হিন্দুস্থানে,
হে সরকার, হুজুর সরকার
হুজুর বড়োলাট, জঙ্গীলাট, বর্মাবীর আলেকজান্ডার,
আমরা বান্দা এখনো, তবু বন্দী তোমরা নিজেদের জালে
ইতিহাসের জাঁতাকলে, আত্মঘাতী নসীবের ফলে। ('খোলা চিঠি')

উদ্দীপনার উক্তি এ-দুটির বেশি আমার নজরে পড়েনি সমর সেনের কবিতায়, আরো উক্তি যদি থেকেই থাকে তারা সর্বসাকুল্যে নেহাৎই অল্পসংখ্যক। উদ্দীপনা সমর সেনের ধাতে নেই। তাঁর চিত্ত স্বভাবত বেগবান নয়, ক্রিয়াশীল নয়। উদ্দীপিত ক্রিয়াশীলতা তাঁর রচনায় কাব্যপ্রাণ সঞ্চার করে না। বস্তুত যে-দুটি স্তবক উপরে উদ্ধৃত করেছি সে-দুটিকে কবিতা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এগুলো নেহাৎই rant, সমর সেন যেন আচম্বিতে পার্টির প্রতি নিজ কর্তব্য স্মরণ করে স্তবক দুটি লিপিবদ্ধ করেছেন। আসলে সমর সেনের মেজাজ কর্মীর নয়, রোমন্থকের, তাঁর চিৎশক্তি উদ্দীপনায় নয়, বিষণ্ণ স্মৃতির মন্থর বিশ্লেষণে। স্মৃতি-ভারাক্রান্ত বিষাদ তাঁর কবিতার পরে কবিতায় চিহ্নিত। আমার ধারণা বাংলা ভাষায় স্মৃতিমন্থর মননের কবি হিসেবে সমর সেনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ এ যাবৎ নেই। সমর সেনের কবিচরিত্র অ্যাক্‌টিভ্‌ নয়, মেডিটেটিভ্‌, ধ্যানী, জাবর-কাটা স্মরণে তাঁর কাব্যসৃষ্টির প্রকৃত প্রকাশ।

আজ শুধু মনে হয়,

ক্ষুধিত স্বেদাক্ত মুখের উপরে টর্চের লাল আলোর পর,
পাথর-কঠিন যুগে যন্ত্রণার
আর পৃথিবীতে পুঞ্জীভূত শতাব্দীর স্তব্ধতার পর
সমুদ্রের শব্দের মতো শেষহীন বজ্রের গুরু গুরু প্রতিধ্বনি। ('কয়েকটি দিন')

নিরালা কাল আপন মনে
পুরোনো বিষণ্ণতা হাওয়ায় বোনে। ('নিরালা')

বিষণ্ণ ফিরি, কানে কানামাছির গান। ('পঞ্চম বাহিনী')

কী অতীত, কী স্মৃতি মনে জাগে,
শুধু শূন্যমাঠ, পোড়োবাড়ি, গ্রামের শকুন!
তামাটে প্রান্তরে ব'সে মানুষ কি জানে
রাত্রির কালোঘামে মলিন জীবন-উর্বশী
এখনো নৃত্যরতা কালের তপোভঙ্গে। ('শহরে')

মগজ স্মৃতির জাবরে ভরা, চা আর ধূমপান,
নিষিদ্ধ গান। ('কলরোল')

এরি মধ্যে পুরাতন অস্বস্তি আমাকে ঘেরে,
দিনশেষের আলো। ('শবযাত্রা')

এই স্মরণপন্থী কল্পনায় দিল্লী নগরীর রূপটি (১৯৪৭-এর পূর্বের পুরানো দিল্লী, যে দিল্লী বাদশাহী আমলের ধূলিধূসরিত ভগ্নাবশেষগুলি সামনে নিয়ে ধুঁকত) সমর সেনের কবিতায় চমৎকার রকমে ধরা দিয়েছে :

ভাঙা পাথর, মাইলের পর মাইল;
জরাগ্রস্ত মসজিদ, মন্দির, মোগলাই দুর্গ,
দিনে প্রাচীন বিষণ্ণ গর্বে কঠিন,
অন্ধকারে অবাস্তব; তখন নবীন শৃগাল বারে বারে ডাকে
ভুঁইফোড়ের জয় গর্বে,
কোটরে প্রাচীন পশু শিথিল, শীতে স্তব্ধ। ('শবযাত্রা')

শতাব্দীর কালসন্ধ্যায় দিল্লীর শ্মশান-স্তব্ধতায়
বারে বারে মনে পড়ে : চারিদিকে ধু ধু মাঠ, অনেক দিন বন্ধ আবাদ,
ধ্বংস সাম্রাজ্যের ভয়াল সমারোহে জাগে তুঘলকাবাদ। ('পোড়ো মাটি')

এ-ধরনের স্তবক পড়তে পড়তে মনে হয় কবি-কল্পনা যেন একটা কুয়াশার প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, কুয়াশার ধূসর মাধ্যমে, কুয়াশার প্রায়-নিশ্চল মন্থর গতিতে, শহরের দিকে তাকিয়ে শহরের বিষণ্ণ আত্মা নিজের আত্মায় শুষে নিচ্ছে. অথবা হয়তো বলতে পারি, নিজেরই অপার রহস্যময় আত্মার অনির্ণেয়তল গহন থেকে বিষাদ প্রয়োগ করছে শহরের উপরে : আমারই

চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ। সমর সেনের আদ্যোপান্ত কবিতায় কুয়াশা ও ধুলোর উল্লেখ পুনরাবৃত্ত, তাঁর কবিতায় বহু-ব্যবহৃত প্রিয় শব্দগুলির মধ্যে এই কয়টি : ধূসর, স্তব্ধ, ক্লান্ত, ম্লান, ভাষাহীন, নিঃশব্দ, অন্ধকার, দুঃস্বপ্ন, বিষন্ন।

সমর সেনের বিদ্রোহ তাহলে বাংলা কাব্যে (আমার যতদূর জানা আছে, বহু বিদেশী কাব্যেরও তুলনায়) একটা তুলনা রহিত, বিশিষ্ট, অনন্য রূপ ধারণ করেছে। এ-বিদ্রোহ উচ্চকিত নয়, বিষন্ন এবং চিন্তামন্থর। সমর সেনের কবিচিত্ত আদৌ extrovert নয়, introspection তার ধর্ম।

৬

কিন্তু এই ধ্যানী বিষাদে কোনো ভাবালুতার খাদ নেই কেন না শাণিত মননের তেজবহ্নিতে পোড় খেয়ে সে-বিষাদ শুদ্ধ হয়েছে। যদি ভাবালুতা থাকত তাহলে সমর সেনের কবিতা অসহ্য হত। আমি যতদূর বুঝতে পারি সমর সেন তাঁর বিষাদ খুঁজে পান নি কোনো মেটাফিজিক্সের উৎস থেকে যেমন পেয়েছিলেন লেপার্দি বা হার্ডি বা এমন কি মোহিত মজুমদার অথবা যতীন সেনগুপ্ত। বিশ তিরিশের দশকের যুগে, বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষে, কোনো সংপ্রত্যয়সম্পন্ন সুশিক্ষিত প্রত্যক্ষজ্ঞানধর্মী বুদ্ধিজীবী যেমনভাবে বস্তুময় ঘটনা প্রবাহের এম্পিরিক্যাল জড়বাদী ব্যাখ্যা করতেন, সমর সেনও তেমনটিই করেছেন। আমার ধারণায় কবিতা হিসেবে সমর সেনের কবিতার মূল্য জড়দর্শনে নয়, তার আদ্যোপান্ত প্রত্যক্ষ-চেতনায়, বস্তুময়তায়। (অবশ্য মানতে হবে যে তাঁর বস্তুময়তা একটা শক্তিমান কাঠামো পেয়েছিল দ্বান্দ্বিক জড়দর্শনে।) বস্তুময়তা থাকলেই কাব্য মহৎ হয় না, কিন্তু পক্ষান্তরে কাব্য মহৎ হলেই বস্তুময়তা তার অন্যতম উপাদান হতেই হবে : দান্তে বা শেক্সপিয়রে, মহাভারতে কালিদাসে এবং রবীন্দ্রনাথের কতক অংশে বস্তুময়তার ভিত্তিতে মহত্ত্ব গড়ে উঠেছে। সমর সেনের বস্তুময়তায় মহত্ত্বের সম্ভাবনা ছিল যদিও তাঁর কাব্য শেষ অবধি মহৎ হয়ে উঠতে পারে নি, সে-অপারগতার হেতু পাওয়া যাবে বস্তুময়তায় নয়, অন্যত্র। তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িকের কাব্যে যে নির্বস্তুক বায়বীয় ভাববিলাস পাঠকের কাছে হাস-পাতালের রোগশয্যার পারিপার্শ্বিকের মতো অস্বস্তিকর তার প্রতিতুলনায় সমর সেনের সাবয়ব, এমন কি স্থূলে, বস্তুচেতনা যে কোনো কালে কাব্যানুরাগীর সম্বর্ধনা পাবে।

তাঁর চারদিককার বস্তুজগৎ সমর সেন লক্ষ্য করেছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, লক্ষ্য করেছেন এবং তাদের মূল্যায়নও করেছেন, সেই মূল্যায়নেই তাঁর সংস্কৃতিবান মননশক্তির পরিচয়। বস্তুজগৎ বিধৃত হয়েছে এমন কয়েকটি বাক্‌প্রতিমার উল্লেখ করছি, পর পর দশটি পৃষ্ঠার প্রত্যেকটি থেকে একটি প্রতিমা নেওয়া হয়েছে :

৪৬ পৃঃ— বসন্তের কার্জন পার্কে
বর্ষার সিক্ত পশুর মতো স্তব্ধ ব'সে

৪৭ পৃঃ— দীর্ঘ দিনে করাল রৌদ্র নির্মম ঐশ্বর্য বিলায়,
উপরে ধূর্ত কাকের ভিড়,
গরুর গাড়ির ছায়ার পিছনে।

৪৮ পৃঃ— ক্ষুধিত স্বেদাক্ত মুখের উপরে টর্চের লাল আলোর পর

৪৯ পৃঃ— গলিত দেহের উপরে গভীর রাত্রে ঘোরে
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ শকুন

৫০ পৃঃ— কার্নিভাল শুরু হল, রেসখেলা শেষ,
কঙ্কালবর্ণ কুয়াশায় দেখ ছেয়েছে নগর

৫১ পৃঃ— পড়ন্ত রোদে নগর লাল হল

৫২ পৃঃ— চোখের সামনে সোনালী আলোয়
অবিশ্রাম ধূলিকণা
দীর্ঘরেখায় আপন মনে নামে,
বর্ণহীন বর্শা কার।

৫৩ পৃঃ— সেখানে দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে
গরুর মতো করুণ চোখ
বাঙলার বধূ নামে

৫৪ পৃঃ— দেখি,
বিকেলের নদী নির্বিকার নীল,
ধানক্ষেতে সন্ধ্যার সবুজ জমে

৫৫ পৃঃ— সন্ধ্যার ট্রেন আকাশে ধোঁয়ার স্তম্ভ আঁকে

কবি বলছেন, দেখি। আর বাস্তবিকও এই বাক্‌চিত্র কয়টির প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষতায় প্রদীপ্ত এবং এহেন প্রত্যক্ষসাধ্য বস্তুময়তা এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রত্যেক পাতায় পাওয়া যাবে। প্রত্যক্ষতা সমর সেনের উপমাগুলিতেও পাই :

২৩ পৃঃ— হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এল
৩২ পৃঃ— অন্ধকার ঝুলছে শুয়রের চামড়ার মতো
৩৩ পৃঃ— নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে
৩৪ পৃঃ— শূন্য মরুভূমি জ্বলে/বাঘের চোখের মতো
৩৬ পৃঃ— আদিম জন্তুর মতো বিরাট মেঘ
৪৩ পৃঃ— অন্ধকারে স্তব্ধ ইঁদুরের মতো
৪৬ পৃঃ— বর্ষার সিক্ত পশুর মতো

বস্তুময়তা ছাড়াও এই উপমা কয়টি (এগুলি আমি জেনেশুনেই বেছেছি) পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে কেননা উপমান সব কয়টি দৃষ্টান্তেই এক,—পশু। এই পুনরাবৃত্ত উপমানের উৎস কি ইয়েট্‌সের What rough beast. . .slouches towards Bethlehem to be born ?—যে-কবিতার সঙ্গে সমর সেনের অপরিচয় অসম্ভব, অথবা এই পুনরাবৃত্তির ব্যাখ্যা

কি হবে ফ্রয়েডীয় পন্থায় কবির ব্যক্তিজীবনের অবচেতনে লুপ্ত কোনো জান্তব স্মৃতির সন্ধান? আমি নিজে সাহিত্যালোচনায় এ-পর্যায়ে উৎস এবং আকরের চেয়ে শিল্পিত রূপান্তরে বেশি আগ্রহী এবং এইটেই আমার বিবেচনায় মূল্যবান কথা যে সমর সেনের বস্তুধর্মিতার স্বাক্ষর তাঁর নানারকম বাক্‌প্রতিমায় এবং তাঁর অন্যান্য বাগৈশ্বর্যে (যার উদাহরণ আমি আর পেশ করছি না), যথা বর্ণনা-স্তবকে, বিশেষণ-প্রয়োগে, শব্দে শব্দে ও ছত্রে ছত্রে সম-বিপরীতের যোজনায় (যাকে ইংরেজিতে বলা হয় antithesis), ঠাসবুনট শ্লোকে, ইত্যাদি।

এই সর্বব্যাপী বস্তুময়তার প্রসঙ্গে লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে সমর সেন শহরের কবি, মহানগরী কলকাতার কবি এবং (কয়েক বৎসর প্রবাসকালের জন্য) দিল্লীর কবি। নগর-জীবনের মাঝে মাঝে সম্ভবত তিনি ছুটি নিতেন এবং আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত কলকাতা-বাসীর মতোই এক রাত্রির ভ্রমণদূরত্ব অতিক্রম ক'রে সাঁওতাল পরগণার এখানে-সেখানে কয়েকদিন কাটিয়েছেন, সেজন্য আমরা এমন ছত্র পাই :

> সাঁওতাল পরগণার নিঃসঙ্গ স্তব্ধতা।
> ধুলোভরা নির্জন পথে মোটরের কর্কশ শব্দে
> একটি হরিণের ঊর্ধ্বশ্বাস, ধাবমান বেগ (১৮ পৃঃ)
>
> আর অন্ধকারে লাল কাঁকরের পথ
> পড়ে থাকে অলস স্বপ্নের মতো (২২ পৃঃ)
>
> রক্তিম প্রাণ গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া গাছে আসে:
> আজ শহর হ'তে বহুদূরে, শালবনের পথে
> বালুতে অতিক্রান্ত দিনরাত্রির ভগ্নস্তূপ,
> বিকেলে কাঁকরে রুক্ষ দিগন্তপ্লাবিত লাল সৌন্দর্য (৪৭ পৃঃ)
>
> কিছু দূর দেশে দিগন্তে লোহিত সূর্য
> কুয়াশায় ঝাপসা পাহাড়
> লাল পথে কালো সাঁওতাল মেয়ে (৫৮ পৃঃ)

অসাধারণ নয় এই বাক্‌চিত্রগুলি, কোথাও মাত্র একটি শব্দের বহুলক্ষণবিশিষ্ট বাক্‌নিপুণতা নেই (যেমন, ধরা যাক, পাওয়া যাবে টেনিসনের And crowded farms and lessening towers-ছত্রে অথবা মোহিত মজুমদারের "আসে যথা রাত্রি ঊর্মিস্বনী শব্দহীন কলস্বনে") কিন্তু এই চিত্রাণু কয়টিতে একদিকে যেমন দর্শন ও বর্ণনের যথাযথ আনুরূপ্য তেমনি কবিচিত্তের অনতিসংগুপ্ত প্রতিতুলনাবোধ—কলকাতার দৃষ্টিতে মহুয়ার দেশের আবেদন, খানিকটা যেন নস্ট্যালজিক, যেন রোমান্টিক মনোভঙ্গীর দূরাভাস। কিন্তু সমর সেনের মন তীক্ষ্ণভাবে, বেদনার্ত ভাবেই, বস্তুচেতন, ভাববিলাসী নয়, এবং সেজন্য সাঁওতাল পরগণার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের গভীরে যে-সব প্রতিপন্থা নিহিত সেগুলি তাঁর মনোযোগ এড়ায় না :

> তারপর এই কর্কশ বালুতে, এই রক্তপথে
> আকাশের নিবিড় নীল আগুন লাগল।

আসমানে ও জমিনে কতই প্রভেদ! এবং এই প্রভেদের সঙ্গে মিশেছে মানুষের জীবন-সংগ্রাম,

'সভ্যতার কবলগ্রস্ত হয়েছে মহুয়ার দেশ :

মহুয়া বনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ,
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন! (২৯ পৃঃ)

সমর সেনের কবিতার যে-আঙ্গিক অসতর্ক পাঠকেরও নজরে পড়ে—বিপরীতের সংশ্লেষ—এ-ছত্র কয়টিতে সে-আঙ্গিক অনুপস্থিত নয়। একদিকে শিশিরে-ভেজা সবুজ সকাল, স্নিগ্ধ আলো, প্রাণের উৎস শিশিরকণা, ভোরের সতেজ নবীনতা, অন্যদিকে মানুষের অবসন্ন শরীর, ক্লান্তি, ধূলির কলঙ্ক, বিনিদ্রতার অতৃপ্তি ও জড়তা, নবজীবনের সম্ভাবনা-স্বপ্নের পরিবর্তে দুঃস্বপ্ন। সমাজ-ব্যবস্থা মহানগরীতে আপন ক্ষয়কারী প্রভাব বিস্তার করে নিরস্ত হয়নি, মেঘ-মদির মহুয়ার দেশেও আগন্তুক বিস্মৃতির সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। অতএব যে-ললিত বেদনার রহস্যময় মাদকতায় রোমান্টিক চিত্ত শিহরিত হতে পারত,

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ। (২৯ পৃঃ)

সেই বেদনার মাধুরী নিয়ে কবি থেমে দাঁড়াতে পারেন না। এই ছত্র কয়টির তুল্য রোমান্টিক বাক্‌লক্ষণা যে কোনো ভাষাতেই বিরল, কিন্তু সমর সেনের বস্তুচেতন বিশ্লেষণপরায়ণ নির্মম (কেননা সত্যনিষ্ঠ) সৃজনীশক্তি যুগপৎ শুনতে পায় সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস ও কয়লার খনির বিশাল ধ্বনি, দেখতে পায় দেবদারু-ছায়ার বিলম্বিত রহস্য আর দিবালোকের ধূলি-কলঙ্ক, অনুভব করতে পারে রাত্রির নির্জন নিঃসঙ্গতা আর অপূর্ণনিদ্র প্রভাতের দুঃস্বপ্ন। নিছক রোমান্টিক হয়ে থাকার মধ্যে স্বস্তি আরাম ও বিগলিত মাধুর্য অবশ্যই আছে কিন্তু প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি কম। প্রত্যক্ষচেতন সমর সেন রোমান্টিক হতে গিয়েও (১৯৩৪-৩৭ কালপর্বের কয়েকটি কবিতাই রোমান্টিকতা এবং রোমান্টিক সম্ভাবনায় উজ্জ্বল) 'এবার ফিরাও মোরে' বলে' তাঁর অনতিদীর্ঘ যাত্রা শুরু করলেন মনন-বিশ্লেষণ-বিদ্রূপের ঊষর বন্ধুর কাব্যপথে। ক্রম-ঘনায়মান প্রত্যক্ষতার রূঢ় সংস্পর্শে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ অবলুপ্ত হয়ে গেল, ১৯৪০-এর পরে সাঁওতাল পরগণা অদৃশ্য হয়ে গেল সমর সেনের কবিতা থেকে।

৭

কলকাতার কবি সমর সেন দেখেছেন মহানগরীর ক্লিষ্ট অসুন্দর রূপ।

ম্লান হয়ে এল রুমালে
ইভনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ—

হে শহর হে ধূসর শহর!
কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে শহর হে ধূসর শহর' (৩৪ পৃঃ)

বাণী ও বেদনা মিলেছে অদ্ভুত রকমে। এই ধূসর শহরের রাস্তায় সদলবলে গান গায় দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছাসেবক (১৬ পৃঃ): এখানে আকাশে ধোঁয়ার ক্লেদ, চারদিকে ধোঁয়ার গন্ধ, আর হাওয়ায় অসংখ্য ধুলোর কণা জীবন্ত বীজাণুর মতো (১৯ পৃঃ): এখানে সাইকেলে-ফেরা কেরানীর ক্লান্তিতে দিনের পর দিন ঘড়ির কাঁটায় মন্থর মুহূর্তগুলি মরে; ডাস্টবিনের সামনে মরা কুকুরের মুখের যন্ত্রণার সময় এখানে কাটে (২৬ পৃঃ): এখানে কলের বাঁশির তীব্র হাহাকার ধ্বনিত হয় দিক থেকে দিগন্তে, রিকশার উপরে ক্লান্ত চীনে গণিকা চোখ বোজে, চারদিকে ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ, প্রান্তরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ক্লান্ত স্বর্ণাঙ্গিনী শীর্ণহাতে ঠোঁটে রং মাখে, কত উৎসুক চোখে অশ্লীল, নাগরিক আনন্দ, পিচের পথে অগণিত মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপ, শীতের আকাশে অন্ধকার ঝোলে শূয়রের চামড়ার মতো আর সন্ধ্যা নামে শীতের শকুনের মতো (৩০-৩৩ পৃঃ); মহানগরীতে আসে বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি, হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ আর সারা-দিন শোনা যায় পাথরের উপরে রোলারের মুখর দুঃস্বপ্ন (৩৭ পৃঃ); এখানে যতদূর চাই ইঁটের অরণ্য, দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাসের পরে ক্লাইভ স্ট্রীট জনহীন, দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড়, খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শোনা যায় (৩৮-৪০ পৃঃ),

আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি। (৪০ পৃঃ)

এই কলকাতা শহর। ক্ষয়, ক্ষয়, ক্ষয়, বিকৃতি, ক্লান্তি, দুঃস্বপ্ন, হাহাকার, মৃত্যুর মতো মন্থর জীবন, মৃত্যু-যন্ত্রণা। এই কলকাতা শহর। মনে পড়ে উনিশ শতকের শেষ দিককার কবি জেম্‌স্ টম্‌সনের লন্ডন নগরী· সিটি অব্ ড্রেডফুল নাইট্। সমর সেনের কবিতায় প্রেমের বিকৃতিতে বেদনা উত্তাল কেননা সুন্দরের স্বপ্নে কবির চিত্ত এখনো মথিত হয়।

এই আকাশের পিছনে কি কাঁপছে
নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন? (৩০ পৃঃ)

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়
হে মহানগরী!
রুদ্ধশ্বাস রাত্রির শেষে
জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন (৩৮ পৃঃ)

মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি:
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন। (৪০ পৃঃ)

তবু জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,
তবু জানি,
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে। (৪৫ পৃঃ)

বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহারে বিক্ষত পর্যুদস্ত মহানগরীর সর্বৈব বিকৃতির মধ্যেও কবির স্বপ্ন (পলায়নী বিলাপের নয়, সৃষ্টির) উত্থিত হয়েছে প্রচণ্ড প্রত্যয় থেকে এবং সে-প্রত্যয় স্থায়ী, উচ্চশির হওয়া সম্ভব হত না যদি না মননের দৃঢ় কাঠামো তার সঙ্গে জুড়ে থাকত। জীবন-প্রত্যয়ের কাব্যায়ন বড়ো কঠিন, কোন্ মুহূর্তে যে প্রত্যয়ের উচ্চারণ শোনাবে শূন্যগর্ভ কলসীর নিনাদের মতো, কোন্ ক্ষণে হরিহর হয়ে যাবে খাঁটি ও ভেজাল, সে কথা বলা দুষ্কর, সে-বিষয়ে কোনো আইন নেই, কোনো বিধিবদ্ধ প্রণালী নেই, শুধু রুচিবান্ কবিতা-পাঠক অন্তরের উপলব্ধিতে জানতে পারেন প্রত্যয়ের খাঁটি কবিতায় স্পন্দিত হয়, যেমন হয়েছে উধৃত স্তবকটিতে, একটা বলিষ্ঠ অস্মিতা। সমর সেনের কাব্যে তাঁর সোশ্যালিজ্‌ম্ অচ্ছেদ্য এবং অমূল্য অঙ্গ। যে সমাজ-রাজ-অর্থনৈতিক দর্শন থেকে, যে ইতিহাস-চেতনা থেকে, যে মানবধর্মী দায়িত্ববোধ থেকে, যে সংস্কৃতি-শিক্ষা-অনুশীলনের নির্ভরে, সমর সেনের কাব্যপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার বিপ্রলাপ অসম্ভব নয়, বস্তুত আমাদের দেশ ইদানীং এহেন বিপ্রলাপে এবং বিরোধে মুখর ও অস্থিতপ্রজ্ঞ, কিন্তু সে-মুখরতায় বিভ্রান্ত না হয়েও আমার সীমিত-সঙ্কল্প কাব্য-আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে পেীছতেই হবে যে সমর সেনের কাব্যে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে এই প্রত্যয়ও শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রাণশক্তি হতে পারে।

৮

কিন্তু এই মনন-বলিষ্ঠ প্রত্যয়েই নিহিত সমর সেনের বিদ্রূপভঙ্গী কাব্য। একদা সমর সেন সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছিল—"নব যৌবনের কাব্য"—সে-আখ্যা আদৌ সুষ্ঠু বলে আমার মনে হয় না। বরঞ্চ আমার মনে হয় সমর সেন শুধু মধ্যবিত্ত সমাজের কবি নন, মধ্যবয়সের কবি, এমন কি মধ্যবয়স পেরিয়ে জীর্ণ জরার কবি।

বৃদ্ধ মহাকাল
ক্ষয়িষ্ণু জীবনে এনেছে জরার যন্ত্রণা (৪৯ পৃঃ)

কত দিনের ক্লান্তিতে কলের বাঁশি বাজে:
পিছনে সমস্তক্ষণ ক্ষিপ্রগতি বাসের শব্দ (৫৬ পৃঃ)

এই ক্ষয়িষ্ণু জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছে boredom একঘেয়েমি

সময় কাটে,
সময় কাটে ট্রামের অবিরাম মুখর শব্দে (৩১ পৃঃ)

বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ,
তবু নিজেকে কতদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে,

জিভে স্বাদ নেই, জানি না
কী পাপে সুন্দর শরীর ঘুণের আশ্রয়। (৭০ পৃঃ)

এবং এই ঘুণে-ধরা দেহমনের পরিণাম এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

তাই দিনান্তে কলের বাঁশিতে
মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে
করাল শূন্যের বুকে
নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে;
লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ। (৭০ পৃঃ)

জীর্ণ জরা রূপান্বিত হয়েছে অতল শূন্যে, নেতিবাদে নিঃসত্তা হয়েছে শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎ—শূন্যতার এমন রূপায়ণ যে কোনো কাব্যেই অতুলনীয়।

এত বাষ্প, এত তিক্ততা মধ্যবয়সেরই ধর্ম, যে-মধ্যবয়সে ভাবজগতের চেয়ে বস্তুজগৎ অধিকতর এবং নিষ্ঠুর সত্য, যে-বস্তুজগতের অন্তর্নিহিত বিরোধগুলি স্বচ্ছ বুদ্ধির সূতীক্ষ্ন বিশ্লেষণে বিদ্ধ হতে পারে। (সমরের কবিতায় 'বর্শা' এবং 'ইস্পাতের ফলক' বারংবার বাক্‌প্রতিমায় প্রযুক্ত হয়েছে।) এই কবিতা-সংকলনে আমি একটি কবিতা দেখতে পাচ্ছি না, 'পুনরুজ্জীবন'-শীর্ষক যে-কবিতাটি ছাপা হয়েছিল "কবিতা", ১৩৪৪ পৌষ-সংখ্যায়। আমার মনে হয় সমর সেনের কাব্য-মনোভঙ্গীর অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত এই কবিতাটিতে এবং সেজন্য আমি সম্পূর্ণ কবিতাটি উধৃত করলাম।

(১) শান্ত-নীল চোখে জীবনের ক্লান্তি,
সেই পুরাতন স্পন্দমান বাসনা আর নেই,
সেই স্বাধিকারপ্রমত্ত রক্তের অন্ধ জয়গান।
শুধু গোয়ালে গরুর কাশি, অগ্নিচক্রে পৃথিবী কাটে,
আর শীর্ণ ছায়ারা ঘোরে শীতের শব্দধর সহরে;
তুচ্ছ পরিণাম!

(২) আবার নিঃশব্দ হিংস্র প্রান্তরে
রক্ত পতাকা আকাশে ওড়ে :
প্রখর, নিঃশব্দ দিন,
অমাবস্যার আকাশের ঘনগম্ভীর গান,
মহাশূন্যে শুনি বুঝি গাণ্ডীব টঙ্কার!
আবার বারে বারে মনে হয়
সঙ্কীর্ণ শেষ মৃত্যু এখনো দূরে, বহুদূরে,
আবার দিকে দিকে যুগান্তরের ডম্বরু বাজায়
উদ্যত জীবন্ত পৃথিবী।

সুন্দর কবিতা, সমর সেনকে বুঝতে হলে এটি অপরিহার্য কবিতা। আঙ্গিকের হিসেবে সমগ্র কবিতাটি যেন একটি দ্বিচরণ শ্লোকের আঠারো শতকী অ্যান্টিথীসিস্, দুটি বিপরীত চিন্তায় ভারসাম্য পেয়েছে একটি বৃহত্তর চিন্তা। প্রথম অংশটির চতুর্থ এবং পঞ্চম ছত্রে ক্ষয়শীল সমাজের প্রতীক (যদিও আমি 'অগ্নিচক্রে পৃথিবী কাটে'—এই বাক্‌-

প্রতিমাটির ব্যঞ্জনা বুঝতে পারলাম না) : গোয়ালে গরুর কাশি, ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ শীর্ণ ছায়ারা। একদিকে এই তুচ্ছতা, সবস্তুক প্রত্যক্ষ তুচ্ছতা, এই তুচ্ছতা-ই কবির পারিপার্শ্বিক জগতে, সে-জগৎ বর্ণনা করতে হয় নঙর্থক শব্দপ্রয়োগে। অন্যদিকে প্রতীক হল রক্তপতাকা, একদা-স্বাধিকারপ্রমত্ত, অধুনা-নির্বীর্য-অশ্ব রক্তের পুনরুজ্জীবন, সে-রক্ত এখন ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান পতাকা। গোয়াল ঘরের দৈন্য, জড়তা, নিস্পন্দ তুচ্ছতার প্রতিতুলনায় এখন প্রতীকের ব্যঞ্জনায় বিধৃত হয়েছে সংগ্রাম, শক্তি, গম্ভীর সমবেত সঙ্গীত, গাণ্ডীব টঙ্কার, ডম্বরুবাদন, এখন পৃথিবী আবার হয়েছে জীবন্ত, উদাত্ত।

কিন্তু সমর সেনের কবিতায় নবজীবনের সম্ভাবনা যদি উচ্চারিত হয়ে থাকে একবার, তাহলে লোল জরার স্তিমিত প্রাণধারণের গ্লানি, তার কলুষিত লালসা, তার অক্ষম কামনা, নানাভাবে বিদ্রূপ-কশায়িত হয়েছে পনেরোবার। এমনই হওয়া স্বাভাবিক, কেননা বাস্তব-বাদী হিসেবে সমর সেন প্রধানত সমকালীন বস্তু-পরিবেশে নিবদ্ধদৃষ্টি, ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ী কিন্তু সে-সম্ভাবনা এখনো সন্নিকট নয়। "জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে"। একদিন, কিন্তু, সে-একদিন এখনো বড়ো দূরে। এখন ব্যক্তি লাঞ্ছিত, ভয়গ্রস্ত, সঙ্কুচিত, এখন পিত্তরসে তিক্তচিত্ত পরাস্ত বাঙালী অনালোক ভূগর্ভ-বিবরে আশ্রয় নিয়েছে, এখন সমাজ রুদ্ধগতি, ক্লেদাক্ত, আত্মপ্রতারণায় নিবিষ্ট। কেউ যদি বলেন, হে কবি, সমাজের দিকে তাকাও কেন, আকাশের দিকে তাকাও, পাখির গান শোন, প্রথম বর্ষা-সিক্ত ধূলির আঘ্রাণে তৃপ্ত হও। বলতে পারেন, কিন্তু সমর সেনের জবাব হবে

কিন্তু বুঝি না তাকে,
দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,
দুনৌকোর যাত্রী এই বাঙালী কবিকে,
বুঝি না নিজেকে। (১২৬ পৃঃ)

এই জীর্ণ জরা-পরিহিত নিরানন্দ দেশকে বিদ্যুত-জীবনে উচ্চকিত করার পন্থা, সমর সেনের পক্ষে, বিদ্রূপের আঘাত হানা, যেমন কিনা এদেশে ও বিদেশে, অধুনা ও অতীতে, অনেক কবি-ই স্যাটায়ার-পন্থা অবলম্বন করেছেন। স্যাটায়ারের দুই স্তর : উপরিতলে চূর্ণ করার ধ্বংস করার প্রয়াস, নঙর্থক প্রয়াস; গভীরতলে সদর্থক প্রত্যয়, নতুনের প্রস্তুতি। সমরের কাব্যে দুটি স্তরই বিদ্যমান। সদর্থক প্রত্যয়ের যৎসামান্য দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে দিয়েছি। তাঁর নঙর্থক প্রয়াসে দুটি পর্যায় : প্রথমে বঙ্গীয় জীবনে, ক্রমে সমকালীন বিশ্বজীবনে, দুই পর্যায়ের পারিপার্শ্বিকে যে হেত্বাভাস ও অনাচার বিষের মতো ছড়িয়ে আছে তাকে ধ্বংস করার জন্য স্যাটায়ার। কাব্যের প্রমাণে মনে হয় সমর সেন সোশ্যালিস্ট্ হয়েছিলেন বলে জীবনকে বিকারগ্রস্ত দেখেন নি, বরং জীবনকে বিকারগ্রস্ত দেখেছিলেন বলেই, বিকারের প্রতিকার খুঁজতে গিয়ে, সোশ্যালিজ্‌মে পৌছেছিলেন।

৯

সমর সেনের কাব্যের সৎ পাঠককে নিয়ত খেয়াল রাখতে হবে যে তাঁর রচনা প্রধানত নাট্যধর্মী, অর্থাৎ যে-আবেগ, যে-বাসনা, যে-প্রবৃত্তি, যে-মনোভঙ্গীটি তিনি প্রকাশিত করছেন সেটিকে তিনি নিজের (অর্থাৎ কাব্যের উত্তম পুরুষের) উপরে আরোপ করেছেন।

প্রভৃং নাটকের Fool-চরিত্র যেমন দুনিয়ার ভণ্ডামি এবং নির্বুদ্ধিতার প্রতিভূ সেজে কথা কয়, যদিও আসলে Fool-এর সঙ্গে ভণ্ডামি নির্বুদ্ধিতার ততই ব্যবধান যতটা সুমেরু-কুমেরুতে, সমর সেনও তেমনি বিকৃত সমাজ-স্বরূপটিকে আত্মচেতনায় নাট্যায়িত করেছেন। এই নাট্যায়নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন :

নিজের ছায়াভীরু,
ছায়া ঘন হলে বাইরে বেরো। (৬১ পৃঃ)

কলরোল
সামনে বরাবর কালের জোয়ার,
সাঁতারের শক্তি কি সাহস কিন্তু কখনো ধরিনি। (৬৯ পৃঃ)

বর্গী আজো দূর।
প্রেম আমার পরিখা, দম্ভ প্রাকার,
দুর্গম নিজদুর্গে অন্তরীণ,
মনে শ্রাবণের ঘন মেঘ। (৭১ পৃঃ)

হঠাৎ কোথা থেকে এত লোক,
*   *   *
ছত্রভঙ্গ, ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাড়ি ফিরে আসি। (৭৪ পৃঃ)

এসব ছত্রে উত্তম পুরুষের প্রয়োগ বারুদঠাসা ব্যঙ্গের কাজ করছে। ছায়াভীরু, জলস্রোতভীরু, বর্গীভীরু, জনতাভীরু যে-প্রাণীটি আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের বেনামী বন্দরে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় তার ঘুণে-ধরা সত্তায় নিজ কবি-ব্যক্তিত্ব একাত্ম করে', নিজ সমীক্ষাপরায়ণ অহংকে এই প্রাণীটির চরিত্রে প্রোজেক্ট করে', কবি তাঁর বিদ্রূপ-শক্তিতে শাণ দিয়েছেন। এই প্রবন্ধের পাঠককে নিশ্চয় বলতে হবে না যে যদিও কবিসত্তার পাদপীঠ ব্যক্তিসত্তা, তবুও ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তা এক বস্তু নয়; যখন এই প্রবন্ধে সমর সেনের মনোভঙ্গীর আলোচনা করি, তখন ব্যক্তি সমর সেনের মনোভঙ্গীর কথা বলি না, বলি সেই মনোভঙ্গীর কথা যা তাঁর কবিতায় কাব্যায়িত হয়েছে। এহেন কাব্যায়নে কবি নিজের বিপরীত সত্তাটিকেই প্রকাশিত করেন, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং যা নন, স্বয়ং যার বিরোধী ও ধ্বংসকামী, সেই বি-পক্ষীয় সত্তার মুখোশ লাগিয়ে সেই সত্তারই বিনাশ করেন।

এই মুখোশী স্যাটায়ার বাংলা কবিতায় আর তেমন আছে কি না জানিনা, থাকলেও সমর সেনের প্রকরণ-নিপুণতা হীনমূল্য হয় না। গোড়ায় সমর সেনের বিদ্রূপ প্রযুক্ত হয়েছিল বাঙালী সমাজের কিছু ধিক্কারযোগ্য আচরণের প্রতি :

কোনো নগরে একদিন যেন ছিল
চারদিকে মেখলার মতো শালবনের অন্ধকার,
পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাসাদ, স্বয়ম্বরা প্রেম;
আর আজো তো আছে
কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী,

আর বন্যার মতো পত্রবন্যা, অরণ্যে যৌবন;
হে ঈশ্বর, এ কী অপরূপ! (৪৩ পৃঃ)

ব্যঙ্গের শূলবেধ তীক্ষ্ণ হয়েছে প্রথম তিন ছত্রের রোমান্টিক কালিদাসী সৌন্দর্যের সঙ্গে পরের চার ছত্রের বাস্তব কদর্যতার বৈপরীত্যে, শেষ ছত্রের অপ্রত্যাশিত ঈশ্বর-স্মরণে, এবং কবিতাটি শিরোনামায়, 'ঘরে বাইরে'। সমর সেনের ব্যঙ্গের লক্ষ্য হল, 'প্রাচীন সভ্যতা থেকে ঘেয়ো কুকুরের মতো'। অতি তীব্র কশাঘাত 'কয়েকটি মৃত্যু'-শীর্ষক কবিতায় পরিচ্ছেদ কয়টিতে। প্রথমটি সম্পূর্ণ উধৃত করছি :

তার মুখে সূর্যের কাঁচা সোনা,
মনে তার নতুন অরণ্যের স্বাদ
তাই সবি ভালো লাগে।
প্রেমের ব্যাপারে দিব্যি বেপরোয়া,
শরম নেই।
আর একটি গুণ—
ছেলেপিলে চায় না মোটেই।
পদ্মামের মুখে মস্ত তুড়ি মেরে
স্বচ্ছন্দে চলে যায় দাম্পত্য জীবন।
অবশেষে ঠকঠকে বুড়ি হয়ে মারা গেল,
সংসার খালি :
দূর ছাই, কিছু ভালো লাগে না,
সঙ্গীহীন বুড়ো ভাবে সন্ধ্যায় :
সমাজ বদলেছে অনেক, নিরুপায়,
নইলে, হে হরি,
এ বয়সে মন্দ লাগত না আর একটি কিশোরী।

এখানেও প্রকরণে সেই বিপরীতের তির্যক সহাবস্থান। চমৎকার রোমান্টিক বাক্‌পুঞ্জ 'সূর্যের কাঁচা সোনা,' 'নতুন অরণ্যের স্বাদ'—তার সঙ্গে জুড়েছে রকবাজি কথা—'পদ্মামের মুখে মস্ত তুড়ি মেরে', 'ঠকঠকে বুড়ি', 'দূর ছাই'—আর স্থূল অনুপ্রাস—'ব্যাপারে দিব্যি বেপরোয়া'—আর শেষ ছত্রের অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত—'এ বয়সে মন্দ লাগত না আর একটি কিশোরী'। ইংরেজ কবি ডান্‌-এর আঙ্গিকে বিপরীতের প্রয়োগ এর সঙ্গে তুলনীয়।

এই কামক্লিন্ন সমাজের মূলে বিদ্যমান, সমর সেনের বিবেচনায়, একটা সার্বিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মিথ্যা দর্শন ও মিথ্যাচার। অতএব অচিরেই সমর সেনের ব্যঙ্গ সমর্পিত হল বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে, আর এদিকে তিরিশের দশকের শেষার্ধে বিশ্ব-রাজনীতির পরিস্থিতিও জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠল। 'রোমন্থন' নামে যে কবিতাটি ১৯৪০-৪২ কাল-পর্যায়ে লেখা হয়েছিল, সে-কবিতাটিতে নাট্যায়িত জীবনীর সঙ্গে যথার্থ আত্মজীবনী মিশেছে অদ্ভুত ভাবে; প্রথম ছয়টি স্তবকে কবি নিজ বয়োবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখছেন। কৈশোরের ধারণা : যুগল জীবনযাত্রাই আদর্শ, জনগণ বর্বর : বয়ঃসন্ধির সময় হল মহাত্মাজীর আন্দোলন (১৯২১এর অসহযোগ আন্দোলন নয়, ফলে সমর সেন গান্ধীর সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পারেননি নিজ জীবনে; এটি আইন-অমান্য আন্দোলন, ১৯৩২ সালের), এবং এ-আন্দোলন-কালে লাল পাগড়ির লাঠির সামনে 'হাঁস্কর

সে লাঠি' (কবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সেই বিখ্যাত স্তবকটি, 'হায় লাঠি, তোমার সে দিন গিয়াছে'). লাঠির সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ কবি ভেবেছেন, 'আর যাই হই নির্বীর্য অহিংস ক্লীব নই'। এর পরে কলেজের দিনে, প্রথম যৌবনকালে শোনা গেল অন্য আওয়াজ : 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'। [এখানে একটা কথা না বলে' পারছি না। সমর সেন এক ছত্রে 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' লিখে পর ছত্রে কেন লিখলেন 'অর্থাৎ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'? যদি শুধু উর্দু স্লোগান্‌-এর পরে বাংলা স্লোগান থাকত, না হয় থাকত, কিন্তু কবি 'অর্থাৎ' লিখলেন কেন? তিনি কি বলছেন, হে বাঙালী কাব্য-পাঠক, তোমার অপার মূর্খতায় যদি তুমি এমন বিচিত্র উর্দু লব্‌জ্‌ কোনোদিন না শুনে থাক অথবা শুনলেও তার মানে বোঝনি, সে-সম্ভাবনায় আমি আমার কথাটা fool-proof করে' দিচ্ছি, উর্দু ও বাংলা স্লোগান্‌ দুটির ইকোয়েশান করে দিচ্ছি।—আশঙ্কা হয় এই অতিকথন-দৌর্বল্যের ফলে সমর সেনের ব্যঙ্গ বুমেরাং-এ পরিণত হয়েছে।]

বহির্জীবনের সংযোগে আত্মসত্তারও ব্যাপ্তি ঘটল। এখন থেকে সময়ের ব্যঙ্গে রাজনৈতিক মিথ্যাচার ও ক্লীবাচার হল প্রধান লক্ষ্য, বিদ্রূপের সঙ্গে মিশলো ঘৃণা, ক্রোধ, অভিশাপ।

চারিধারে ধানক্ষেত ভেসে গেল, বৃষ্টি আর থামে না,
দলে দলে তাই চলেছি সভায়,
দেখি আগন্তুক মন্ত্রী কী বলেন।
কী যেন খেয়ে তাঁর ঘোরতর অম্বল, রক্তবর্ণ মুখ,
তাই স্বল্পভাষী; বিজয়ী প্রসাদে গেলেন ফিরে;
যাতায়াতী খরচ কত
পৈটিক রসদ কত কঠিন তরল,
শত্রুপক্ষ নানা কথা বলে। (৭৯ পৃঃ)

চাপা ইঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে লক্ষ্যবস্তুর ঘৃণার্হতা। অন্যত্র প্রযুক্ত হয়েছে, ইঙ্গিত নয়, জ্বলন্ত গ্লানি, ঘৃণা, এবং ক্রোধ:

মধ্য ইউরোপে
জারজ সন্তানকে সঙ্গোপনে রসদ জোগায়
মাতা তার, দাঁতচাপা বৃদ্ধা গণিকা,
পশ্চিমী গণতন্ত্র নাম। (৮৬ পৃঃ)

ঘৃণা ও ক্রোধ থেকে কবিচিত্তের উত্তরণ ভবিষ্যৎ-প্রত্যয়ে :

পুঞ্জীভূত শতাব্দীর প্রতিশোধ,
এ কঠিন কঙ্কাল দেহে একবার প্রাণ দাও,
হে কাল, হে মহাকাল! (৭২ পৃঃ)

ভবিষ্যৎ-প্রত্যয়ে কবির স্বর গভীর, গম্‌গমে, উদাত্ত। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন,

পৃথিবীর বদরক্ত বের হোক,
অস্ত্রোপচার নিতান্ত প্রয়োজন (৭৯ পৃঃ)

সেই অস্ত্রোপচারের রক্তরঞ্জিত বাকপ্রতিমার সঙ্গে তাঁর শেষ দিককার কাব্যে বারংবার মিশেছে কতকগুলি বিভীষিকার প্রতিমা, যাকে তিনি বলেছেন 'তান্ত্রিক'। তেতাল্লিশের মন্বন্তরকালে এই তান্ত্রিক চেতনা থেকে উত্থিত হয়েছে একটি বাক্‌প্রতিমা যার চেয়ে তুঙ্গতর ভয়-

প্রতিমা রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ' ও মোহিত মজুমদারের 'মোহমুদ্গর' ছাড়া অন্য কোথাও আমি পাইনি :

আজ তাম্রসীতা, উলঙ্গিনী, দুর্ভিক্ষকন্যা আমাদের দেশ
নগরের সামনে অস্থিচর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে ব'সে।
তোমার বিষাণ বজ্রে বাজে!
নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত দুর্ভিক্ষের ধূপে,
কৃষ্ণবর্ণ, লোলজিহ্বা, করালবদন!
পদপ্রান্তে নিরুদ্দেশ ধান আর গম
আর পুঞ্জীভূত পুরুষের প্রাণহীন দেহ,
ছিন্ন শিশুর রক্তজবা' (১১০ পৃঃ)

আমরা যারা সেই কলঙ্কিত তেতাল্লিশে 'চালের কাঙাল' ছিলাম, উপরের প্রথম দুটি ছত্রে আমাদের মনে পড়বে জয়নুল আবেদিনের অবিস্মরণীয় রেখাংকনগুলি।

সমর সেনের কাব্যে এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে একটা অমূল্য ঊর্ধ্বপাতন, সাব্লিমেশন্, যেন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সেই যে অবিস্মরণীয় বাক্‌প্রতিমাটির উল্লেখ করেছেন কবি এক কবিতায়, তারই আভাস তাঁর বিদ্রূপধর্মী কাব্যে আসন্নপ্রায় :

প্রায় পত্রহীন সে প্রৌঢ় বট, বহুদিন মাখেনি সবুজ কলপ,
কিন্তু তার শিকড়েরা ঊর্ধ্বমুখ, আকাশ সন্ধানে। (১১৭ পৃঃ)

আকাশ সন্ধানের কিছু নিদর্শন আছে শেষদিককার কাব্যে।

১০

এই কবিতা-সংকলনের শেষ পরিচ্ছেদের রচনাকাল নির্দেশিত হয়েছে, ১৯৪৪-৪৬। অনতি-অধিক কুড়ি বছর আগেকার কবিতায় সংকলনটি থমকে গেছে। সমর সেন আর লিখছেন না, লিখলেও (আমি সঠিক জানিনে) ক্বচিৎ কদাচিৎ লেখেন এবং, মনে হয়, সে-লেখাকে স্মরণীয়তার মর্যাদা দিতে চান না। জীবন-মধ্যাহ্নে, কবিকৃতির উঁচু ঢালু পথের মাঝামাঝি উঠে, তিনি কেন কবিতা রচনা ছাড়লেন এ-প্রশ্ন নেহাৎ জৈবনিক কৌতূহল নয়, সমর সেনের কাব্য-মূল্যায়নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমি ভেবেছি, উত্তরের সন্ধানে কবিতাগুলি পড়েছি অনেকবার, কিন্তু এমন কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি যাতে আমার বিবেক সন্তুষ্ট হতে পারে। এই কারণেই সমর সেনের কাব্য-মূল্যায়নও আমার অসাধ্য যদিও সে-কাব্যের কিছু অংশ সম্বন্ধে আলোচনা উপরে করেছি।

কবির গতি নিয়ত অগ্রগতি হবে, উচ্চতর গতি হবে, এমন কোনো অবশ্যতা নেই। বস্তুত অনেক কবির বেলা এগিয়ে যাওয়ার পরে পিছিয়ে যাওয়া আছে, পিছিয়ে তেমন না গিয়েও প্রশস্ত রাস্তা থেকে সরে গিয়ে ইতস্তত আঁকাবাঁকা পথে চলবার প্রান্তিও আছে, উঁচুতে না গিয়ে নিচু ঢালুতে অথবা সুদীর্ঘ সমতলেও চলা যায়। দৃষ্টান্তের অভাব নেই এবং সচরাচর এসব ব্যতিক্রমের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাও মেলে। কিন্তু যিনি শুরু করলেন উজ্জ্বল ভরসা নিয়ে—যে কোনো ভাষায় কম কবিই সমর সেনের মতো উজ্জ্বল এমন কি চমকপ্রদ সম্ভাবনা নিয়ে শুরু করেছেন—তিনি যদি মধ্যপথে স্তম্ভিত হয়ে যান তাহলে (শুধু কাব্যের নির্ভরে) ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমরা জানি ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ দশ বছর

মহৎ কাব্য রচনার পরে মহত্ত্ব হারিয়ে ফেলেছিলেন, যদিও তারপরে প্রায় চল্লিশ বছর বেঁচে-ছিলেন এবং গাদা গাদা নিরেশ কাব্য রচনা করেছিলেন। ডান্ পাদ্রি হওয়ার পরে কিছু সনেট রচনা করেছিলেন ভগবদ্‌ভক্তি নিয়ে, কিন্তু হারিয়ে ফেলেছিলেন আগেকার বিচিত্র সংবেদনা। ল্যাংল্যান্ড একটি প্রায়-মহৎ কাব্যের স্রষ্টা কিন্তু সারাজীবন বসে একটি মাত্র কাব্যই রচনা করেছিলেন। আমাদের ভাষার কোনো শক্তিশালী কবিই নেহাৎ অল্প লিখে ক্ষান্ত হন নি। নিজ ভাষার ঐতিহ্যে সমর সেন স্বতন্ত্র।

তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রথম থেকেই প্রকট। এই স্বাতন্ত্র্যের যে-লক্ষণটি সব চেয়ে স্থূলভাবে নজরে পড়ে সেটি তাঁর গদ্যছন্দ। "কবিতা" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সমর সেনের চারটি ছোট লিরিক প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সম্পাদকের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক পত্র, এই পত্রে তিনি বলেছেন 'পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি' এবং যে সব কবিদের রচনা প্রথম সংখ্যায় বেরিয়েছিল তাঁদের কয়েকজন সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি মন্তব্য : 'সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এ'র লেখা টাঁকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে।'—টাঁকসই হবে সে তো ভালো কথা কিন্তু গদ্যের রূঢ়তা বলতে যে কবি কী বুঝলেন সে-রহস্য সেই ১৩৪২ সাল থেকে আজ অবধি আমার হৃদয়ঙ্গম হল না। রহস্যোদ্ধারের চেষ্টা হওয়া দরকার কেন না 'গদ্য কবিতা' বলে' যে কবিতার একটি জাতি মানা হয়েছে (যে নামকরণ নিয়ে একদা অন্নদাশঙ্কর রায় কিছু ব্যঙ্গ করেছিলেন), সে-কবিতা সম্বন্ধে আজ অবধি বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের নিজ অনেক অকৃপণ মত-প্রকাশ সমেত, সে-কবিতার স্বরূপ সম্যক বুঝতে হলে সমর সেন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই অসতর্ক-প্রযুক্ত উক্তিটির সবিশেষ আলোচনা হওয়া একান্ত দরকার। আমার পক্ষে সে-আলোচনায় এখন প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়, কেবল এইটুকু বলব যে সমরের এই কবিতা কয়টিতে যদি 'গদ্যের রূঢ়তা' থেকে থাকে তাহলে বাংলা ভাষায় 'রূঢ়' শব্দটির অভিধা পালটে ফেলা দরকার। ঐ চারটি কবিতার একটি মাত্র আমি উধৃত করছি :

> তুমি যেখানেই যাও,
> কোনো চকিত মুহূর্তের নিঃশব্দতায়
> হঠাৎ শুনতে পাবে
> মৃত্যুর গম্ভীর, অবিরাম পদক্ষেপ।
> 　　　আর, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে?
> 　　　তুমি যেখানেই যাও
> 　　　আকাশের মহাশূন্য হ'তে জুপিটারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
> 　　　ভেড়ার শুভ্র বুকে পড়বে।

রূঢ়তা তো দূরস্থান, এ-জিনিস গদ্যও নয়, বিশুদ্ধ কবিতা, যদি না ইংরেজি "গীতাঞ্জলি" ও "লিপিকা" গদ্য হয়, যদি না Song of Solomon গদ্য হয়।

এই কবিতাটি সমরের প্রথম দিককার কাব্যের প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হতে পারে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ তো বটেই। অবশ্য প্রথম দিককার বলতে আমি কোনো দৌর্বল্য বা অপরিণতি বোঝাচ্ছি না। বস্তুত যদিও তাঁর কবিতায় তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা সমীচীন বলে আমার মনে হয়—প্রথম দিকে প্রেমের ও নিসর্গপ্রীতির কবিতা, দ্বিতীয় পর্যায়ে বঙ্গীয় সমাজ সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা, চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্বজাগতিক সমাজ-রাজ-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

সম্বন্ধে যুগপৎ বিনাশাত্মক ও প্রত্যয়াত্মক কবিতা—তিন পর্যায়ের সমীচীনতা সত্ত্বেও (সচরাচর অন্য কবিদের বেলা যেমনটি হয়ে থাকে) কোনো পর্যায়েই, প্রথম পর্যায়েও নয়, তারুণ্যসুলভ অপটুতা নেই। সমর সেন যেন কোনোকালেই কবিতার শিক্ষানবিশি করেননি, এই সংকলনটির প্রথম কবিতা থেকেই সুডৌল পরিচ্ছন্ন বস্তুসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করি। এ কারণেও তিনি বাংলা কাব্যে স্বতন্ত্র। আরো লক্ষ করার বিষয় যে সমর সেনের কবিতা কদাচ দীর্ঘ হয়ে থাকে (তাঁর দীর্ঘতম তিনটি কবিতা, 'নানাকথা' ও 'ক্লান্তি' প্রত্যেকটি ১২২ লাইন, 'গৃহস্থবিলাপ' ১০৩ লাইন, কোনোটিই দীর্ঘ নয়)। তাঁর কবিতা 'মুক্ত'-প্রধান, এড্‌গার অ্যালান্ পো-কথিত আদর্শ কবিতা : I hold that a long poem does not exist. I maintain that the phrase, "a long poem" is simply a flat contradiction in terms.

এই সুমিত পরিসরের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের কাব্যে ছিল একটি আশ্চর্য মৃদু অনুচ্চবাক ললিত স্বগতোক্তির সুর যার তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত আমি উধৃত করছি :

তোমাকে বললাম—এস,
তোমার ধূসর জীবন হতে এস,
তোমার রাত্রির এই ক্লান্ত স্তব্ধতা পার হয়ে এস (২১ পৃঃ)

হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এল—
তখন পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল :
সে অন্ধকার মাটিতে আনল কেতকীর গন্ধ,
রাত্রের অলস স্বপ্ন (২৩ পৃঃ)

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস (২৯ পৃঃ)

আমার মনে হয় এ-ধরনের মৃদু ললিত ভাষণের লিরিকে সমর সেন আমাদের সাহিত্যে অতুলনীয়। কিন্তু এই সুডৌল অনুভূতিঘন রোমান্টিক মাধুর্য টিঁকল না বেশিদিন, বাইবেল-উক্ত গার্ডেন্ অব্ ইডেনে প্রবেশ হল বিদ্রোহী, বিদ্রোহ-রচনাকারী সেটান্-এর। সমাজচেতনায় সমর সেনের কাব্যে প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটল। এই ললিতভাষণ তিনি শেষ অবধি কখনোই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন নি, শুধু সে-ভাষণ শুনতে চান নি :

ললিত বসন্তের, বেশি কথায় দিন বিগত (৯২ পৃঃ)

শুনি না আর সমুদ্রের গান
থেমেছে রক্তে ট্রামবাসের বেতালা স্পন্দন।
ভুলে গেছি সাঁওতাল পরগণার লাল মাটি
একদা দিগন্তে দেখা উদাত্ত পাহাড় (১৪০ পৃঃ)

যে-পরিবর্তন সমরের কাব্যে ঘটল, তাতে মনোভঙ্গীতে এবং কাব্যের প্রকরণে এলো সমান প্রভেদ। প্রথম পর্যায়ের কবিতার শব্দগুলি পুরোপুরি রোমান্টিক, উপরের উদ্ধৃতি

কয়েকটিতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। শব্দভাণ্ডার অত্যন্ত সীমিত, কয়েকটি শব্দ ঘুরে ফিরে ব্যবহৃত হয়েছে : প্রথম কুড়ি পৃষ্ঠায় পাচ্ছি অন্ধকার (৩৫ বার), ক্লান্ত (১৮ বার), স্তব্ধ (১২ বার), তাছাড়া সমার্থ শব্দাদি (নিঃশব্দ, শব্দহীন) ধরা হয়নি; ধূসর (৭ বার), হাহাকার (৭ বার); অন্য পুনরাবৃত্ত শব্দের মধ্যে আছে; মন্থর, ম্লান, দুঃস্বপ্ন, স্বপ্ন, দিগন্ত, উজ্জ্বল, উন্মাদ। এ-পর্যায়ে রূপক প্রায় অনুপস্থিত, কিন্তু 'মতো' 'যেন' প্রয়োগে উপমা বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। সাপের মতো মসৃণ, কালো পাথরের মতো মসৃণ, শীতের অজগরের মতো, সবুজ পাতায় ম্লান পাখির মতো : শুধু উপমা-প্রয়োগের সমীক্ষায়ও সমর সেনের কাব্যে নিসর্গের প্রভাব বোঝা যেতে পারে, নিসর্গের প্রভাব তাঁর কাব্যে সব পর্যায়েই সমান যদিও তিনি সচরাচরিক অর্থে নিসর্গের কবি নন।

মধ্য পর্যায়ের কাব্যে শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হল অধিক তৎসম শব্দের, ('স্ফীতোদর', 'নীলরক্তবান', 'নারীধর্ষণ'), অ-কাব্যিক শব্দের 'ফেঁপে', 'খোয়াড়', 'আত্মম্ভরী' 'ভীমরতি'), প্রাকৃত শব্দের ('রেস্তহীন', 'রন্দা', 'তুড়ি মারি', 'পয়সা খসিয়েছ', 'বই...মেরেছ') প্রয়োগে; অনুপ্রাসের চতুর ব্যবহারে—ব্যঞ্জন ও স্বর দুই বর্ণেরই অনুপ্রাস (মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি : পিত্তরসে তিক্ত ভীরু চিত্তে সঙ্গোপনে এল; স্খলিত দাঁতের ফাঁকে কাঁদে আর হাসে|ট্রামে আর বাসে)। এই সঙ্গে এসেছে পূর্বসূরীর কবিতার চরণ-উদ্ধৃতি এমনভাবে পেশ করা যাতে কবিতায় বিদ্রূপাত্মক anti-climax রচিত হতে পারে; আরো এসেছে প্রবচনের প্রয়োগ ('আপনি বাঁচলে বাপের নাম')। উপমা কমে আসছে, তার জায়গায় এসেছে রূপক, মাঝে মাঝে প্রতীক। শব্দভাণ্ডারের এসব বৈশিষ্ট্য চূড়ান্ত পর্যায়েও প্রবাহিত হয়েছে, বরং সমৃদ্ধতর জটিলতর হয়েছে এবং অন্তত একটি নূতন উপাদানের আমদানি হয়েছে, হিন্দুস্তানী শব্দ, মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দও।

এই মধ্যপর্যায়ের বিদ্রূপাত্মক কাব্যরচনাকালেই সমর সেন পারিপার্শ্বিক ও সমসাময়িক বাংলা কাব্যের প্রকরণে অতৃপ্ত হয়ে ঐতিহ্য খুঁজতে সচেষ্ট হলেন এবং বিষ্ণু দে'র মতোই মনে করলেন সমুচিত ঐতিহ্য মিলবে ঈশ্বর গুপ্তে। (পাঠক লক্ষ্য করবেন সমরের শেষের রচনাগুলিতে 'লবেজান' শব্দটি বহুপ্রযুক্ত; বিষ্ণু দে তাঁর প্রবন্ধে 'বিবিজান চলে যান লবেজান করে'—লাইনটির তারিফ করেছিলেন।) দুজন কবিরই ঐতিহ্য-বিচার ত্রুটিপূর্ণ এবং যদিও তাঁরা কেউই এ-বিষয়ে পরে আর আলোচনা করেননি (ইতিমধ্যে তাঁরা নিজেরাই ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন), আমার ধারণা তাঁরা অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বহীন চালাক পদ্যগুলিতে সৃজনী কাব্যের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অধুনা ইংরেজি কাব্যের আলোচনায় যেমন Line of Wit বলে একটি কাব্যধারা রেখায়িত করার রীতি চলেছে, আমার ধারণা বাংলা কাব্যেও তেমনটি সম্ভব যদি (বিষ্ণু দে ও সমর সেন যা করেন নি) আমরা জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস থেকে দেখা শুরু করে ভারতচন্দ্র ও কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যের কিছু অংশের মধ্য দিয়ে, উনিশ শতকের অযথা-অনাদৃত কবিগানের বাক্‌বিধির সনিষ্ঠ পরীক্ষা করি তাহলে হয়তো একটা উপকারী ও খাঁটি ঐতিহ্য পাব যার আধুনিক প্রতিনিধিদের মধ্যে সমর সেন নিজেই। যা হোক, তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাকরণিক ঐতিহ্য সম্ভবত পেয়েছিলেন বিদেশী কাব্যে। আমার এ-ও মনে হয় ১৯৪২-পরবর্তী কাব্যে সমর সেনের আর ট্রাডিশনের প্রয়োজন ছিল না। তাঁর বস্তুজগতের তুল্য বস্তুজগৎ (এবং সে-জগতের Line of Wit কাব্য) পৃথিবীর ইতিহাসে জানা নেই, অতএব সমর সেন তাঁর নিঃসঙ্গ নিজস্ব পথে চলতে লাগলেন। সে পথে তাঁর কবিকৃতির কিঞ্চিৎ আভাস আমি

উপরে দিয়েছি।

সমর সেনের রচনা-ক্ষান্তি আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয় বিশেষত এই কারণে যে তাঁর চূড়ান্ত কাব্যে আমি কোনো দুর্বলতা, শৈথিল্য, ক্ষয়ক্লান্তি দেখতে পাই না। হয়তো প্রাক্-চূড়ান্ত পর্বে কিছু দুর্বলতা, কিছু অনিশ্চয়তা অল্প দিনের জন্য এসেছিল। কিছু কবিতাতে ('নানাকথা', 'নববর্ষের প্রস্তাব') আমি প্রয়াস-চিহ্নিত উচ্চভাষণের আড়ষ্টতা লক্ষ করি, বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে (বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে তুলনীয় পরিপ্রেক্ষিত নেই) তাঁর রাজনৈতিক প্রত্যয় তিনি প্রকাশ করছেন এমন অসামান্য ঝোঁক দিয়ে, এমন প্রায় নিরবচ্ছিন্ন তৎসম শব্দের উচ্চকণ্ঠ প্রাচুর্যে, যে মনে হয় অনভ্যস্ত বাংলা ভাষার মাধ্যমে এই প্রত্যয়-প্রকাশে তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন, কোনো কোনো সময় তাঁর গদ্যের ছন্দ গৈরিশী নাটকের সুরেরই প্রতিবেশী। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর প্রকরণ সমৃদ্ধতর হল। দ্বিচরণ শ্লোকবন্ধ রুদ্ধপ্রবাহ পয়ারের ঠাসবুনট, আকস্মিক অন্ত্যমিল ও অন্তর্মিল, বাক্‌বিধির পরিবর্তন, গদ্যছন্দের নির্ভীক সংমিশ্রণ, ভাবসংশ্লেষ, বিরোধী উক্তির ও উৎপ্রেক্ষার সমাবেশে জটিল আবেগের প্রকাশ, উপমা-রূপক থেকে প্রতীকের গভীরতর দ্যোতনা-সঞ্চার, সর্বোপরি অন্তরতম বেদনার্ত জীবনপ্রত্যয় ও মানবতা—এসব মিলে সমর সেনের শেষকাব্যে সম্ভাবনা আমি প্রচুর দেখতে পাই এবং সেজন্যই তাঁর ক্ষান্তিতে বিচলিত বোধ করি। সমর সেন লিখেছেন, "পৃথিবীর কবিতার শেষ নেই." কিন্তু তবুও তাঁর সৃজনী আকাঙ্ক্ষার ও ক্ষমতার শেষ হয়ে গেল, এটা নিঃসীম ক্ষোভের বিষয়।*

অমলেন্দু বসু

* সমর সেনের কবিতা (দ্বিতীয় সংস্করণ)। সিগনেট প্রেস। কলিকাতা ২০। মূল্য চার টাকা

স মা লো চ না

The New Radicals. *By* Paul Jacobs and Paul Laudan. Penguin Books. London. *7s 6d.*

গত সাত বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে নতুন বামপন্থী আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং উঠছে, আলোচ্য বইয়ে তার একটা মোটামুটি বিবরণ পাওয়া যায়। দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোদের সংগঠন এস এন সি সি (স্টুডেন্ট নন-ভায়োলেন্ট কোঅর্ডিনেটিভ্ কমিটি), উত্তরাঞ্চলের অনুরূপ সংগঠন, যদিও নিগ্রোদের প্রাধান্য তাতে তেমন নেই, এস ডি এস (স্টুডেন্টস ফর এ ডেমক্রেটিক সোসাইটি), মাওপন্থী পি এল (প্রোগ্রেসিভ লেবার) দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টগোষ্ঠীয় ডুবয়েস ক্লাব, ট্রটস্কিপন্থী ইয়ং সোসালিস্ট এ্যালায়েন্স, বার্কলের ফ্রী স্পীচ মুভমেন্ট, এই সমস্ত দল-উপদলের ধ্যানধারণা বিদ্রোহ-অভিযানের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রগতিপন্থীরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চেষ্টা করছেন। এ'দের কার্যসূচীর ভবিষ্যৎ, এ'দের বক্তব্য, এ'দের স্বরূপ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্ভবত এখনও বলার সময় হয় নি, যদি কিছু বলতেই হয়, সেটা প্রচুর আশাব্যঞ্জক হবে না। যাঁরা এই আন্দোলনের পুরোধা তাঁদের কেউ নাকি দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিদ্রোহ করছেন না, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুঃখদুর্দশার মূলে নাকি টাকাপয়সার প্রাচুর্য, তাঁদের আন্দোলনের মূলে আছে নিজেকে চিনবার এবং অপরকে ভালোবাসবার তাড়না। উদারপন্থী কেনেডির ওপর তাঁদের ভরসা ছিল, কিন্তু কিউবায় তাঁর কাজকর্ম দেখে এই সব প্রগতিবাদীরা বিরক্ত হন, তাঁরা চান, fair play for Cuba। জীবনকে খেলা হিসেবে দেখবার সামর্থ্য আছে যাঁদের তাঁরা অবশ্যই ধন্য, কিন্তু বৃহত্তম শক্তি, ধনতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যাঁরা সাফল্যলাভের আশা করেন, তাঁদের সম্ভবত অন্যতর ধাতুতে গড়া দরকার। তবুও, যৎকিঞ্চিৎ আন্দোলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হচ্ছে এ'দেরই মাধ্যমে, সুতরাং এ'দের দৃষ্টিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান পরিস্থিতি দেখা যাক।

১৯৫৪ সালের সুপ্রীম কোর্টের বিচার (বিদ্যালয়গুলিতে পৃথকীকরণ সম্পর্কে) এবং ১৯৬৪ সালের সিভিল রাইট্স এ্যাক্ট, এই দশ বছরে নিগ্রোবিদ্বেষের যে-সব আইনগত ভিত্তি ছিল, তা ভাঙা হয়েছে এবং ভাঙার মূলে সিট-ইন, ফ্রীডাম রাইড ইত্যাদির ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু আইনের বেড়া ভেঙে ফেলার অর্থ এই নয় মার্কিন সমাজে নিগ্রো-প্রীতি রাতারাতি গজিয়ে উঠল। বরং বলা চলতে পারে, হোটেলে, রেস্তরাঁয়, লাইব্রেরিতে, স্নানাগারে নিগ্রোবিরোধী আইন তুলে দেওয়ায় মার্কিন ব্যবসা-দোকানদারিতে খদ্দেরের প্রসার ঘটবে, সুতরাং মার্কিনীদের সুবিধেই হল এবং সেজন্যে নিম্নমধ্যবিত্ত নিগ্রোদের আন্দোলনে সমর্থন জানাতে ধনী মার্কিনীদের স্বার্থে ঘা লাগল না। কিন্তু যেসব নিগ্রোদের হোটেল-লাইব্রেরিতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, সেইসব নিঃসম্বল নিগ্রোদের মধ্যে, দক্ষিণাঞ্চলে বার্মিংহামের আন্দোলনে যেমন হয়েছিল, যখন এই স্বাধীনতার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল, নিগ্রোদের নিম্নতম এবং বৃহত্তম সমাজ যখন নিগ্রো-আন্দোলনকে গুটিকয়েক ছাত্রদের

ডিঙিয়ে গ্রহণ করল, তখনই মার্কিন সমাজে ঘা লাগল। তখন শুধু হোটেলে বসে খাবার প্রশ্নই না, বৃহত্তর অর্থনৈতিক যুদ্ধে পরিণত হল নিগ্রো-আন্দোলন। এবং অর্থনৈতিক যুদ্ধে নামার অর্থই রাজনৈতিক আন্দোলন। বব মোসেস-এর নেতৃত্বে মিসিসিপিতে ভোট দেওয়ার দাবীর আন্দোলন এর পরিণতি।

নিছক প্রতিবাদ যে মুহূর্তে রাজনৈতিক যুদ্ধে পরিণত হচ্ছে মার্কিনীদের নিগ্রো-প্রীতিও সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়ছে। ১৯৫৪ সালে নিগ্রো বেকারদের সংখ্যা যা ছিল, আজ তা থেকে বহুগুণ বেশি, নিগ্রোদের আয় দশ বছরে শতকরা তিন ভাগ কমেছে; নিগ্রোদের কাজ দেওয়া হয়েছে এমন সব চাকরিতে সেসব শীঘ্রই অটোমেশনের আওতায় আসবে, স্কুল-কলেজে আইনগত বাধা না থাকলেও নিগ্রোদের নেওয়া হয় না; নিগ্রোবস্তির সংখ্যা বেড়েছে। এই যখন সমস্যা তখন সিভিল রাইট্স আন্দোলন পরিণত হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে। চামড়ার রঙ নিয়ে যেসব প্রচণ্ড মারামারি হচ্ছে, বার্মিংহামে, হার্লেমে, ফিলাডেলফিয়ায়, রচেস্টারে, সেসব নিছক বর্ণগত যুদ্ধ নয়, শ্রেণীগত। ১৯৬৩ সালে হার্লেমে নিগ্রোরা বস্তি ভাড়া দেওয়া বন্ধ করেন, গৃহগত শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে তাঁরা সিটি হল পিকেট করেন,—ভাড়াবন্ধ্ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে নিউওয়ার্ক-এ, সান ফ্রান্সিসকোতে। এই ভাড়াবন্ধ্ আন্দোলন মূলত শ্রেণীগত, বর্ণগত নয়।

নিগ্রো-আন্দোলনের এই চরিত্র বুঝতে পেরে উদারপন্থী মার্কিনী তাদের নিগ্রোপ্রীতি বজায় রাখতে পারে নি। নিউ ইয়র্কের বস্তি দূর করার খরচ ১৭ বিলিয়ন ডলার, নিগ্রোদের দারিদ্র্যমোচন করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা রূপায়িত করার খরচ ১০০ বিলিয়ন ডলার। "নিউ ইয়র্ক টাইমসে"র সম্পাদকীয় মন্তব্য : 'এইসব সংস্কার করতে খরচ প্রচুর নিগ্রোদের এসব নিয়ে বেশি চেচামেচি করা উচিত নয়, করলে সাদারা চটে যেতে পারে। কারণ সাদাদের ধনতন্ত্রের জন্য দেশবিদেশে যুদ্ধ লাগিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক, বস্তি-উন্নয়নে সেসব টাকা খরচ করা কোন কাজের কথা নয়।

ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের এই রাজনৈতিক পরিণতি এখন কোন্ পথে অগ্রসর হবে? রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্ত না করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব, এই সিদ্ধান্তে এতদিনে আসা গেছে কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা কোন্ পথে আনা সম্ভব? এই তর্কে বহু মত : একদলের মত : রাষ্ট্রক্ষমতা আনার কাজ দুই কোটি নিগ্রোর পক্ষে একা সম্ভব নয়, অন্য দলের সঙ্গে হাতমেলানো দরকার; মার্কিনী সমাজের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে হাত-মিলিয়ে নিগ্রো-লিবারেল-লেবার সম্মেলন করা দরকার।

এই আলোচনার সূত্রে ১৯৬০ এবং ১৯৬৪ সালের নির্বাচন বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। নিগ্রোদের ভোট পেয়ে ১৯৬০ সালে কেনেডি নির্বাচিত হলেন, কিন্তু শতকরা সাত ভাগ সংখ্যাধিক্যে। এই সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেনেডি নিগ্রোসমাজের উন্নতিকল্পে বৃহৎ সংস্কারসাধনে সাহসী হন নি, বার্মিংহামের আন্দোলনের দরকার ছিল সংস্কার আনবার জন্য। ১৯৬৪ সালেও নিগ্রোরা সমবেতভাবে জনসন-হামফ্রেকে ভোট দেন। কিন্তু জনসনের সংখ্যাধিক্য প্রচুর পরিমাণে থাকায়, তিনি অধিকমাত্রায় সংস্কারে সাহসী হন। জনসনের জয়ের সাফল্যের মূলে ছিল অবশ্য বৃহৎ বণিকগোষ্ঠীর সমর্থন। কিন্তু বণিকগোষ্ঠীর সমর্থন নষ্ট হল সংস্কারের ধাক্কায়। সুতরাং জনসনকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বহাল রাখতে হলে দুই কোটি নিগ্রোসমাজকে হাতে রাখতে হবে। এই সুযোগ নিগ্রোসমাজের হাতছাড়া করা উচিত নয়, যেহেতু তাঁরা যেদলে থাকবেন সেইদলের জয়ের সম্ভাবনা, সুতরাং ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী হলেও

নিগ্রোদের ভোট অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৪-তে দক্ষিণাঞ্চলের ১৬ লক্ষ নিগ্রো ভোটের সাহায্যে সে অঞ্চলের রাজনৈতিক চেহারা পাল্টে গিয়েছিল, নতুন আইনের ফলে আরও ৩৬ লক্ষ নিগ্রো-ভোটের জন্ম হয়েছে, সুতরাং তার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

এই বিশ্লেষণের ত্রুটি হল, নিগ্রোদের শত্রু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে গোল্ডওয়াটার-জাতীয় বর্ণবিদ্বেষকে, যদিও নিগ্রোদের আসল শত্রু জনসন-জাতীয় ডেমক্র্যাটরা। নিগ্রোরা কখনই জনসনের ডেমক্র্যাট দলকে দিয়ে সমাজের আমূল সংস্কার করাতে পারবেন না, সুতরাং ডেমক্র্যাটদের সঙ্গে হাত মেলানো নিরর্থক। তদুপরি, সাদাদের সঙ্গে হাত মেলানোর চোটে, পদে পদে সন্ধি করার ফলে, নিগ্রো আন্দোলনের আসল রূপটি হারিয়ে যাবে, নিগ্রোরাও Establishment-এ মিশে যাবেন। জনসনের ডেমক্র্যাটদের সমর্থন করা উচিত নয়, কারণ নামে উদার হলেও এ'রা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সোৎসাহে অংশ নিচ্ছেন। কোয়ালিশন-পন্থী বেয়ার্ড রাস্টিনের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এই জন্য ভ্রান্ত যে তাঁরা শুধু দেশের আভ্যন্তরীন রূপটি দেখে অগ্রসর হচ্ছেন, আন্তর্জাতিক অবস্থা মোটে চিন্তাতেই নিচ্ছেন না। জনসনদের প্রকৃতি ধরা পড়বে ব্যক্তি স্বাধীনতা আইনে নয়, ভিয়েতনামে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিপ্লবের পথে আনতে হলে কোয়ালিশন নয়, অহিংস বিপ্লবের পথে আনতে হবে,—নতুন প্রগতিপন্থীদের অনেকেরই এই ধারণা। এ'রা সশস্ত্র বিপ্লবকে ঘৃণা করেন, সোশ্যাল ডেমক্র্যাটদের ভোটের সাহায্যে বিপ্লবী সরকার স্থাপনের আশা অলীক মনে করেন, এ'রা মনে করেন দেশময় প্রতিবাদ করে বিপ্লব আনা সম্ভব। বিপ্লব একটিমাত্র ঘটনা নয়, দেশব্যাপী বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফলশ্রুতি। বব মোসেসের নেতৃত্বে মিসিসিপি ফ্রীডাম ডেমক্র্যাটিক পার্টি যেভাবে রাজনৈতিক কাঠামো অচল করে দিয়েছিল, তারই প্রভাবে এই মত গড়ে উঠেছে।

প্রোগ্রেসিভ লেবার পার্টি এসব বিশ্লেষণ ভ্রান্ত মনে করেন। তাঁদের ধারণা, কিছু দাবী আছে যা ধনিক শ্রেণী সামান্য ক্ষতি স্বীকার করেও মেনে নিতে পারেন, আর কিছু দাবী আছে যা মানতে গেলে ধনিকচরিত্রই আর টেঁকে না। লিবারেল-লেবার-নিগ্রো যে কোয়ালিশন চলছে, তার যে দাবী তা মানতে জনসনের অসুবিধে নেই, কিছু কিছু ত্যাগ করেও শাসনযন্ত্রের অধিকার ধনিকগোষ্ঠীর হাতেই থাকছে। কিন্তু ১৯৩০ সালে সি-আই-ও যেভাবে কলকারখানা দখল করে নিচ্ছিল, মজদুররা যদি অনুরূপ পথ আবার অনুসরণ করেন তাহলে শাসনতন্ত্রের কাঠামো থেকে উদারপন্থী ধনিকশ্রেণীর অপসারণ অবশ্যম্ভাবী। বর্তমানে যেভাবে আন্দোলন চলছে, তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। ধরা যাক নিগ্রোদের চাপে পড়ে, গণ-আন্দোলনের ধাক্কায় বড় বড় শিল্পবাণিজ্যের জাতীয়করণ সম্ভব হল। কিন্তু যে জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যের অধিকর্তা ধনিকগোষ্ঠীর প্রতিভূরাই, সেই জাতীয়করণের সার্থকতা কোথায়? জাতীয়করণই যদি সর্বরোগহর হয় তাহলে লেবার সরকার-চালিত রেলশাসকদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ কর্মীরা ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন? কোয়ালিশনপন্থীদের সম্ভবত ম্যাজিকে বিশ্বাস—নাহলে ডেমক্র্যাট পার্টির লিবারেলরা চাইছেন ডেমক্র্যাটিক পার্টি দখল করতে, বামপন্থীরা—লিবারেলরা চাইছেন লিবারেলদের আয়ত্তে আনতে, সোশ্যালিস্ট পার্টি চাইছেন বামপন্থী-লিবারেলদের দখলে আনতে, কম্যুনিস্টরা চাইছেন সোশালিস্টদের শোধন করতে। এই বিরাট প্রতিযোগিতায় প্রোগ্রেসিভ লেবার পার্টির বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই।

অবস্থা যদিও বিপ্লবাত্মক। অটোমেশানের দৌলতে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় দেউলিয়া। এই পরিস্থিতিতে 'চাকরি থাক না

থাক, মাইনে চাই'—এই দাবী নিশ্চয়ই বিপ্লবী দাবী, বুর্জোয়া কাঠামোর পরিপন্থী, কিন্তু দাবীপূরণের পথ কোনটা? নিগ্রোরা যদি তাদের 'স্বাধীনতা চাই, এই মুহূর্তে' এই দাবী নিয়ে এগোন, তাহলে সেটা বিপ্লবের সহায়ক হবে। কারণ মার্কিন লিবারেলরা ভিয়েৎনামের যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁরা আশু প্রস্তুত নন। নিগ্রোদের দাবী আদায়ের কাজে ট্রেড ইউনিয়নগুলো কোন কাজে লাগবে না। আমেরিকার শ্রমিকদের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ইউনিয়নের বহির্ভূত, বর্তমান ইউনিয়নের পক্ষে বিরাট আন্দোলনে নামা সম্ভব নয়, এদের নেতৃত্ব রক্ষণশীল লোকদের হাতে। সুতরাং বিপ্লবের বিকল্প সহায় 'কম্যুনিটি সিণ্ডিকালিজম', অর্থাৎ এক একটা পাড়ায় যত কর্মী ও বেকার আছে তাদের নিয়ে ইউনিয়ন তৈরি করা এবং তাদেরকে শ্রেণীযুদ্ধের স্বরূপটি চিনিয়ে দেওয়া।

ভিয়েতনামে যাঁরা আজ যুদ্ধ করছেন তাঁরা সকলেই লিবারেল : প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান (a mainstream liberal), প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার (a moderate liberal), প্রেসিডেন্ট কেনেডি (a flaming liberal)। বাণ্ডি, ম্যাকনামারা, রাস্ক, লজ, গোল্ডবার্গ, জনসন—এঁরা সকলেই লিবারেল। লিবারেল ধর্মের উদ্গাতা টমাস জেফারসন কিংবা টমাস পেইন অবশ্য এঁদের উদারনৈতিকতা দেখলে আঁতকে উঠতেন।

ভিয়েতনামে নাকি সত্যকারের বিপ্লব হচ্ছে না, সেখানে বাইরে থেকে অস্ত্র আসছে, ভাড়াটে সৈন্য আসছে, ভিয়েতনামের লোকেরা যুদ্ধ করতে চায় না, বাইরের লোকেরা যুদ্ধ করছে। যদি বাইরের লোকেদের যুদ্ধ করা অর্থই বিপ্লব না হওয়া, তাহলে আমেরিকার বিপ্লবের সময় ফরাসী সাহায্যে ব্রিটিশ জাহাজ ডোবাতে মার্কিনীরা আপত্তি করেন নি কেন, স্পেন থেকে অস্ত্র ধার নিয়েছিলেন কেন?

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশে যুদ্ধ করতে এত আসক্ত কেন? পৃথিবীর স্বাধীনতারক্ষার জন্য?

রোডেশিয়ার রকমসকম মার্কিন লিবারেলদের পছন্দ নয়, কিন্তু রোডেশিয়ার ক্রোমিয়াম কিনতে তাঁদের আপত্তি নেই, কেননা সস্তা নিগ্রোদের হাতে তোলা রোডেশিয়ার ক্রোমিয়ামও দামে বেজায় সস্তা।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ মার্কিন লিবারেলদের ঘোরতর অপছন্দ কিন্তু তাই বলে ওদেশকে রাশি রাশি টাকা দিতে এদেশের ব্যাঙ্কমালিকদের কোন আপত্তি নেই, এবং তলে তলে আণবিক অস্ত্র দেওয়ার চেষ্টাও চলছে। পশ্চিম জার্মাণিকেও তাঁরা আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করেছেন, যদিও তারা স্নায়ুযুদ্ধ চান না, ইউরোপকে দুভাগে বিভক্ত দেখে তাঁরা দুঃখিত।

১৯৫৩ সালে সি.আই.এ ইরাণ থেকে মোসাদেককে সরালেন, কেননা তিনি দেশের তৈলসম্ভার জাতীয়করণ করার কথা ভাবছিলেন। মার্কিন লিবারেলরা মোসাদেকের পরিবর্তে বসালেন নাৎসীভক্ত জেনারেল জাহেদীকে এবং পরিবর্তে ইরাণের তৈলসম্পদের শতকরা চল্লিশ ভাগ পঁচিশ বছরের চুক্তিতে পেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি প্রতিষ্ঠান, যার একটা গাল্‌ফ অয়েল। সেসময়ে সি.আই.এ'র নেতা ছিলেন কারমিট রুজভেল্ট। ১৯৬০ সালে কারমিট রুজভেল্ট গাল্‌ফ অয়েলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হন।

১৯৫৪ সালে গুয়াটেমালার আরবেঞ্জ তাঁর দেশের ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির একাংশের জাতীয়করণ করতে উদ্যোগী হলে সি.আই.এ'র উদ্যোগে তাঁর পতন হল। সি আই এ-র ডিরেক্টর জেনারেল ওয়াল্টার ব্যাডেল স্মিথ পরের বছর ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেক্টরে যোগ দিলেন।

১৯৬০ সালে গুজব রটল মার্কিনীরা কিউবা আক্রমণ করছে। সরকার বললেন, বাজে কথা। ১৯৬১ সালে মার্কিনীরা কিউবা আক্রমণ করল। ১৯৬২ সালে মিসাইল পাঠানো নিয়ে গণ্ডগোল। মার্কিন লিবারেলরা জানালেন, অন্য কোন দেশ তার নিজস্ব বৈদেশিক নীতি পালন করতে চাইলে, যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীময় আণবিক যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

১৯৬৩ সালে ব্রিটিশ গায়ানার চেদি জাগান ইংল্যান্ডের হাত থেকে মুক্তি চাইলেন এবং শ্রমআইন সংস্কারে প্রবৃত্ত হলে, AFL-CIO'র জে লাভস্টোন শ্রমিকদের অজ্ঞাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চক্রান্ত করে এগারো-সপ্তাহব্যাপী ভুক ধর্মঘট করালেন। চেদি জাগানের পতন ঘটল, গায়ানাও ব্রিটিশ থাকল, এবং যেসব শ্রমিক দিনে পঞ্চাশ সেন্ট বেশি মাইনে চেয়েছিল তাদের কম্যুনিস্টদের দালাল বলা হয়।

১৯৬৫ সালে ডমিনিকান রিপাবলিকে বিদ্রোহ সুরু হল, মার্কিন সৈন্য তড়িঘড়ি বিদ্রোহ দমন করল। কেন? কাকে শান্তিদূত রূপে পাঠানো হয়েছিল সেই (ছোট) এলসওয়ার্থ বাঙ্কার ডমিনিকান রিপাবলিকের ন্যাশনাল শুগার রিফাইনিঙ্ কোম্পানীর মালিক। জনসনের বন্ধু, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এ্যাবি ফোরটাস গত উনিশ বছর ধরে গুড় ব্যবসায়ী সুক্রোট কোম্পানীর বোর্ডে আছেন। এই বোর্ডের চেয়ারম্যান মৃত কেনেডির ঘনিষ্ঠ বন্ধু এ্যাডলব বার্লে। রাষ্ট্রদূত এ্যাভেরল হ্যারিম্যানের ভাই রোল্যান্ড ন্যাশনাল সুগারের বোর্ডে আছেন। ডোমিনিক্যান রিপাবলিকে ২৭৫০০০ একর জমির মালিক, সবচাইতে বড় চাকুরিদাতা, যাঁরা তাঁদের শ্রমিকদের মাইনে দেন মাসে তিরিশ ডলার সেই দক্ষিণ পুয়োর্টো রিকো শুগার কোম্পানীর বোর্ডের সভ্য হলেন রিপাবলিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোসেফ ফারল্যান্ড।

এঁরা সকলেই লিবারেল।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। কলিকাতা ২৮। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কবিতার সংজ্ঞা ও প্রকরণে অধুনা নানা ব্যতিক্রম, এবং এই নতুন লক্ষণ আর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। যদিও এই ব্যতিক্রম সম্পূর্ণ আধুনিক নয়, এবং এর শুরু মোটামুটি প্রাচীন, তবু তা আজকের মতো কবি মানসিকতার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হওয়ার গৌরব অর্জন করে নি। তখন তাকে এক আন্দোলন, আরো রোম্যান্টিক ভাষায়, বিদ্রোহ বলে অভিহিত করা হয়েছিল। বস্তুত, চিরাচরিত কাব্য ধারা থেকে তদানীন্তন প্রস্থান, আমাদের কবিতার ইতিহাসকেই সমৃদ্ধ করেছে; কাব্য-বোধে সেই এক নতুন সংযোজন।

আশার কথা, বাংলা কবিতায় এমন স্রষ্টা আজও উপস্থিত। তাঁরা যে পরিচিত জগতকে ভিন্ন চোখে দেখতে পারেন, অনুভূতিকে যে ভিন্ন রীতিতে পরিবেশন করতে পারেন, এতে নিঃসন্দেহে কাব্যরসিকেরা স্বস্তি বোধ করবেন।

এই গোত্রেরই অন্যতম কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কিছু কবিতা এর আগে ইতস্তত পাঠ করেছি, কিন্তু এক সঙ্গে এতোগুলি কবিতা পড়ার সুযোগ এই প্রথম। বলা

বাহুল্য, তাঁর বাংলা ভাষার অনুশীলন সার্থক। কি গদ্য, কি পদ্য, দুটি মাধ্যমকেই সমান সরসতার সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর দক্ষতার পরিচয় মেলে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার বইটি পাঠ করতে শুরু করেছিলাম কিছুটা দ্বিধা নিয়ে। কারণ গ্রন্থের নামাকরণেই মনে হয়েছিল, বুঝি-একটা চমক দেবার কিন্তুত আয়োজন।

আধুনিক কবিতার যে-কটি উপকরণ তাকে ভিন্ন করেছে, সেগুলি হল চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহার। এবং এদিক থেকে সুনীলবাবু সিদ্ধ হস্ত। যেমন 'চোখের জলে মাছ ধরেছি' (মহারাজ, আমি তোমার)। এই একই কবিতায় এমন শব্দ সৃষ্টি তিনি করেছেন যার উচ্চারণে আদিবাসীর অপাকৃত মন্ত্রোচ্চারণের অনুরণন : 'ঝিলি ঝিলি খান্ডা গুলু, হুম চাক ডবাং ডুলু। হুড় মুড় তা ধিন না, উসখুস সাকিনা খেলা—মহারাজ, মনে পড়ে না?' এমন অজানা শব্দের ব্যবহারেও কবিতার প্রার্থিত মেজাজটি কোথাও ব্যাহত হয় নি, বরঞ্চ রঙের গোলকের মতো পরিপূরকের কাজ করেছে।

অথবা 'রৌদ্রের চিৎকার,' মুণ্ডহীন আমি,' কিম্বা 'রক্তের সমুদ্রে এক দ্বীপ আছে, সেখানে স্টীমার ছাড়ে সঠিক দশটায়।' এদের সবগুলিই আধুনিক চিত্রকল্পের সার্থক উদাহরণ।

তাঁর কোনো কবিতায় শরীর কামনার 'অপরাধ' থাকলেও ভালোবাসার অন্বিষ্টার অনুপস্থিতি নেই। তফাৎ এই যে, ভালোবাসাকে তিনি কৈবল্যে স্থিত করেন নি। ফলে জৈবিক কামনার শেষে অবসাদ ও অণীহায় সহজ ভালোবাসার প্রয়াস। 'যেমনভাবে লক্ষ-কোটি মানুষ ভালোবাসে, ভালোবাসায়।' (আর্কেডিয়া ও হঠাৎ নীরার জন্য কবিতায় মুহূর্তের মধুর রোম্যান্টিকতা।

কাব্য মানসিকতাকে প্রকাশ করার ভঙ্গীটি সুনীলবাবুর স্বাশ্রয়ী। তাঁর গতিবেগ অব্যাহত। তাই কয়েকটি কবিতা মনে হবে, স্বপ্নের ঘোরে অসংলগ্ন আলাপের মতো। তাঁর ক্ষুব্ধ অনুভূতির দ্বিধাহীন প্রকাশ : 'আপনজন ও নীরাকে উত্তর' কবিতা দ্রষ্টব্য। স্বপ্নে সংগতি থাকে না, পারম্পর্যেরও অভাব ঘটে। চেতনায় সব কিছু এলোমেলো। সুনীলবাবুও যেন এ-জাতের কবিতায় তেমনি চেতনার জটিলতায় পথ হারিয়েছেন। ফলে বক্তব্যে তাঁর খেই নেই, হারানো পথে স্খলিত পদযাত্রার মতোই তখন তাঁর উক্তি। কিন্তু কবিতার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করলেই দেখা যাবে, এই স্খলিত চেতনার প্রভাব সাময়িকমাত্র। অচিরেই আবার তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 'অপমান এবং নীরাকে' কবিতাটি পাঠ করলে অন্তত এই মনে হয়। বিশ্লিষ্ট চেতনায় তিনি তাঁর কবি মনকে প্রকাশেই অবনমিত করেছেন। এবং এইখানেই অতি বাস্তবতা সৃষ্টির প্রবনতায় অনভিধানিক শব্দ নিয়ে খেলা বাহুল্য ঠেকেছে। তখন তিনি ভেবেছেন, 'উদাসীন সঙ্গম সাধনা,' ভালোবাসায় তাই বিশ্বাস হারিয়েছেন। কিন্তু সেই বিভ্রমের কুণ্ডলী থেকে মুক্তি-লাভ করে 'প্রতি নারী অঙ্গকে শিশির ধোয়া জ্যোৎস্নার মতো পবিত্র, স্বচ্ছ ঘাসের মতো কোমল ভাবতে পেরেছেন। এবং এই পর্যায়েই সুনীলবাবু নিছক ব্যক্তিত্বের বর্ণহীন শিকড় থেকে উন্নীত হয়েছেন। এবং এই তাঁর কবি মানসিকতার অভ্রান্ত স্বীকৃতি।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

কুশল সংলাপ—কবিরুল ইসলাম। পূর্বাশা প্রকাশন। কলিকাতা ৯। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'দরজা সব খোলা থাক্ এবং জানালা—আলো আসবে, হাওয়া হাসবে, কুশল শুধাবে'—কবিরুল ইসলামের এই মেজাজটিই কবিতানুরাগী একালের পাঠকের পক্ষে বহুবাঞ্ছিত আমন্ত্রণ। অথচ, তিনি আমাদের এই অশেষসমস্যাজর্জর দেশ-কালেরই মানুষ,—বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনীতিক-রাষ্ট্রীয় আবর্তের বিদ্যমান দুর্যোগেও তাঁর এই বিশ্বাস এবং আশা অকৃত্রিম বলতে দ্বিধা নেই। 'কুশল সংলাপ' এবং 'কুশল সংবাদ' নামে দুটি কবিতাতেই তিনি মানুষের মৌল স্বভাব ভালোবাসায় এই বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। শেষোক্ত কবিতায় লিখেছেন—

কালক্রমে আমাদের স্থির লক্ষ্য উত্তরপুরুষ
স্বাধিকারে পৌঁছে যাবে সূর্যের বাসরে

'আমি ঠিক চিনে নেব' নামে আর-একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

এক হাজার বছর পরে যদি স্বর্ণযুগ আসে
আমি সেই স্বর্ণযুগে যেন ফিরে আসি—
এই বাংলাদেশ, এই সূর্যের সংসারে
স্ববাসে প্রবাসী কেউ যখন থাকবে না।

এই কবিতাগুচ্ছে ভালোবাসার রূপক গোলাপ। স্মৃতির উপমান জননী। 'কুশল সংলাপ' এবং 'সমস্তই স্মৃতি হয়ে যায়' কবিতা-দুটিতে এই চিন্তা আছে। 'নিত্যই নতুন হই' তাঁর এই কবিতাগুচ্ছের একটির শিরোনামও বটে, আবার এই বইখানির ব্যাপক আশাবাদের বীজমন্ত্রও বটে। কবিতার প্রেরণা হিসেবে এই আশা-বিশ্বাস-ভালোবাসাই তাঁর স্বীকৃতি-চিহ্নিত। 'সহোদর' নামে একটি রচনায় দেখা যায়—

বস্তুত একটিই বস্তু কবিতার জন্ম দিতে পারে .
ভালোবাসা, হে আমার বিকল্প ঈশ্বর!
একটি বৃক্ষেরও নাম সেই ভালোবাসা
মাটির শরীরে যার দৃঢ় মূল কিন্তু ঊর্ধ্বে ডালপালার বাহু
আলো হয়ে আকাশে বাড়ানো...

আবার, 'সহোদর, হে আমার উমিদ্র বিষাদ' নামে আর-একটি রচনায় তিনি তাঁর বিষাদের দিকটিও স্বীকার করছেন। কিন্তু বিষাদের দূরপনেয় কোনো কালিমা নেই কবিরুল ইসলামের স্বগতোক্তিতে। তিনি প্রতীক্ষায় আছেন—

আমি আজো অপেক্ষায় আছি :
ভোরের সান্নিধ্যে কবে আলোর আলাপে
বুকের গোলাপ ফুটবে অলৌকিক ঈশ্বরের মতো।

জননীতে প্রিয়াতে যে একই শক্তির অভিব্যক্তি, সে-উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে 'মায়ের প্রসন্ন মুখ' কবিতাটিতে। মায়ের প্রসন্ন মুখও প্রিয়, আবার, 'যৌবনে উজ্জ্বল নারী ফুলের উত্তাপে বাড়ে', সেও সত্য; কবিরুল একথাও জানেন যে—

প্রত্যেকেই নিজ নিজ সূর্য-সান্নিধানে যেতে চায়।
কেউ কেউ যেতে পারে।

এবং পরিণামে সকলেই পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। অনেকেই আবর্তনে অন্ধ হয়ে আছে বটে, অথচ আশা জানে যে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছুতেই হবে। সেই জোরেই প্রতীক্ষা চলেছে—

'কবে কত আলোকবর্ষ পরে
প্রত্যেকে পৃথিবী হয়ে সূর্য-সন্নিধানে চলে যাবে।'

একালের কোনো নবীন কবির পক্ষে এ-প্রতীক্ষার সামর্থ সত্যিই বিস্ময়কর। কবিরুল ইসলাম যে অবসাদে ব্যথিত তথাকথিত আধুনিক কবি মাত্র নন, এই অভিজ্ঞতাই তাঁর পাঠকের সর্বাধিক প্রাপ্তি।

তাঁর ছন্দের হাত মসৃণ। শুধু 'স্বরচিত' নামে লেখাটির প্রথম স্তবকের তৃতীয় চরণে কানে একটু অভাববোধ অনুভব করা গেল। এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দসজাগ মিতভাষিতার স্মৃতি তাঁর কয়েকটি কবিতা পড়তে পড়তে মনে পড়ে।

হরপ্রসাদ মিত্র

বিজ্ঞপ্তি

প্রেসের গোলযোগে 'চতুরঙ্গে'র বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশে বিশেষ বিলম্ব হলো। পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের নিকট আমরা মার্জনা চাইছি।

চতুরঙ্গ

ধোবার কোন সাহায্য ছাড়াই আপনার বাচ্চাদের জামাকাপড় দেখতে দেখতে ছোট হয়ে যায়...

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ ভারতীয় ঐতিহ্য ২০১

সুশীল রায় ॥ দুর্গা ২১৩

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ কেউ কথা রাখেনি ২২১

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ॥ ধ্যান ধারণায় ভিড়ে ২২৩

দিব্যেন্দু পালিত ॥ তোমাদের দেবার মত ২২৪

শান্তিকুমার ঘোষ ॥ একটানা বৃষ্টি পড়ছিল ২২৫

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ॥ প্রবাস ২২৭

অচ্যুত গোস্বামী ॥ নাট্য-চিন্তা ২২৮

ওয়ালিদ ইখলাসী ॥ বিকেল ২৩৫

যামিনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ ভারতীয় সঙ্গীতে রাগালাপ ২৩৮

অমিয়ভূষণ মজুমদার ॥ অধ্যাপক মোহিত স্যানের উপাখ্যান ২৪৫

শিশিরকুমার ঘোষ ॥ এজরা পাউন্ড : দু'একটি কথা ২৬২

গৌরকিশোর ঘোষ ॥ আধুনিক সাহিত্য ২৮১

সমালোচনা—অমিয়কুমার মজুমদার, রামপ্রসাদ সেন, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, তরুণ রায়, সুমিত মিত্র ২৮৩

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ঊনত্রিংশত্তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

কার্তিক-পোষ ১৩৭৪

ভারতীয় ঐতিহ্য

হুমায়ুন কবির

ধ্রুপদী এবং খেয়ালী শিল্পরীতির মধ্যে জীবনদৃষ্টির দুটী পৃথক ভঙ্গীর পরিচয় মেলে। দুটী শিল্পরীতির যেখানে সমন্বয়, সেখানে শিল্পের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু সকল শিল্পেই কমবেশী দুটী ধারারই পরিচয় মিলবে। এ দুটী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে যেখানে নতুন জীবনদর্শন ও সংস্কৃতির আবির্ভাব, সেখানে মানুষের জীবন নতুন নতুন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে প্রাচীন ভারতীয় এবং নবাগত সারাসেনিক শৈলীর সমন্বয় ঘটেছিল বলে সে যুগে কেবল শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্র বলে নয়, জীবনের সমস্ত প্রকাশেই মানুষের আত্মার মহিমান্বিত আবির্ভাব আমাদের মুগ্ধ করে।

হিন্দু এবং মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গম ও সমন্বয়ের ফলে ভারতে দর্শনের ক্ষেত্রে যে বিকাশ, তার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। বুদ্ধির ক্ষেত্রেই যে এ সমন্বয় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। প্রথম পরিচয়ে হৃদয়ের চেয়ে মনের উপরই প্রভাব বেশী হয়। বুদ্ধি যাকে সত্য বলে স্বীকার করে, হৃদয় তখুনি তাকে গ্রহণ করে না বলে ব্যবহারে তার প্রকাশ বিলম্বিত হয়। তার জন্য সময় ও বোধ হয় পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। বুদ্ধি দিয়ে যা স্বীকার করি আবেগ দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে যে আরো সময় লাগে, অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার পরিচয় মেলে। কিন্তু এক বার সত্য বলে যাকে গ্রহণ করি, তা আমাদের সত্তাকে আমাদের অজ্ঞাতেই প্রভাবান্বিত করতে শুরু করে এবং তার ফলে ধীরে ধীরে আমাদের অনুভূতিও বদলায়। বুদ্ধির প্রভাবে তাই কালক্রমে আবেগও রূপান্তরিত হয় এবং শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রকাশ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের মাটীতে ইসলাম যেদিন পৌঁছল, তখন তার প্রথম প্রভাবে দক্ষিণ ভারতে দর্শনের সৃষ্টি কিন্তু বহু-দিনের পরিচয় ও অন্তরঙ্গতার ফলে উত্তর ভারতে শিল্পসৃষ্টিতেই সে প্রভাবের পূর্ণ বিকাশ।

ভারতীয় স্থাপত্যে হিন্দু এবং মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। বাঙলাদেশে বৈষ্ণব পদাবলী ও সাহিত্যের মধ্যে এ সমন্বয়ের আর একটি অপরূপ দৃষ্টান্ত মেলে। সার্থক শিল্পসৃষ্টির জন্য যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন, আদিকাল থেকেই বাঙলা দেশে তাদের অভাব ছিল না। সে সমস্ত উপাদানকে একত্রিত করবার জন্য শুধু

একটী যোগসূত্রের প্রয়োজন ছিল। ইসলামের আবির্ভাবে সে যোগসূত্র মিলল বলে অল্প-দিনের মধ্যেই বাঙলাসাহিত্যে অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি দেখা দিল।

বাঙলার বৈষ্ণব কাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। সমন্বয়ের এক অপরূপ প্রকাশে সক্রিয় মনোবৃত্তির সঙ্গে মায়াবাদের নিশ্চেষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর যে মিলন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। আধ্যাত্মিকতাকে সাধারণত হিন্দু মানসের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ মনে করা হয় কিন্তু বহুক্ষেত্রে যে সে আধ্যাত্মিকতা নিষ্ক্রিয় এবং নেতিবাচক একথাও অস্বীকার করা চলে না। নিষ্ক্রিয়তা এবং নেতিধর্মের কারণ খুঁজতে গেলে ঐতিহাসিককে স্বীকার করতেই হবে যে পার্থিব জীবনে পরাজয়ের মধ্যেই তার উদ্ভব। এককালে হিন্দু-মানস সম্মুখ রাজসিক মহিমায় ভারতবর্ষ অতিক্রম করে বৃহত্তর ভারতের পত্তন করেছিল, সেকালে নিষ্ক্রিয় নেতিবাদের ছায়া হিন্দুমানসকে স্পর্শ করেনি। পরবর্তী যুগে আধ্যাত্মিক শক্তির অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তা বাড়তে সুরু করে কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমান যেদিন অভিযাত্রী হিসাবে ভারতবর্ষে প্রথম এসেছিল, সেদিন ভারতবর্ষের হিন্দু সক্রিয়ভাবে তাদের বিরোধিতা করেছে এবং বহুদিন ধরে স্বকীয়তা বজায় রাখবার জন্য সংগ্রাম করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের পরে যে মানসিক অবসাদ, তারই ফলে কালক্রমে সক্রিয় সংগ্রামশীল মনোবৃত্তির বদলে সংসারকে অস্বীকার করবার প্রবৃত্তি দেখা দিল। ধীরে ধীরে যে সন্ন্যাসমনোবৃত্তি ভারতবর্ষে ছেয়ে গেল, তা পার্থিব সাফল্যকে ছোট করে আধ্যাত্মিক জগতকে বড় করবার চেষ্টা করেছে। এই যে সংসারের প্রতি বীতরাগ এবং পৃথিবীকে নশ্বর মায়া বলে লঘু করার চেষ্টা, তার ফলে পুরাকালে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কীর্তি ও প্রাচীনকালের হিন্দুদের দিগ্বিজয়ের কথা ধীরে ধীরে অলীক কাহিনীতে পর্যবসিত হল।

ভারতবর্ষেরও যে এককালে রাজসিক ঐতিহ্য ছিল, সেকথা আমরা ভুলতে বসেছি। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেশবিদেশে ভারতবর্ষের বিজয় কাহিনী আজ রূপকথার মতন শোনায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করবার যে প্রচেষ্টা, তার কথা আজ অনেকেই জানে না। মধ্যযুগে সন্ন্যাসের ধূসর আবরণে ভারতবর্ষের চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল, ফলে পূর্বযুগের রাজকীয় মহিমা ও ঐশ্বর্যের কথা জনমানসে একেবারে চাপা পড়ে গেল। এ পরিবর্তনে বিস্মিত হবার কারণ নেই। পরাজিত ও বিজিত গোষ্ঠি বা সম্প্রদায় সর্বদা সর্বত্র সন্ন্যাস মনোবৃত্তির আড়ালে আত্মরক্ষা করতে চায়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী একান্তভাবে সন্ন্যাসবিরোধী, পার্থিব এবং অপার্থিবের মধ্যে প্রভেদ অস্বীকার করে ইসলাম বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির বিকাশে সাহায্য করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ভারতীয় মুসলিম সমাজে অভিজ্ঞতাবিমুখ সন্ন্যাসমনোবৃত্তির প্রকাশ সুস্পষ্ট। পরলোকে ভবিষ্যত সুখ ও গৌরবের স্বপ্নে ব্যক্তি এবং সমাজ ইহলোকে প্রতিদিনের জীবনে বর্তমানে যে পরাজয়, তার গ্লানি ভুলবার চেষ্টা করবে, তাতে বিচিত্র কি? আধ্যাত্মিক মহিমার আশায় পার্থিব জগতের দুঃখ এবং দৈন্য সহ্য করবার শক্তি সংগ্রহের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার মেলে।

প্রাক মুসলিম যুগেই ভারতবর্ষে এ সন্ন্যাস মনোবৃত্তির সূচনা হয়েছিল। তার সামাজিক কারণও স্পষ্ট। জগত নশ্বর, জীবন মায়া এ কথা মনে করলে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় মানুষে মানুষে যে বৈষম্য, তা মনকে পীড়া দেয় না। বর্ণাশ্রমের অধোগতিতে জাত্যাভিমানে যেদিন সমাজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করল, সেদিন

এই সন্ন্যাসধর্মী মনোবৃত্তির ফলেই শোষিত অত্যাচারিত মানুষ বিদ্রোহ করেনি, সমাজকে ভেঙে চুরমার করে ফেলেনি। এই সংসারবিমুখ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই সামাজিক অসাম্য ও অন্যায়কে তারা মেনে নিয়েছে। মনকে প্রবোধ দিয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপ। আত্মা অজর ও অমর, তাই ব্যবহারিক জগতে যে দৈন্য ও অপমান, ব্যক্তির মধ্যে নিহিত দেশকালাতীত ব্রহ্মকে তা স্পর্শ করে না। সামাজিক অসাম্য ও অত্যাচার, ব্যক্তির দুঃখ ও গ্লানি সবই মায়া। এই নশ্বর জীবনের শেষে ব্যক্তি যখন ব্রহ্মে বিলীন হবে, তখন এ মায়ারও অবসান হবে।

ইসলাম যেদিন ভারতবর্ষে এসেছিল, সেদিন ইসলামের প্রাণশক্তি প্রবল, সন্ন্যাসমনোবৃত্তির ছায়ামাত্রও সেদিন ছিল না। তাই ইসলামের সংঘাতে ভারতবর্ষের সংসারবিমুখ মনোবৃত্তিতে প্রচণ্ড আলোড়ন এল। ইসলাম একান্তভাবে অভিজ্ঞতা নির্ভর ধর্ম, পার্থিব ও পারলৌকিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়কেই সমানভাবে স্বীকার করে। সকল মানুষকে ভাই বলে ঘোষণা করে ইসলাম সামাজিক গণতন্ত্রের যে বাণী বিশ্বময় প্রচার করেছিল, সেযুগের কোন সভ্যতা বা রাজনৈতিক সংগঠন তার প্রভাব এড়াতে পারেনি। ইসলাম সেদিন একথাও ঘোষণা করেছিল যে মানুষের সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব এই জীবনে এই পরিচিত পৃথিবীতেই সাধন করতে হবে, মৃত্যুর পরে কোন অজ্ঞাতলোকে পারমার্থিক অভিজ্ঞতার সাম্য মিলবে, এ কথার দোহাই দিয়ে বর্তমান জীবনের অসাম্য ও অন্যায়কে সহ্য করা চলবে না। যে সমস্ত সংস্কার ও বন্ধনের ফলে মানুষ চিরাচরিত অসাম্য মেনে নিয়েছিল, ইসলামের বিপ্লবী আহ্বানে সে সমস্ত সংস্কার ও বন্ধন চূর্ণ হয়ে গেল। দেশে দেশে বঞ্চিত ও অত্যাচারিত মানুষ তাই ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, ইসলামের আবির্ভাবে মুক্তি ও স্বাধীনতার সন্ধান পেয়েছিল। সে যুগে ইসলামের প্রভাব যে দুর্বার ও দ্রুত গতিতে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, কেবলমাত্র শস্ত্র শক্তি দিয়ে তার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। দেশবিদেশের লোক স্বতোস্ফূর্তভাবে সামাজিক, মানসিক ও আত্মিক মুক্তির আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল বলেই সেদিন ইসলামের এ বিস্ময়কর প্রসার ও প্রগতি।

প্রাচীন সমাজের নিস্পন্দতা ও ইসলামের বিপ্লবী আবেগ - এই দুই শক্তির সমন্বয়ের অপূর্ব নিদর্শন বাঙলার বৈষ্ণব কবিতায় মেলে। বৈষ্ণব কাব্যের মর্মকথা প্রেম এবং প্রেমের যে প্রকৃতি এ কবিতায় উদ্ভাসিত, এই সমন্বয়ের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। কেবলমাত্র দেহ বা মনের বিচারে প্রেমকে বোঝা যায় না। সংবেদনের আধারে যাঁরা প্রেমকে উপলব্ধি করতে চান, তাঁরাও ভ্রান্ত। দেহমনের সম্মিলিত আকৃতি প্রেমে মূর্ত হয়ে উঠে। কেবলমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়, সমাজের ক্ষেত্রেও প্রেম সৃজনীশক্তির প্রতীক ও স্বরূপ। বুদ্ধিজীবী প্রেমের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। কেবলমাত্র জৈবিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে যাঁরা প্রেমকে বিচার করেন, তাঁদের ভুল আরো বেশী। অতীত এবং বর্তমানের নিশ্চয়তাকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের অজ্ঞাত লক্ষ্যের সন্ধানে ব্যক্তির অভিযান বললেই বোধ হয় প্রেমের প্রকৃতির খানিকটা পরিচয় মেলে। যে অভিযাত্রী, সে সক্রিয়। তাই সক্রিয়তা প্রেমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অভিযান যত দুরূহ, সক্রিয়তার প্রয়োজন তত বেশী। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের যে প্রয়াস, তার লক্ষ্য স্থির বলে প্রয়াসও সীমাবদ্ধ। প্রেমের যে অজ্ঞাত লক্ষ্যের জন্য অভিযান, সেখানে লক্ষ্য অনির্দিষ্ট বলে প্রয়াসও ব্যাপক ও সীমাহীন। সে লক্ষ্যহীন প্রয়াসকে জীবনের আনন্দের প্রকাশ বললে অত্যুক্তি হয় না। বন্ধনমুক্ত ও স্বাধীন জীবনশক্তির এ প্রকাশ মানুষের জীবনে শিশুর অহেতুক আনন্দের মধ্যে মেলে, প্রেমিকের দেহমনাতীত প্রেমলীলায় তারই চরম প্রকাশ।

প্রেমকে যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক, অবশেষে স্বীকার করতে হয় যে লীলাই তার মর্মকথা। বৈষ্ণব কাব্যে প্রেম তাই অনির্দিষ্ট এবং অনির্দেশ প্রাণশক্তির লীলা। লীলাই সক্রিয়তার চরম বিকাশ কিন্তু বৈষ্ণব কাব্য সেই চরম বিকাশের প্রান্তে পৌঁছেও নিষ্ক্রিয়তাকে একেবারে বর্জন করতে পারেনি। বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের সমস্ত প্রকাশেই কবি প্রেমাস্পদ, লোকাতীত প্রেমিকের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং করাই তাঁর ধর্ম। কবি তাই প্রেম ভিখারী, কোথাও কিন্তু নিজে প্রেমিকের ভূমিকা গ্রহণ করেন না। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে যে কবির এ মনোভাবই স্বাভাবিক, পরমব্রহ্মের কাছে মানবাত্মা আত্মসমর্পণ করবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? সাধারণ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এ কথা সত্য হতে পারে, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্যক্তি চিরদিনই অব্যক্তের সন্ধানে আত্মবিলোপ করবে কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় অভিজ্ঞতার যে স্তরের আভাস মেলে, সমস্ত নিস্পন্দতা বর্জন করে মানুষের আত্মা যেখানে একান্তভাবে সক্রিয়, সে স্তরে ব্যক্তি ব্রহ্মের অভিসারে বাহির হয় না। সেখানে ব্যক্তি এবং ব্রহ্মের বিভেদ লোপ পেয়েছে বলে মানুষের আত্মাকে বিচ্ছিন্ন ও অধীন মনে করা চলে না। প্রেমলীলার যেখানে চরম বিকাশ, সেখানে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে বিভেদও দূর হয়ে যায়, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিতেও এ বিভেদের রেশ রয়েছে। বৈষ্ণব কবিতা তাই মায়াবাদকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেনি কিন্তু প্রেমের লীলারূপ স্বীকার করে অদৃষ্টবাদ বা নিয়তির বন্ধনকে লঙ্ঘন করবার প্রয়াস করেছে।

বৈষ্ণব কবিতার এ স্বরূপ হিন্দু এবং মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ের ফল। মুসলিম যুগের অব্যবহিত পূর্বে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই মায়াবাদের প্রভাবের পরিচয় মেলে। নিয়তি এবং মায়াবাদে বিশ্বাস যেখানে প্রবল, সেখানে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। শুধু তাই নয়। মায়াবাদে যারা বিশ্বাসী, তাদের কাছে ব্যক্তি গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্যকে মায়া বলে অবহেলা করবার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। পূর্বেই দেখেছি যে মায়াবাদের ফলে মানুষ সামাজিক অন্যায় ও অসাম্যকে মেনে নেয়, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না। পুনর্জন্মে বিশ্বাসও এ মনোবৃত্তির ফলে সহজগ্রাহ্য হয়ে উঠে এবং তার ফলে সমস্ত পরিবর্তন ও প্রগতি অবাস্তব মনে হয়, ব্যবহারিক জীবনের অসাম্য সহ্য করা সহজ হয়ে উঠে। কীটপতঙ্গপশুপক্ষী এবং মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখার অর্থ যে জীবনের প্রকাশে অগ্রগতি নেই এবং পৃথিবীর সে সমসমাজে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ভিত্তিহীন। ইসলাম কিন্তু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিল যে মানুষ সমস্ত সৃষ্টির ভূষণ এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর তার কর্তৃত্ব। স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী বলে মানুষ অন্যায় করতে পারে কিন্তু সেই স্বাধীনতাই তাকে সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছে। বৈষ্ণব কাব্যও ললিতকণ্ঠে ঘোষণা করেছে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

[ক্রমশঃ

লুসি

সুশীল রায়

রাত্রের সেই উৎসব-সজ্জায় তার সাজ ছিল এক রকমের। এখন, এই ভোরে, আরপুলি লেনের একতলার এই অন্ধকার ঘরে তাকে দেখলে চেনা খুব কষ্টই হবে। এই কি সেই?

বিচিত্র রূপ এই কলকাতা শহরের। প্রহরে-প্রহরে এর রং বদলায়। ভোরবেলা কর্পোরেশনের ময়লাগাড়ি নিদারুণ শব্দ করে এর পথঘাট উচ্চকিত করে; একটু বেলা হলে প্রায় সমস্ত শহরটাই যেন নেমে আসে রাস্তায়—জনস্রোত চলতে থাকে ফুটপাথ বেয়ে, ফুটপাথ উপচে সেই স্রোতের কিছুটা চলতে থাকে রাস্তার কিনার বরাবর। ট্রাম বাস ট্যাক্সি ঠেলাগাড়ি লরি জট পাকিয়ে যায় মোড়ে-মোড়ে। দুপুর-বেলা ভিড় কিছু কমে। বিকেলবেলা আবার সেই জনস্রোত বয়ে চলে উল্টোমুখে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি নামে। চাপ-চাপ অন্ধকারের মত মানুষের ভিড় দল বেঁধে দাঁড়ায় মোড়ে-মোড়ে—ঘরে ফেরার জন্যে উদ্‌বৃত্ত জনতা তখন যানবাহন খুঁজছে।

সেই ভিড়ের ওপার দিয়ে ধীর গতিতে হেঁটে চলেছে দুটি পা। হাঁটা আর হাঁটা…

সকালবেলার আরপুলি লেনের অন্ধকার ঘরে একে যে দেখেছে, সে একে এখন চিনতে পারবে না। এর চেহারা এখন আলাদা, এর হাঁটার ধরণ ভিন্ন, এর চোখের চাহনি এখন অন্যরকম।

এক ভাবে হেঁটে চলেছে দুটি পা। এমনি যুগল পায়ে ভর করে আরও কয়েকজন এমনি ভাবেই হেঁটে চলেছে চৌরঙ্গীর চওড়া রাস্তার পাশের ফুটপাথ দিয়ে।

তাদের চোখ-দুটি নিশ্চয় কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বিচিত্র রূপ এই কলকাতা শহরের। বিচিত্র রূপিণীদের রূপও বড় বিচিত্র।

কিন্তু সে অন্য কথা।

আমরা এখানে যার কথা বলতে বসেছি সে হচ্ছে সাহেবদাদা। ঐ নামেই তার পরিচয়। বন্ধুবান্ধবদের কাছেও সে হচ্ছে সাহেব। কিন্তু তার এ নামের তাৎপর্য কি, তা কেউ জানে না। ওটা ওর ডাকনাম। গায়ের রং যতটা কালো হওয়া সম্ভব ততটাই কালো। কিন্তু চেহারায় পালিশ আছে। বেশ ভদ্রগোছেরই চেহারা। অথচ স্বভাবটা একেবারে বিপরীত, অনেক সময় অভদ্রও হয়তো বলা যায়।

আসানসোল থেকে মাঝে-মাঝে সে আসে কলকাতায়। কলকাতায় সে আসে বিশেষ-কোনো কাজে নয়, কাজের অছিলায়।

অদ্ভুত চরিত্র এই সাহেবদাদার। উচ্ছৃঙ্খল অনাচারী ইত্যাদি যত কঠিন শব্দ আছে, তার সব কয়টিই তার বেশ উপযোগী। অথচ তার চাল-চলন আদব-কায়দা দেখে বুঝবার উপায় নেই যে এই মানুষটা একেবারে অমানুষ। কলকাতায় সে আসে কাজের অছিলায়, এখানে এসে তার যা-কিছু কাজ সবই তার উচ্ছৃঙ্খলতা।

সাহেবদার নিজের চরিত্রে অনেক ভেজাল আছে, কিন্তু ভেজাল জিনিসের ওপর তার তীব্র বিতৃষ্ণা। তার জীবনের চাহিদাই হচ্ছে খাঁটি—সে তাই বলে।

অমায়িক হেসে সে বলে, আমার চাহিদা খাঁটি, এর মানে কি জানো? খাঁটি জিনিস

আমি চাই। আহারে যেমন, বিহারেও তেমন।

যারা তাকে চেনে এবং তার স্বভাবের কথা জানে তারা বুঝতে পারে তার কথা। যারা বোঝে না তারা তার চকচকে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

উজ্জ্বল চোখ-দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে সাহেবদাদার।

ইঙ্গও নাকি ভালোবাসেন সাহেবদাদা, বঙ্গও নাকি ভালোবাসেন তিনি, কিন্তু যাকে বলে ইঙ্গবঙ্গ সেই জগাখিচুড়ি তাঁর নাকি একেবারে পছন্দ নয়।

দু-পয়সা রোজগার তাঁর আছে, বিয়ে করে বেশ সানন্দে ও স্বাচ্ছন্দে দিন চালাবার মত মেজাজ ও রেস্তও তাঁর আছে; অথচ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে হল না আজও। অথচ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু যারা, যারা এত স্বচ্ছল ও স্বাস্থ্যবান নয় তারা দিব্যি বিয়ে-সাদি করে হেসে-খেলে দিন কাটাচ্ছে।

কলকাতায় এলে সাহেবদাদা ওঠেন তাঁর বন্ধুর ডেরায়—পার্ক সার্কাসে।

মৃগাঙ্ক বলে,—ওর মাথাটা খারাপ। একটু ছিট আছে। ও একটু সাহেব-ঘেঁষা। তাই মধ্যবিত্ত পাড়ায় ওঠা তার পোষায় না। চড়কডাঙ্গা, বেনেপুকুর, হালসিবাগান, জেলে-পাড়া –কত পল্লীই তো আছে এই কলকাতা-শহরে। কত বন্ধুই তো আছে ঐসব পাড়ায় কিন্তু উঠতে হলে ও উঠবে গিয়ে ঐখানে—সার্কাস ম্যানশনে। ত্রিদিবের কাছে। ত্রিদিবও তো একটু ইয়ে-গোছের, যাকে বলে ফিরিঙ্গি-ঘেঁষা।

বাদুড়বাগানে অপরেশের বাসায় পুরনো বন্ধুরা একত্র হয়েছে অনেক দিন পরে। এমন একটা কাজ চাই যা নাকি সকলকে কিছুক্ষণের জন্যে এক সুতোয় বেঁধে রাখতে পারে। সেই সুতোটি হচ্ছে আপাততো তাস। তারা তাস পিটছিল, আর তাদের পুরনো বন্ধু শ্রীশচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। সত্যি, তাদের কলেজ-জীবনে শ্রীশ ছিল কত সাদাসিধে হঠাৎ কেমন সাহেব বনে গেল।

ওরা আক্ষেপ করছিল না, ওরা মজা করছিল। শ্রীশকে নিয়ে ওদের মজা বেশ জমে। কালেভদ্রে শ্রীশকে সশরীরে পায় বটে, কিন্তু তার প্রসঙ্গ নিয়ে মজা করতে ক্ষতি কি!

অপরেশের স্ত্রী একটা নীচু মোড়ায় বসে এদের কথায় একটু-একটু যোগ দিচ্ছিল। মৃগাঙ্কের কথা শুনে সে বলল,—আপনারা কোনো কাজের মানুষ নন। আপনারা কেবল কথার মানুষ। শুধু কথা আর শুধু কথা। মানুষটা একটু সাহেব-ঘেঁষা যদি হয়েই থাকে তাতে আপনাদের এত গা জ্বলে কেন। আপনারা কি সবাই সাচ্চা মানুষ? কোনো কিছুর ঘেঁষা কি আপনারা নন্?

কথাটা বলে মহিলাটি একটু হাসলেন। মনোরঞ্জন একটু ঠাণ্ডা-প্রকৃতির লোক। তাসের হাত ধরে সে বসে আছে, সে মন্তব্য করল,—বিবি।

মনোরঞ্জনের ঐ মন্তব্যে সকলে চমকে গেল, বিবি কি কোনো রং নাকি? রং ডাকতে গিয়ে বিবি ডাকল কেন সে? তারও কি মাথায় ছিট হয়েছে ঐ শ্রীশের—অর্থাৎ ঐ সাহেবের মাথার মত?

বিপুল আর অপরেশ চোখ-চাওয়া-চাওয়ি করল। মনোরঞ্জনকে নিয়ে অনেক রকম ব্যঙ্গের কথা বলল। ঠাণ্ডা-প্রকৃতির মানুষটি এতটুকু বিচলিত বা বিব্রত হল না, সে আগের মতই আবার নির্লিপ্ত মন্তব্য করল,—বিবি।

—কি হল হে তোমার মনোরঞ্জন? বিপুল ওর পিঠে একটা চাপড় দিয়ে প্রশ্ন করল।

—জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছি মাত্র।

হাতের তাস ফেলে দিয়ে সমস্বরে সকলে বলে উঠল,—কি রকম, কি রকম?

ঠাণ্ডা জবাব দিল মনোরঞ্জন, বলল,—রকম কিছুই না। আমরা সাহেব-ঘেঁষাও না, ফিরিঙ্গি-ঘেঁষাও না; আমরা হচ্ছি অল্পবিস্তর বিবি-ঘেঁষা। আমরা সকলেই যে-যার বৌ নিয়ে মশগুল হয়ে ভাবছি—আমরা ঠিক পথে আছি, আর, ওরা-সব চলে গেছে বিপথে।

সকলের হেসে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু সকলেই কেমন-যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে, চুপ করে বসে রইল সকলে। আর, আড়চোখে তাকাতে লাগল শ্রীমতী অপরেশের দিকে।

মৃণালিনী যেন বিজয়িনী এখন। তিনি ঠোঁট চেপে হাসতে লাগলেন।

—বুঝলাম, বলে উঠল বিপুল,—আমাদের অপরেশচন্দ্র কতটা মুরগি-ঠোকরানো স্বামী। শ্রীমতী মৃণালিনী এই সামান্য ঠোকর দিয়ে একটা অসামান্য সত্য আজ উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

আপত্তি করে উঠল অপরেশ, বলল,—ওঁর কাছে কেন কৃতজ্ঞ হবে, কৃতজ্ঞ হতে হবে আমার কাছে। আমার দশাটি প্রকাশ করে তোমাদের দশাটি দশ জনের কাছে উনি জানিয়ে দিলেন। আমার দশা না জানলে নিজের দশা কি বুঝতে পারতে? সুতরাং আমিই এখানে হীরো, আমার কাছেই তোমাদের হতে হবে গ্রেটফুল।

মনোরঞ্জন বলে উঠল,—গ্রেট, গ্রেট।

বিপুল হাততালি দিয়ে বলল,—হিয়ার হিয়ার।

তাসের আবহাওয়া মিলিয়ে গেল বাতাসে। কিন্তু বাতাস চঞ্চল হয়ে রইল এদের উল্লাসের আর হট্টগোলের শব্দে।

কিন্তু এই শব্দ ভেদ করে দু-জোড়া ভারি জুতোর শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। বাদুড়বাগানের এই সরু গলির মধ্যে এমন গুরুগম্ভীর আওয়াজ বড়-একটা বাজে না। ওরা কান পাতল ঐ শব্দে।

মৃণালিনী দেবী উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়েই ফিরে এসে বললেন, কারা যেন এলেন।

দরজা খুলল অপরেশ, ওদের দেখতে পেয়েই সে যেন চমকে গেল, বলে উঠল, —হ্যাল্‌লো, হ্যাল্‌লো!

কি ব্যাপার? তাসের সাহেব, তাসের বিবি উপুড় হয়ে পড়ে রইল আসরে, অবাক হয়ে ওরা তাকাল নতুন দুই আগন্তুকের দিকে। শ্রীশ আর ত্রিদিব এসেছে। সাহেব-ঘেঁষা আর ফিরিঙ্গি-ঘেঁষা দুই বন্ধু এসেছে।

হঠাৎ ওরা এখানে এভাবে আসতে পারে তা ভাবাই কষ্ট। কিন্তু ওরা যখন এসেছে, তখন ওদের একটু বাড়তি আপ্যায়ন করে ওরা বসাল।

মনোরঞ্জন উঠে এল, করজোড়ে নমস্কার করে, মৃদু হেসে বলল,—আসুন। আসুন।

অনেক দিন পরে এদের দেখা, অনেক হাসিতামাশা হল। ঠাণ্ডা ভঙ্গিতে মনোরঞ্জন এদের পরিচয় করে দিল মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে, বলল,—ইনি আজ আমাদের হোস্‌টেস্‌—ডিয়ার হোস্‌টেস্‌। ইনি মৃণালিনী দেবী। আর, ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শাসমল, ইনি শ্রীযুক্ত ত্রিদিব বাগচী।

শ্রীশ সপ্রতিভ উত্তর দিয়ে বলল,—ওটা আমার ডাকনাম, আমার আসল নাম সাহেব, বন্ধুরা আমাকে এই নাম দিয়েছে; ছেলেছোকরারা আমাকে ডাকে সাহেবদাদা। আপনিও আমাকে সাহেবদাদা বলতে পারেন।

ত্রিদিব বলল,—আমার নাম এখনো ত্রিদিবই আছে।

মৃণালিনী বললেন,—আপনাদের সঙ্গে আজ প্রথম দেখা হল বটে, কিন্তু আপনাদের সম্বন্ধে সব জানি। আজও আপনাদের নিয়ে এখানে কথা হল।

—হবেই। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে শ্রীশ বলল,—মহাপুরুষদের নিয়ে আলোচনা হয়েই থাকে। আমার সম্বন্ধেও নিশ্চয় অনেক কিছু শুনেছেন?

মৃণালিনী একটু থতমত খেয়ে গেলেন। যার সঙ্গে আগে কখনো পরিচয় হয়নি, তিনি যে হঠাৎ এসে নিজের পরিচয় এইভাবে বলতে পারেন তা ভাবাই যায় নি।

শ্রীশচন্দ্রের বন্ধুরাও হতবাক হয়ে গিয়েছে। শ্রীশের উক্তির প্রতিবাদ তারা করতে পারল না, সে উক্তির সমর্থন মনে-মনে যতই করুক, মুখে সে সম্বন্ধে কিছু বলা ঠিক না।

ত্রিদিব একটু ভারিক্কি হাসি হাসতে লাগল। তারপর বলল,—শ্রীশের মেজাজ হঠাৎ বদলে গিয়েছে। আজ ভোর থেকে সে আমার উপর জুলুম আরম্ভ করল—পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সে করবেই এবং আজই। পুত্রপরিবার নিয়ে কে কেমন আছে, তা' দেখার জন্য নাকি ব্যাকুল। ওকে নিয়ে বের হলাম, বিপুলের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, সে নেই; মনোরঞ্জনের বাড়ি গিয়ে শুনলাম সে এসেছে বাদুড়বাগানে অপরেশের বাসায়। ঠিকানা তিনি জানেন না। অবশেষে মৃগাঙ্কর বাসায় গিয়ে তাকে পেলাম না, কিন্তু এই ঠিকানাটা পেলাম। তাই আমরা দুজনে এসে হাজির হয়ে ভণ্ডুল করে দিলাম তোমাদের আড্ডা। আমরা এই অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।

মৃণালিনী দেবী বলে উঠলেন,—সে কি, সে কি! আপনারা আসায় আসর তো খুব জমেই উঠেছে।

—বটে? হেসে উঠল শ্রীশ। বলল,—আমি সাহেব, জানেন নিশ্চয়। তা ছাড়াও আমার সম্বন্ধে আরও অনেক-কিছু জানেন। অনেক-কিছুই শুনেছেন। যা-যা শুনেছেন সবই কিন্তু সত্যি। আমি যা-তা মানুষ একটা।

উপস্থিত বন্ধুরা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

সে দিকে না তাকিয়ে শ্রীশ বলল,—আমি বিয়ে করিনি। বিয়ে করিনি, কেননা—জানেনই তো—আমি একটি বাজে লোক। আমি মেয়েদের শ্রদ্ধা করিনি। তাদের আমি জেনেছি অন্যভাবে।

মৃণালিনী দেবীর মুখ এবার ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। তিনি তাঁর স্বামী অপরেশের দিকে একবার তাকালেন, তারপর চোখ নামালেন।

কিন্তু তাঁরা যে মহীয়সী, জেনেছি কাল রাত্রে। কাল রাত্রে মিস্ লুসি—

শ্রীশ একটু থামল।

শ্রীশের স্বভাব ও চরিত্রের কথা বন্ধুরা খুঁটিনাটি সবই জানে। তারা তাই একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল। কি বলতে কি সে বলে বসবে, তার কোনো ঠিক নেই। কে এই মহিলাটি—এই মিস্ লুসি—তা তারা জানে না। কিন্তু তারা যা অনুমান করছে সে নিশ্চয় তাই। পাঁচজন বন্ধুর মধ্যে সে আলাদা—সে অনন্য। তার সঙ্গে কারও তেমন খাপ খায় না। সেও কারো সঙ্গে যেমন মেশে না, তাকেও সকলে তেমনি এড়িয়ে চলে।

বিপুল বলল,—তোমার গল্পটা শুনব তোমার সার্কাস ম্যানসনের ডেরায় গিয়ে, কি বলো সাহেব?

ত্রিদিবের দিকে তাকাল শ্রীশ। যেন, তাকে জিজ্ঞাসা করছে বিপুলের এই প্রস্তাবটা

কেমন। কিন্তু ত্রিদিব কোনো মন্তব্য করার আগেই বিপত্নে বলল,—ও হচ্ছে বিপত্নীক, ফাঁকা বাড়িতে এ রকমের আলোচনা বৈঠক জমবে ভালো। শ্রীশচন্দ্রের জীবনকথা শুনব আমরা।

কিন্তু এতে আপত্তি আছে শ্রীশের। কেন, এমন কী সাংঘাতিক কথা সে বলবে যে, যার জন্যে দরকার হবে মহিলাবর্জিত একটি আসর?

সুতরাং সে অনুমতি চাইল মৃণালিনীর। বলল,—আমি মহিলা প্রসঙ্গে কথা বলব। অতএব সেখানে মহিলা থাকা চাই। কি বলেন আপনি?

মৃণালিনী কিছু বলার আগেই অপরেশ হুকুম দেওয়ার মত করে বলল,—কফি আসুক। বলুক শ্রীশ। আমরা শুনতে চাই।

কফি এল। শ্রীশচন্দ্র বলতে লাগল—

আমি বাউণ্ডুলে। কিন্তু জীবনকে ভণ্ডুল না করে যতটা বেপরোয়া হওয়া যায়, আমি ততটা উচ্ছৃঙ্খল। আমি অনাচারীও। আমার বন্ধুরা আমাকে চেনে বলে তারা দাবি করে। কিন্তু তারা আমার কতটুকু জানে? আমাকে আমি জানি। আমাকে আমি ঘৃণা করি। আমার আচরণকে আমি তারিফ করিনে।

কিন্তু একটা গুণ আমার আছে। আমি খাঁটির ভক্ত। ভারতবর্ষ আমি মন্থন করেছি। আমাদের এই দেশের বিভিন্ন মহলের মহিলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আমি এসেছি। তাদের ভালোবেসেছি বলব না, কিন্তু তাদের আমার ভালো লেগেছে। বঙ্গ আমি ভালোবাসি; ইঙ্গও ভালোবাসি আমি—আমার নামই তো এইজন্যে সাহেব। কিন্তু ইঙ্গবঙ্গ আমার পছন্দ নয়। আমার এ ঘোষণার জন্যে ত্রিদিব নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না। তিনি যে পল্লীতে বাস করেন সেটি ইঙ্গবঙ্গ পল্লী। ভালো একটি বাসস্থান তিনি সেখানে পেয়েছেন বলে সেখানে আছেন। কিন্তু ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন কিনা জানিনে।

আমি ভালোবাসিনি কখনো তাদের। মিস্ লুসি হচ্ছে এমনি একটি মেয়ে। আমরা যাকে বলি ফিরিঙ্গি।

সারা ভারত ঘুরেছি আমি। অনেকে দেখেছি। মন উদার হয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি উদার হয়েছে? সম্ভবত নয়। তা যদি হত তাহলে লুসিকে অবজ্ঞা নিশ্চয় করতাম না।

আমার চরিত্র আমি যতটা জানি, তার চেয়ে বেশি চেনে সে আমার চরিত্র।

কাল আমি প্রায় মারাই গিয়েছিলাম। আমাকে কাল যে বাঁচিয়েছে সে লুসি।

সাধারণ ভাষায় আমি নিচু স্তরের জীব। আমাদের মত লোকের ভালোবাসা হচ্ছে মেকি; কিন্তু আমাদের ঘৃণা খুব সাচ্চা।

আমি ঘৃণা করতাম তাকে—এর মধ্যে কোনো ভেজাল ছিল না, যুক্তি তো ছিলই না। তাকে ঘৃণা করে খুব আরাম পেতাম, নিজেকে খুব মস্তমানুষ বলে মনেও হত। দর্পটা কিন্তু চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সেই কথা বলার জন্যেই আজ আমি বন্ধুদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। এ কথা শুনে কারও কোনো কল্যাণ হবে না জানি। কিন্তু না বললে আমার অস্বস্তি থেকে যাবে।

হাঁটা হাঁটা আর হাঁটা।

আমরা যখন রাতে আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করি, তখন অক্লান্ত ভাবে ধীরপায়ে পথ দিয়ে হেঁটে চলে যায় কত পথচারী। তাদের দিকে কখনো আমরা তাকাই, কখনো তাকাই নে। এর মধ্যে থাকে কত পথচারিণী—এরা খোঁজে শিকার।

আমিও শিকারী। আমিও শিকারের সন্ধানে মাঝে মাঝে আসি এই কলকাতা শহরে। এই স্বভাবের জন্যে আমার খুব নাম হয়েছে, সেটা সুনাম অবশ্য নয়।

কিন্তু কিছুকেই পরোয়া না করে আমি মনের আনন্দে নিজের খুশি-মত কাজ করে চলেছি। কে আমাকে কি বলল, কিংবা আমার সম্বন্ধে কে কি ভাবল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। আমি নিজেকে নিয়েই নিজে বিভোর হয়ে আছি।

জীবনে যত রকমের অন্যায় করা সম্ভব আমি তা করেছি। যাদের পথচারিণী বললাম, অর্থাৎ যারা নাকি পদচারিণী আমি এসে তাদের পিছু ধাওয়া করি। কথা বলি, পছন্দ করি, গাড়িতে তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাই।

লিন্ড্‌সে স্ট্রীটের মোড়টা আমার ঘাঁটি। এইখানে আধো অন্ধকারে আমি ওৎ পেতে দাঁড়াই। লক্ষ রাখি চারদিকে। একা-একা হাল্কা পায়ে কেউ হেঁটে যাচ্ছে দেখলে, এবং তাকে আমার পছন্দসই মনে হলে আমিও হাঁটতে থাকি, পাশে গিয়ে কানে মন্ত্র পড়ার মত করে আঁতের কথা বলি। তার পর আর কি। সব ঠিক হয়ে যায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিকই তো। অনেক রকমের মেয়েই তো পথে চলে। তার মধ্যে ভুল হয়ে যাবার আশঙ্কা তো আছেই। সকলেই পথে হাঁটে বটে, কিন্তু সকলেই অবশ্যই ওয়াকিং নয়। কিন্তু নিজের দৃষ্টির উপরেও আস্থা রাখা চাই। অনেকেই পথে চলছে, কিন্তু তার মধ্যে থেকেই বেছে নিতে হয় ওই ধরণের মেয়েদের। আমি বেছে বেছে নিয়েই বেশ নির্বিবাদে এত দিন চালিয়ে এলাম। কখনো ভুল হবে ভাবিনি, কিন্তু ভুল হয়েছিল কাল। কিন্তু সে কথা পরে।

বছর-দেড়েক আগে লিন্ড্‌সে স্ট্রীটের মোড়ে প্রথম দেখি ঐ ফিরিঙ্গি মেয়েটিকে—ওই লুসিকে। বাস-স্টপে সে দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছি আমি। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটার ফলে একটু ক্লান্ত হয়েছি, সেও হয়তো তাই। সেইজন্যে একটু দাঁড়িয়ে নিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছি। সামনের দিকে তাকিয়ে থেকেও পাশের লোকের উপরে নজর রাখা যায়। আমি তেমনি নজর রাখছিলাম ওর ওপর। কিন্তু ওর প্রতি কোনো লালসা কামনা বা বাসনা আমার নেই। আমি খাঁটির ভক্ত। হয়, সম্পূর্ণ দেশী চাই; কিংবা সম্পূর্ণ বিদেশী। দেশের আর বিদেশের মেশাল দেওয়া মাকাল আমার পছন্দ না। তার উপর, বাল্যকাল থেকে ওদের সম্বন্ধে সত্যিমিথ্যা মিশিয়ে অনেক আজগুবি কথা শুনে ওদের উপর কেমন অশ্রদ্ধা আমার রক্তে মিশে আছে। তাই, ওর রকমটাই লক্ষ্য করছিলাম, সঙ্গ একেবারে চাইনি।

কিন্তু, দেখলাম, ধীরে ধীরে আমার দিকে ও এগিয়ে এল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। সে বলল,—ক্যান ইউ লেন্ড্ মা ইয়োর ম্যাচেস প্লিজ?

কোনো উত্তর না দিয়ে দেশলাইটা তার হাতে দিয়ে পার্ক স্ট্রীটের দিকে হাঁটা দিলাম। আমার এই ভঙ্গিটাকে সে ইশারা মনে করে থাকবে। আগে বুঝিনি যে সে আমার পিছন-পিছন আসছে। অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে কীড স্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। কিছুক্ষণ পরে চেয়ে দেখি অদূরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে।

মুখে আলো পড়েছে তার। ফুটফুট করছে মুখ। লোভার্ত হবার মতই মুখটা। অথচ লোভ আমার হল না। একটু পিছনের দিকে চেয়ে দেখি আধ-ময়লা গায়ের রং বেশ বলিষ্ঠ একটি মেয়ে ফুটপাথের কিনারের দেয়াল ঘেঁষে হেঁটে চলেছে। আমি পিছু নিলাম তার। এক মিনিটেই রফা হয়ে গেল।

হাঁক দিলাম,—ট্যাক্সি। দুজনে উঠে পড়লাম ট্যাক্সিতে। ফুটফুটে মেয়েটা একটু দূরে

দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল।

বেশ মজা লাগল আমার। বেশ গর্বিত মনে হল নিজেকে। যেন বেশ জব্দ করা হয়েছে ওই ফিরিঙ্গি ওয়াকিং গার্লকে।

কলকাতায় আসি। দিন-দুই থাকি। অ্যাডভেঞ্চার করি। ফিরে যাই আসানসোলে।

কিন্তু মজা এই। যে বারই আসি এবার থেকে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে লাগল প্রায় প্রত্যেকবার। দূর থেকে করুণ চোখে সে আমার দিকে তাকায়; কিছু যেন বলতে চায়। অথচ তাকে কিছু বলার সুযোগই আমি দিই নে।

মাস-খানেক আগে লাইটহাউসের সামনে বইএর স্টলে দাঁড়িয়ে বই দেখছি। বই অবশ্য দেখছিনে, সময় কাটাচ্ছি, আর চোখ রাখছি চারদিকে।

হঠাৎ একটা মিহি শব্দ শুনলাম পাশে,—মে আই?

চমকে তাকিয়ে বললাম,—সরি।

কথাটা বলেই সেখান থেকে সরে পড়লাম। মেয়েটার দিকে আর ফিরেও তাকালাম না। বইয়ের দোকানে এসে বই কিনবে কি না, সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করার মানে কি? ওদের এই হ্যাংলামির জন্যেই বোধ হয় ওদের এমন বদনাম। মুখখানা সুন্দর হলে কি হবে, মন ওদের বেজায় নোংরা। ওদের এড়িয়ে চলি তো এইজন্যেই। নিজেকে কৈফিয়ত দেবার মত বেশ তাজা যুক্তি পেয়ে গেলাম। মনও বেশ মজবুত হল। দাঁড়ালাম গিয়ে চৌরঙ্গীতে। চারদিকে চোখ রেখে চেয়ে আছি। হঠাৎ দেখি, দূরে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে ওই মেয়েটি। কী যে ও বলতে চায় বুঝতে পারছিনে। আমাকে ভালোবেসে ফেলল নাকি ভেবে হাসি পেল।

একটা শিকার পেয়ে গেলাম। হাঁক দিলাম,—ট্যাক্সি। দুজনে উঠে পড়লাম ট্যাক্সিতে।

ফুটফুটে মেয়েটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল।

কিন্তু কাল ঘটে গেল একটা অঘটন। রাত প্রায় দশটা। চৌরঙ্গী অঞ্চলের ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। সুরেন ব্যানার্জি রোডের মোড়ে ওই মস্ত ঘড়িটার নীচে ফুটপাথের একটা ল্যাম্প-পোস্টের গায়ে অপরূপ সুন্দর একটি মেয়ে একা দাঁড়িয়ে। যেমন তার রূপ, তেমনি স্বাস্থ্য। শাড়িটা শরীরের সঙ্গে নিখুঁতভাবে লেপটে আছে।

অনেকক্ষণ আমি ওঁৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছি। বাজপাখি যেভাবে ছোঁ মারে, সেভাবে আমি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম যেন তার পাশে। এসব ক্ষেত্রে যেভাবে প্রস্তাব দাখিল করি, নির্ভুলভাবে সেই কথা বললাম তার কানে।

আর যাবে কোথা। রুখে দাঁড়াল মেয়েটা। চেঁচিয়ে উঠে খাঁটি বাংলায় বলল,—পাজি বদমায়েস।

থমকে দাঁড়ালাম। বুঝতে পারিনি, খানায় পা দিয়েছি।

ঝলমল করে আলো জ্বলছে পানের দোকানে। মেয়েটার সঙ্গীরা ঐ দোকানে দাঁড়িয়ে পান-সিগারেট খাচ্ছে, আর বোধহয় আলোচনা করছে সে-ছবিটা দেখে বেরিয়েছে একটু আগে, তারই সম্বন্ধে।

মেয়েটার গলা পেয়ে চার-পাঁচটি জোয়ান ছেলে ছুটে আসতেই আমি সরে পড়ার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু নিমেষে জমে গেল ভিড়, আমাকে প্রায় ঘিরে ফেলল। বিপদ বুঝতে পেরে কি করব ভাবছি। এরাও আমাকে খুব শাসাচ্ছে। পালাবার আর পথ নেই।

ভিড় সরিয়ে কে যেন ঢুকল ভিতরে। বলল,—কাম অন্ ডিয়ার। কাম অন্ কাম অন্।

সেই ফুটফুটে মেয়েটি। আমার হাতটা তার হাতের সঙ্গে পেঁচিয়ে নিয়ে সে আমাকে টেনে বের করে আনল ভিড়ের ভিতর থেকে।

দু-একজন ছোকরা একটু আপত্তি করতে চেষ্টা করল। মেয়েটা খাঁটি ইংরেজিতে যা বলল তার মর্মার্থ হল এই যে, সব মিথ্যা কথা, কে কি করেছে তা তারা জানে না, চীৎকার শুনে তার হাজব্যান্ড্ ছুটে এসেছিল মাত্র। কাম্ অন্ ডিয়ার বলে আমাকে টেনে নিয়ে সে চলল।

নিরাপদ দূরত্বে যখন চলে এসেছি, তখন আস্তে করে জিজ্ঞাসা করলাম, কি নাম তোমার?

সে বলল,—লুসি।

বলেই সে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে জোর কদমে হাঁটা দিল।

—মে আই কাম উইথ ইউ? জিজ্ঞাসা করলাম।

মুখ না ফিরিয়ে সে বলল,—নো।

তার কাছে গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম সঙ্গে যাব কিনা। ভর্ৎসনা করার মত গলায় সে বলল,—নো, নো।

—কবে আবার দেখা হবে? জিজ্ঞাসা করলাম।

সে বলল,—নেভার।

—কেন, কেন, কেন।

—ডোন্ট আস্ক্ মি।

সারা সুরেন ব্যানার্জি রোড পার হয়ে সে একটা রিক্‌শা নিল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গা দিয়ে চলল রিক্‌সা। প্রায় ফাঁকা রাস্তা দিয়ে একাকী একটা রিক্‌সা চলেছে।

আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে অনেক পিছনে-পিছনে ধীরে-ধীরে চলতে লাগলাম। মেডিকাল কলেজের কাছে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল রিকসা। ট্যাক্সি থেকে নেমে আমি গলিটার নাম দেখে এলাম—আরপুলি লেন।

কাল রাত্রে ঐ অঘটনের মধ্যে পড়ে মনের জোর হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই ঢুকতে সাহস করিনি গলিতে।

আজ সকালে গিয়েছিলাম আরপুলি লেনে। কিন্তু কাউকে খুঁজে পাইনি।

রাস্তার কলে জল নিচ্ছিল ময়লা স্কার্ট-পরা একটি মেয়ে। মুখের আদলটা মনে হল তারই মত, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না—তুমি কি লুসি?
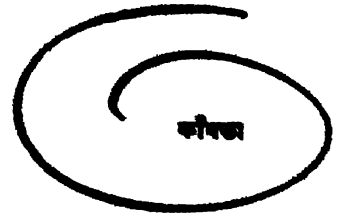
কেউ কথা রাখেনি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে নি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমী তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে।
তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা এসে চলে গেল কিন্তু সেই বোষ্টুমী
আর এলো না
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।

মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল, বড় হও, দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
যেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে!
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে?

একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারি নি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাস-উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কন পরা ফর্সা রমণীরা
কতরকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি।
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন আমরাও…

বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাস-উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না!

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে!
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্নতন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখে নি বরুণা, এখনো তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে-কোনো নারী!
কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না!

ধ্যান ধারণার ভিড়ে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কলকাতা-সময় অনুযায়ী
সে আমাকে আত্মার আঁচলে নিল তখন রাত্রি দশটা।

এদিকে তোমরাই—তার অশুভানুধ্যায়ী—
মধুপুরে দেখেছিলে আমার অভাবে ঘুরছে শ্মশানে মশানে ছিন্নমস্তা।

র্যাশিডি-সময় অনুযায়ী
ও'রাও নারীর গুচ্ছে, রাত একটা, সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা।

ওদিকে উৎসাহী
তরুণ কবির ভিড়ে, ভবানীপুরে, রাত্রি দুটোয় তুমি আহুত মর্যাদা।

এতগুলি ধারণার চড়াই-উৎরাই
ভেঙে যেতে-যেতে আমি অভিমানে ভাবি তুমি পিতৃকুলায়ে স্নেহে নষ্টা

অনাথপুত্তলী ; তুমি জেনেছো বিলীয়মান সব ধারণাই,
জঙ্ঘায় ত্রিশূল চিহ্ন সহজ বিবেকে আঁকবে কোন্ শাস্তিদাতা ?

তোমাদের দেবার মত

দিব্যেন্দু পালিত

তোমাদের দেবার মতো কিছুই থাকল না।

চতুর্দিকের কোলাহলের মধ্যে হাত-বদল হতে হতে
এক একটা দিন
ক্রমশ চলে যাচ্ছে গাঢ় অবগাহনের ভিতর—
হরিধ্বনি তেমন জোরালো নয়;
যদিও শবযাত্রীর সংখ্যা হাতে গোনা যায় না।
আর, বাসস্টপে দাঁড়ানো কেউ, ট্রামস্টপে দাঁড়ানো কেউ
হা-ভাতের নিঃশ্বাস চেপে ক্রমাগত মিশে যাচ্ছে ঐ দলে।

যে-ভাবেই বলা হোক না কেন—
কথার মানে বদলে যাচ্ছে।
এখন গৃহ মানে স্কাইস্ক্র্যাপার,
শান্তি প্রতিষ্ঠা মানে ঠান্ডা লড়াই;
করমর্দনের আগে দেখতে হয় হাতের ছাপ ঠিক আছে কি না;
মৃত্যু ও মৃত্যুর অভিনয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝার জন্য

আমাদের তর্কের ভিতর, হাসির ভিতর, কূট-চিন্তার ভিতর
শিল্প হতে হতে
তোমাদের আবির্ভাবের অর্থও বদলে যাচ্ছে—
এখন প্রশ্নের চেয়ে উত্তর বেশি;
মেধার চেয়ে হিসেব।

আর, যতোদিনে মাতৃগর্ভের ছাড়পত্র পেয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে
তোমরা আসবে সীমান্তের এ-পারে—
ততোদিনে, ভয় হয়,
তোমাদের দোলনার জন্য বরাদ্দ জায়গাটুকুও
আমরা হেঁকে দিয়েছি নীলামে!

একটানা বৃষ্টি পড়ছিল

শান্তিকুমার ঘোষ

একটানা বৃষ্টি পড়ছিল সে দিন নদীর উপর
তুমি হাঁটছিলে ভিজে ভিজে, খুশী, প্রস্ফুটিত, বৃষ্টির ভেতর
স্ট্র্যান্ড রোড পার হতে গিয়ে, মনে আছে,
আমি গেলাম তোমার পাশ দিয়ে
তুমি হাসছিলে এবং আমিও হাসলাম
চিনতাম না তোমাকে আমি
জানতে না তুমি আমাকে
তবু সেদিন, ভুলো না

গাড়ী-বারান্দার তলায় একটা লোক ছিল দাঁড়িয়ে
সে তোমার নাম ধরে চিৎকার করলো : পারমিতা!
আর তুমি ছুটে গেলে তার দিকে সেই বৃষ্টির ভেতর
ভিজে সপসপে সুখী প্রস্ফুটিত
তুমি সঁপে দিলে নিজেকে তার দুবাহুর বন্ধনে, মনে পড়ে
আমি 'তুমি' বলছি তোমাকে তাতে যেন বিরক্ত হোয়ো না
মাত্র একবার দেখলেও ভালোবাসি এমন সবাইকে আমি 'তুমি' ডাকি
তাদের পর্যন্ত আমি 'তুমি' বলি যাদের জানি না
কিন্তু যারা পরস্পর ভালোবাসে।
মনে রেখো, প্রজ্ঞা আর হর্ষ ঝরছিল তোমার নন্দিত মুখের পর
কালো চোখের পাতার উপর

যৌবনের শহরের 'পর
পড়ছিল সেই বৃষ্টি কেল্লার উপর
বঙ্গোপসাগরে জাহাজগুলোর 'পর

পারমিতা, কী ভয়ানক যে আকাল!
কী হলো তোমার আজকে যখন আকাশ থেকে এই আগুন ঝরছে
ঝরছে কেবল লাভা রক্ত আর মৃত্যু
যে তোমাকে ভালোবেসে চেপে ধরেছিল তার বুকে
সে কি মরে গেছে, কিম্বা আজো বেঁচে?

পারমিতা! বালুতে ভর্তি একটানা হাওয়া বইছে মরুভূমি থেকে
গাছগুলো ভেঙে পড়ে, ঘাস হলুদ বিবর্ণ হয়ে গেল

উজাড় গ্রামকে গ্রাম, হাড় জমে' উঁচু স্তূপ
এবং দুঃখ দুঃখ যেন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি
সেই আগের মতন
কিন্তু ঠিক সে রকম আর নয়
মেঘগুলো মরে যাচ্ছে কুকুরের মতো
যে সব কুকুর স্রোতে ভেসে যায় এবং দূরে গিয়ে পচে ওঠে
নদী থেকে দূরে, বহু দূরে
আর নদীর কিছুই থাকে না

প্রবাস

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ঘরবাড়ি নেই, তো বানিয়ে নাও
বানালুম। কিন্তু
বাড়ি থাকলেই মনে হয় কেন আসবাব থাকবে না?
যাদের প্রত্যহ আমি বদলিয়ে সাজাতে পারি; টেবিল, চেয়ার, খোঁখাট
সুখ ও শরীর যাপনের ইত্যাকার আসর একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে
এদিক ওদিক করে নিত্যনতুন বসালে মনে হবে, যেন
হঠাৎ বেড়াতে এসেছি, জীবাত্মা যেমন আসে জন্মের প্রবাসে।
প্রবাস, অথচ হাত তুললেই আলিঙ্গন, আমি
বৃক্ষসমাজের মৃত্যুপরবর্তি প্রতিনিধি ওই দারুময় দরজা জানালা—অর্থাৎ
আকাশের সঙ্গে যোগাযোগের উপায়গুলি একে একে শেষ
বন্ধ করে ক্রমশ যখন দগ্ধনিশ্বাসের মতো
তপস্যার খুব কাছে চলে যেতে চাই,
শুনি চারদেয়ালের চৌকো সভ্যতাকে
নৌকার সমান ঢেউ-এ দোলাতে দোলাতে
তুমি, উপনিষদের আত্মা, বলেই চলেছো
না, না, উঁহু, না, ওভাবে কখনো প্রেম-ভালবাসা বানানো যায় না।

নাট্য-চিন্তা

অচ্যুত গোস্বামী

বর্তমান শতকের শুরু থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি সার্থকভাবে সমস্ত নবনাট্য প্রয়াসকে ভ্রূণাকারে পরিণত হওয়ার পূর্বেই শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করতে পেরেছিল। তারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের যে সার্থক সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছিল তা সংস্কৃতির ইতিহাসে অসামান্যতার দাবী করতে পারে। অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে ভারতীয় গণনাট্য সংস্থা বিভিন্ন স্থানে সাময়িক রঙ্গমঞ্চে বাস্তববাদী নাটক পরিবেশনের আয়োজন করে এই একাধিপত্যের উপর আঘাত হানতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক কারণে যাঁরা এই সংস্থাটিকে সন্দেহের চোখে দেখেন তাঁদের মনে রাখা দরকার যে বাংলা রঙ্গমঞ্চ আজ যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের একনায়কত্ব থেকে অন্তত আংশিকভাবেও মুক্তি পেয়েছে তার পিছনে উক্ত সংস্থাটির একটি সুস্পষ্ট অবদান আছে। তাঁরা সর্বপ্রথম একথাটি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে ঐতিহাসিক পৌরাণিকের জমকালো পরিবেশ ছাড়াও অন্য নাটক সুলিখিত ও সুঅভিনীত হলে তা বাঙ্গালী দর্শক-সমাজ গ্রহণ করতে সক্ষম। এই সংস্থাটির আজ আর কোন অস্তিত্ব আছে কিনা ঠিক জানি না; থাকলেও আজ তার কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে চোখে দেখতে পাচ্ছি না। সংস্থাটি হয়ত তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গতায়ু হয়েছে; কিন্তু তাদের উত্তরাধিকার নিয়ে লিটল্ থিয়েটার বহুরূপী রূপকার নান্দীকার শৌভনিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপেশাদার বা অর্ধপেশাদার নাট্য সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে। ফলে বাংলা নাট্যজগতে একটি নবজন্মের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

জানি, নবজন্মের পূর্বাভাস কথাটি অনেকের মনঃপূত হবে না। বিশেষ করে নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত এবং এইজন্য যাঁদের আন্তরিকতার অভাব নেই পরিশ্রমে ক্লান্তি নেই তাঁরা অবশ্যই বিশেষণাত্মক শব্দ ব্যবহারে আমার কার্পণ্যকে ভালো চোখে দেখবেন না। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা প্রয়োজন—নাট্যকর্মের দুটো দিক আছে: একটি রচনার, অপরটি অভিনয়ের দিক। সাম্প্রতিক নাট্যসংস্থাগুলি অভিনয়-নৈপুণ্যে ও মঞ্চ-পরিবেশ রচনায় যথেষ্ট অগ্রগতির পরিচয় দিলেও, তদনুরূপ নতুন নাট্যকারের আবির্ভাব হয়নি। অধিকাংশ নাট্য সংস্থাই ভারতীয় পরিবেশ অনুযায়ী রূপান্তরিত বিদেশী নাটকই মঞ্চস্থ করে থাকেন। এমনও দু-একটি দল আছে যাঁরা দেশী লেখকদের লেখা নাটক স্পর্শ করেন না বলে আভিজাত্যের গর্বে গর্বিত। বিদেশী নাটকে যাঁদের আভিজাত্য বা কৌলীন্য বাড়ে তাঁদের এই হীনমন্যতা-জাত আভিজাত্যকে আমি খর্ব করতে চাই না। কিন্তু তাঁদের এই ধরনের প্রয়াসে নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা হচ্ছে এ দাবী আমি মানতে রাজী নই। যখন বাঙ্গালী ঐতিহ্য পরিবেশ ও প্রতিভা অনুযায়ী বাংলাদেশের সামাজিক ও মানসিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে নাটক রচিত হবে ও সেই নাটক মঞ্চস্থ হবে তখনই প্রকৃতপক্ষে বলার সময় আসবে যে বাংলাদেশে নাটকের পুনর্জন্ম হয়েছে।

বাংলা নাটকের বন্ধ্যা-দশা কেন কাটছে না এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। তবে তার একটি খুব সহজবোধ্য কারণ এই যে বাংলাদেশে যাঁরা লেখার কাজে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে

আসেন তাঁরা সাধারণত গল্প-কবিতা-উপন্যাস রচনায় যতটা আগ্রহী হন, নাটক রচনায় ততটা হন না। সুতরাং আধুনিক লেখকদের মধ্যে নাট্যপ্রতিভা কারও আছে কিনা তা অপরীক্ষিত। নাটক রচনায় অনাগ্রহের কারণ—প্রথমত, মঞ্চস্থ না হলে নাটকের বিক্রয়-মূল্য সৃষ্টি হয় না, এবং দ্বিতীয়ত, নাট্য সম্প্রদায়গুলির মনে একটি বদ্ধমূল সংস্কার, যিনি মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন তিনি ভাল নাটক লিখতে পারেন না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এরা সাধারণত দলভুক্ত লেখকের লেখা নাটক মঞ্চস্থ করে। এরা ভুলে যায় যে যারা মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত—অভিনেতা বা মঞ্চ-নির্দেশক বা পরিচালক—তারা কখনোই প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার হতে পারে না। তার সহজ কারণ, প্রচলিত নাট্যরীতি পরিচিত বিষয়বস্তু এবং চরিত্র এদের মনকে এমনভাবে অভ্যস্ত করে রাখে যে গতানুগতিকতার বেড়া ডিঙিয়ে অকর্ষিত ভূমিতে পদক্ষেপ এদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভাল নাটক লিখতে শুরু করে পরে মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এমন লেখকের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়; কিন্তু মঞ্চের সঙ্গে পূর্ব থেকে যুক্ত হয়ে পরে ভাল নাটক লিখেছেন এমন উদাহরণ আমার জানা নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এরকম এক আধ জনের যদি সন্ধান পাওয়াও যায় তবে সে ব্যতিক্রম নিয়মকেই প্রতিপন্ন করবে। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত না বাংলাদেশে মঞ্চ-বহির্ভূত লেখকরা নাট্য রচনায় উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসবেন ততদিন পর্যন্ত বাংলায় ভাল নাটক রচিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আপাতত মঞ্চ-বহির্ভূত লেখকদের নাটক রচনায় উৎসাহিত হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছি না। কেউ যদি নাটক লেখেন এবং তা মঞ্চস্থ করার জন্য কোন নাট্য সংস্থায় দ্বারস্থ হন তবে তিনি দলীয় লেখক নন বলে তাঁরা ভ্রূকুঞ্চিত করবেন।

সুতরাং আপাতত সুদিনের প্রতীক্ষায় কাল গোনা ছাড়া আর আমরা যা করতে পারি তা হল হয়ত মাঝে মাঝে নাটক সম্পর্কে আলোচনা করে লেখক এবং পাঠক সমাজকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে পৃথিবীতে নাটক বলে এক জাতীয় শিল্পকর্ম রয়েছে যার জনপ্রিয়তা অসীম। বাংলাদেশে অভিনয় শিল্পের দিকে উৎসাহের জোয়ার এসেছে, নাটক রচনার ক্ষেত্রে নয়—একথা জানা থাকা সত্ত্বেও আমি আলোচনা করব বাংলাদেশে এখন কোন্ ধরনের নাটক রচনার অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান।

আমি যতদূর খবর রাখি, বাংলাদেশে রূপান্তরিত ও ছায়া অবলম্বনে রচিত নাটক বাদ দিলে যে-সব মৌলিক নাটক রচিত হয় সেগুলি এই কয়েকটি শ্রেণীতে পড়ে বাস্তববাদী বা বাস্তববাদের ভনিতা-যুক্ত, হাস্যরসাত্মক কমেডি এবং রোমান্টিক বা আধা রোমান্টিক কমেডি। বাস্তববাদী নাটকগুলির মধ্যে আবার দুটি বিভিন্ন ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারায় শরৎচন্দ্র-সুলভ সমাজ সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসৃত হচ্ছে; অপর ধারাটিতে সামাজিক অবক্ষয় ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের চিত্র উপস্থিত করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা সৃষ্টির চেষ্টাও দেখা যাচ্ছে। এ-সব নাটক সাধারণত সমাজের বহিরঙ্গের সমস্যাই প্রাধান্য লাভ করে—দুর্নীতি, ব্যভিচার, বিকৃতির চিত্রগুলিই দেখানো হয়। গভীরে প্রবেশের চেষ্টা নেই বলে এবং মানস-সংকটকে উপস্থাপিত করার শক্তি নেই বলে চিত্রগুলি বহু পুনরাবৃত্তির দরুন জীর্ণ। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি কর্তব্য পালনের তাগিদে কোন কোন লেখক স্থানে অস্থানে স্লোগান বা প্রায়-স্লোগান-ধর্মী কথা সংযোজন করতে ইতস্তত করেন না। তাতে জনতার রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় না, তবে শিল্প-চেতনা আহত হয়।

বাংলাদেশে ভাল বাস্তববাদী নাটক রচনার সুযোগ ছিল বলেই আমার বিশ্বাস; কিন্তু

উপযুক্ত নাট্য পরিবেশের অভাবে সে সুযোগ অপচারিত হয়েছে। এখনো যে ভাল বাস্তবধর্মী নাটক রচিত হতে পারে না এমন কোন কথা নেই। কোন লেখকের যদি বাস্তবকে নতুনভাবে দেখার চোখ থাকে তবে বাস্তববাদের পথে সার্থক না হবেন কেন? প্রতিভাবানের কাছে কোন পথই অবরুদ্ধ নয়। প্রতিভাবানদের কথা বাদ দিয়ে সাধারণ পরিবেশগত আনুকূল্যের কথা যদি চিন্তা করি তবে বোধ করি স্বীকার না করে উপায় নেই যে বিশুদ্ধ বাস্তববাদী নাটক সৃষ্টির সুবর্ণময় অবকাশ এখন বিগত। তার দুটি কারণ। প্রথম কারণ : যে সব রূপান্তরিত নাটক বাংলাদেশে ইতিমধ্যে অভিনীত হয়েছে সেগুলি পাশ্চাত্যের সাম্প্রতিক কালের বিভিন্নমুখী আন্দোলন থেকে সংগৃহীত। প্রতীকবাদ (symbolism), উন্মোচনবাদ (expressionism), অস্তিবাদ (existentialism), এপিক-ধর্মিতা (epic theatre)—প্রভৃতি বিদেশের অনেকগুলি নাট্যরীতি এখন বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত হচ্ছে। দর্শক এবং লেখক সমাজ আজ জেনে গিয়েছেন যে বাস্তববাদের সঙ্কীর্ণ পরিসরের বাইরে নাটকের বিস্তারের এক উদার দিগন্ত বিদ্যমান। এই সব নাটকে দুর্বোধ্যতা বা জটিলতা হয়ত আছে, কিন্তু সেইসঙ্গে আছে নতুনত্বের চমক ও চমৎকারিত্ব, কল্পনার অবাধ বিস্তার ও মানসিক স্বাধীনতা। নব্যরীতি বাঙালী লেখকের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে; সেই চ্যালেঞ্জকে অস্বীকার করে গতানুগতিক ধারায় নিজের প্রয়াসকে সীমাবদ্ধ রাখতে পেশাদার লেখক বাধ্য হলেও তরুণ ক্ষমতাবান লেখক রাজী হবেন কেন?

দ্বিতীয় কারণ বাস্তববাদের রীতির মধ্যেই নিহিত। উপন্যাস একালের সৃষ্টি এবং তার দীর্ঘ পরিসরের মধ্যে বাস্তববাদ শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছে। স্বভাবতঃ উপন্যাসে বাস্তববাদ স্বাভাবিক; বরং কল্পনার আতিশয্যকেও বাস্তববাদের পোশাক পরে আসতে হয়। পক্ষান্তরে নাটক একটি অতি প্রাচীন কলা। যুগ যুগ ধরে মানুষ নাটকের মধ্যে কল্পনার চমৎকারিত্ব, অতিপ্রাকৃত ঘটনা, প্রতীক ও রূপক প্রভৃতির যথেচ্ছ ব্যবহার দেখে এসেছে। নাটকে বাস্তববাদ নিতান্ত সাম্প্রতিক কালের আমদানি। বস্তুত বাস্তববাদের অভিযান নিয়েই আধুনিক নাট্য আন্দোলনের শুরু হয়েছিল ইউরোপে উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে। সেই থেকে মঞ্চ-নির্দেশনা ও মঞ্চসজ্জা নতুন গুরুত্ব লাভ করল। জোলা যাকে বলেছিলেন—জীবনের খণ্ডাংশ (a fragment of life), জোলার শিষ্য জাঁ জুলিয়েন যাকে বলেছিলেন—জীবনের একটি ফালি (a slice of life), তা পরিবেশন করতে গিয়ে দেখা গেল পুরানো চিত্রিত সীনে কাজ চলে না। বাস্তবের ভ্রান্তি মঞ্চে সৃষ্টি করতে হলে সলিড সেট চাই—বাস্তবের মত দরজা জানলা টেবিল চেয়ার আলমারি প্রভৃতির সমাবেশ দরকার। যার নাম দেওয়া যায় পরিবেশ সৃষ্টি। যেদিকটায় দর্শকরা বসেন সেদিকটা খোলা নয়; সেদিকটাকে একটি বন্ধ চতুর্থ দেওয়াল বলে কল্পনা করে নায়ক-নায়িকারা নিভৃতে বসে গোপনতম আলোচনায় লিপ্ত হচ্ছেন।

ইবসেন স্ট্রিন্ডবার্গ প্রভৃতি বাস্তববাদের পথিকৃৎদের মনে আইডিয়া ছিল প্রধান। চিন্তাধারার সাহায্যে সমাজের রূপান্তর সম্ভব এ বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে দৃঢ় ছিল। সুতরাং তাঁরা যে কাহিনী রচনা করেন তার মধ্যে অনুস্যূত আইডিয়া তাকে স্থূল অসুন্দর বাস্তবতাতে পর্যবসিত হতে দেয়নি। শেখভের মধ্যে আইডিয়া-প্রাধান্য না থাকলেও তাঁর সূক্ষ্ম রুচিজ্ঞান, তাঁর অত্যন্ত ব্যঞ্জনাসাপেক্ষ অনুভূতির স্পন্দ তাঁকে অমার্জিত বাস্তবতার হাত থেকে রক্ষা করেছে। বার্নার্ড শ'র হাতে এসে বাস্তববাদ আলোচনা-প্রধান নাট্যকর্মে পর্যবসিত হয়। শ'-এর নাটক জীবনের ফালি পর্যায় থেকে অনেক দূরে। অত্যন্ত কৃত্রিম এবং সুচতুর

কাহিনী পরিকল্পনার উপর তাঁর আইডিয়ার সুষ্ঠু প্রকাশ নির্ভর করেছে। এমন-কি গর্কির 'লোয়ার ডেপ্‌থে'র মধ্যেও অপ্রীতিকর বাস্তবের চিত্র থাকলেও উপস্থাপনার অভিনবত্ব ও চরিত্র বৈচিত্র্য তার প্রভাবকে কাটিয়ে উঠেছে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ক্লাসিক্যাল নাটকে বা সেকস্‌পীয়রীয় নাটকে বাস্তবের উপর যে অতিরঞ্জন সাধন করা হয়েছে, বা ঘটনা ও চরিত্রে যে বিরাটত্ব আরোপ করা হয়েছে, প্রথম যুগের বাস্তববাদী নাটকে তা বর্জিত হয়েছে বটে, কিন্তু মঞ্চ-সজ্জার অভিনবত্ব ও আইডিয়ার চমক তার ক্ষতিপূরণ করেছে। আর সত্যি বলতে কি ইবসেন থেকে আরম্ভ করে গর্কি পর্যন্ত এমন কোন্ নাট্যকার আছেন যাঁদের সৃষ্ট বাস্তব আমাদের অনায়াস-দৃষ্ট বাস্তবের অনুরূপ? তাঁদের হাতে বাস্তব রূপান্তরিত হয়ে অন্য এক শিল্প-সম্মত বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তিনটি বা চারটি দৃশ্যের মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ-বাস্তবের চিত্র দিতে গিয়ে তাঁরা ঘটনার মধ্যে এমন সঙ্কোচন (বা compactness)-এর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছেন যার ফলে জীবনের খণ্ডাংশ এক কৃত্রিম কাহিনী-পরিকল্পনার পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া ইবসেনের মধ্যে সিম্বল ও রহস্যময়তা, শেখভের মধ্যে আবেগের অনির্দেশ্যতা নীতিগতভাবে বাস্তববাদের পরিপন্থী। সুতরাং তাঁরা বস্তববাদের সীমা লঙ্ঘন করে তবেই তাঁদের নাটকের শিল্পগ্রাহ্যতাকে বর্ধিত করতে পেরেছেন।

আমার বক্তব্য: বাস্তববাদ যেখানে সার্থক সেখানে তা এক রূপান্তরিত বাস্তবকে রূপ দিয়েছে, এবং তার পিছনে প্রাচীন নাটকের মতই কল্পনা বিস্তারের অবাধ প্রাধান্য দেখতে পাই। বাস্তববাদী নাটক যখন মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তখন তা মোটেই সমাজ বাস্তবের চিত্রায়ন মাত্র নয়; তা জীবনের ব্যাখ্যা, সমালোচনা ও নতুন চিন্তার বাহন। স্বল্পপরিসরের কাহিনীকে এতখানি তাৎপর্যময় করে তোলার জন্য তাঁরা প্রাকৃতবাদী পন্থাকে এড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কালক্রমে বাস্তববাদী নাটক সমাজ বাস্তবের নিখুঁত চিত্রায়নের দিকে ঝুঁকেছে।

এলমার রাইসের স্ট্রীট সিনস্ বা কার্সন ম্যাককুলারের মেম্বার্স অব্ দি ওয়েডিং চিত্র হিসাবে উপভোগ্য; ক্লিফোর্ড ওডেটসের অকরুণ বাস্তবের মর্মস্পর্শী চিত্রায়ন আমাদের কর্তব্যবোধকে সজাগ করে। কিন্তু এ জাতীয় নাটক মানুষের মনে মহৎ কিছুর আস্বাদন জাগায় না; তার মনকে বাস্তব থেকে উত্তরণে, যা ব্যাপক বা বৃহৎ বা গভীর কোন সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করে না। এই কারণে রঙ্গমঞ্চে বাস্তববাদী নাটকের অভিনয় অল্প-দিনের মধ্যেই পাঠককে ক্লান্ত করে ফেলে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে অধিকাংশ দর্শকই প্রাত্যহিকতার পুনরাবৃত্তি দেখার জন্য রঙ্গালয়ে যায় না। ইউরোপে ১৮৯০ সালের পর থেকেই বাস্তববাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করেছিল।

বাস্তববাদের, আরও বিশেষ করে, প্রাকৃতবাদের সীমাবদ্ধতা কোথায়, তা জর্জ নাথানের একটি উক্তি থেকে সহজে উপলব্ধি করা যাবে:

It is absurd to speak of the drama holding the mirror up to nature; all that the drama can do is to hold nature up to its own peculiar mirror which, like that in a pleasure park flattens up nature, or shirnks it, yet does not at any time render it unrecognisable. One does not go to the theatre to see life and nature; one goes to see the particular way in which life and nature happen to look to a cultivated,

imaginative and entertaining man, who happens, in turn, to be a play-wright. [*The Critic and the Drama*]

বাস্তববাদের উদ্দেশ্য যদি হয় বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতার সঙ্গে সমাজের বিজ্ঞান-সম্মত চিত্র উপস্থিত করা, তবে দর্শক-মনকে প্রাত্যহিকতার ঊর্ধ্বে তুলতে সক্ষম নয়, খণ্ড জীবন-দৃষ্টি থেকে পূর্ণ জীবনদৃষ্টিতে উন্নীত করতে সক্ষম নয়। বাস্তববাদের উদ্দেশ্য যদি হয় সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করা তবে তা যে সাধু সংকল্প এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে লেখককে স্বীকার করে নিতে হয় যে তিনি সমাজ-সংস্কারক বা রাজনৈতিক নেতার দোসর হিসাবে কাজ করছেন, আর্টের নিজস্ব স্বয়ং-সম্পূর্ণ ভূমি থেকে নয়। পক্ষান্তরে বাস্তববাদের উদ্দেশ্য যদি হয় কাহিনীর মাধ্যমে কোন সামাজিক ধারণাকে প্রতিপন্ন করা, তবে নাটক সংলাপ-প্রধান হয়ে উঠবে এবং নাট্যকার ইবসেন বা শ'-এর মত শক্তিশালী লেখক না হলে তত্ত্ব প্রাধান্যের তলায় আর্ট শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে।

বাস্তববাদের একটি সহজ বিকল্প আছে—সুগঠিত নাটক। কিছু বাস্তবতা, কিছু রোমান্টিক প্রেম, কিছু হাস্যরস, সেইসঙ্গে উৎকণ্ঠা ও উদ্বিগ্নপূর্ণ নাটকীয় সংকট সৃষ্টি এবং পরিণামে সুখ-সমাপ্তি—কাহিনীতে এ-সবের সুসম বণ্টন করে নাটক রচনা করা বলা বাহুল্য, এ ফর্মুলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের জন্য, এর নজর বক্স-অফিসের দিকে। সুতরাং প্রতিভাবান নাট্যকার এ সহজ রাস্তা প্রত্যাখ্যান করবেন বলেই অনুমান করা যায়।

বাস্তববাদের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করছি বলে এ অনুমান সঙ্গত হবে না যে আমি বাস্তববাদের বিরোধী। বাস্তববাদকে অবলম্বন করে যথেষ্ট ভাল নাটক রচনা করার সম্ভাবনা বাংলাদেশে রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে অন্যান্য আধুনিক শিল্পরীতি সম্পর্কেও আমাদের ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার।

প্রচলিত ধারণা এই যে আধুনিক শিল্পরীতিগুলি নাটকের সাংগঠনিক বা রূপ-গত ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা। কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। এক একটি শিল্পরীতির সঙ্গে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ কোন ভাবনা জড়িত। ভাবনা বলতে অবশ্য বিষয়বস্তু বোঝায় না,—একটি শিল্পরীতিকে অবলম্বন করে অনেক রকম বিষয়বস্তুই রূপময় হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই নানা বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি সাধারণ প্রত্যাশা ও নান্দনিক লক্ষ্য বিদ্যমান থাকে। যেমন বাস্তববাদী নাটকের কথা শুনলেই আমরা ধরে নিতে পারি যে তার মধ্যে সমকালীন সমাজের কিছু সমালোচনা থাকবে।

কবি পল ফোর্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্যারিসের থিয়েটার দ্য আর্ট-এ ১৮৯০ সালের থেকেই মেটারলিংক রচিত প্রতীকধর্মী নাটক প্রদর্শন শুরু হয়। জীবনের রহস্যময়তার অনুভূতি, এমন সব অনির্দেশ্য ভাব ও ভাবনা যা ঠিক যুক্তি-সমর্থিত নয়, অথচ আমাদের মনোরাজ্যে যার প্রভাব অনস্বীকার্য, যা চিরকালীন, কোন নির্দিষ্ট কালের সত্য বহন করে না,—এই সব জিনিসকে নাট্যাকারে উপস্থাপনার জন্য প্রতীকনাট্যের উদ্ভাবন। প্রতীকের সাহায্যে এমন গভীর কিছুকে ব্যঞ্জিত করার চেষ্টা হয় যা সহজ ভাষায় উপস্থাপিত করা যায় না। সিম্বলিস্ট নাটকের জন্য নতুন নয়নাভিরাম সজ্জায় মঞ্চকে সজ্জিত করা হল অবাস্তবতার ভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য। মেটারলিঙ্কের *Pelleas and Melisande*, পল ক্লদেলের *Tidings brought to Mary*, হাউপ্ট্‌ম্যানের *The Sunken Bell* প্রভৃতি সিম্বলিস্ট নাটকের স্বল্পসংখ্যের মধ্যে উজ্জ্বল রত্ন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রতীকীরীতিকে নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন।

সিম্বলিজমের অতি-প্রয়োগের অসুবিধা এই যে তাতে নাটকের কোন সহজ-বোধ্য অর্থ আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। নাটক দেখতে দেখতে যদি কিছু অংশ অন্তত বোধগম্য হয় এবং কিছুটা রহস্যাবৃত থাকে তবে দর্শক খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের মত সবটাই যদি রহস্যাবৃত হয় তবে শুধু সজ্জা-বৈচিত্র্য আর ধ্বনি-মাধুর্য ছাড়া দর্শকের আর কিছু প্রাপ্তি নেই। এদিক থেকে দেখতে গেলে কবি ইয়েট্সের হ্রস্ব কলেবরের নাটকগুলির কৌশল ভাল। তা থেকে একটা বর্ণনাযোগ্য ও মনে রাখা যায় এমন একটি চমকপ্রদ কাহিনী অন্ততঃ দর্শক লাভ করতে পারে। পরে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে সে কাহিনীটির গূঢ়ার্থ ভেবে ভেবে বার করার অবকাশ পায়।

সিম্বলিজমে তবু কালানুক্রমিকতা বজায় রাখা হয়, বাস্তববাদী নাটকের মত দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। কিন্তু উন্মোচনবাদে মানুষের স্বপ্নজগৎকে বিধৃত করার চেষ্টা রয়েছে। তার ফলে স্বপ্নজগতে যেমন কালানুক্রমিকতা বা ধারাবাহিকতা নেই, এই নাটকেও তেমনি। এক দৃশ্য থেকে পরবর্তী দৃশ্যের মধ্যে সংযোগ-সেতু নেই; এক দৃশ্য চলতে চলতে অন্য এক দৃশ্যের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে এবং সেই পরবর্তী দৃশ্যটি হয়তো বহু পূর্বে সংঘটিত ঘটনার নায়কের মনের স্মৃতি। মঞ্চ-সজ্জায় আমাদের পরিচিত জগতের পরিচিত আকারগুলির বদলে বিচিত্র অপরিচিত প্রতীকী অর্থযুক্ত ডিজাইনের ভীড়। নায়ক নায়িকারা বাস্তববাদী নাটকে যেমন, আমাদের পরিচিত মানুষদের মত ব্যবহার করে না। তারা অ্যাব্স্ট্রাক্সন মাত্র– মূর্তীকৃত বিমূর্ত কোন ধারণার প্রতিফলন। Realism "endowed him with 'existence', if not essence; whereas in anti-realistic drama he is likely to have essence without existence." | John Gassner—*Form and Idea in Modern Theatre* |

সুর রিয়েলিস্টরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। মানুষের নির্জ্ঞান মনকে রূপ দেওয়ার জন্য তারা পরিচিত বাস্তবের শৃঙ্খলা ও যুক্তিকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছে। ককতুর 'অর্ফিয়ুস' নাটকে মনোজগতের যুক্তি ও পারম্পর্য-বর্জিত ঘটনাসমূহের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। কামিংসের 'হিম' নাটকে মানুষের আদিম কামনা, অবসেসন ও আর্তিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়, কারণ তাই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত বাস্তব।

ইটালিতে উদ্ভাবিত ফিউচারিস্ট সমগ্র মঞ্চকে এবং মঞ্চোপরি অভিনয়-রত অভি-নেতাদের একটি যন্ত্র-সুলভ রূপ দিতে সচেষ্ট। এক যন্ত্রময় বিশ্বের স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাবশতঃ তারা সবকিছুর মধ্যে যন্ত্র-প্রাধান্যকে প্রকাশ করতে আগ্রহী। অভিনেতারা এক যন্ত্রময় বিশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র।

এইভাবে একদিকে যেমন প্রাকৃতবাদ-বিরোধিতা সমস্ত পরিচিত আকৃতি সঙ্গতিবোধ কালানুক্রমিকতা ভেঙ্গে দিয়ে এক কুয়াশাচ্ছন্ন মনোরম জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছে, তেমনি অপরদিকে বাস্তবের কোন গূঢ় অপ্রকাশ্য সত্তাকে প্রকাশ করার জন্য প্রতীয়মান বাস্তবকে ভেঙ্গে দিয়ে ও পুনর্যোজনা করে এক পুনর্নির্মিত বাস্তবকে উপস্থিত করেছে ব্রেখ্টের এপিক থিয়েটারের মধ্যে। এপিক ড্রামা ঐতিহাসিক এবং সমকালীন উভয়বিধ বিষয়বস্তুর উপরই রচিত হয়েছে, যেমন ব্রেখ্টের "গ্যালিলিও", পল গ্রীনের "জনি জন্সন্" (উড্রো উইলসনের কালের বিষয়বস্তু), ব্রেখ্টের "প্রাইভেট লাইফ অব্ দি মাস্টার রেস" (প্রায় সমকালীন হিটলারের উত্থান পতনের কাহিনী)। দৃশ্য, বর্ণনায়, গীতপ্রধান অন্তর্দৃশ্য প্রভৃতির মধ্যে ব্রেখ্ট বাস্তবের অবিকল প্রতিফলনকে এড়িয়ে গিয়ে একটি স্পষ্টতাই কৃত্রিম

আবহাওয়া রচনা করেন তাঁর বক্তব্য বিষয়কে সহজগ্রাহ্য করে তোলার জন্য। অভিনয়েও তিনি স্বাভাবিকতার বদলে কৃত্রিমতার পক্ষপাতী।

উন্মোচনবাদ থেকে এপিক থিয়েটার পর্যন্ত সর্বত্রই নাট্যকারদের লক্ষ্য গূঢ় অপ্রকাশ্য বাস্তবকে প্রকাশ করা। বাস্তব সম্পর্কে উত্তরণের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন নাট্যকার বিভিন্ন শিল্পরীতিকে অনুসরণ করেছেন। একটু চিন্তা করলেই মনে হবে এই সব নাট্য-রীতির সোচ্চার আধুনিকতা আসলে ততখানি আধুনিক নয়। আমরাই যদি পৌরাণিক এবং গ্রীক নাটকের কাহিনীগুলি পর্যবেক্ষণ করি তবে সহজেই দেখতে পাব বাস্তবিকতার ভ্রান্তি সৃষ্টির কোন প্রয়াস ছিল না! অসম্ভব অযৌক্তিক আজগুবি কাহিনীকে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা অনায়াসে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মানসলোচনে যা সত্য বলে ধরা পড়েছে তাকে রূপ দেওয়ার জন্য। কাজেই যদি কোন নাট্যকার বাস্তববাদের সীমাবদ্ধতাকে এড়িয়ে যেতে চান তিনি অনায়াসে প্রাচীনকালের রূপক-ধর্মিতাকে অবলম্বন করতে পারেন, যান্ত্রিকভাবে পাশ্চাত্তোর অনুকরণ খুব আবশ্যিক নয়।

ভগীরথ, যযাতি বা নচিকেতার কাহিনী বাস্তব নয়, কিন্তু গভীরতর বাস্তব সত্যের দ্যোতক। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব সার্তর প্রমুখ কিছু কিছু পাশ্চাত্ত্য লেখক গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে নাটক লিখছেন। আমরা বাঙালীরা অনুরূপ প্রচেষ্টা খুব সার্থকভাবে করতে পারি।

মোটের উপর নাটকে প্রাত্যাহিকতা এবং প্রতীয়মান বাস্তব নিতান্ত সাম্প্রতিক কালের আমদানি। এক সময়ে এই প্রয়াসের মধ্যে নতুনত্বের চমক দর্শককে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু নাটকের স্বাভাবিক ঝোঁক হল চমৎকারিত্বের দিকে, বিস্ময় সৃষ্টির দিকে, নিছক পরিচিত বাস্তবকে আর একবার মঞ্চে দেখার জন্য আমরা চার পাঁচ টাকা খরচ করে থিয়েটারে যাই না। কাজেই বাস্তববাদের পাশাপাশি ভিন্নতর পরীক্ষা নিরীক্ষার গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। এই পরীক্ষা নিরীক্ষা পাশ্চাত্তোর অনুকরণেই করতে হবে এই অঘোষিত দাবীতে অবশ্য আমার আপত্তি আছে। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, উন্মোচনবাদ যেভাবে ধারাবাহিকতা ও কালানুক্রমিকতাকে ভেঙে দিয়ে নাটককে দুর্বোধ্য করে তুলেছে তা অর্থহীন। নাট্যকারের অধিকারের সীমা আমি বহুদূর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে রাজী আছি, কিন্তু তাই বলে দর্শকদের উৎপীড়ন করার অধিকার দিতে রাজী নই।

তেমনি মঞ্চ থেকে রক্তমাংসের চরিত্রদের বাদ দিয়ে নাট্যকারের আজ্ঞাবহ যান্ত্রিক চরিত্র স্থাপনাতেও আমি রাজী নই। পুরাণোক্ত চরিত্রগুলি ঠিক আমাদের পরিচিত মানুষ নয়, তবু তারা মানুষ। বরং নাথানের কথাতেই ফিরে আসি : মঞ্চ হবে একটি বিকৃতি-সাধক আয়না; তাতে বাস্তবিকতা অর্থবোধকভাবে বিকৃতি লাভ করবে, কিন্তু তাকে চিনতে কোন কষ্ট হবে না।

এক কথায়, বাঙালী নাট্যকারগণের এমন নাটক লেখা উচিত যা আঙ্গিকের দিক থেকে বাস্তববাদী, বিষয়বস্তুর দিক থেকে রূপকের সাহায্য নিয়ে গভীরতর বাস্তবের সন্ধানী। দর্শক দেখার সময়ে গভীরতর তাৎপর্যটুকু যদি ধরতে না-ও পারেন, তবু চমকপ্রদ কাহিনীর চুম্বকটুকু তাঁর মনে আঁকা থাকবে অবকাশমত বিজৃম্ভনের জন্য। এই পরিবর্তনশীল জগতে নাট্যকারগণ ক্রমাগতই বাস্তবকে নতুন চোখে দেখতে চাইবেন এ সহজ সত্যকে স্বীকার না করার কোন অর্থ নেই। তেমনি নাটক রচনার উদ্দেশ্য মঞ্চস্থ করা এ কথাও ভুলে যাওয়া ঠিক নয়।

বিকেল

ওয়ালিদ ইখলাসী

দেওয়ালঘড়িতে পাঁচটা বাজল। সারা বাড়িতে ছড়িয়ে গেল তার ধ্বনিতরঙ্গ। জানলা দিয়ে আমি দেখছিলাম, বাবুইগুলো আকাশ পার হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার বাবুই উড়ন্ত কাল বিন্দুর মতন।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা নামছিল।

ঠাকুমার নামাজ শেষ হয়েছে দেখে আমি বললাম, ওদের ভাল হোক।

ঠাকুমার বিষণ্ণ গলা শোনা গেল : আজ আমার নামাজের দেরি হয়ে গেল।

—ভেব না, আরো বিকেল আসবে।

আমার কথা ঠাকুমা শুনতে পেল না।

আমি দেখছিলাম, বাইরের দিকে জানলার কাঁচের ওপর একটা মস্ত মাছি বসে আছে। আমাকে যেন মানছেই না, আমার নাকের এত কাছে বসে আছে।

বললাম,—সারাদিন মাছিটা আমাকে জ্বালিয়েছে, আমি ওটাকে মারতে পারিনি।

ঠাকুমা কোন জবাব দিল না। ঠাকুমা আবার নামাজ শুরু করেছে।

বেলা গড়িয়ে যাওয়ার বিষয়ে আমার চেতনা ছিল না। মাছিটা আমার এত সময় নিয়েছে! শার্শিতে টোকা মেরে আমি ওটাকে ভয় দেখিয়েছি, তবু নড়েনি। নখ বড় হয়েছে দেখে আমি একটা কাঁচি এনে নখ কাটতে শুরু করলাম।

স্বচ্ছ অন্ধকারে আকাশটা ঢেকে যাচ্ছিল। হরিণের চামড়ার চেয়ারে বসা ঠাকুমার প্রার্থনার ধ্বনি কেটে গেল একমাত্র ঘড়িতে ছ'টা বাজার শব্দে। আর সব চুপচাপ।

অন্য ঘর থেকে আমার ছোট বোন ছুটে এসে, আজ রাত্তিরে এমন একটি জিনিস রান্না হচ্ছে বলে ঘোষণা করল যা খাবার জন্য আজ সকালেই নাকি আমার জিভের জল পড়ছিল। অথচ এখন মনে হল, ওই খাদ্যটা আমার খুবই অপছন্দ।

আবার জানলার দিকে ফিরে আমি অবাক হয়ে দেখলাম, মাছিটা তখনো ঘুমোচ্ছে।

ঠাকুমা আমার ছোট বোনকে আদর করে, তাকে বলল,—রেডিওটা খুলে দে। এখন ফাইরুজের গান হবে।

দুপুরেই তো ওর গান শুনেছি, আমি কঠিন গলায় বললাম। বাইরের অন্ধকারে বাবুইগুলোকে আর দেখতে পেলাম না। তবু, মানতে হবে, ফাইরুজের গান আমার ভালই লাগে।

ঠাকুমা বলল,—ফাইরুজের গান আবার শুনব।

আমি কোন জবাব দিলাম না। আমি ঘুমন্ত মাছিটাকে ভাবছিলাম। একটা ভাবনা আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল : আমি ঘুমিয়ে পড়লে একটা মাছি যদি আমার দিকে কটাক্ষ করে থাকে?

শুনতে পাচ্ছিলাম, আমার বোন আজ সন্ধ্যায় সেই সুরেলা পাখির গল্পটা শুনবার জন্য ঠাকুমার কাছে আবদার করছে। ঠাকুমা বলছিল, কালকেই কি ওই গল্প বলিনি?

ছোট বোন ক্ষুব্ধ আবদেরে গলায় চেঁচাচ্ছিল,—কাল! কাল তো ফুরিয়ে গেছে।

আমি মনে মনে বললাম, সুরেলা পাখির গল্প তুমি আর শুনতে পাবে না। বিষণ্ণতায় আমার মন ছেয়ে গেল।

বোন বলল,—আমরা নতুন গল্প চাই না।

—কিন্তু পুরোন গল্পটা তো ফুরিয়ে গেছে।

ফুরোয় নি! বোন চিৎকার করছিল।

আমার বোন ঠাকুমার কোল থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে অন্য ঘরে চলে গেল। আমারও রাগ হচ্ছিল, আমিও পুরোন গল্পটাই চাইছিলাম।

খানিক পরে ঠাকুমার ইচ্ছেয় আমি রেডিও খুলে দিয়ে একটা স্টেশন ধরতে চেষ্টা করছিলাম। ঠিক সাতটা বাজলে এ্যালেপ্পো বেতার কেন্দ্রের সাড়া পেলাম। অথচ তখনই আবার আমি রেডিওটা বন্ধ করে দিলাম।

—খবরটা শুনি না! ক্ষুব্ধ গলায় ঠাকুমা প্রতিবাদ জানাল।

সকালবেলার খবরকাগজের পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে আমি বললাম, রেডিওর সব বাসি খবর।

এর মধ্যে নতুন কিছুও তো ঘটতে পারে। বৃদ্ধা ঠাকুমা এমন করে কথাগুলো বলল যেন হঠাৎ মনে পড়েছে তার কত বয়েস।

আমি খবরের শিরোনামাগুলো পড়লাম। দুপুরেও একবার পড়েছি। কোন খবর মনের ওপর ছায়া ফেলল না।

আচমকা মনে হল, ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, কিন্তু যাবার মতন ঠিক কোন জায়গা খুঁজে পেলাম না। সেই ঘরেই বসে রইলাম।

ছোট বোন বড় একটা পুতুল নিয়ে সেই ঘরে ফিরে এল। ঠাকুমার দিকে কটাক্ষ করে বলল,—আমার পুতুলকে একটা গল্প বলবে?

বৃদ্ধা শুধু হাসল।

আমি জানলার দিকে মুখ ফেরালাম। পুরো আকাশ অন্ধকারে অবসিত। আমার নাকের এত কাছের ঘুমন্ত মাছিটাকে খোঁচাতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। মাছিটার ওপর আমার আর রাগ ছিল না। ভুলেই গিয়েছিলাম, ওটা আমাকে আজ এত জ্বালিয়েছে।

—তুমি আমার পুতুলকে একটা নতুন গল্প বলবে? বোন আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

সত্যি বলতে কি, আমার কোন গল্প জানা ছিল না। অবশ্য তখনই মনে পড়ল, দুপুরে রেডিওর একটা গল্প শুনেছিলাম।

বললাম,—আমি তোকে ভালুক আর মধুর গল্পটা বলতে পারি।

—ওটা তো পুরোন গল্প! বোনের গলায় কান্না মেশান।

অস্বস্তিতে আমি আবার জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। চোখ রাখলাম মাছিটার ওপর।

ওটা কী? জানলার পাশে আমার দিকে আসতে আসতে ছোট বোন জানতে চাইল।

—একটা ঘুমন্ত মাছি।

একটা ঘুমন্ত মাছি? ভুরু কুঁচকে আমার বোন বলল, এটা কি একটা নতুন গল্প?

—ও ঘুমোচ্ছে। ও ক্লান্ত।

—ঐ গল্পটা আমার পুতুলকে বলবে?

—আচ্ছা বেশ, তোর পুতুলকে গল্প বলছি।

বোন আমার খুব কাছে ঘেঁসে এল। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল,—তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছ কী?

একটা চেয়ারে উঠে আমার বোন মাছিটার দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে রইল। একটু পরে জয়ের উল্লাসে তীর তীক্ষ্ণ গলায় ঘোষণা করল : কিন্তু ওটা তো মরে গেছে!

বোনের দিকে তাকিয়ে আমার খুব অস্বস্তি হল। চেয়ারে ওঠায় হঠাৎ ওকে আমার সমান উঁচু দেখাচ্ছে।

বললাম,—মাছিটা ঘুমোচ্ছে।

—ওটা মরে গেছে! আমার অজ্ঞতায় আমার বোনের বিস্ময় তার গলায় মিশে গেল।

সাবধানে জানলা খুলে আমি মাছিটার গায়ে আস্তে ফুঁ দিলাম। খুব ছোট একটা কাগজের টুকরোর মতন মাছিটা খসে পড়ল।

আমার মনে এল, সারাদিন মাছিটা ঘুরেঘুরে আমার চারপাশে উড়েছে। মনে পড়ল, ওটার ওপর আমার ঘেন্না হয়েছিল এবং পরে ওর প্রতি স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিলাম।

—আমার পুতুলকে তুমি ঘুমন্ত মাছির গল্পটা বলবে না?

বোনের কথার জবাব দিলাম না। দেওয়াল ঘড়িটা বেজে ওঠার শব্দ সারা বাড়িতে ছড়িয়ে গেল। সেই ধ্বনিতরঙ্গে আমি মগ্ন ছিলাম।

অনুবাদ : সুধাংশু ঘোষ

[১৯০৫ সালে সিরিয়ায় ওয়ালিদ ইখলাসীর জন্ম। এখন তিনি এ্যালেপ্পোর বাসিন্দা, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-অর্থনীতির অধ্যাপক। তাঁর দুটি গল্প সংকলন, একটি ছোট উপন্যাস ও দু'খানি নাটক প্রকাশিত হয়েছে।]

ভারতীয় সঙ্গীতে রাগালাপ

যামিনীকান্ত চক্রবর্তী

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ আলাপকে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। যুগে যুগে সঙ্গীত তার রূপ পরিবর্তন করেছে; এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। কারণ স্বরলিপি পদ্ধতির প্রচলন না থাকায় যেসব বই পুঁথি পাওয়া তা থেকে সেই সময়ের সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা গেলেও প্রত্যক্ষ সঙ্গীতের কোন রূপের বিবরণ পাওয়া যায় না। আমরা যেসব সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে প্রাচীন কালের সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারি তার মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ভরতের নাট্যশাস্ত্র। ইনি পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বের। তারপর দত্তিলের দত্তিলম্, মতঙ্গের বৃহদ্দেশী, নারদের নারদীয় শিক্ষা এবং সঙ্গীত মকরন্দ। কিন্তু এসব গ্রন্থে রাগালাপ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হয় তখনও রাগালাপের প্রচলন হয়নি। মাত্র এক স্থানে 'জাতিগান' সম্বন্ধে আলোচনার সময় ভরত 'গ্রামরাগের' কথা উল্লেখ করেছেন। বরং বৃহদ্দেশীতে আমরা রাগ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ পাই। পরে সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে নারদ লিখিত সঙ্গীত মকরন্দ গ্রন্থে সর্বপ্রথম রাগ এবং রাগিণীর উল্লেখ পাই। ইনিই প্রথমে রাগকে পুরুষ এবং রাগিণীকে স্ত্রী রূপে কল্পনা করে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁর গ্রন্থ থেকেও তখনকার সঙ্গীত সম্বন্ধে সঠিক কিছু ধারণা করা যায় না। এরপর যে প্রামান্য গ্রন্থ আমরা পাই তার নাম সঙ্গীত রত্নাকর। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শার্ঙ্গদেব এই গ্রন্থ রচনা করেন। সঙ্গীত রত্নাকরে তৎকালে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত সঙ্গীত সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া পূর্বকালীন সঙ্গীত সম্বন্ধেও একটা ধারাবাহিক আলোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। সঙ্গীত রত্নাকর থেকে আমরা জানতে পারি যে তৎকালীন সমাজে রাগালাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল এবং দুই প্রকারের গানের প্রচলন ছিল, 'নিবন্ধ' এবং 'অনিবন্ধ' গান। তালে বদ্ধ গানকে নিবন্ধ গানের পর্যায়ে ফেলা হত এবং যে সঙ্গীত তালবদ্ধ ভাবে গাওয়া হত না তাকে অনিবন্ধ গান বলা হত। আলাপ্তি বা আলাপ গানকে এই অনিবন্ধ সঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা হত। সঙ্গীত রত্নাকর থেকেই আমরা জানতে পারি যে প্রাচীন কালে জাতিগানেরই প্রচলন ছিল। এই জাতিগান নিবন্ধ সঙ্গীতের অন্তর্গত। শার্ঙ্গদেবের সময় নিবন্ধ গানের মধ্যে প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক প্রভৃতি গাওয়া হত। প্রবন্ধ গানের পাঁচটি ভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা : উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা এবং আভোগ। এগুলিকে ধাতু বলা হ'ত। বর্তমানকালে ধ্রুপদ গানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ চারটি ভাগ বা তুক পাওয়া যায়। ঐগুলিও সেইরূপই ছিল। প্রবন্ধ গান ভিন্ন ভিন্ন তালে এবং বিভিন্ন ছন্দে গাওয়া হত।

প্রাচীন কালে রাগ গাওয়ার রীতিপদ্ধতি কঠিন ছিল। তখনকার দিনে রাগকে দশটি বিভাগে বিভক্ত করার রীতি ছিল,—গ্রামরাগ, উপরাগ, রাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তর্ভাষা, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, উপাঙ্গ। উক্ত দশটি বিভাগের মধ্যে এক-একটি বিভাগে বহু রাগ ছিল। সঙ্গীত রত্নাকরে ২৬৪ প্রকারের রাগের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাগের আলাপ করার সময়

রাগের দশটি লক্ষণ দেখতে হত, যথা : গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, সন্ন্যাস, বিন্যাস, মন্দ্র, তার, অল্পত্ব, বহুত্ব। রাগালাপ ছাড়া আর এক প্রকারের আলাপ গান ছিল যাকে বলা হত 'রূপকালাপ'। রূপকালাপে প্রবন্ধগানের মত ভিন্ন ভিন্ন ভাগ ছিল। এই বিভিন্ন ভাগ-গুলিকে আলাদা আলাদা করে আলাপ করে দেখাতে হত। এই ভাগগুলি আজকালকার আলাপের ভাগের মতই। প্রাচীন কালে রাগালাপের আর একটি সুন্দর নিয়ম ছিল, যাকে বলা হত 'স্বস্থান' নিয়ম। ঐ প্রকারের রাগালাপে কতকগুলি বিশেষ রীতি গায়ককে মেনে চলতে হত। এই নিয়ম অনুযায়ী অংশ স্বরের উপর সমস্ত রাগের রূপ নির্ভর করত। এই অংশ স্বরকেই স্থায়ী স্বর বলা হত। স্থায়ী স্বরের চতুর্থ স্বরকে 'স্বরার্ধস্বর' বলা হত। স্থায়ীর অষ্টম স্বরকে 'দ্বিগুণ স্বর' বলা হত। স্থায়ী এবং দ্বিগুণের মাঝের স্বরগুলিকে 'অর্ধাস্থিত' বলে মানা হত। স্বস্থান নিয়মে প্রথমতঃ গায়ককে নিজের আলাপকে 'স্বরার্ধ' স্বরের নিচের স্বর পর্যন্ত রাখতে হত। মন্দ্রসপ্তকে গায়ক ইচ্ছামত আলাপ করতে পারতেন। প্রাচীন কালের আলাপ সম্বন্ধে এর চাইতে বেশি তথ্য পাওয়া যায় না।

প্রাচীন কালের উল্লিখিত গায়কপদ্ধতি আজকের দিনে ইতিহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সঙ্গীত পদ্ধতির সঙ্গে তার কোন মিল নেই। আগের দিনের শুদ্ধ সপ্তকের সঙ্গে এখনকার শুদ্ধ সপ্তকের মিল নেই। এখন আমরা বিলাবলকে শুদ্ধ সপ্তক মানি আর তখন ছিল মোটামুটি আজকের দিনের কাফির সপ্তক। এ বিষয়ে যদিও কিছু কিছু মতদ্বৈধতা পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলি এখনও প্রামাণ্য বলে মানা হয়নি।

বর্তমানে উত্তর ভারতীয় এবং দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে উভয় পদ্ধতির গানের আলোচনা একযোগে করা সম্ভব নয়। তাই আমার বর্তমান আলোচনা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখব।

বর্তমান কালে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ধ্রুপদ গায়করা প্রথমে কোন রাগের পূর্ণাঙ্গ আলাপ করে থাকেন। তারপর স্থায়ী অন্তরা সুরু করেন। বিশিষ্ট ধ্রুপদ গায়কদের ঘরে এই প্রথার প্রচলন দেখা যায়। অবশ্য অধুনা রাগালাপ ছাড়াও শুধুমাত্র স্থায়ী অন্তরা ইত্যাদি গানটুকুই গাইতেও কোন কোন ধ্রুপদিয়াকে দেখা যায়।

প্রচলিত ধ্রুপদ গানের প্রথম প্রচলন সম্বন্ধে জানা যায় যে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির দরবারে নায়ক গোপালের উপস্থিতিতে বৈজুবাওরা ছয়খানি ধ্রুপদ তৈরী করে গেয়েছিলেন। বর্তমান ধ্রুপদের এই সূচনা। নায়ক গোপাল এবং বৈজুবাওরার বহু ধ্রুপদ গান এখনও আমরা পাই। এরপর প্রায় দুইশত বৎসরকে সঙ্গীতের অন্ধকার যুগ বলা চলে। এই সময়ের মধ্যে আমরা এমন কোন সঙ্গীতজ্ঞকে পাই না যিনি ক্রিয়াসিদ্ধ অংশে বা ঔপপত্তিক বিষয়ে কোন নতুন পথের সন্ধান দিতে পেরেছেন। বহু বৎসর পরে গোয়ালিয়রের মহারাজা মানতোমর ধ্রুপদ সঙ্গীত নিয়ে বিশেষ চর্চা করেন। গায়ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁর স্ত্রী মহারানী মৃগনয়নীও কণ্ঠসঙ্গীতে অসাধারণ পারদর্শিণী ছিলেন। মহারাজা মান ধ্রুপদ সঙ্গীত প্রচারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গোয়ালিয়রে স্থাপিত এই বিদ্যালয়টি ভারতের প্রথম সঙ্গীত বিদ্যালয়। মহারাজা মানকুতূহল নামে একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। শোনা যায় রাজা মান তাঁর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন স্বামী হরিদাসের শিষ্য নায়ক বৈজুকে। হরিদাস স্বামী প্রচলিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মূল উৎস। এই বৃন্দাবনবাসী সন্ন্যাসী, একাধারে গায়ক, বাদক এবং নর্তক ছিলেন। পরবর্তীকালে এঁরই শিষ্য তানসেনকে দেখতে পাই সম্রাট আকবরের দরবারে শ্রেষ্ঠ

গায়ক হিসাবে এবং হরিদাস স্বামীর বন্ধ শিষ্য রাজা সমোখন সিংহের পুত্র মিশ্রি সিংকে দেখতে পাই শ্রেষ্ঠ বীণকার হিসাবে। সঙ্গীত প্রেমিক সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় মিঞা তানসেন এবং মিশ্রি সিং যে সঙ্গীতের প্রচার করেন তারই অমৃত ফল আমরা ভোগ করছি। সম্রাটের উদ্যোগে তানসেন দুহিতা সরস্বতী দেবীর সঙ্গে মিশ্রি সিংজীর বিবাহ হয়। মিশ্রি সিংজীর নাম দেওয়া হয় বড়ে নৌবাৎ খাঁ। তানসেনের পুত্র বংশকে রবাবিয়া বংশ বলে। এবং দৌহিত্র বংশকে বীণকার বংশ বলা হয়। অবশ্য উভয়েই নিজেদের সেনীয়া বলে গর্ব করে থাকেন। ভারতের প্রচলিত যন্ত্র এবং কণ্ঠসঙ্গীতের মূল উৎস এই সেনীয়া। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী বলেছেন 'আমি বিভিন্ন ঘরাণার ওস্তাদদের কাছে শিক্ষা করেছি, বস্তু সংগ্রহ করেছি কিন্তু রাগ সম্বন্ধে সেনী ঘরাণার মতকেই প্রামাণ্য হিসাবে মেনে নিয়েছি।' পণ্ডিতজী ছিলেন বীণকার বংশের শ্রেষ্ঠ গুণী উজীর খাঁ সাহেবের শিষ্য।

প্রচলিত ভারতীয় ধ্রুপদ গানে যেমন চারিটি ভাগ বা তুক দেখা যায় আলাপেও তাই। চারটি ভাগ : স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, এবং আভোগ। সব ঘরেই এই চারটি তুক, তবে কোন কোন জায়গায় দেখা যায় আগে আভোগ এবং তারপর সঞ্চারী। অর্থাৎ তৃতীয় তুক আভোগ এবং শেষ তুক সঞ্চারী। কিন্তু কাজের বেলায় কোন প্রভেদ বিশেষ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ উভয় পক্ষই তৃতীয় এবং শেষ তুকের আলাপ একইভাবে করে থাকেন, সেখানে কোন প্রভেদ নেই। সুতরাং এ সামান্য মতভেদ কিছু নয়। আমরা তৃতীয় তুককে সঞ্চারী এবং শেষ তুককে আভোগ হিসাবেই বলব। সেনীঘরের আলাপ চার প্রকারের : বন্ধান, কয়েদ, আওচার, বিস্তার। এ বিষয়ে গৌরীপুরের বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (সেনীঘরের শিষ্য) মহাশয় এই চার প্রকার আলাপ সম্বন্ধে যা বলেছেন সেটা উদ্ধৃত করছি,

বন্ধান : 'সেনী মতে বন্ধান আলাপে স্বর বিস্তার বা সুরের বাঢ়ৎ ক্রমশঃ ছোট ছোট তান হতে বৃহত্তর তান দ্বারা রাগের স্বরূপ প্রকাশ করতে দেখা যায়। প্রত্যেক তানে রাগের স্বরূপ থাকবে এবং স্বরবিস্তারের গণ্ডী ও তানের পরিধি ক্রমশঃ বাড়বে।'

কয়েদ : 'কয়েদ আলাপের রীতি অনেকটা রূপক আলাপের অনুরূপ। ইহাতে প্রত্যেক তানে এক-একটি সুরকে মুখ্য বা কেন্দ্র স্থানে রাখিয়া ক্রমশঃ উদারা, মুদারা ও তারাস্বরের প্রয়োগ করিয়া তানের আয়তন বাড়াইয়া রাগের রূপ প্রকাশ করিতে হইবে। কয়েদ অর্থ নির্দিষ্ট গণ্ডী অর্থাৎ প্রথম যেমন তিন সুর পরে চারি সুর, একই প্রকার ক্রমশঃ সুরের গণ্ডী বাড়াইয়া স্বর বিস্তার দ্বারা রাগের রূপ প্রকাশ করিবার পদ্ধতিকেই কয়েদ আলাপ বলা যাইতে পারে।'

আওচার : 'এই প্রকার আলাপে রাগের বিশেষ তান বা পকড়ের সাহায্য লইয়া রাগের যাবতীয় আরোহণ ও অবরোহণ অবলম্বনে বিস্তার সা হইতে আরম্ভ করিতে হয়। এই প্রকার আলাপে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম পালন না করিয়া সহজভাবে রাগের মূর্তি প্রকাশিত হয়। আরোহাবরোহণ অর্থাৎ যাতায়াতের পথ প্রদর্শক আলাপকেই আওচার অঙ্গীয় আলাপ বলা যাইতে পারে।'

বিস্তার : 'আওচার অঙ্গীয় আলাপের তানগুলিকে ক্রমশঃ বৃহত্তর তানে বিস্তৃত করিলেই বিস্তার প্রকৃতির আলাপ হইবে। রাগের রূপ প্রথমেই খুলিয়া দিয়া পরে মাঝে মাঝে কোন কোন সুরের উপর বিস্তার করিতে হইবে। তানের আয়তন বা গণ্ডী প্রথম হইতেই বড় বা অধিকসংখ্যক সুর লইয়া হইবে। এই প্রকার আলাপে রাগের রূপ সুরের গণ্ডি বাঁধিয়া ক্রমশঃ বাঢ়ৎ অর্থাৎ বিস্তার করিতে হয়। বাদী, সম্বাদী বা গ্রহস্বরের যে কোন

একটি স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ স্বরের পংক্তি বাড়াইয়া রাগ খুলিতে হয়।

সেনীঘরের আলাপের প্রকার মোটামুটি বোঝা গেল। কিন্তু ব্যাপার যে খুব গোলমেলে তাতে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন বইপুঁথি পাওয়া যায় না। হাল আমলে যেসব সাত্যিকারের গুণী ছিলেন, যাঁরা পথের কিছু নিশানা দিতে পারতেন, তাঁরা আজ প্রায় সকলেই গত হয়েছেন। তবুও জীবিত অনেক ওস্তাদ এবং গুণীদের সঙ্গে কথা বলে এবং বইপুঁথি পড়ে যেটুকু বুঝেছি সেটা বলছি।

বিস্তার এবং আওচার বিস্তার অঙ্গে আলাপ সাধারণতঃ খেয়াল গায়করা স্থায়ী অন্তরা গাওয়ার পর করে থাকেন। যন্ত্রীরাও গতের পর এই ধরনের আলাপ করে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায় গায়করা গানের আগে বা যন্ত্রীরা গৎ সুরু করার আগে ৫।৭ মিনিট একটু রাগরূপটা দেখিয়ে নিয়ে গান বা গৎ সুরু করেন। বাদী, সম্বাদী বা পকড়ের সাহায্য নিয়ে রাগরূপটা প্রথমেই খুলে দেন। স্বরের সংখ্যা কম বেশিতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু 'কয়েদ' বা 'বন্ধান' আলাপ অন্য জিনিস। সাধারণতঃ যেখানে পূর্ণাঙ্গ আলাপ গাওয়া বা বাজান হয় সেখানে গুণীরা এই 'কয়েদ' বা 'বন্ধান' শ্রেণীর আলাপ সুরু করেন। তবে আমার মনে হয় 'বন্ধান' শ্রেণীর আলাপ যেমন সহজবোধ্য এবং আনন্দদায়ক 'কয়েদ' তেমন নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, যে ওস্তাদদের একটা অদ্ভুত জেদ চেপে যায় যে আলাপ করব কিন্তু রাগ বুঝতে দেব না। একেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব মনে করেন।

বর্তমান রাগালাপের চারিটি ভাগ কিভাবে গাইতে হয় বা বাজাতে হয় সেই সম্বন্ধে কিছু বলছি। ধ্রুপদাঙ্গ আলাপ করার সময় বর্তমানকালের গায়করা তোম্, তা, না, রি, রে, নুম প্রভৃতি বাণী সহযোগে আলাপ গান করে থাকেন। প্রাচীন কালে এই রকম অর্থশূন্য বাণীর ব্যবহার ছিল না। তখনকার দিনে হিন্দু গায়করা 'ওঁ নারায়ণ নিরঞ্জন হরি' এই ভক্তিমূলক কথা ব্যবহার করতেন। কারণ তাঁরা রাগালাপের ভিতর দিয়ে নিজের অন্তরের ভক্তি অর্ঘ্য ভগবৎ চরণে নিবেদন করতেন। মুসলমান গায়কগণ এই বাণীর পরিবর্তন সাধন করেন। বর্তমান সময়ে যে বাণী দিয়ে আলাপ করা হয় তাকে চলতি কথায় নোম্ তোম্-এর আলাপ বলা হয়। একটা জিনিস মনে রাখা দরকার। আলাপের বাণীর উচ্চারণ শুদ্ধ হওয়া দরকার। প্রতিটি বাণী বলিষ্ঠ এবং স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কোথায় কোন বাণী ব্যবহার করতে হবে সেটা বাছাই করার উপরেই গায়কের রসবোধের পরিচয় মেলে। শ্রেষ্ঠ গায়কদের গান যারা শুনেছেন, তাঁরাই এ কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। এইখানেই গায়কের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যাবে।

আলাপের সময় প্রথম স্থায়ীর আলাপ আরম্ভ করতে হয়। স্থায়ীর আলাপ সব সময় মধ্য সপ্তকের সা থেকে আরম্ভ করতে হয়। মধ্য সপ্তকে রাগের বাদী বা সম্বাদী যে স্বর সা-এর কাছে থাকে সেই পর্যন্ত স্বরগুলিকে নিয়ে আরম্ভ করতে হয়। বাদী স্বর যদি মধ্যমের পর হয় তবে মধ্য সপ্তকে না এগিয়ে মন্দ্র সপ্তকের দিকে যাওয়াই প্রশস্ত। অর্থাৎ মন্দ্র বা মধ্য যে সপ্তকেই হোক মধ্য 'সা'-এর কাছে বাদী স্বর পর্যন্ত স্বরগুলি নিয়ে বিস্তার করা উচিত। তবে প্রথমে তিনটির বেশি স্বর না নেওয়াই প্রশস্ত। তিন স্বরের নানারকম স্বররচনা করে মাঝে মাঝে মধ্য 'সা'তে এসে আলাপ শেষ হয়। মধ্য 'সা'তে ফিরে মহড়া নিতে হয়। রাগ ভেদে এই মহড়া এক একরকম হয়। যেমন ইমন রাগে সা সা সা নি নি রে সা। মধ্য সপ্তকের 'সা'কে কেন্দ্র করে মন্দ্র এবং মধ্য সপ্তকের সবগুলি স্বরকে ধীরে ধীরে নিতে হবে এবং নূতন স্বর রচনার সৃষ্টি করতে হবে, এটাই স্থায়ীর আলাপের উদ্দেশ্য।

বাদী সম্বাদী এবং বিশ্রান্তি স্বরের সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বারা রাগের কাঠামো দাঁড় করাতে হবে। মধ্য সপ্তকের নিষাদ পর্যন্তই স্থায়ী বিস্তার হবে। এক আধবার তার 'সা' স্পর্শ করা যেতে পারে, সেখানে দাঁড়ান চলবে না।

অন্তরার সুরু হবে মধ্য সপ্তকের মাঝামাঝি জায়গা থেকে অর্থাৎ পঞ্চম বা মধ্যম থেকে তবে রাগভেদে গান্ধার থেকেও সুরু করা হয়। সেনীঘরে বলা হয় তার 'সা'তে যাবার সময় নিষাদে জোর দিয়ে তার 'সা'তে উঠতে হবে, বলা বাহুল্য, যে রাগে নিষাদ আছে; যেখানে নিষাদ নেই সেখানে ধৈবতে জোর দিয়ে 'সা'তে ন্যাস করতে হবে।

অন্তরাতে ধীরে ধীরে তার 'সা'-এর উপর নানাভাবে ন্যাস করে দেখাতে হবে। সাধারণতঃ অন্তরা আলাপে তার সপ্তকের গান্ধার বা মধ্যম পর্যন্ত যাওয়া হয়। মাঝে মাঝে মধ্য 'সা'তে ফিরে মহড়া নিতে হয়। স্থায়ী এবং অন্তরার আলাপের পর রাগরূপের প্রতিষ্ঠা শেষ হল। স্থায়ীতে মন্দ্র মধ্য সপ্তকের স্বরগুলিকে মণ্ডলাকারে দেখান হয়েছে। নানাভাবে নূতন স্বররচনা করে ঘুরে ফিরে বাদী সম্বাদীর সাহায্যে রাগরূপ দেখান হয়েছে। অন্তরাতে তার সপ্তকে স্বরগুলির বিশিষ্ট ব্যবহারের ভিতর দিয়ে রাগের পূর্ণতা দেখান হল। এর পর রাগে আর নূতন কোন স্বর থাকলো না, বা রাগের রূপের মধ্যে নূতন কিছু করার থাকল না। এর পর যা কিছু করা হবে তাকে রাগের অলঙ্করণ বললেও বোধহয় ভুল হয় না। তবে তারও প্রয়োজন আছে। নব নব ভাবে অলঙ্করণের ভিতর দিয়ে নব নব রস সৃষ্টি করা হয়।

সঞ্চারীতে রাগের অবরোহী বিস্তার দেখান হয়। এটা আরম্ভ করতে মধ্য সপ্তকের মাঝামাঝি জায়গা থেকে। অর্থাৎ যেখান থেকে অন্তরার ঊর্ধ্বগতি সুরু হয়েছিল, সেখান থেকেই অবরোহী গতিতে সঞ্চারী সুরু হবে। তবে কাউকে কাউকে একটু অন্যরকম করতেও দেখা যায়। অর্থাৎ নিষাদ ধৈবত থেকেও আরম্ভ করেন। এ বিষয়েও মতবৈষম্য দেখা যায়।

সঞ্চারীতে মন্দ্র সপ্তকের ষড়জ পর্যন্ত নেমে যাওয়া যায়। যন্ত্রীরা অতি মন্দ্র সপ্তকেও চলে যায়। তবে সাধারণতঃ কণ্ঠে অতি মন্দ্র সপ্তকে যাওয়া সম্ভব হয় না। মোটের ওপর যন্ত্রে বা কণ্ঠে যিনি যতটা নামতে পারবেন ততটাই যেতে পারবেন এ স্বাধীনতা আছে; কিন্তু যখন মধ্য সপ্তক থেকে মন্দ্র সপ্তকে নামবেন তখন একবারেই মন্দ্র 'সা'তে চলে যাবেন না। মাঝে একটু উপরে উঠতে হবে আবার নামতে হবে। যেমন অন্তরাতে মধ্য সপ্তকের মধ্যম পঞ্চম থেকে সুরু করে হঠাৎ তার সপ্তকের গান্ধার মাধ্যমে যাবে না। খানিকটা গিয়ে আবার একটু নেমে আসবে এসে তার 'সা'তে ন্যাস করবে। এমনি ক্রমে ক্রমে তার সপ্তকে গান্ধার বা মধ্যম পর্যন্ত যাবে। ঠিক তেমনি সঞ্চারীতে মধ্য সপ্তকের মাঝামাঝি জায়গা থেকে ক্রমশঃ নীচে নামবে আবার খানিকটা উঠে যাবে। এমনি করে ক্রমশঃ মন্দ্র সপ্তকের শেষ স্বর অবধি যাবে। সঞ্চারীতে তার সপ্তকের কোন স্থান নেই। স্থায়ী অন্তরা থেকে সঞ্চারীর আলাপের লয় একটু বাড়বে। আলাপ ক্রমশঃ গমকযুক্ত হবে, মীড়ের ভাগ ক্রমশঃ কমতে থাকবে। সঞ্চারীর শেষ মহড়া মধ্য 'সা'তে নেবার পর আভোগ আরম্ভ হবে।

আভোগ আরম্ভ হবে মধ্য সপ্তকের যে জায়গা থেকে অন্তরা সুরু হয়েছিল সেখান থেকেই উপরের দিকে যাবে অন্তরার মতই। তবে আভোগের গতি আরও দ্রুত হবে, গমক এবং হলকের কাজ হবে। নানা রকমের অলঙ্কার প্রয়োগ করা যেতে পারে। আভোগের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে যদিও সুরু হবার সময় মধ্য সপ্তকের মাঝামাঝি জায়গা থেকে

ঊর্দ্ধগতি নেবে কিন্তু এতে আরোহী এবং অবরোহী উভয় ক্রমই দেখান হবে। মন্দ্র মধ্য তার তিন সপ্তকেই ঘোরাফেরা করবে। মন্দ্র বা অতিমন্দ্র যতদূর ইচ্ছা নামা যাবে, এবং তার বা অতি তার যতদূরে সাধ্য ওঠা যাবে। লম্বা মীড়ের কাজ নানা প্রকারের গমকের কাজ এবং কম্পনের কাজ এতে দেখান হয়। শেষে এসে মধ্য 'সা'তে শেষ মহড়া নিয়ে শেষ করতে হবে।

এরপর আসবে জোড়। জোড় তিন রকম লয়ে গাওয়ার নিয়ম। বিলম্বিত মধ্য এবং দ্রুত। একেও স্থায়ী অন্তরা ভাগে ভাগ করে করার নিয়ম। তবে সেভাবে কেউ করে না। বিলম্বিত জোড় কাউকে করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মধ্য এবং দ্রুত জোড়ই করা হয়। মধ্য জোড়কে চলতি কথায় মদজোড় বলে আর দ্রুত জোড়কে বলে গমক জোড়। আলাপের গতি বাড়িয়ে দেখানকেই জোড় বলে। জোড়ের সময় অবরোহী ক্রমের বিস্তার দেখান হয় বেশি এবং একই টুকরার পুনরাবৃত্তি থাকে। একটা টুকরাকে দুবার বলে তার সঙ্গে আর একটা যোগ করা হয়। হয়ত বা এজন্যই একে জোড় বলা হয়েছে। এতে আরোহী বর্ণের আলাপ থাকবে না তা নয় তবে অবরোহী বর্ণের প্রাধান্য থাকে। মধ্য জোড়ে মীড়ের কাজ বেশি থাকে তবে সে মীড়ের গতি মধ্য দ্রুত তারপর দ্রুত জোড় আরম্ভ হলে গতি দ্রুত হবে এবং মীড়ের জায়গায় গমক আসবে। সাধারণতঃ মধ্য জোড় মন্দ্র মধ্যতে করা হয় এবং দ্রুত জোড় মধ্য এবং তার সপ্তকে করা হয়। বাদী সম্বাদীর বিস্তার এবং বিশ্রান্তি স্বরের ব্যবহার স্থায়ী অন্তরাতেই দেখান হয়ে থাকে। জোড়ের সময় বাদী সম্বাদীর সঙ্গে অনুবাদী স্বরেরও বিস্তার দেখান দরকার। রাগের 'অন্তর্মার্গ' সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান না থাকলে অনুবাদী স্বরকে দেখান খুব অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

জোড়ের পর আসে ঝালা। ঝালা ঠিক গলার জিনিস নয়। ওটা যন্ত্রের জন্য। যন্ত্রে ঝালা শুনতে ভাল লাগে; গলায় সব রকমের ঝালা তেমন হয়ও না, বা জোর করে যদি কেউ করেনও তবে বিশেষ শ্রুতি মধুর হয় না।

যন্ত্রে ঠোক, লড়ি, লড়গুথাও, লড়ন্ত বা লড়লড়ন্ত, ধুয়া, মাঠা, পরমাঠা, লড়লাপেট, কত্তরঝালা প্রভৃতি দশ রকম বা কোন কোন মতে বার রকমের ঝালা বাজান হয়। অবশ্য এই দশ বা বার প্রকারের ঝালা প্রত্যেকটা আলাদা করে তাদের বাণী বুঝিয়ে দিয়ে বাজিয়ে দেখানর লোক সমস্ত ভারতবর্ষে ক'জন আছে বলা কঠিন। প্রত্যেকটি প্রকারের ঝালার বাণী এবং বোল আলাদা, সেটা আলাদা আলাদা করে দেখান খুব কঠিন ব্যাপার।

কণ্ঠে যে দু'এক প্রকারের ঝালা গাইতে শোনা যায় সেগুলো আসলে তবলা পাখোয়াজের বোলকে রি, রেনে, নানা, তানা, নানা প্রভৃতি বাণী দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

বিলম্বিত আলাপে নানা প্রকারের বাণী ব্যবহার করা হয়। আলাপের গতি যত দ্রুত হবে বাণী তত সংক্ষেপ হবে। ঝালাটা পুরোপুরি গমকের ওপর দ্রুত গাওয়া হয়। যাঁরা পূর্ণাঙ্গ আলাপ কণ্ঠে করতে চান তাঁরা জোড় পর্যন্ত করলে দোষ নেই। কিন্তু যন্ত্রে ঝালা না বাজালে আলাপের অঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকে। গলার ঝালা গাওয়া ইদানীং দেখা যায়। প্রাচীন নিয়মে আলাপ জোড় গাওয়া হত। গতির পাল্লা দুনিয়াকে কোথায় নিয়ে যাবে জানি না। সব কাজেই কে কত দ্রুত করতে পারে তারই পাল্লা। সঙ্গীতে এই জিনিস ঢুকে এর যে কত ক্ষতি করেছে তা ভাববার সময় এসেছে। যুগধর্মকে মানতে হবে। সুতরাং উপায় নেই।

রাগ সম্বন্ধে আর কয়েকটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। তরুণ গায়ক-গায়িকারা যখন যে রাগ শিখবেন তখন সেই রাগের 'অন্তরমার্গ' সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। 'অন্তরমার্গ' কাকে বলে এটা বোঝা দরকার। রাগের বিশিষ্ট লক্ষণ, বাদী সম্বাদীর বিচার,

রাগের ভিন্ন ভিন্ন স্বরসঙ্গতি, বিশেষ বিশেষ স্বরকে বাদ দেওয়া এবং বিশেষ বিশেষ স্বরের বিশিষ্ট প্রকারের গুরুত্ব আরোপ আদি কৃত্যকে 'অন্তরমার্গ' বলা হয়। 'অন্তরমার্গ' সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান না থাকলে রাগের রূপ সম্বন্ধে কোন সম্যক্ ধারণা হয় না।

প্রত্যেক রাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি জানলে তবেই রাগ সম্বন্ধে ঠিক ঠিক ধারণা আসবে। যথা : (১) ঠাট (২) জাতি (৩) অঙ্গ প্রাধান্য (৪) বাদী (৫) সম্বাদী (৬) সঙ্গতি (৭) মিশ্রণ (৮) বর্জ্যস্বর (৯) দুর্বলস্বর (১০) বক্রতা (১১) আরোহাবরোহ (১২) পকড় (১৩) বিশ্রান্তি স্থান (১৪) উঠান (১৫) সাধারণ চলন (১৬) অন্তরার উঠাও (১৭) মিলান (১৮) প্রাচীন গ্রন্থোক্ত রূপ বা আধার (১৯) প্রচলিত রূপ এবং আধার।

কোন রাগের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও আলাপ করতে হলে উপরোক্ত জিনিসগুলি ভাল-ভাবে জানা দরকার। যাঁদের উপরোক্ত বিষয়গুলির জ্ঞান নেই তাঁদের আলাপ শুনলেই সেটা বোঝা যাবে। ভৈরবীর চটক যতই থাক, সমঝদারের কাছে তার দৈন্যতা ধরা পড়তে দেরি হয় না।

অধ্যাপক মোহিত স্যানের উপাখ্যান

অমিয়ভূষণ মজুমদার

ব্রায়ার পাইপই বটে, তবে ভাঙা, তার জড়িয়ে জুড়ে রাখা।

এক আলমারি বই, ছোট দুটো তাকে ঠাসা আরও কিছু। তাকের মাথায় আর ওদিকে ছোট আকারের টেব্‌লে অনেক পত্রিকা। আলমারির কাচগুলো কিন্তু ছোট ছোট কাগজের টুকরোয় জুড়ে রাখা। পেপারব্যাকগুলোর পিঠ ছেঁড়া, বয়সে ধুলোয় বাদামী। পত্রিকাগুলোর কোনটির বয়সই দু-চার বছরের কম নয়। আর সবই, সবই ধুলোয় ঢাকা।

পুরনো একটা আধা-ইজিচেয়ারে অধ্যাপক মোহিত। পাইপের বাটিটা হাতের তেলোয়।

মোহিত স্যান পা ঝুলিয়ে বসেছিলো। চেয়ারে পা তুলে বসলো। পনরো মিনিটেই পা চিবোতে সুরু করেছে। এটা, এখন ভেবে দেখলে, একমাস হলো হয়েছে। মনে হয়েছিলো নসে থেকে টাঁস-ধরা, এখন বোঝা যাচ্ছে এটাও আর একটি উপসর্গ যা থাকতে এসেছে। হলদেটে চামড়ার নিচে থেকে ঠেলে ওঠা চৌকো চোয়াল, খাঁড়া নাক, ন্যাবাধরা চোখের নিচে দুটো থলি। উঠে যাওয়া বিবর্ণ চুল। শুকনা ফ্যাকাসে লম্বা-লম্বা আঙুল, কব্জির গাটটা ফুলো বোধ হচ্ছে।

সেই ঘরের অন্য অংশে অধ্যাপকের স্ত্রী মানময়ী।

একটা পুরনো পালিশ-চটা হাত-কলের সামনে মুখ নিচু করে পোশাক তৈরি করছে। কাপড়টা দামী। মানময়ীর কনুই-ঢাকা জামার নিচের থেকে রোগা হাত দুখানা খোলা। মাথার রুক্ষ চুল পুঁটুলি করে জড়ানো। ঘাড়ের হাড়গুলো জেগে আছে। শুকনো সাদা মুখের উপরে হলুদ ফ্রেমের চশমার দুটি বৃত্ত। মানময়ী লজ্জা বোধ করছে। দামী হতে পারে কিন্তু এই লজ্জাহীনা ঘুমানোর জামা । সে চোরাচোখে দেখে নিলো মোহিতের চোখ কোন্ দিকে। তা দেখতে গিয়ে তার কানের কাছে খানিকটা গরম লাগলো। তাই ধারণা তার, এসব লজ্জায় গাল লাল হয় না, ব্রীড়ায় যেমন হতে পারে।

তা হলেও তাকে সেলাই করতে হবে। কাপড় কেটে, নির্দোষ কাপড়, এই লজ্জাহীনাদের তৈরি করতে হবে। বরং এদের সংখ্যা যদি আরও কিছু বেশী হতো! হয় না। কারণ অনেক দূরে দূরে হেঁটে তবেই জুটিয়ে আনা যায়, আনতেও হয় অনেক গোপন করে।

কারণ, বুকের ভিতরে একনিমেষের জন্য ধড়ফড় করে উঠলো, কারণ সেলাই করে মানময়ী পয়সা নেয়। সামাজিকতার সৌখীন সৌজন্য নয়।

মোহিত মৃদু একটা এহেঁ-হে করে গলা সাফ করলো। একবার ডান আর একবার বাঁ কাঁধে থুতনি ঘষে নিলো। বুড়ো কাকের মতো যেন ভঙ্গিটা।

বললো—তিশটে পয়সা দিতে পারো?

মিনিট দুয়েক দেরি করে অধ্যাপক মোহিত স্যান্ আবার বললো, গোটা তিশ

মানময়ী কাপড়ে কাপড় জুড়তে মাপ নিলো। মনে হতে পারে এতদিনে সে কালাও হতে পেরেছে।

কেউ যখন সাড়া দিলো না মোহিত তখন সামনের টেবলের বইএর কোন এক খাঁজ থেকে একটা ছোট্ট পাকানো কাগজের মোড়ক বার করলো। চোখের সামনে তুলে ধরলো মোড়কটাকে।

খানিকটা রস-শুকোনো কালো তামাকপাতা। হাতের তেলোয় মোড়কটা রেখে অন্য হাতের আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তামাকের পরিমাণটাকে অনুভব করলো। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে চেয়ে মিনিট দুয়েক কেটে গেলো তার।

আর একবার তবু স্বগতোক্তির মতো বললো, শুনছো। পাইপে তামাকটুকু ভরলো, কিন্তু পাইপ ভরলো না তাতে। চোরাচোখে লক্ষ্য করে নিলো মানময়ী দেখছে কি না। মানময়ী সেলাই নিয়ে ব্যস্ত। মোড়কের কাগজটাকে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকলো। তামাকের গন্ধই বটে। কাগজটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কেউ দেখে ফেলার আগেই পাইপে ভরে ফেললো।

মোহিত স্যানের পাইপ ধরার কায়দাটা ভালো। খুবই স্টাইলিশ। এটা একটা অভ্যাস যা যেন পূর্ব প্রজন্ম থেকে এসেছে।

পাইপ ধরালো অধ্যাপক স্যান। আর দেশলাই ঘষার শব্দে মানময়ী একবার চোখ তুলে চেয়ে আবার সেলাইএর দিকে মুখ নামালো।

আর তিন সপ্তাহ থেকে খবরের কাগজও আসছে না। কথাটার মধ্যে কিছু মিথ্যাও আছে। বন্ধ হয়েছে মাস ছয়। পাশের ফ্ল্যাটের কাগজ। পড়া হলে ওদের ছেলেটি দিয়ে যেতো। তার অভ্যস্ত সময় চলে গেলে সেদিন দুপুরে মোহিত নিজেই আনতে গিয়েছিলো। পাশের ফ্ল্যাটের সেই ছেলেটি বেরিয়ে এসে বললো—বাবা বলেছেন পরে পাওয়া যাবে। তখন তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান বাবার কারখানায় থাকার কথা।

মোহিত যেন ভয়ঙ্কর একটা ঠোক্কর খেলো। চৌকাঠ ধরে নিজেকে সামলে নিলো। বিনি পয়সার কাগজ পড়তে চাওয়ার নির্ভেজাল আবেদন নয়? তাই ধরা পড়লো না? তিন সপ্তাহ আগেকার কথা।

মোহিত চেয়ার থেকে পা নামালো। যেন উঠবে, পায়চারি করবে। স্ত্রীর দিকে চাইলো। পাইপে গুটিকয়েক টান দিলো। স্ত্রীর দিকে আবার চাইলো। রোগা, শুকনো, কি ভয়ঙ্কর শুকনো আর কি অদ্ভুত সাদা। মোহিতের মুখও সাদা হয়ে গেলো। অথচ এখন আটত্রিশই হবে। আর তার নিজের পঞ্চাশ হতে চলেছে। অথচ সে কি না ভেবেছিলো ষাট তো বটেই তার পরেও কয়েক বছর জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছাত্রদের অনুরোধে তাকে অধ্যাপনা করতে হবে।

টেলিফোনটা আবার বাজতে সুরু করলো। দোতালার প্রায় সবটা জুড়ে একটা প্রেস। টেলিফোনটা তাদেরই কয়েকটির একটি। এটাই মোহিতের ফ্ল্যাটের সবচাইতে কাছে। দু-তিনদিন আগে ভর দুপুরে একবার বেজেছিল। প্রেসের একজন পিওন এসে খবর দিয়েছিলো মোহিতকে। এখন আবার। এখন প্রেসের দরজা খুললেও কর্তাব্যক্তিদের কেউ আসে নি যে এত ঘন ঘন আর ঘটা করে বাজবে। এটা যে মানময়ীকেই কেউ ডাকছে তা যুক্তি না দিতে পারলেও অনুভব করা যায়, চিররোগী যেমন সামান্য চিন্ চিন্ করে ওঠা থেকেই উপসর্গ বেড়ে ওঠার আভাস পায়।

টুক্ করে মোহিত বললো, মন্দা তো আমাদেরই মেয়ে। মানময়ী সেলাই থেকে মুখ তুললো। কেউ যেন গোলমেলে কাজ করছে—হয় হৃৎপিণ্ড, নয় ফুসফুস। কি আর্ত তার চোখদুটো।

কি সাদা দেখাচ্ছে তার মুখ!

মোহিত বললো, তাকে আসতে বলা যায় না? টেলিফোনটা—

মানময়ীর চশমার কাচ চক্ চক্ করে উঠলো। মোহিত জানে এরকম সময়েই আরও

কঠোর মনে হয় তাকে।

মানময়ী উঠে পড়লো। ধীরে ধীরে হে'টে দরজা পর্যন্ত গেলো।

নিরুপায়, মোহিত জানে, এই মুহূর্ত থেকে সে নিরুপায়। এর পরে মানময়ী ধীরে ধীরে সি'ড়ি দিয়ে নেমে যাবে, টেলিফোনটা যেখানে আছে তার দরজার কাছে দাঁড়াবে। যতক্ষণ না প্রেসের কোন পিওন রিসিভারটা ধরে খবর নিয়ে বলছে। আর তারপর মানময়ী কথা বলবে। আর সে কথা এই ঘরে বসেও শোনা যাবে। প্রেসের কর্মচারীরা তো শুনবেই, তেতালার প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটেই সেই পারিবারিক সমস্যাগুলো শুনতে পাওয়া যাবে।

টেলিফোনটা বাজছে এখনও। মানময়ীও নেমে গেলো সি'ড়ি দিয়ে। আর এখন মোহিত নিরুপায়, মোহিতের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এ বিষয়ে ঠিকই হলো। মানময়ীই কথা বলছে, আর শুনে বুঝতে বাকি থাকে না তা মন্দার সঙ্গেই। অন্যের টেলিফোনের কথা কানে এলে ও-পক্ষ কি বলছে তা আন্দাজ করা যায় না, কিন্তু মানময়ীর ধরন অন্য রকম। তুমি অনায়াসে আন্দাজ করতে পারবে ও-পক্ষ কি বলছে।

মোহিতের আগ্রহ হলো কানে হাতচাপা দেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সে জেনে ফেলেছে এসব আগ্রহ সময়ের বুদ্বুদ। সময়ের টানে ভেসে যায়। তুমি যেন কিছুদূর পর্যন্ত তার ভেসে যাওয়া দেখতে পারো, অন্য সময়ে ভেসে যাওয়ার আগেই তা ফেটে যায়। তাছাড়া—শব্দটা এতক্ষণে অন্য ফ্ল্যাটগুলো থেকে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

...না, কেন আসবে? কি লাভ হবে এসে? নিশ্চয়ই তুমি আমাদের মেয়ে। বিশ্রামের জন্য, মানে মানসিক বিশ্রামের জন্য? কিন্তু এই পৃথিবীতে তা কোথায় পাওয়া যাবে। কালো দত্তর দলে মিশছে তাতে অবশ্য, কিন্তু সে তো তোমার স্বামী, বুঝতে পেরেছো? সে তোমার স্বামী। আর তুমি আমার মেয়ে। সুতরাং তোমাকে বলতে পারি আমিও চিরদিনই আমার—মানে তোমার বাবার সহগামিনী। হ্যাঁ, তিনি যে পথে চলেছেন সেটাই একমাত্র আমার পথ। আর তুমি কি এরকম অনুভব করো না আসলে তা দুটো আত্মার মিশে যাওয়ার ব্যাপার। সে পথ যদি ধুলোর হয় তা হলেও নিরঞ্জনের পথই তোমার।...

ঠিক যেন তৈরি করা বক্তৃতা। আর কি অশ্লীল! কেন যে মানময়ী বোঝে না টেলিফোনে অত জোরে না বললেও চলে, আর অত জোরে বললে তা এসব ফ্ল্যাটের সব-গুলোতেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এখন এটা চলবে অন্তত আরও দু-তিন মিনিট এবং তা হয়তো আরও উ'চু গলায় আরও স্পষ্ট উচ্চারণে।

—না, তা ভুলেও ভেবো না। মানময়ীর গলাটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো টেলিফোনে। আমাদের পথ আমাদের। আর কালোবরণদের মানে তোমাদের পথ তোমাদের। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।—

অথচ, মোহিত ভাবতে চেষ্টা করলো; অথচ, ঘড়ির কাঁটার একটা সেকেন্ড একটা বুদ্বুদ হয়ে যেন তাকে টানছে, হয়তো মেয়েটা বিপন্ন, হয়তো সে তার অল্প বয়সের বুদ্ধি দিয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, আর তা ছাড়া এসব সমস্যা কত কঠিন হতে পারে তা অন্তত বয়স্কদের বুঝতে পারা উচিত।

কালোবরণ, হ্যাঁ, তা কালোবরণ, মানে কালোবরণ তার মানে মোহিতের বন্ধু। অন্তত তোমাকে স্বীকার করতেই হবে এক সময়ে সে আর এই কালোবরণ খুব কাছেই এসেছিলো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তা তখন ভাবাই যায় নি। আর কালোবরণ হয়তো এবার উপ-

মন্ত্রীই হবে কিম্বা ডেপ্‌্টি মেয়র।

খন্‌ খন্‌ করছে টেলিফোনে মানময়ীর গলা। নড়েচড়ে বসলো মোহিত যেন চেয়ারটার আরও গভীরে যাওয়ার চেষ্টায়। আঃ। কি আশ্চর্য রকমে অসম্ভব হতে পারে কেউ। আর—আর এবার কালোবরণ হয়তো উপমন্ত্রী হবে। আর কারো কারো এই স্বভাব টেলিফোন ধরলে ছাড়তে চায় না।

মোহিত পায়ের গাঁটটা টিপলো। একট্‌ ফ্‌লো ফ্‌লো লাগছে। কিন্তু এটা হয়তো জল লাগা নয়। অন্তত আশা করা যাক এটা জল লাগা নয়। ওটাকে স্বভাবই বলতে হবে, অভ্যাস নয়, কারণ এমন নয় যে অনেকবার টেলিফোনে কথা বলে বলে মানময়ীর এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। কথাটা বাংলায় কি হবে কে জানে—অরেটরিক্যাল, ভাষণীয়, মানময়ীর কথাবার্তাও একট্‌ ভাষণীয়।

কিন্তু ও ব্‌দ্‌ব্‌দটা ভেসে ভেসে চোখের আড়ালে চলে গেলো। অন্তত অন্যান্য দিনের হিসাবে এতক্ষণে তা যাওয়া উচিত ছিলো। কতকটা হাল্কা হল্‌দ রঙের এই স্রোতটা সময়ের। ঠিক তাই। বিশ্বাস করো। জানলায় হল্‌দে কাঁচ থাকলে ঘরের আলো যেমন হতে পারে। নিঃশব্দ, নিথর। তা হলেও স্রোত তা বোঝা যায়। সকালের চা থেকে নতুবা দ্‌প্‌রের খাবার ঘণ্টায় কি করে পেঁছানো যায়। কখনও থর থর করে কাঁপে। কখনও ব্‌দ্‌ব্‌দ ফোটে। সেগ্‌লো কখনও ফ্‌টতে ফ্‌টতে ফেটে যায়, দ্‌-একটি অনেকটা দ্‌র ভেসে যায়, কচিৎ একটা ব্‌কশেলফ থেকে, মানময়ীর সেলাইএর কল পর্যন্ত গিয়ে এবার কি একটা টানে মোহিতের চেয়ারের পিছন দিয়ে ঘ্‌রে সামনে এসে পড়ে।

অবশ্য আগেকার দিনে এ অবস্থায় আফিম খাওয়া হতো। এরকম বাত ইত্যাদির বেলায়। আজকাল তা হয় না। উপরন্তু আজকাল বলে সময়ের একটা ব্যাপ্তি বোঝাতে চেষ্টা করলেও আজ আর কালে তফাৎ আছে। একটা নিঃশ্বাস জোরে ফেললো মোহিত। দ্‌প্‌রের খাওয়া আর তারপর বিকেলের চায়ের কাপ ছ্‌ঁয়ে আবার রাত্রির জলযোগে পেঁছানো —তা যদি সত্যি হয় তবে সময়ের স্রোতটা চলছে এটা ব্‌ঝতে হবে, তোমার যতই অন্য রকম মনে হোক। সময়ের হল্‌দ স্রোতটা—

মানময়ী ফিরে এলো। দরজার কাছে রংচটা স্যান্ডালটা খ্‌ললো। ঘরের ঠিক মাঝখানে থেমে দাঁড়ালো, যেন কিছ্‌ বলবেও। কিছ্‌ না বলে কয়েক ম্‌হ্‌র্ত সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরও বেশী বিবর্ণ হতে লাগলো। তারপর ফিরে গিয়ে সেলাই কলের পাশে বসলো।

মানময়ী কাউকে উদ্দেশ্য না করে সাধারণভাবে বললো,—একজন মেয়েমান্‌ষকে আর কেউই তার স্বামীর ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে না যদি সে নিজে না পারে। কালোবরণের মতো কারো সঙ্গে যদি কারো স্বামী মিশে থাকে তবে সে নিজেও খ্‌ব ভালো নয় তা ব্‌ঝতে হবে। ভালোবাসার আগে প্‌র্‌ষের র্‌চিটাকে ব্‌ঝতে পারা উচিত। সে র্‌চিই তাকে কালোবরণের দলে নিয়ে যাচ্ছে। সে র্‌চির একম্‌খ যদি তখন তোমার ভালো লেগে থাকে তবে এখন তার অনাম্‌খ দেখে শিউরে উঠলে হবে কেন?

উ'হ্‌ উ'হ্‌ করে গলাটাকে সাফ করলো মোহিত। কি বলা যায়? কি বলা যায়?

—আর তখনই কি সন্ধ্যাতে বাড়ি ফিরতে? কোন কোন দিন কি রাত বারোটা হয়ে যেতো না তোমাদের? আর তখনই কি বোঝা যায়নি?

কিন্তু ও তো আমাদের মেয়ে, কেমন? তাই নয়? মন্দা?

বরং সেলাইকলের শব্দ শোনা গেলো।

পাইপটাকে আবার হাতে নিলো মোহিত। চেয়ারে বসে বসেই এদিক-ওদিক খুঁজে দেখলো। তামাকের শেষটুকু তার মোড়কসমেত কিছুক্ষণ আগেই পুড়িয়ে ফেলেছে তা জেনেও যদি ভুলে কোথাও এদিকে-ওদিকে একটু পড়ে থেকে থাকে এরকম একটা গল্প বানালো সে মনে মনে। অবশ্য কালোবরণ একসময়ে মোহিতের ঘনিষ্ঠদের একজনই ছিলো। তখন এই নামটাকে তার খুব ভালোই লাগতো। হ্যাঁ, ভালোই। একসঙ্গে ওঠা বসা। গরমের দিনে একসঙ্গে বিয়ার খাওয়া, আর সেবার দার্জিলিং-এ......

খন্ খন্ করে সেলাইকলটা চলছে। যেন টেলিফোনটাই।

আর এই জামাগুলো নিশ্চয়ই নির্লজ্জ—মানময়ী যা গোপনে সেলাই করছে। গোপনে তা বুঝতে পারা শক্ত নয়, কিছুক্ষণ আগেই জামাটা চোখের সামনে মেলে ধরতে গিয়ে মানময়ীর শাদা মুখ কিছু লাল হয়ে উঠেছিলো। আর গোপনেই আনতে হয়। বাজার করার হাতে ঝোলানো বেতের ঝুড়িটার কাগজ চাপা দিয়ে। যেন দশজনকে জানানো চলে না এখনও।

গলা সাফ করলো মোহিত।

—আমাদেরই মেয়ে। আর সে যদি বাপমায়ের কাছে বিশ্রামের জন্যে আসতে চায়? তাছাড়া কালোবরণের হাতে গিয়ে পড়লে -

—স্বামীর পথই মেয়েদের পথ হওয়া উচিত। স্বামী যদি সে পথেই গিয়ে থাকে, রাতে একা বাড়িতে থাকতে ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠলে চলবে কেন? না, কোনমতেই প্রশ্রয় দেয়া চলে না মেয়ের পালিয়ে আসাকে। এরকম ক্ষেত্রে স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে আসা ভ্রষ্টাদেরই সাজে। বরং মেয়েদের কাজ হবে সঙ্গে থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনা যদি তা দরকার মনে হয়।

মোহিত কিছু বলার না পেয়ে চেয়ারের উপরে সামনে পিছনে দুললো। কি অদ্ভুত রকমে শাদা। মোহিতের চাইতে অন্তত পনেরো বছরের ছোট হবে বয়সে। কিন্তু মাথার চুলগুলো একেবারে শাদা। পরনের শাড়ির পারও এত হাল্কা যে শাদা বলে মনে হয়। হাতের শাঁখা দুগাছা, কনুই থেকে আঙুলের ডগা, পায়ের পাতা দুটো বরফের মতো শাদা।

সেলাইএর ঝুড়িটাই টেনে নিয়েছে মানময়ী। আস্তিন পুটে জুড়ে দিচ্ছে। আর শুধু কি তৈরির জামাই। সেই বেতের ঝুড়িটার নতুন কাপড়ের নিচে ব্যবহার করা জামাকাপড়ও থাকে। বিশেষ করে যেগুলি সিল্কের অথবা পশমের। আর সেগুলো কাচা ইস্ত্রি হয়ে আবার ফেরৎ যায়। তখন হঠাৎ কেউ দেখলে, মনে করবে মানময়ী লণ্ড্রি থেকে ফিরছে পথে কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়ি ঘুরে।

অবশ্য কালোবরণ তখন মোহিতের বন্ধুদেরই একজন ছিলো। গরমের দিনে একসঙ্গে বিয়ার খাওয়া। মাঝে মাঝে শিকার। এমন কি একই সঙ্গে সেবার দার্জিলিংএ বেড়াতে যাওয়া পর্যন্ত। সেবার কালোবরণের সঙ্গে তার ভাবী স্ত্রী ছিলো। সেই ছিমছাম পোশাক পরা, ঠোঁট রাঙানো, শ্যাম্পুর দরুণ লালচে হয়ে আসা এককাঁধ চুল হাসিমুখের সেই মেয়েটি। আর কালোবরণ যে কিছু উপমন্ত্রী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই, কারণ এই নির্বাচনটা—

এখন আর কিছু করা যায় না - এই তৃতীয়বার চলছে। সেকেন্ডহ্যান্ডের পরে থার্ড-হ্যান্ড বলে না বটে, কিন্তু বললে তাই হবে ঠিক কথাটা। গভমেন্ট কলেজের পরে প্রাইভেট কলেজ আর তারপরে এখন নেই। সাতবছর হয়ে গেলো আর সাতবছর তার নামের সঙ্গে

এত ধ্লো জমেছে, এত পোকায়কাটা দেখাবে তাকে অন্যদিকে এখন যারা আসছে তারা এত নতুন আর টাটকা যে তাদের পাশে মোহিতের কোন আশাই থাকতে পারে না। বাসি মাছ কি জলে সাঁতরায় আর?

পাইপটাকে হাতে নিয়ে আবার রেখে দিলো মোহিত। রাখতে গিয়ে ঠুক করে একটা মৃদু শব্দ করলো। এক চিলটে তামাকও নেই। কাল হয়তো কখনও সে বেশী খেয়ে ফেলেছে। আর মানময়ী সেলাই করছে দেখো।

এখন আর অদ্ভূত বলার কোন যুক্তি নেই। থার্ডহ্যান্ড কথাটাকে ব্যবহার করতে মোহিতের যতই আপত্তি থাক, অর্থাৎ এক কালের অধ্যাপক মোহিতের, এ কথাটাই লাগসই। পুরনো হলে সব কিছুর মতো মানুষের বাজারদরও পড়ে যায়। আর বিশেষ করে এখন যখন নতুন মালে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে অথচ ক্রেতা নেই। সেক্ষেত্রে, সুতরাং, ইনসিওরেন্স থেকে মাসিক ভাতা ছাড়া আর অবলম্বনের কি থাকতে পারে। আর প্রথম জীবনের অ্যানুইটির সেই মাসিক বরাদ্দটা। অথচ নিদেন দ্বিতীয় দফার সেই প্রাইভেট কলেজের অধ্যক্ষ হতে পারতো মোহিত স্যান এতদিনে।

হলুদ রঙের সেই স্রোতটাই বুককেস থেকে মানময়ীর দিকে, যা তিক্ তিক্ করে বয়ে যাচ্ছে। মোহিত একটু ঝুঁকে পড়ে যেন স্রোতটাকে লক্ষ্য করলো। আর তা করতে গিয়ে তার চোখের কোণগুলোতে চাপা পড়ে থাকবে। খানিকটা জলো জলো কিম্বা ভিজে দেখালো চোখের কোণ।

অবশ্য ইনসিওরেন্সের ভাতায় এই ফ্ল্যাটের ভাড়াটা উঠে যায়। নতুবা এই বইএর আলমারি, আর বুককেসগুলোকে নিয়ে কোথায় যেতে পারতো সে? আর এগুলো—এই মানময়ীকে দেখে বুঝতে পারবে না একদিন আবার আঁচল দিয়ে একখানা একখানা বই ঝেড়ে তুলবে সে নিজেই। এই গোছানোটা তারই। কোথায় যাবে, কোথায়? গ্রামে, না বস্তিতে? এই বুককেসগুলোকে নিয়ে? ফোঁপানোর মতো ছন্দ নয় এই কথাগুলোর?

মানময়ী মুখ নিচু করে সেলাইএর ফোঁড় তুলছে হাতে। মোহিত মুখটাকে একপাশে বেঁকিয়ে শূন্য পাইপের ডাঁটটা চুষলো। তারপর কথাটা যেন মনে পড়লো। বসে বসে হাত বাড়ালো মোহিত। বৃথা আশা নয়। আশার ছলনা নয়। যে কাগজে টিপয়টা ঢাকা তার নিচেই আছে। আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলো মোহিত। খুচরোতে মিলিয়ে প্রায় এক টাকাই। নিঃশব্দে পয়সাগুলোকে সরিয়ে নিতে গেলো মোহিত। কিন্তু একটু শব্দ হলোই।

অথচ মানময়ীর সেলাইএর কলের শব্দ তার চাইতে অনেক জোরালো। তা সত্ত্বেও মানময়ী উঠে এলো। নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো মোহিতের সামনে। কথা না বলে হাত পাতলো। কিছুই ঘটেনি, কিছুই বুঝতে পারছে না এরকম ভান করে পয়সার উপরে মুঠ করা হাতটা সে পিছিয়ে নিতে গেলো। কিন্তু তার আগেই মানময়ী তার মুঠকরা হাতটাকে স্পর্শ করলো। বললো,—কাল বাজার ফেরৎ এসে ওখানেই খুচরো পয়সাগুলো রেখেছিলে। তুলে রাখলেই হবে ভেবেছিলাম। এখন রাখছি, দাও।

মোহিত মানময়ীর প্রসারিত হাতের উপরে ছেড়ে দিলো।

মানময়ী সেলাইএর কলের দিকে যেতে যেতে মাঝপথে থামলো। পুরনো রঙটা বেঁটে লোহার ক্যাবিনেটটা খুললো আঁচলের চাবি দিয়ে। তার মধ্যে থেকে ছোট একটা টিনের বাক্সো বার করলো। পয়সা কয়েকটি রেখে ক্যাবিনেটটা আটকালো আবার।

সেলাইএ বসবার আগে দাঁড়িয়ে মোহিতকে একদৃষ্টিতে দেখলো কয়েক সেকেণ্ড। আর এতক্ষণে মোহিতের কানের কাছে চামড়ার রংটা গাঢ় হয়ে উঠলো।

কালোবরণের সঙ্গের মহিলাটি অবশ্য সুন্দরীই ছিলো। হাতপায়ের গড়ন, শরীরের ডৌল। পোশাক পরিচ্ছদ।

—একটু বেশী যেন, মানে তোমার বন্ধু কালোবরণবাবুর সঙ্গে যে।

—সে তো পুরুষের ভাগ্য।

—একটু বেশী ফাস্ট, পুরুষ-কাড়া। পোশাকটার কথা ভাবো।

—তোমার পুরুষ সম্বন্ধেও ভয় আছে নাকি তোমার?

—ছিঃ। কিন্তু কেমন বেশী আদুরে ভাব নয়। এক্স্ট্রা ফাস্ট নয়?

আরও, কালোবরণ একদিন ম্যালের কোণে এক রেস্তোরাঁয় বিয়ার চুমুক দিতে দিতে বলেছিলো। সবই ভালো। কিন্তু মাইরি আমি হলে অত পবিত্রতা সহ্য করতে পারতুম না, মানে তোমার মতো, অধ্যাপক মোহিত। বলো, ঠিক করে বলো, আচ্ছা, কখনও কখনও কি তোমার একটু অমার্জিত, অশুদ্ধ ব্যবহার পাওয়ার জন্য মন কেমন করে না?

আর অন্য আর একসময়ে কালোবরণ দত্তই বলেছিলো। চিরু রায়ের বউএর সঙ্গে আলাপ হলো। বাস্তবিক ওরকম বউই দরকার। তুমি দেখো চিরু রায় ফরেন সার্ভিসে সড়্ সড়্ করে উঠে যাবে।

মানময়ীর দিকে তাকালো মোহিত স্যান। সেলাই করছে দেখো মাথা নিচু করে। আর...তাতে কিই বা ক্ষতি। সেই এক্স্ট্রা ফাস্ট মেয়েটি এই আঠারো বছর ধরেই কালোবরণের স্ত্রী। সেও স্ত্রী, স্ত্রীই বটে।

ওদিকে অবশ্য কালোবরণ সম্বন্ধে মানময়ীর মন এখনও নরম হয়নি। অপবিত্র, অবিশুদ্ধ, কিম্বা কথাটা সম্ভবত আন্স্ক্রুপুলাস্, মানময়ীর চোখে কালোবরণদের অনেকেই তাই।

এই বুদ্বুদগুলোকে লক্ষ্য না করলেও চলে। কারণ এই হ্রদে স্রোতটা প্রকৃতপক্ষে মানময়ীর সেলাইএর কলের কাছে গিয়ে শেষ হয় না আর বুকসেল্ফের পিছনে এটার উৎসও নয় ঠিকঠাক বলা না গেলেও বুঝতে পারা যায় এটা যখন একেবারে থেমে যাওয়ার মতো তখনও চলে, আর তখনই বুদ্বুদগুলো ফোটে, আর বুদ্বুদ সমেত স্রোতটা মোহিতের চেয়ারের পিছন দিয়ে ঘুরে আবার সামনে চলে আসে। কালও আসবে। যদিও বুদ্বুদগুলোর কোন কোনটা চোখের জলের ফোঁটার মতো, কিম্বা হৃৎপিণ্ডের মতো। আ!

ইতিমধ্যে দুপুরে খাবার সময় হয়ে গেলো এবং তা পার হয়েও গেলো। মোহিতের চেয়ারের সামনে টিপয়টার উপরে লাঞ্চ এসেছিলো। দু-টুকরো রুটি, একটা কলা, কাঁটা-চামচ, এক টিপট চা। মানময়ীও বসেছিলো খেতে। এটা একেবারে বাস্তব ঘটনা, কোথাও ভুল দেখার কিছু ছিলো না। যদি না কলার কথাটা ধরো। সেটাকে মানময়ী লম্বালম্বি চিরে এমন করে সাজিয়েছিলো যে আধখানাকে পুরো একটা মনে হতে পারে।

অবশ্য, আন্স্ক্রুপুলাস্ মানে, মোহিত শূন্য পাটপটা আবার হাতে নিলো, উপায় সম্বন্ধে খুব একটা বাছবিচার নেই। আর সে বরাদ্দের বেশী তামাক খরচ করে ফেলেছে—আনস্ক্রুপুলাস্।

মানময়ী অন্য আস্তিনটা পুটে টেঁকে নিচ্ছে। তা থেকেই প্রমাণ হয় কাঁটা-চামচ, টিপট, প্লেট সরিয়ে রেখে এসেছে সে কোন একসময়ের মধ্যে।

মোহিত সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন স্রোতটাকে দেখলো। কিছু আন্দাজ করলো, বুদ্বুদের মতো কিছু একটা ফুটছে সেখানে। সে বললো, অহ্‌, মন্দা, মানময়ী, আমাদেরই মেয়ে। যদি তুমি......

আর এই স্রোতটাই ভিক্‌তিক্‌ করে চলতে চলতে রাতের খাবার সময়টাকে নিয়ে আসবে। কলাটাকে এমন কৌশলে কেটেছিলো যে তুমি বলতে পারবে না সেটা পুরো একটা নয়।

মোহিত নিঃশব্দে হাসলো। আর একটু হাঁ করে নিশ্বাস নিলো। কপালটা ঘেমে উঠলো যেন। মন্দা যে তারই মেয়ে এ বিষয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই।

কিন্তু এ বিষয়ে কেউই আর তাকে সাহায্য করতে পারে না। সাত বছরে সে একেবারে পুরোপুরি অতীত কালের অংশ হয়ে গিয়েছে। বাসি মাছ জলে দিলে...... ·

আর তখন কালোবরণের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিলো।

—কি শুনেছি? তোমার একটু ট্যাকট্‌ফুল হওয়া উচিত নয় কি, মোহিত?

—ছাত্ররা কি বন্ধু না বউ, যে তাদের সঙ্গে ট্যাকট্‌ফুল হতে হবে?

—তুমি কি এনকোয়ারি কমিশনের সামনে যাবে না?

—আদৌ না, আদৌ না। এর মধ্যে এন্‌কোয়ারির কি আছে? ছাত্র ছাত্র, হুলিগ্যান হুলিগ্যান। হুলিগ্যান হলে ছাত্র থাকে না তারা।

—কিন্তু গভমেন্ট মানে সরকার যদি মনে করে......

—তোমার গভমেন্ট কি আমার চাইতে ভালো ইংরেজি সাহিত্য পড়ায় নাকি? নাকি আমার চাইতে ভালো ছাত্র ছিলো। রাম কহো।

কালোবরণ অবাক হয়ে গিয়েছিলো। আর তা স্বাভাবিকই। সামাজিক বিপ্লবের আশায়, কিম্বা রাজনৈতিক চেতনার নাম করেও হুলিগ্যান হওয়া ছাত্রের পক্ষে দণ্ডনীয় নীতি-বিচ্যুতি মোহিতের এই স্পষ্ট উচ্চারণ করা মত এনকোয়ারি কমিশনও মানে নি। শিক্ষাদপ্তর তাকে বদলি করেছিলো ঘাটশিলায়। ঘাটশিলার স্বাস্থ্য ভালো। কিন্তু. ..

—আচ্ছা, মানময়ী, তোমার কি মনে হয়?

মানময়ী তখন নিচু হয়ে খাটের পায়ার কাছে থেকে এক তিল ধুলো পালকের ঝাঁটায় ঝেড়ে ঝাড়নে করে তুলছিলো। উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এসে হেসে বলেছিলো, —ভাবছো নাকি?

—হ্যাঁ, মানে, এরপর ঘাটশিলায় যাওয়া যায় না, না? ওরা বলছে ঘাটশিলা খুব স্বাস্থ্যকর।

—আচ্ছা, (মানময়ী তখনও সাদা ছিলো, কিন্তু লাল হতো কখনও কখনও গাল) তোমার প্রথম দিকের ছাত্রী মণিমালা—

—ওটা,—

—একই ব্যাপার নয়? ভালোবাসতে তো, কিন্তু বিয়ে করো নি, মণিমালা ইঙ্গিত দিলেও নয়, এমনকি তার গার্জেনরা সকৌতুক প্রস্তাব পাঠালেও না।

—কারণ—দেখো, ছাত্রী কতকটা কন্যার মতো নয়? ছাত্রীকে ভালোবাসতে অবশ্যই হবে কিন্তু ভালোবাসা মেয়ের মতো, বোনের মতো, আই মিন্‌, প্যাশান থাকতে হবে কেন? বিশেষ করে অধ্যাপক তো?

—এ দিকেও দেখো। তুমি তো রেজিগনেশন দিয়েই দিয়েছো। রাজনীতির জন্য হুলিগ্যানদের না ঘাঁটানো দরকার হতে পারে। এই এনকোয়ারিতে মনে হয় না? কিন্তু

ছাত্রীর যেমন অধ্যাপকের প্রতি প্যাশান থাকা উচিত নয়, ছাত্রেরও তেমন...কিম্বা রাজনীতি তো এর আগেও হতো। গোবর্ধন রায়ের কথা ভাবো......

(কিন্তু মন্দা তো আমাদেরই মেয়ে। দু-চারদিন সে আমাদের কাছে এসে থাকতে পারে না? আর হয়তো সে ক্লান্ত।)

আর তারপরই সেই প্রাইভেট কলেজ। এখন অবশ্যই মানময়ীর সেলাই না করে উপায় কি? কোথায় যাওয়া যেতে পারে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে? অন্য কোথায় বলো এই পুরনো বইগুলো নিয়ে?

গোল দুটি বিন্দু মোহিত স্যানের দু চোখের কোন থেকে বেরিয়ে এলো। নুনের মতো স্বাদ লাগলো মোহিতের মুখে।

—আচ্ছা? ও, আচ্ছা!

শূন্য পাইপটাকে বেশ ভালো করেই ধরলো মোহিত, বউল্‌টাকে বাঁ হাতের তেলোতে ধরে ডগাটাকে সামনের দিকে এগিয়ে দিলো। যেন সে বলবে মেটাফিজিক্যাল কথাটাকে এই কবিদের বেলায় কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছিলো—এবার তোমাদের তা বলছি।

খন্‌ খন্‌ করে উঠলো সেলাইএর কলটা। কিন্তু থামলো।

মানময়ী বললো,—তামাক খরচটা একটু বেশী হচ্ছে না? তা ছাড়া এই সপ্তাহে এর মধ্যেই তিনবার বিয়ার খেয়েছো। আর তা বাজারের পয়সা থেকে কিছু বাঁচিয়ে তা আমি ধরে ফেলেছি; বুঝেছো?

মোহিত স্যান চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ যেন কিছু একটা শক্ত হয়ে উঠলো কোথাও।

এখন বাইরে রোদ নেই। ঘরের ভিতরেই বেশ শির্‌শিরে ঠাণ্ডাই। বরং বাইরে রাস্তার পিচ আর দু-পাশের ব্লকের দেয়ালগুলো কিছু উত্তাপ ছড়াতে পারে। ওদিকে প্রেসটা থেকে ডে শিফ্‌টের কাজের লোকরা হয়তো এখন চলে যাচ্ছে। তা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সেই হলদে স্রোতটাও যেন কালচে হয়ে উঠছে। লাঞ্চের পর থেকে দুপুরটা তা হলে পার হয়ে গিয়েছে। মোহিত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো বলেই তা ধরা পড়লো যেন।

একটু পা টেনে হাঁটছে মোহিত। ওটা বাতের ব্যথাই। নিউর‍্যাল্‌জিয়া বলা হবে কিনা কে জানে। এখন পোশাক পরবে সে। কি উপায় বলো তা না পরে? এ ফ্ল্যাট ধরে থাকার মতোই ব্যাপার, যদি তাই বলতে চাও।

আধঘণ্টা পরে মোহিত বেরুলো শোবার ঘর থেকে। ট্রাউজারটা পিন্‌স্ট্রাইপেরই। হাঁটুর কাছে ফাঁপা। সার্টের কলার অনেকটা ফাটা। রিফু তে ধরে রাখতে পারছে না। ডান হাতে বেতের লাঠি ধরে বেরুলো সে পা টেনে টেনে। মানময়ী নিজেই উঠে এলো। পায়ের কাছে বসে একটুকরো ফ্লানেল দিয়ে ফাট ধরে ওঠা জুতো জোড়া ঘসে দিলো।

—আর তারপর সেই প্রাইভেট কলেজ। .

কাদের যেন চিৎকার হঠাৎ শোনা গেলো। যেন খুঁজে পেয়েছে তারা আবার তাকে। সে সময়ে আর একবার দেখা হয়েছিলো কালোবরণের সঙ্গে।

—তুমি ওদের বলো, অধ্যাপক মোহিত, তুমি আমার বন্ধু। আচ্ছা, দাঁড়াও, আমিই বলবো তোমার গভর্নিং বডিকে। কে কে আছে নামের লিস্টিটা দাও। শুধু লিস্টিটা দাও।

—না, না, দত্ত, তুমি কি করে জানলে? আশ্চর্য, আমি তো কাউকে বলিনি। না, না কালোবরণ। তুমি বলো না। না, দত্ত। তুমি বললে হয়তো—এমনকি ছাত্ররাও হয়তো,

কিন্তু বলো না।

ফুটপাতে এখন ভিড়। কিন্তু একেবারে ধার ঘেঁষে পা টেনে টেনে চলা যায়। (তা ছাড়া, মন্দা তো আমাদেরই মেয়ে। মন্দা তো আমাদেরই মেয়ে।) একটা জোরে নিঃশ্বাস পড়লো মোহিত স্যানের।

সেদিন সন্ধ্যায় স্তব্ধ হয়ে বসেছিলো মোহিত স্যান।

মানময়ী বলেছিলো,—কি ঠিক করলে?

—ঠিক তো করতেই হবে আর আজই তা। এই সন্ধ্যা থেকে কাল সকাল পর্যন্ত সময়। প্রিন্সিপ্যাল বলেছেন : জীবনে অনেক কম্প্রোমাইজ করতে হয়। অনেক নীতিকে ছাড়তে হয় অন্তত সাময়িকভাবে।—কারণ জীবন একটা বায়োলজিক্যাল ব্যাপার। নীতিগুলো তৈরি করা জিনিস, তার মূল্য আপেক্ষিক। তা ছাড়া গভর্নিংবডির এটা একটা ব্যবসাও বটে এই কলেজ। প্রায় প্রাইভেট লিমিটেড। আর ছাত্ররা এখানে—। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিলেন—ওরা এখানে অনেক কিছু করে যা ছাত্র না হলে করতে পারতো না। মানে অন্য কেউ হলে আইন...যাক সে কথা, ভেবে দেখো।

মানময়ী আবার বললো,—কিছু একটা ঠিক করে ফেলো। চায়ের কাপটা এগিয়ে দিলো সে।

—অন্যান্য অধ্যাপকরা ছাত্রদেরই সমর্থন করছেন। বলছেন সকলেরই সংসার আছে মশাই। কালোবরণ অবশ্য—

—কালোবরণ?

—হ্যাঁ। সেই। সে সাহায্য করতে পারে।

—কালোবরণ? মানময়ী যেন চমকে উঠলো। না, না। তুমি ভেবে দেখো। আমি জানি না হয়তো। কিন্তু তুমি ভেবে দেখো।

—তাকে তুমি অবশ্যই পছন্দ করো না। কিন্তু তার কিছু প্রভাব আছে।

—আণ্ডার ওয়ার্লড বলে একটা কথা আছে না? তুমি কি আজকাল ভুলে যাচ্ছ। তুমি বরং নিজেই ঠিক করো। সেবার রেজিগনেশন দিয়েছিলে। ঘাটশিলায় বদলি হওনি।

—এবার তা দেবো না ভাবছি। এবার ওরাই অপরাধটা করুক।

আর তখন মানময়ীর সাদা রং আরও সাদা হয়ে উঠেছিলো যেন।

—হ্যাঁ, তাই করুক। বরং অন্যায়টা ওরাই ঘটাক। মানময়ী মৃদুমৃদু হাসতে চেষ্টা করেছিলো।......

কিন্তু—

মাটির উপরে লাঠির চাপ দিয়ে চলতে চলতে শূন্যাস্থিত এই 'কিন্তু' শব্দটাকেই যেন শুনতে পেলো মোহিত। কিম্বা শুধু শুনতে পাওয়া নয়। চোখে পড়লো, চোখ পুড়িয়ে দিলো। জল দেখা দিলো চোখে।

কথাটা কি আণ্ডার ওয়ার্ল্ড? মোহিত ত্রিকোণ পার্কের দিকে এগোতে এগোতে ভাবতে চেষ্টা করলো। তার অ্যাকাডেমিক মন হঠাৎ একটা তুলনা আবিষ্কার করতে পেরে একই সঙ্গে খুশী আর বিস্মিত হয়ে উঠলো। কথাটাকে সাবকনসাসের মতো সাবওয়ার্লডও বলা যায়, অবরপন্থী। একই রকম নয়? কেমন একটা দুঃসহ রুগ্ন হিংস্রতা নয় দুয়েরই। রাজনীতির অনেক কিছুই কি এই অবরপন্থীর সিদ্ধান্ত, আমাদের আচরণ যেমন অবচেতন মানসের নির্ধারণ?

মোহিত মুখ তুলেছিলো যেন আকাশ থেকে অনেকদিন পরে কিছু পান করবে। কিন্তু যা আলোর মতো মিটমিট করে জ্বলে উঠেছিলো তা তখনই নিবে গেলো। বরং সেই সম্বন্ধে তিক্ তিক্ করে চলা স্রোতটাই। বরং বেশ একটা ঝাঁকুনি খেলো সে বাথাধরা পায়ের গাঁটে। ফুটপাতের ধারে এসে পড়েছিলো সে। লাঠিটা পথ ছুঁতে পেরে ঝোঁকটা সামলেছে বটে কিন্তু ঝাঁকুনিটাকে শুষে নিতে পারে নি।

ত্রিকোণ পার্কের ভিতরে ঢুকলো মোহিত স্যান। গেটের পাশে পুলিশ কনস্টেবলটি যেন তাকে দেখে হাসলো। মুখটা বেশ চেনা। হয়তো মোহিতকেও চিনে ফেলেছে সে এতদিনে। প্রায়ই হয়তো এই সময়ে এ জায়গাটায় ডিউটি পড়ে তার। কিম্বা......

এ জায়গাটায় কাগজওয়ালারা কেন কাগজ সাঁটে কে জানে? ত্রিকোণ পার্কে এখনও যারা আসে তাদের সুবিধার জন্যই হয়তো। ডিউটিতে দাঁড়িয়ে কাগজ পড়া উচিত নয়। কনস্টেবলটি সেই অন্যায় কাজে ধরা পড়ে অমন হেসে থাকবে।

—কি খবর? মোহিত বললো। মোহিতের ফ্ল্যাটে বেশ কিছুদিন থেকেই কাগজ যাচ্ছে না।

কনস্টেবল বললো,—নির্বাচন। তার খবরই দেখছিলাম।

—এদিকে তো গোবর্ধন রায়ই—

—ঠিক এ সময়েই একটা তদন্তর কথা উঠেছে তার বিরুদ্ধে।

খবরের কাগজ থেকে পড়লো মোহিত সেন। যেন তা শুধু কনস্টেবলকে প্রশ্রয় দিতেই। কনস্টেবল কথা বলেছে এটা হয়তো তার অনুমান। আশ্চর্য কালোবরণ থাকতে গোবর্ধনের—ও, হ্যাঁ তাইতো এবার তো কালোবরণই দাঁড়াচ্ছে নিজে এদিকে।

পার্কের একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলো মোহিত স্যান।

আশ্চর্য! অথচ কালোবরণই ছিলো গোবর্ধনের ডান হাত। এমন কি, এমন কি, তাকেও, মোহিত স্যানকেও, বলেছিলো দু-একবার গোবর্ধনের নির্বাচনের ব্যাপারে মাথা লাগাতে। আর এবার কালোবরণ নিজেই মন্ত্রীই হবে হয়তো। কিম্বা হয়তো ডেপুটি হুইপ।

কিছুক্ষণ আগে যেমন একটা ছোট অ্যাকাডেমিক আলো জ্বলে উঠেছিলো একমুহূর্তের জন্যে তেমনি আবার কিছু একটা ফ্যাস করে রেগে উঠলো মোহিতের মনে। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। চারিদিকে চাইলো সে ভয়ে ভয়ে যেন রাগটাকে ঠিক কোথায় লাগিয়ে দেয়া যায় তা খুঁজে পাচ্ছে না, অথচ দুহাতে কতক্ষণই বা তাকে বয়ে নেয়া যাবে!

পার্কের দক্ষিণে সরু নির্জন গলি, তার ওপারে শ্যাওলা-ধরা মেটে রঙের একসারি বিশ্রী উঁচু উঁচু বাড়ি। আর উত্তরের ট্রামটা গোঁ-গোঁ করে চলে গেলো বড় রাস্তা ধরে। এমন হতে পারে যে মানময়ী নিজেই আমেরিকান বিয়ারের টিনের কৌটাগুলোর একটা আজ কিনে নিয়ে যাবে, আর এক পুরিয়া তামাকও হয়তো। তা হলেও... ..

—গোবর্ধন রায়কেই তুমি রাজনৈতিকদের মধ্যে পছন্দযোগ্য মনে করতে, তাই না, মানময়ী? আর এখন দেখো। দেখো না, ভালো করেই দেখো। আর কাগজে ছেপেছে তদন্তর কথা আর তুমি এটাও অস্বীকার করতে পারবে না যে মন্দা আমাদেরই মেয়ে। গোবর্ধনকে বিশুদ্ধ ভাবতে?

(হ্যাঁ মন্দা আমাদেরই মেয়ে আর একমাত্র।) এদিকে এই কনস্টেবলও ডিউটিতে দাঁড়িয়ে কাগজ পড়ার মতো অন্যায় করে থাকে।

বড় রাস্তার গ্যাস জ্বলে উঠলো। তার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিকোণ পার্কটাতেও কি একটা

টিক্-টিক্ করে উঠলো। বেশ কালো রঙের এই স্রোত। এখন এই স্রোতটা বইতে সুরু করবে। যদিও হয়তো বুদ্বুদ নেই। বুঝতেই পারা যায় বুকেসেলফ্ আর মানময়ীর সেলাই-এর কলের মাঝে যে স্রোত এটার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।

মোহিত স্যানের দুচোখ থেকে দুই দুই করে চার ফোটা জল বেরিয়ে এলো। কি বাধা যেতো পারে, তাই নয়? কিন্তু গোবর্ধন রায়ের সম্বন্ধে যদি তদন্ত হতে পারে তা হলে......

মন্দা তো আমাদেরই মেয়ে। আর নিরঞ্জন হয়তো কালোবরণের লেফ্টানেন্ট। গোবর্ধন রায়ের রাজনৈতিক ব্যাপারে যদি......

মন্দার স্বামী কালোবরণের ক্লাবেই হয়তো রাত কাটায়......গোবর্ধন রায়ের এই ব্যাপারই প্রমাণ করে না ঠিক শক্ত স্থায়ী কিছু না থাকতে পারে? হয়তো মান বদলে যায়।—আর মন্দার স্বামী হয়তো কালোবরণের নির্বাচনে কাজ করছে। আর মানময়ী ভালো করে দেখো তোমার হিসাবে, মানে গোবর্ধন রায় সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা তা শক্ত থাকছে না। তেমন বিশুদ্ধ ছিলো না হয়তো গোবর্ধনের রাজনীতি। আর দেখো যাকে আন্ডারওয়ার্লড বলতুম তা হলে সেটা প্রকৃতপক্ষে সাবকন্‌শাসের মতোই।

মোহিত উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু—

অনেকক্ষণ ধরে, অনেকটা দীর্ঘ একটা ক্ষণকে ধরে, এই শব্দটা যেন আকাশের ছাই রঙের মেঘের মতো, যেন তার থেকেই ঝুলে রইলো। বড় রাস্তার গ্যাসগুলো যেন মুখ নিচু করে লক্ষ্য না করার ভান করছে।

বাঁ পায়েই জোর কম পাচ্ছে মোহিত। বাঁ হাতে লাঠি ধরে তার উপরে ভর রেখে রেখে বড় রাস্তাটা পার হলো সে।

এক শ' গজ চলতে চলতেই মোহিতের মনে একটা আলাপ তৈরি হলো।

· ভালো আছো তো? এই পথে যেতে যেতে মনে হলো দেখে যাই তোমাকে। মন্দা আমাদের একমাত্র মেয়ে। আর সে জনাই আমরা এতো ইন্টারেস্টেড্, নিরঞ্জন।

··না, না, কি বলো। এরা তোমার বন্ধু, বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি মানে যাকে বাড়ি বলতে পারো।

(এই জায়গায় মোহিত খুব জোরে জোরে হেসে উঠবে)

একটু হাঁ করে দম নিলো মোহিত স্যান নিজের অজ্ঞাতেই। আর গোবর্ধনের ব্যাপারটার পরে, আমি এখন বলতে পারি তোমাদের কাছাকাছি আমারও যাকে বাড়ি বলা যায় এমন কেউ আছে। যেমন ধরো কালোবরণ।......

আর, মানময়ী, দেখো তোমার ধারণা ভুল হতে পারে। না, না ভেবে দেখো যদি একবার। গোবর্ধন রায় কেমন একটা ধারণা বদলে দেয় না? হয়তো স্বজন পোষণ কিম্বা আমি জানি না।

কালোবরণ তার ক্লাবে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সে বলবে: এতদিনে তুমি এলে অধ্যাপক মোহিত।

আর সে বলবে: এতদিনে সময় হলো।

আর কালোবরণ বলবে: এখন কি পারবে?

আর সে বলবে: কি যে বলো তুমি! আমাদের ও রকটা তো বটেই, পাড়াটাই বলতে পারো। খুবই আশা রাখি আমি...ঠিক করে দেবো। গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে ওদিকে রেল লাইন।

আর তারপর কালোবরণ জিভে টাকরায় চ্‌ব্‌ চ্‌ব্‌ করে বলবে : তুমি সেবার গভার্নিং বডির নামের লিস্টি দিলে না। চ্ব চ্ব!

একটা কিছু ভাঙলো যেন। খালি কাচের অ্যাম্‌পিউল পায়ের নিচে পড়লে যেমন শব্দ আর অনুভূতি হয়। পা সরিয়ে ফুটপাতের উপরে লক্ষ্য করলো মোহিত স্যান। কোথায় তবে? কোটের বোতামের উপরে হাত রাখলো সে। লাঠিটা বাঁ হাতে ধরা ছিলো বলেই সুবিধা হলো। ডান হাতের দুটো আঙুল বোতাম সারির নিচে গলিয়ে দিয়ে সার্টের উপরে বুলিয়ে দিলো। তাছাড়া শব্দটা অ্যাম্‌প্লিফাই করলে হয়তো কান্নার মতোই শোনাবে। ঠোঁটের কোণগুলো কাঁপলো মোহিতের।

...এটাই কালোবরণের ক্লাব। ক্লাবের ঘরে ভাগ্যপরীক্ষার স্লটমেশিনের সামনে সুবেশ যুবকদের ভিড়। আর ওইতো দেখো তাদের একমাত্র, মানে জামাতা, নিরঞ্জন। যদিও সে অ্যাড্‌ভোকেট। ঠিক অন্যান্য যুবকদের মতোই নয়? তেমনই পোশাক। আর এরা হয়তো ছাত্রই। মোহিত একটা আঙুল তুলে সেটাকে সামনে পিছনে দুলিয়ে নিঃশব্দে হাসলো। যেন বললো, এই দেখো এবার আমিও এসে পড়েছি। কেমন পারবো মনে হচ্ছে না? আর এ ঘরটার পাশেই কালোবরণের অফিস ঘর। এখানেই কালোবরণ। কিছু বদলেছে কি শেষবার দেখা হওয়ার পর থেকে? উঁচু কলারের মধ্যে মোটা ঘাড়টা ঘুরিয়ে কালোবরণ হাসলো। একটু মোটা সোটা হয়েছে যেন আগের চাইতে, কিন্তু হাসিটি একটুও বদলায় নি। তার চারিদিকে চার পাঁচজন সুবেশ ব্যক্তি। হয়তো একটু চোয়াড়ে চেহারা। কি একটা বিষয়ে তারা পরামর্শ করছে যেন। কালোবরণের সামনে ট্রের উপরে হুইস্কির গ্লাস। অধ্যাপক মোহিতের এরকম মনে হলো এই সুবেশ ব্যক্তি কয়েকটিকে প্রায় পালোয়ানের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু তার এই দেখাই কি ভুল নয়? সে হাসলো, প্রায় শোনা যায় না এমন নিচু গলায়, কিন্তু অত্যন্ত আগ্রহে যেমন তাড়াতাড়ি হতে পারে তেমন করে সে বললো : আমি এলাম কালোবরণ, তোমার কাজে লাগাও। আর সত্যি বলছি ভাই আমার দিন চলছে না। অন্যকে যা দাও, তার চাইতে অনেক কমেই আমি রাজি। অনেক কমে। আর কাজও আমি অনেক বেশী করবো। কোন কাজে ফাঁকি না দেয়াই অভ্যাস আমার—অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারটা মনে আছে তো।

কালোবরণ বললো, —তারপরই তো তুমি ভুল করলে।

মোহিত বললো,—হ্যাঁ, তা তো আমাকে দেখেই বুঝতে পারছো।

কালোবরণ হেসে হেসে বললো,—আর তোমার সেই পবিত্র বিশুদ্ধ স্ত্রী। সেই শ্বেতপরী?

মোহিত সাহস করে বললো,—এবার তুমি দেখো কালোবরণ। বেশ বলেছো কথাটা শ্বেতপরী।......

ফুটপাতের উপরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো মোহিত স্যান। ডোভার লেনই বটে। লাঠিটায় ভর দিয়ে দাঁড়ালো। এদিক ওদিক দেখলো। কি করে জানলো সে এখানে কালোবরণের ক্লাব? ও হ্যাঁ, মন্দা বলছিলো। আর তা ছাড়া, তাকে এখানে ব্যাটাছেলের মতো কাজ করতে হবে। কে যেন কাউকে শ্বেত কি একটা বলছিলো। কিন্তু সেটা কিছু আসল ব্যাপার নয়।

বাড়ির সামনে খান কয়েক গাড়ি। গাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে গলিয়ে মোহিত সামনের ঘরটায় ঢুকে পড়লো। রাস্তার সামনের ঘর বটে কিন্তু ইতিমধ্যে আলো জ্বালাতে হয়েছে। সেই নীলাভ আলো যাকে নিওন বলে। কিন্তু—যেন একটা রেস্তোরাঁ। বেশ কয়েকজন

অল্প বয়সী, মাঝবয়সী। ভিন্ন ভিন্ন টেবলে। ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে কারা একটা আলোচনাও করছে। ওদের ওই ওটিকে নিরঞ্জনের মতো লাগছে না? কাকে চাই, একজন দরজার পাশে থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু মোহিত কিছু বলার আগেই কালোবরণ এসে গেলো। এখানে দৃষ্টিগুলো যে খুব তীক্ষ্ম আর দরজার দিকে তাতে সন্দেহ নেই। কালোবরণই আস্তিন ধরে টেনে কাঁধে হাত রেখে একটা টেবলে বসিয়ে দিলো তাকে।

মোহিত বললো,—কালোবরণ আমিও এলাম, মানে—

কালোবরণ দত্ত বললো,—বসো, বসো। ওদিকে একটু হাত বাড়িয়ে আঙুল তুলে কি ইঙ্গিত করলো সে।

কালোবরণ যে এবার এম. এল. এ এমনকি অন্তত একজন উপমন্ত্রী হতে যাচ্ছে।

—একি, হুইস্কি! মোহিতের চোখ চক্‌চক্‌ করলো, জানো কালোবরণ, বুঝতেই পারছো, মানে অ্যাম্‌ ইন্‌ সার্চ অব এ জব্‌। আর তা ছাড়া নিশ্চয় আমার এফিশিয়েন্সিতে তোমার সন্দেহ নেই।

—হবে, হবে। এসো।

কিন্তু ওদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে কালোবরণকে। যারা আলোচনা করছিলো দাঁড়িয়ে তাদের দিকে সে সরে গেলো।

মোহিত গ্লাসে প্রথম চুমুক দিয়ে ভাবলো, আর এদিকে দেখো প্রায় একটা পুরো বোতল। সে হাসলো খুঁত খুঁত করে। কালোবরণের আর্থিক জোরটা দেখো। মোহিত হাসলো। যেন সে জোরটা তার গায়েও ঢুকছে চিন্‌ চিন্‌ করে। আর সেই আলোচনা থেকেও পাশে মুখ বাড়িয়ে কালোবরণ বললো, একটু ব্যস্ত আছি, বুঝলে? বসো, বসো। চালিয়ে যাও।

দ্বিতীয় তৃতীয় গ্লাসের দু-তিন চুমুকেই কথাটা অর্ধেক তৈরি অবস্থায় দেখা দিলো, দীক্ষিত, মানে, মানে ইনিসিয়েটেড্‌। আর তখন মোহিতের মুখটা হাসি হাসি দেখালো। আর এ দুটো স্যান্ডুইচ্‌ও বটে। আর তোমরা যারা চোরা চোখে দেখছো তারা হয়তো জানোই না কালোবরণ কতদিনের পরিচিত। মানে এতদিন, মানে শ্বেতপরী যদি...গ্লাসটা একবারে গলায় ঢেলে দিলো মোহিত......ড্যাম্‌......স্ন্যাকস্‌ আর বোতলটা তারই জন্যে।

হাঁ করে করে একটু নিঃশ্বাস নিলো মোহিত স্যান। কাচভাঙার শব্দ হলো যেন। না তার টেব্‌লে ভাঙেনি। অন্য কোথাও, অন্য কোথাও। কেউ হয়তো টোস্ট করতে গিয়ে মেঝেতে ফেলেছে। হিয়ার্স টু কালোবরণ...ড্যাম্‌!...উঠে দাঁড়ালো মোহিত। বিড়বিড় করে বললো—কালোবরণ রাজ্যপাল হবে এটা আমি চাই, আর তোমরা জানো না সে আমার কত-দিনের বন্ধু। সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো সে। বরং বসে পড়ে আবার গ্লাস ভরলো কাঁপা কাঁপা হাতে।

তখনই কালোবরণ এলো। টেবলে হাত রেখে একটু ঝুঁকে দাঁড়ালো। আমরা এখন একটু বেরুচ্ছি। বুঝতেই পারো, সময়টা ব্যস্ত যাচ্ছে। মোহিত উঠে দাঁড়ালো। একটু টলতেই হচ্ছে তাকে। তা, কালোবরণ, দেখো এই প্রথম, মানে ইনিসিয়েশন্‌। বুঝতেই পারছো, কিন্তু দেখে নিও।

কালোবরণ অবশ্যই বুঝতে পারে।

দুজন দুপাশে এসে দাঁড়ালো মোহিতের। বগলের তলায় হাত দিয়ে মোহিতকে আশ্রয় দিলো। দরজার সামনে এসে একটু ইতস্তত করলো। একটা ট্যাক্সি এসে পড়ায় সুবিধা হলো।

দরজা খুলে ট্যাক্সির অস্পষ্ট অন্ধকারে বসিয়ে দিলো মোহিতকে তারা।

—আর দেখো কালোবরণ সবই, মানে, মানে...জীবনের অনেক কিছুই—

কালোবরণ হাসি হাসি মুখে পাশ পকেট থেকে একমুঠো নোট তুলে মোহিতের ট্রাউজারের পকেটে গুঁজে দিলো। সিগারেট? একটা প্যাকেট মোহিতের হাতে গুঁজে দিলো।

—আপাতত—

—হ্যাঁ আপাতত। ব্যস্ত হয়ে অন্যদিকে যেতে যেতে কালোবরণ বললো।

ট্যাক্সিটা ছাড়লো। তখন বিড়বিড় করে বললো মোহিত স্যান,—দেখো কালোবরণ তুমি দেখে নিও।......

ট্যাক্সিটা দ্বিধা করছে না। কেউ হয়তো ঠিকানাটা বলে দিয়েছে। কিন্তু যদি ভেবে থাকো তোমরা এখনই অধ্যাপক মোহিত স্যান এই প্রথম সন্ধ্যাতেই বাড়ি ফিরছে তা হলে সেটা ভুল। ড্যাম্...। অবশ্য ভুল...হ্যাঁ, তা...আর এর আগেও কেউ কেউ করেছে। সিগারেট ধরালো মোহিত। জলন্ত কাঠিটা একটু অসুবিধা সৃষ্টি করলো বটে। প্যাকেটটাকে উল্টে-পাল্টে দেখলো। মিটমিট করে হাসলো।

কেমন একটু মিস্টিরিয়াস্ নয়? আর কেউ যেন বলেছিলো শ্বেত, হ্যাঁ শ্বেত, নিশ্চয় শ্বেত, আর শ্বেতপরীই বটে। এই কালোবরণদের ব্যাপার কেমন মিস্টিরিয়াস নয়। সাব-কনশাস্ নাকি কথাটা।

—কি করি বলো? অধ্যাপক মোহিত বললো।

—তুমি তো পদত্যাগ করছো? তাইতো স্থির করেছো তুমি?

—ওরা, মানে, টিচার্স কাউন্সিলের ওরা বলছিলো ক্ষমা চাইতে হবে না, ভুল স্বীকারও করতে হবে না। ছাত্ররা কি করেছে—মানে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা থেকে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে রাখলেই একসময়ে মিটমাট হয়ে যাবে।

—মিটমাট, মানে কম্প্রোমাইজ্?

—হ্যাঁ মানে, ঘাটশিলার কথাও উঠেছে—

—তুমি কি বলো?

—ছাত্ররা অছাত্রীয় ব্যাভার করে—

—চোখ সরানো যায় না, তাই নয়?......

আর তখন তাকে কি সাদাই না দেখাচ্ছিলো, যেন সেই তখনই সাবান দিয়ে মুখ আর হাত ধুয়ে এসেছে। এমন কি কানের ফুলটাতেও সাদা পাথর! শ্বেতপরীই। তাছাড়া আর কি? পদত্যাগই করেছিলো মোহিত, নিঃশব্দে স্বাস্থ্যকর স্থান ঘাটশিলায় যাওয়ার চাইতে বরং পদত্যাগ।

আর স্ত্রী বটে কিন্তু তখনও বিশুদ্ধরীতির ব্যবহার—

হঠাৎ যেন রহস্যটা কেটে গেলো। হ্যাঁ অধ্যাপক মোহিত স্যানের জীবনরহস্য। ঘামতে শুরু করলো সে। হ্যাঁ, বিন বিন করে কপালে ঘাম ফুটছে। আতঙ্কে তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো। কিংবা কথাটা পরী নয়, ডেভিল, উইচ্।

হোয়াইট্ ডেভিল। আর তার পরেও, দেখো,—তার সমস্ত জীবনকে গ্রাস করে শুষে নিয়ে, দেখো, যেন সাদা ধোঁয়া থেকে উঠে আমাকে দেখো, সেই সেলাইকলের পাশে বসে থাকা। যাকে মানময়ী বলা হয়।......

—পদত্যাগ করতে চাইছি না এবার।

—হ্যাঁ, তাই হ'ক, ওরাই অপরাধটা করুক বরং।...

আর তারপরই এই ফ্ল্যাটে।

...হঠাৎ যেন সিঁড়ির উপরে থমকে দাঁড়ালো অধ্যাপক মোহিত। আর সে অনুভব করলো তার পাশ দিয়ে তার থমকে দাঁড়ানোকে গ্রাহ্যে না এনে আর কেউ ছায়ার মতো উঠে গেলো তার শরীর থেকেই। তারপরই এই ফ্ল্যাটে তার সেই আত্মাকে রোজ শুষে নিচ্ছে, আর যত তা নিচ্ছে ততই নিজে শুষে নেয়া সাদা হতে পারছে। সমস্ত শরীর ঝাঁকি দিয়ে নাড়ি থেকে বমি উঠে আসছে যেন। কিম্বা একটা দারুন কোঁপানি।

দাঁড়াও ওখানেই দাঁড়াও, অ্যারেস্ট্ দি উইচ্। লাঠিটা তুললো মোহিত স্যান। বিন্দু বিন্দু করে ঘাম দেখা দিলো তার হাত দুটোতেও। দেখো, দেখো, লুক্, লো, হাউ সে উই! সেলাইএর কলটার পাশেই উঠে দাঁড়িয়েছে দেখো। টেক্ এনি শেফ্ বাট্ দ্যাট্। টেক্ এনি শেফ্ বাট্ দ্যাট্।

হঠাৎ মনে পড়লো মোহিতের ট্রাউজারের পাকেটে গোঁজা নোটের বাণ্ডিলটার উপরে। এটাকেই সামলানো দরকার আগে। নতুবা, নতুবা এখুনি ওটা সেই সেলাইএর পয়সা রাখা যা থেকে একটা দুটো করে সংসার চালানোর পয়সা বার হয় সেখানে গিয়ে উঠবে, আর তুমি মোহিত স্যান যে শুধুমাত্র দলে যোগ দিতে চাও এই আভাস দিয়েই এতগুলো নোট উপার্জন করেছো তার তামাক কেনার পয়সাও থাকবে না।

—আর এগিয়ো না। আমার হাতে লাঠি আছে। উইচ্। অনেক শুষেছে। আর মন্দা আমার একমাত্র সন্তান—তাকেও। দাঁতে দাঁত ঘষে বললো মোহিত। যেতো না কম্প্রোমাইজ করা? যেতো?

—তুমি মদ খেয়েছো, ছিঃ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর ছিঃ নয়। আর এই দেখো কালোর টাকা এই পকেটে বোঝাই। পকেট থাবড়ালো মোহিত।

—টাকাগুলো দাও।

—বাঃ, বাঃ, এ রকমই হবে। কিন্তু আর এক পা এগোবে তো—

—মারবে? মাতাল হয়েছো?

—হ্যাঁ, তবে জেনে যাও দু-একটা গ্লাস হুইস্কি খাওয়ার শখ এবং পয়সা দুই-ই ছিলো একসময় অধ্যাপক মোহিত স্যানের। কিন্তু মারবে? ওহো, মারবে?

হঠাৎ চোখে জল এলো মোহিতের।—তুমি, তুমিই আমাকে শুষে নিচ্ছ। লুডিক্রাস্। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

কিছু একটা ভাঙলো। গুঁড়িয়ে গেলো। হাতের লাঠিটার গায়ে কি রক্ত মাংসে আর চুলে জড়ানো খানিকটা রক্ত। আর সেলাইকলটার পাশেই ওই সাদা স্তূপটা, ওটাই, ওটাই।

ট্যাক্সি করেই পালাতে হবে। ...

·এই রখো রখো

ট্যাক্সিড্রাইভার মুখ ফেরালো।—রখো।

ট্রায়াঙ্গুলার পার্কটাই বোধ হয় সামনে। ওই যে কনস্টেবলটা দাঁড়িয়ে আছে। একটা এলোবি দরকার। এখানেই নামবো আমি, এখানেই।

মোহিত তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে কনস্টেবলটার পাশে দাঁড়ালো। সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে ধরলো।

বেশ জোর দিয়েই বললো মোহিত,—লজ্জা কি, হ্যাভ্ এ ক্যাপ্। সেই তুমি দাঁড়িয়ে আছ, আর সেই আমি ওদিকের বেঞ্চটায় ঠায় বসে আছি। কেমন কিনা?

কনস্টেবল কি বিস্মিত হলো? আর সেই বিস্ময়েই যেন অধ্যাপক মোহিতের ঘোরটা কেটে গেলো। কিম্বা ট্র্যামটা এখানে একবার ঘটাং করে উঠলো বলে।

মোহিত বিড়বিড় করে বললো...হুজ্ মার্ডার ইজ্ ইয়েট্ বাট্ ফ্যান্টাস্টিক্যাল। নরহত্যা যার কল্পনা মাত্র।...ট্রাউজারের পাশ পকেটের উপরে চাপড়ে দেখলো। হুঁ, হ্যাঁ, একটা বাণ্ডিলই তো সেখানে, বেশ মোটাই লাগলো হাতে। একেবারে বিস্মিত হয়ে গেলো মোহিত স্যান্। তার চোখের তলার জলের থলিগুলো যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো। সে অনুভব করলো কনস্টেবলটির হাত টেনে নিয়ে যেন বুকের উপরে রাখা দরকার, যেন কেউ হাত বুলিয়ে দিলে কমতো কমতো সেখানে যা হচ্ছে সেখানে যা হচ্ছে।

কনস্টেবল বোধ হয় কিছু শুঁকলো। মৃদুস্বরে বললো, বাড়ি যান, বাড়ি যান।

মোহিত হাঁটতে শুরু করলো। একটা অ্যালেবি দরকার, অ্যালেবি একটা, অ্যালেবি। সেই ঘাটশীলা, কিম্বা প্রাইভেট কলেজ, কিম্বা হয়তো তার আগেকার কবেকার সেই প্রথম জন্মদিন থেকে সব কিছুকে অস্বীকার করার অ্যালেবি দারুণ একটা......

রাসবিহারী এভেনিউতো বটে। আর এখন বেশ খটখটে সন্ধ্যা। এখন বেরোনরই সময়। অনেক লোক চলছে ফুটপাতেও। একটু টলছে নাকি, সামান্য একটু, তার পা দুটো? আর কি আশ্চর্য পকেটে ভারই লাগছে।

গড়িয়াহাটার মোড়ের কাছে বেশ ভিড়। আর কি কষ্টই হচ্ছে বেতো পায়ের উপরে হাঁটতে। দু দু ফোঁটা জল যেন মোহিতের চোখে আবার। ওই পুরনো বইগুলো নিয়ে সেই ফ্ল্যাট ছাড়া আর কোথায় বা যেতে পারে?

বাসি মাছ, কে যেন বলেছিলো। আর ওটা ঠিক স্রোতও নয় যা বুকসেল্ফ থেকে মানময়ীর সেক্সাইকল পর্যন্ত ভিক্ ভিক্ করে চলে।

লেখকের মন্তব্য : এ জায়গাটায় এসে অধ্যাপক মোহিত স্যানকে হারিয়ে ফেললাম। চৌমাথার চার রাস্তাতেই দেখলুম, কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না। এই রাস্তাগুলো দেখো তেপান্তরের রাস্তার মতো কত দীর্ঘ। আর কি ভিড়। এই স্রোতেই কোথাও তলিয়ে যাওয়া যায়। অনুমান করি দুই বাড়ির কোন খাঁজে, বা কোন বাড়ির সিঁড়ির পাশে বসে পড়েছে। মাঝপথেই হারিয়ে গেলো।

এজরা পাউণ্ড : দু'একটি কথা

শিশিরকুমার ঘোষ

এজরা পাউণ্ডকে নিয়ে পূর্বের উচ্ছ্বসিত মত্ততা প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছে। সেই বিদগ্ধ, বিচিত্র ও বিতর্কিত জীবন ও কাব্য আর নব্যতন্ত্রের মধ্যমণি নয়। জীর্ণ, রণক্লান্ত, মর্ত্ত এ আয়ুর সীমানায় আজ সেখানে ম্লানিমার ঘন আবরণ। দীর্ঘকাল যাবত আন্তর্জাতিক শিল্পীমহলে এই মেজাজি গৃহত্যাগী—পরে দেশদ্রোহী—সাহিত্যিক নানাবিধ পসরা নিয়ে ফিরেছেন, শেষ বিচারে তার কতটুকুর স্থায়িত্বের গৌরব তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই তো নিয়ম। তাঁর প্রচলিত পরিচয় হয়তো যথার্থ বা শেষ পরিচয় নয়। এযাবত যে সকল কাব্য ও শিল্পরীতির, জীবনায়ন ও বিচিত্র মতবাদের সপক্ষে তিনি ফতোয়া দিয়ে এসেছেন, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নানাবিধ উৎসাহী পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কবিকুলের স্ব-নির্বাচিত স্কুল-মাস্টারি চালিয়ে এসেছেন তা অবশ্যই ঐতিহাসিক ও গবেষকের খোরাক জোগাবে। মনে হয় তিনি স্মরণীয় হবেন হয়তো অন্য কারণে, সে তাঁর জীবনের গভীরতম উৎস, প্রেরণা বা আনুগত্যের জন্য, যার সম্পর্কে কবি স্বয়ং সম্পূর্ণ অবহিত নাও হতে পারেন। কবির সচেতন বিচার ও প্রয়াস এবং তাঁর সৃষ্টির স্বাক্ষর[১], উভয়ের তারতম্য থেকে আমরা একটি শিক্ষা, নীতি বা সিদ্ধান্তের সন্ধান পেতে পারি, সে-সিদ্ধান্ত উগ্র আধুনিকতার পরিপন্থী নাও হতে পারে। অর্থাৎ প্রগল্ভ সাময়িকতার আয়ুষ্কাল সীমিত। অপর পক্ষে এজরা পাউণ্ডের সমগ্র সাহিত্য-জীবনকে বর্তমান যুগের, এই দৈন্য সভ্যতার, 'old bitch gone in the teeth'-এর ফলশ্রুতি বা সমালোচনা হিসাবেও ধরা যেতে পারে, এই বিচিত্র মানুষটি ও তাঁর সাহিত্যকর্মকে আমাদের সংশয়াপন্ন, সমস্যাজর্জর, কেন্দ্রচ্যুত সমাজের মানদণ্ডরূপেও গ্রহণ করা সম্ভব। অর্থাৎ শিল্পীর ও শিল্পের অসঙ্গতির জন্য বর্তমান সমাজব্যবস্থাও কি কিছুটা দায়ী নয়? কে বলতে পারে, যেমন সমালোচক ফ্রেজার[২] সখেদে জানিয়েছেন, বর্তমান অবস্থা কতজন ও কতবার কবি ও শিল্পীদের বাধ্য করেছে নির্বাসন প্রতিবাদ ও উৎকেন্দ্রিকতার ভূমিকা বেছে নিতে, হয়তো বা মানসিক অসুস্থতা[৩], এমন কি দেশদ্রোহিতা[৪]? এই

[১] "There is a strange discrepancy between Pound's ideals and his ability to embody them in his work." Edmund Wilson, 'Ezra Pound's Patchwork'. ১৯২২ সনের অভিমত আজও গ্রহণীয়।

[২] G. S. Fraser : *Ezra Pound.*

[৩] পাউণ্ডের মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে মার্কিন মেডিকেল বোর্ড (নভেম্বর ১৯৪৫) যে রায় দিয়েছিলেন তা একাধারে স্মরণীয় ও কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপক। তার কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দেওয়া গেল : "The defendant, now sixty years of age and in generally good physical condition, was a precocious student, specialising in literature. He has been a voluntary expatriate for nearly forty years, living in England and France and for the past twenty years in Italy, making an uncertain living by writing poetry and criticism. His poetry and literary criticism have received considerable recognition, but in recent years his preoccupation with monetary affairs and economics has apparently obstructed his literary productivity. He has long been recognized as eccentric querulous and ego-centric. At the present time he exhibits extremely poor judgement as to his situation. He insists that his broadcasts were not treasonable but that all of his radio activities have stemmed from his self-appointed mission 'to

দুর্দৈবের জন্য কি শিল্পীদের,—যাঁরা, হয়তো স্বভাবদোষেই, কিছুটা নিয়মরহিত—পুরোপুরি দায়ী করা চলে?[৫]

গত যুগের একাধিক আন্দোলন ও বাগবিতণ্ডার কেন্দ্রে একদা বিরাজ করেছেন এই অস্থিরচিত্ত অগ্রজ বা সাহিত্যচূড়ামণি। সেদিনকার মতই আজও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার বিচারের ক্ষেত্রে মতবিরোধ স্পষ্ট, আগের মতই তীব্র। আধুনিক বিদ্রোহের অন্যতম পথিকৃৎ, তাঁর এই আখ্যা অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন; অথচ, গুণগ্রাহীমণ্ডলীর বাইরে তাঁকেই আবার মনে হয়েছে এক ব্যর্থ, করুণ, প্রাচীন স্মৃতিবাহ নিদর্শন; যিনি মূলতঃ অনাধুনিক, অথবা নব্য ঢঙে রোম্যান্টিক, আজন্ম ছিন্নমূল, খুঁজে ফিরেছেন মর্তের অমরাবতী, ভাবের ভুবন; অথচ যিনি—অবাক হবার কিছু নেই—রাজনীতির ক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রতিক্রিয়াশীল। জীবিতের অপেক্ষা মৃত অতীতের প্রতি তাঁর অধিক মমত্ববোধ, বলেছিলেন এককালীন সুহৃদ ও সহকর্মী, উইন্ডহাম্ লুইস[৬]। অথচ একাধিক মহৎ কবিই, যথা ইয়েটস ও এলিয়ট, তাঁকে দিয়ে কবিতা সংশোধন বা শুদ্ধ করিয়ে নিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। সাহিত্যিকদের চিনে নিতে, তাদের সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করতে পাউন্ডের জুড়ি নেই। অপরকে সাহায্য করার কাজে তাঁর দক্ষতা সুবিদিত অথচ নিজের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হয়েছে কম, সেখানে যথেচ্ছাচারের অভাব নেই। সেই কারণে, অনেক সময়ে ওঁকে আধুনিকদের পথপ্রদর্শক মনে করা হয়ে থাকলেও একাধিক বিচক্ষণ সমালোচকের মতে এজরা পাউন্ড আদতে একটি প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজ ছাড়া আর কিছুই নন; লেখক হিসাবে যাঁর স্থান তৃতীয় শ্রেণীতে, যিনি মুখ্যতঃ একটি অশুভ প্রভাবেরই প্রতীক এবং বিভিন্ন ভাষা থেকে বহু অনুবাদ করলেও তাদের

serve the Constitution'. He is abnormally grandiose, is expansive and exuberant in manner, exhibiting pressure of speech, discursiveness, and distractibility.

"In our opinion with advancing years his personality, for many years abnormal, has undergone further distortion to the extent that he is now suffering from a paranoid state which renders him mentally unfit to advise properly with counsel or to participate reasonably and intelligently in his own defence. He is, in other words, insane and mentally unfit for trial, and in need of care in a mental hospital."

এই নির্দেশ অনুযায়ী ওয়াশিংটনের সংরক্ষিত অঞ্চলে, সেন্ট ইলিজাবেথ হাসপাতালে ওঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। ক্রমে, নিয়ম শিথিল হলে, দেশ বিদেশের জ্ঞানীগুণী, কবি-সাহিত্যিকেরা সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে (১৯৩৫) পাউন্ডের রাজনীতিঘেঁষা পুস্তিকা *Jefferson or/and Mussolini* স্বদেশবাসীদের যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হয়েছিল। ১৯৪২ সালে তিনি নিজেকে সর্বান্তঃ ফ্যাসিবাদী বলে ঘোষণা করেন।

যুদ্ধকালীন ওঁর একাধিক বেতার ভাষণকে আর যাই হোক মার্কিন নীতির সমর্থনে বলা অসম্ভব। সহজ ভাষায়, এ দেশদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু বিরোধিতার সূচনা দীর্ঘকালের, প্রায় গোড়া থেকেই। পাউন্ডের সুবিদিত উক্তির অন্যতম হোলো, "And if you have any vital interest in the arts...you sooner or later leave the country." যেমন কথা তেমনি কাজ। পাউন্ডের এই উদ্ধত আচরণ সকলের কাছে ক্ষমার্হ মনে হয় নি। "পোয়েট্রি" পত্রিকার সঙ্গে পাউন্ডের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রায় প্রথম থেকেই। ১৯৪২ সালে 'The End of Ezra Pound' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে এককালীন সহযোগী ও সহকর্মীদের কণ্ঠে শোনা গেল: '...That it is one of the poets who is thus playing Lord Haw-Haw...seems to cast a slur on the whole craft. In the name of American poetry, and of all who practise the art, let us hope that this is the end of Ezra Pound.

এই প্রসঙ্গে সাবেকী ভুরকম খাঁটি কথা বলেছেন "We should reject his politics and respect his poetry" এক আন্দোলনকারী টিচারদের নেতৃত্ব অনুসরণ করেছেন বাস্ত করেছিলেন।

[৫] G. S. Fraser. *Ezra Pound*

[৬] Wyndham Lewis: *Time and Western Man*.

প্রকৃত মর্ম বিষয়ে যিনি নিজে বিশেষ অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না, এমনকি যাঁর মাতৃভাষার জ্ঞান বা প্রয়োগ পণ্ডিতদের পীড়া ও আক্রোশের কারণ ঘটিয়েছে। এমনিতে তিনি ঐতিহ্যের ধ্বজাধারী, অথচ মেজাজ-সম্মত না হলে কোনো প্রকারের সংযম মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সংক্ষেপে, তিনি বিদ্রোহী (*révolté*) হয়তো বা বিদ্রোহী বালখিল্য যিনি কবিতা লেখার কাজে ব্যস্ত না থাকার কালে তামাম দুনিয়াকে চিরটা কাল ধমক দিয়ে এসেছেন এবং উগ্র মতান্ধতার তোড়ে অন্তর্দৃষ্টির অভাবকে চাপা দিতে চেয়েছেন বা পূরণ করে এসেছেন।

গোড়ার দিকের রচনায়[৭], বলতে গেলে আগাগোড়া, পাউন্ডের তিনটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে : অনুবাদকর্মে আগ্রহ (যতটা না কৃতিত্ব); শব্দ ও সুর সংযোজনা এবং কাব্যের সাঙ্গীতিক মূল্যের অনুসন্ধান; এবং কথ্য ভাষা ও যথাযোগ্য চিত্রকল্পের—প্রয়োজন হলে চীনা আইডিওগ্রাম (ideogram) অবধি ধাওয়া করতে প্রস্তুত—প্রতি অভিনিবেশ। এই সকল বৈশিষ্ট্যের বা তাঁর সাহিত্যজীবনের ক্রমিক আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, আমরা প্রধানতঃ তাঁর কাব্যজীবনের অন্যতম মূলসূত্রটিকে, নান্দনিক পাউন্ডকে[৮] অনুসরণ করবো। নানা পালাবদলের মধ্যে এইটিই বোধহয় তাঁর মুখ্য ও মূল ভূমিকা।

মধ্যযুগীয় বের্ত্রাঁ দ্য বর্ন, ক্যাভালক্যান্টি, বা ল্যাটিন প্রপার্টিয়াস বা জাপানী রিহাকু যিনিই হোন না তাঁর আদিরূপ পাউন্ড কিন্তু কখনই শুধু আক্ষরিক অনুবাদকে আদর্শ বলে মনে করতে পারেন নি। প্রায় সব ক্ষেত্রেই, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের খাতিরে, তিনি অল্প-বিস্তর, এমনকি যথেষ্ট পরিবর্তন না করে পারেন নি। পাউন্ডের অনুবাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করে উপায় নেই : এ ঠিক অনুবাদও নয় অথচ আবার অনুবাদও বটে। মনে হয় এই অনুবাদের সাহায্যে[৯] পাউন্ড একটা কিছু খুঁজছিলেন বা কোনো কিছুর কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে অধিকাংশ সময়ে তাঁর যথেষ্ট স্বাধীন বা বেপরোয়া ভাব সত্ত্বেও—অথবা, ব্যতিক্রম হিসাবে, চীনা কবিতাগুলির উত্তেজনারহিত ভাবমণ্ডলের কথা মনে করলে পাউন্ডের অনুবাদকর্মে এক ধরনের ব্যক্তিগত অনিশ্চয়তা, মুখ ও মুখোসের (personae) পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর এই অনুবাদস্পৃহা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বর্তমানের সঙ্গে মিতালি পাতানো তাঁর পক্ষে কখনই সহজ বা সম্ভব হয় নি। একমাত্র "পীজান ক্যান্টোজ"-এই বুঝি তিনি ব্যক্তিগত ও সমসাময়িক অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করতে বা তার ঊর্ধ্বে যেতে পেরেছেন। তাঁর ব্রাউনিঙসুলভ "সেসটিনা : আলটাফর্ট" ('Damn it all! all this our south stinks peace....') সোহো রেস্তরায় পঠিত হবার কালে শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করে থাকবে, কিন্তু স্থায়িত্বের দিক দিয়ে আর বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। অপ্রধান রচনার মধ্যেই তাঁর স্থান নির্ণীত হবে। "নীয়ার পেরিগর্ড" তো ভিক্টোরিয় যুগের শেষ অবস্থার চমকলাগানো সাহিত্যিক প্রয়াস ('End Fact. Try

[৭] "The difficulty is to be interested in the earlier work..."—F. R. Leavis, *New Bearings on English Poetry.*

[৮] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথ-কৃত

[৯] "...spends two-third of his time translating or quoting other poets, and a good deal of the rest in imitating them." Edmund Wilson, "Ezra Pound's Patchwork." এই রীতির মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিজীবনের বা চৈতন্যের যে বিস্তৃতি ও সঙ্গতি আশা করেছিলেন তা তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

Fiction.') ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নয়। এই চমকলাগানো ভাবটি—দুঃখের বিষয় সব সময় সফল অথবা প্রশংসনীয় নয়—পাউন্ডের সমগ্র রচনার বেশ একটি বড় রকমের অংশ জুড়ে আছে। এহেন বুদ্ধিজীবী কবির পক্ষে ঘটনাটি বিস্ময়কর বইকি।

"হমেজ টু সেক্সটাস প্রপার্টিয়াস্"-এ ল্যাটিন পূর্বসূরীকে আশ্রয় করে অতীত যুগ বা ভিন্ন কণ্ঠস্বরকে নিজের ও সাম্প্রতিকতার কাজে লাগানোর সেই একই চেষ্টা চোখে পড়ে। নস্ট্যালজার পরিবর্তে নাগরিকতা, এই যা তফাৎ। কিন্তু প্রাচীন রোমক ও অর্বাচীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের "অসীম ও অকথ্য বিকীর্ণ দশা"র টেয়েনবীসুলভ সাদৃশ্য পাঠককে সাহায্য করে না, অর্থাৎ কবিতায় প্রাণসঞ্চার ঘটেনি। এই জাতীয় কৃত্রিম রচনার একটি বিশেষ রস বা স্বাদ থাকতে বাধা নেই, কিন্তু বর্তমানের বুদ্ধিজীবী, রীতিপ্রধান কাব্যের মোহে না পড়লে একথা বোঝা কঠিন নয় বিশুদ্ধ রসিকের কাছে এর সমাদৃত হবার আশংকা খুবই কম। এলিয়ট যে পাউন্ডের সংকলন নির্বাচন করার কালে এই কবিতাগুলিকে স্থান দেন নি তা অর্থপূর্ণ। তিনি এগুলিকে প্রধানতঃ ছন্দ প্রয়োগের নিপুণ পরীক্ষা হিসাবেই[১০] দেখতে চেয়েছেন। বিচক্ষণ সুহৃদের বর্ণনায় দ্বিধার অংশটুকু লক্ষ্য করার মত।

অন্যান্য অপ্রধান রচনার কথা বাদ দিলে "ক্যাথে" অনুবাদ গ্রন্থটির অসামান্যতা স্বীকার করতেই হয়। বলা হয়ে থাকে এযুগে অনুবাদের মাধ্যমে চীনা কবিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন এজরা পাউন্ড। অথচ, শোনা যায়, অনুবাদের কালে চীনা বা জাপানী ভাষায় পাউন্ডের সবিশেষ জ্ঞান ছিল না। দেখেশুনে মনে হয় বৈদগ্ধ্য বা সর্বজ্ঞতার খামখেয়ালি ভাণ না করলেই বুঝি তিনি সৎ কবিতা লিখে থাকেন। (একথা "ক্যান্টোজ" সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।) অনুবাদের কালে বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও বিদায়ক্ষণগুলির বর্ণনা আন্তরিক ও মর্মস্পর্শী। সে কি এই কারণে যে তাঁর দীর্ঘ জীবনে এ-জাতীয় ঘটনা বারংবার দেখা দিয়েছে? বহু-উদ্ধৃত 'দ্য রিভার মার্চেন্টস্ ওয়াইফ : এ লেটার' পুনরায় উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

While my hair was still cut across my forehead
I played about the front gate, pulling flowers.
You came by on bamboo stilts, playing horse,
You walked about my seat, playing with the plums.
And we went on living in the village of Chokan:
Two small people, without dislike or suspicion....

At sixteen you departed,
You went into far Ku-to-yen, by the river of swirling eddies,
And you have been gone five months.
The monkeys make sorrowful noise overhead.
You dragged your feet when you went out.
By the gate now, the moss is grown, the different mosses,
Too deep to clear them away!

---

[১০] "...a most interesting study in versification." Ezra Pound's *Selected Poems*. Introduction by T. S. Eliot. 1928.

এহেন অনুশীলিত সারল্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে রসভঙ্গ করা অনুচিত হবে। অবশ্য ব্যাখ্যা মাত্রেই রসভঙ্গের নামান্তর নাও হতে পারে। তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ পাউন্ডকৃত "দ্য জুয়েল স্টেয়ার্জ গ্রীভেন্স"-এর সূক্ষ্ম, সংক্ষিপ্ত টীকা[১১]।

কিন্তু স্বপ্নাভ, সুদূরের চৈনিক জগৎ থেকে চোখ ফিরিয়ে নির্মম অসুন্দর বর্তমানের মোকাবিলা পাউন্ডকে করতেই হত এবং হয়েছে। প্রথম প্রকাশের কালে তাঁর সরাসরি 'আধুনিক' কাব্যগ্রন্থ : "হিউ সেলউইন মবার্লি, লাইফ অ্যান্ড কনট্যাক্টস", সমালোচক-মহলে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। দুর্ধর্ষ লীভিস সাহেবের প্রতীতি জন্মেছিল যে পাউন্ডের রচনাবলীর মধ্যে এইটি একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংযোজন : "বইটিতে পাওয়া যাবে একটি সামগ্রিকতাবোধ এবং এ আগাগোড়াই মহৎ কবিতা"। পরবর্তী কালে তিনি তাঁর মতের পরিবর্তন করেন নি। ("ক্যান্টোজ", তাঁর মনে হয়েছে, কারিকুতার উদাহরণ ছাড়া আর কিছু নয়।[১২]) ফ্রেজার তো "হিউ সেলউইন মবার্লি"-কে "দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড"-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে বসে আছেন। সত্যি কি তাই? চমৎকার, কৃত্রিম, সীমিত এবং অপ্রধান কবিসুলভ ভাব এই কাব্যগ্রন্থে অবশ্যই ধরা পড়েছে। এতে রয়েছে কিছুটা উন্নাসিক রসিকতা অথচ আত্মতৃপ্তির স্বাদ, সে এক উপভোগ্য সংকর, কিন্তু পাউন্ডের মহত্তম কীর্তির দাবী এ-রচনা করতে পারে না। বড় বেশি চিকন এর রীতি ও আশ্রয় :

The age demanded an image
Of its accelerated grimace,
Something for the modern stage,
Not, at any rate, an Attic grace;...
O bright Apollo
tin andra, tin hēroā, tina, theon
What god, man or hero
Shall I place a tin wreath upon!

কবিতার বা পাউন্ডের মুখপাত্র, মবার্লি, একজন সাধারণ কবি। পাউন্ড-ভক্তেরা আমাদের সতর্ক করেছেন এই বলে যে আমরা যেন মবার্লি ও পাউন্ডকে এক করে না দেখি। কিন্তু উভয়ের একাত্মতা এতই স্পষ্ট যে সে-নিষেধের কোনো অর্থ হয় না। প্রথম কবিতাটিতেই, ফরাসী

[১১] এই সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনাবহ কবিতা ও তার পাউন্ডকৃত টীকা দুইই উদ্ধৃতি দাবী করে.

The jewelled steps are already quite white with dew,
It is so late that the dew soaks my gauze stockings,
And I let down the crystal curtain
And watch the moon through the clear autumn.

Ribaku

NOTE.: Jewel stairs, therefore a palace. Grievance, therefore there is something to complain of. Gauze stockings, therefore a court lady, not a servant who complains. Clear autumn, therefore he has no excuse on account of weather. Also she has come early, for the dew has not merly whitened the stairs, but has soaked her stockings. The poem is especially prized because she utters no direct reproach.

[১২] "*Cantos*..appear to be little more than a game..How boring..wilful ideas and platform vehemence..Throughout he has substituted book-living for actual living." অন্যত্র : "The spectacle of Pound's degeneration is a terrible one, no one ought to pretend that it is anything but what it is." F. R. Leavis.

রু'সার অনুসরণে, পাউন্ড উত্তম পুরুষের মারফত সংলাপ আরম্ভ করেছেন : "ই. পি : ওড পুর লেলেকশি'র দ্য স' সেপ্যুল্‌ক্‌র"। কবির অনুরাগীবৃন্দ এই লেখার মধ্যে যথেষ্ট প্রবীণ আত্মসমালোচনার নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা মনে করেন এই লেখাটির মাধ্যমে পাউন্ড তাঁর বিশুদ্ধ নান্দনিক জগৎ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। কিন্তু সে কাজ কি এতই সহজ? সাম্প্রতিককালের সঙ্গতিহীন অশোভনতা ও কারিকুরির চিত্র এই সাংবাদিকসুলভ বিবরণে অবশ্যই কিছুটা ধরা পড়েছে। এই লেখাটিকে প্রথম মহাযুদ্ধের ফসল হিসেবে বিবেচনা করা চলে। এবং সেদিক দিয়ে একে মহৎ কবিতা বলা বেশ কঠিন। সময় সময় পাউন্ডের আত্মতৃপ্ত মেজাজ প্যারডির মতন শোনায়। মবার্লি, হিউ কেনার জানিয়েছেন, পাউন্ডের প্যারডিই, অবশ্য তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পাউন্ডের যথেষ্ট সংকোচ। সংকোচ অকারণে নয়।

সাম্প্রতিক মানসের অন্যতম লক্ষণ তার সীমিত দৃষ্টিভঙ্গী অথবা বর্তমানকে নিয়ে বাড়াবাড়ি। অতীত সংস্কৃতি ও বিভিন্ন যুগের সঙ্গে যুক্ত রসজ্ঞ পাউন্ডের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষণীয়, সমালোচকদের মধ্যে তো বটেই। এ এক নতুন ধরনের দৃষ্টিহীনতা। কিন্তু কেবল গোড়ার দিককার রচনার উপর নির্ভর করলে পাউন্ডের কবিখ্যাতি স্থায়ী বা দীর্ঘজীবী হবার নয়। সৌভাগ্যবশতঃ পাউন্ড মূলতঃ "ক্যান্টোজে"র কবি। এই তাঁর প্রধান পরিচয়। এই দুঃসাহসী ও অসম্পূর্ণ পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করছে তাঁর কাব্যকৃতি। "একাধিক অর্থবহ মহাকাব্য" লিখবার যোগ্যতা, যেমন তিনি এক সময়ে দাবী করেছিলেন, তাঁর হয়তো কোনো দিনই ছিল না। কিন্তু নানা কারণে পাউন্ডের এই বিশিষ্ট প্রয়াস সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যদিও তা আগাগোড়া সমর্থক হয়তো হয়নি। নিঃসঙ্গ উৎকর্ষের[১৩] প্রতীক, এহেন একক প্রতিভার দ্বারা মহাকাব্য রচনার অযৌক্তিকতা, পাউন্ডকে এই ব্যাপারটি বিচলিত করেছিল বলে মনে হয় না। এই বহুভাষী, নানা সংস্কৃতি ও কালের বুলিনির সাহায্যে তিনি কোনো সার্বিক সমন্বয়ের সন্ধান না যদৃচ্ছার সমর্থন খুঁজছিলেন কে বলবে? যাই হোক, এই প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শকল্প কনফুশিয়াসের প্রবচন পাউন্ডের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার ইচ্ছা খুবই স্বাভাবিক : আত্মসংযম ব্যতিরেকে (শিল্প বা) গৃহকর্মে সুশৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। ক্যান্টোজের নানা অসঙ্গতি পাউন্ডের মানসলোকেরই প্রতিচ্ছবি।[১৪]

কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশের কথা বাদ দিলে, ক্যান্টোজের অর্থোদ্ধার করা মোটেই সহজ নয়। এবং ব্যাখ্যাতাদের কল্যাণে কবিতাটি অধিকতর দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। তাই প্রকাশের এত কাল পরেও—উত্তরের আশা না রেখে—প্রশ্ন করা চলে : ক্যান্টোজের বিষয়বস্তু কি[১৫] এবং এর নির্মিতির সঙ্গতি ও সার্থকতা কোথায়? অনুরাগীদের কাছে

[১৩] T. S. Eliot, "Isolated Superiority", *Dial*, January, 1928.

[১৪] "..The last-ditch argument is that the *Cantos* are unified by the personality of their creator..That self is not integrated. The Cantos fall into bits because Pound is radically incoherent—not only the man-in-history certified insane, but also the maker as you come to know him by readings that large, occasionally disintegrating bundle.." George P. Elliott, "Poet of Many Voices."

[১৫] এ-বিষয়ে নানা বিপরীত অভিমত শোনা যাবে। মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করছি। আল্যান টেটের মত বিষয়বস্তু বলতে এর বিশেষ কিছুই নেই, "about nothing", এ এক ধরনের বুদ্ধিজীবীর ডায়েরি বা স্বগতভাষণ। অপরে মনে করেন এই কাব্যগ্রন্থ "..some sort of intimate journal..what the *Cantos* in the end are 'about' is the isolated artist, and his struggle, through an idea of traditional community, towards sanity.."

কিন্তু প্রশ্ন রয়েই যায় : এ-জাতীয় "intimate journal" কি আদৌ মহাকাব্যপদবাচ্য হতে পারে?

"ক্যান্টোজ" পাউন্ডের মহত্তম অবদান হিসাবে স্বীকৃত ও ঘোষিত। এর অন্যান্য বিশেষত্বের মধ্যে ভিনদেশী বা অবহেলিত সংস্কৃতির সম্পর্কে প্রতিকূল ধারণার অবসান ঘটানো অর্থাৎ কাললাঞ্ছিত দশা বা প্রাদেশিকতার[১৬] অবসান। অর্থাৎ সার্বভৌম চৈতন্যের আবাহন করেছেন এই আন্তর্জাতিক কবি। এ প্রশংসা বা দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়, যদিও পাউন্ডের সাংস্কৃতিক পণ্ডশ্রম খেয়ালখুশির পরিমাণের অংশ স্বীকার না করে উপায় নেই। সুবিস্তৃত তাঁর মানসবিহার, অনায়াসে ও অনিবার্যভাবে তাঁর স্থানকালপাত্রের পরিবর্তন ঘটে। অথচ, সব মিলিয়ে, মহাকাব্যোচিত ওজস্বিতা, গাম্ভীর্য বা ঔদার্যের অংশ দুঃখকরভাবে অনুপস্থিত। অপরপক্ষে চমকপ্রদ আজগুবি বিবরণের বাহুল্য লক্ষ্য না করে উপায় নেই। অথচ সমকালীন প্রখ্যাত কবি-বন্ধুরা, যথা ইয়েটস ও এলিয়ট[১৭], পাউন্ডের আত্মবিশ্বাসে আস্থাবান, এই মহাকাব্যের চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। কিন্তু পাঠকের কাছে এ এক অনিন্দ্য কাব্যবেদ। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এহেন বিশ্বাসের অংশীদার হওয়া বেশ কঠিন। তাই যখন হিউ কেনার হেনের মত সমালোচককে বলতে শোনা যায় যে ক্যান্টোজের দুর্বোধ্য অংশগুলিরও নিজস্ব মহিমা ও কাব্যমূল্য আছে তখন নিজেদের অজ্ঞতা ও অবিশ্বাসের জন্য বিলাপ করা ছাড়া আর কি করণীয় থাকতে পারে?

অবশ্য হিউ কেনারের সপ্রশংস টীকাই একমাত্র নয়। এ প্রসঙ্গে কঠোর সমালোচনাও[১৮]

অন্য দৃষ্টি অনুযায়ী: "I am proposing here that the principal subject of Cantos as a whole poem, the only one capable of subsuming the subjects of the individual Cantos and of drawing them all into one intelligible system of meanings, is the rejection of life as it is now lived, not merely in politics, and its economics but also its arts, its religion and its metaphysics (against what Pound himself describes as the 'domination of modern life')." W. M. Frohock, "The Revolt of Ezra Pound."

[১৬] দ্রঃ "..at heart..an incurable provincial." Edmund Wilson, "Ezra Pound's Patchwork." April 1922. উইলসনের অভিমত মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু পাউন্ডের দেখনসই সার্বভৌমত্বের ত্রুটি চোখ এড়ায় না। তাতে অন্তর্দৃষ্টি বা সহজ ঔদার্যের চাইতে খাদ মিশেছে বেশি। খানিকটা, উইলসন যেমন ধরেছেন: "Look at me! See how cultured and cosmopolitan I have become...."

[১৭] "ক্যান্টোজ" অর্ধ-প্রকাশিত হবার কালে ইয়েটসকে বলতে শোনা গিয়েছিল: "He is mid-way in an immense poem in *vers libre* called for the moment *The Cantos*....Like other readers I discover at present only merely exquisite or grotesque fragments....His belief in his own conception is so great that since the appearance of the first canto I have tried to suspend judgment." এলিয়টও, প্রকারান্তরে, সুরে সুর মিলিয়েছেন: "I know that Pound has a scheme and a kind of philosophy behind it, it is quite enough for me that he thinks he knows what he is doing; I am glad that the philosophy is there but I am not interested in it."

[১৮] ইভান্স; ইভান্স; ব্ল্যাকমার; ফ্রোহক।

নানা বিরূপ কণ্ঠস্বরের মধ্যে রবার্ট গ্রেভসের প্রায় সপ্তমে গিয়ে উঠেছে। গ্রেভস অবশ্য, স্বভাবগুণে, পূর্ব হতেই পাউন্ড-বিদ্বেষী। পাউন্ডের সুবিখ্যাত কবিতা বা হেঁয়ালি, 'Papyrus':

Spring....
Too long....
Gongula....

নিয়ে তাঁর রাগান্ধ প্রতিক্রিয়া আজ কিছুটা হাসির খোরাক জোগায়। এই কবিতাটি নিয়ে গ্রেভসের সমস্যা ও সমাধান এই রকমের: "Who or what is Gongula? Is it the name of a person? Of a town? Of a musical instrument? Or is it the obsolete botanical word meaning 'spores'?...Is the poem a fragment from a real papyrus? Or from an imaginary one?..Bluff....charlatan."

পাউন্ড-সমর্থক কেনার যেভাবে কবিতাটিকে পূরণ করে দিয়েছেন তাতে গ্রেভস সাহেবের উষ্মা মিটবার নয়, বাঙালী পাঠকের কৌতূহল কিছুটা মিটতে পারে:

কম হয় নি। সেখানেও বিদগ্ধ ব্যক্তির অভাব নেই এবং ক্যান্টোজকে তাঁরা সরাসরি নিন্দা করেছেন এই বলে যে এটি একটি বিরাট ধাপ্পা, পণ্ডিতি পাঁচমিশেলি বা বুদ্ধিজীবীর খাপছাড়া হযবরল ছাড়া আর কিছু নয়। 'স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিশৃঙ্খল', এ কবিতা এক অরণ্য'-এর মতন জটিল, সূচনা থেকে এ কবিতা গিয়েছে ভুল পথে, শেষ পর্যন্ত এক মহৎ ব্যর্থতা[১৯], যা কদাচিতই ছন্দোবদ্ধ, এবং সব মিলিয়ে আধুনিক জীবনধারার বিপরীত যার সিদ্ধান্ত। প্রশংসা ও নিন্দায় দোলায়িত এই কবিতার সত্য বা সার্থকতা তাহ'লে কোথায়? পাউন্ডের সচেতন ব্যাখ্যা বা প্রয়াসের মধ্যে তাকে পাবার আশা কম। সে এসেছে একটু আশ্চর্য ও অপ্রত্যাশিত ভাবে। বলতে গেলে দুর্দৈবের ফসল, কৃপার নামান্তর। সে-কথায় পরে আসছি।

ক্যান্টোজ-কে সভ্যতা ও সংহতির আবিষ্কার বা সন্ধানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আমি চেয়েছি এক নতুন সভ্যতা, প্রসঙ্গান্তরে পাউন্ডকে এই ধরনের কথা বলতে শোনা গিয়েছিল[২০]। কিন্তু কথাই হয়তো যথেষ্ট নয়। অন্যভাবে বলা যায় এই কবিতা আসলে সকল কালের কবিমাত্রের স্বপ্নপ্রয়াণের স্বগোত্র, ভূস্বর্গের সেই মোহমায়া যা মহৎ কবির অপেক্ষা অপ্রধান কবির আশ্রয় বা উপজীব্য। এর নানা রকমের কৌশল বা কটূভাষণের আড়ালে পলায়নী মন সক্রিয়। যাই হোক, কবির জবানবন্দী থেকে জানা যায়, নূতন সভ্যতার পথে এই অভিযাত্রার—যার তুলনা দেওয়া হয়েছে গ্রীক কাব্যের periplum-এর সঙ্গে—উৎস হলেন প্রতীচ্যের অন্যতম নায়ক ওডিসিয়ুস এবং যাত্রা অবসানে প্রবাসীর প্রত্যাবর্তন ইথাকা নগরীতে। অন্যে দান্তের কমেডিয়ার সঙ্গে ক্যান্টোজের মিলের দিক লক্ষ্য করেছেন। পূর্বজদের মধ্যে ওয়াল্ট হুইটম্যানের[২১] কথাও শোনা গিয়েছে। এই পূর্বসূরী, মহৎ কবিদের

Spring (has come again)
Too long (have I been away from you)
Gongula (my dearest).

যাই হোক, "ক্যান্টোজ" সম্পর্কে গ্রেভস সাহেব, বলতে গেলে গোটা পণ্ডিতসমাজ, বেশ খাপ্পা এবং তাঁর বক্তব্যকে সমালোচনা না বলে উদ্‌গিরণ বলাই ভাল! "..It is an extraordinary paradox that pound's sprawling, ignorant, indecent, unmelodious, seldom metrical *Cantos*, embellished with esoteric Chinese ideographs—for all I know they may have been traced from the nearest tea-chest—and with illiterate Greek, Latin, Spanish and Provencal snippets (the Italian and French read all right to me, but I may be mistaken) are now compulsory reading in many ancient centres of learning...."

[১৯] *The Egoist*, Spring 1928.

[২০] সে কি এই কারণে যে, ভিন্ন রীতিতে ও ধারণার বশবর্তী হলেও, উভয়েই স্বকীয় "Song of Myself" লিখবার চেষ্টা করেছিলেন? এই প্রসঙ্গে পাউন্ডের হুইটম্যান-প্রশস্তি স্মরণীয় ·

I make a pact with you, Walt Whitman...
It was you that broke the new woods,
Now is a time for carving.

অন্যত্র তিনি বলেছেন : "He *is* America." (পাউন্ডও কি তাই?) "Mentally I am a Walt Whitman who has learned to wear a collar and a dress shirt (although at times inimical to both)." দ্রঃ "Whitman's and Pound's means of making an American epic are diametrically opposed, but they have at least this in common: they ask that their poetry lead to a totally unifying sacramentalism." Roy Harvey Pearce, "Whitman and the American Epic." সে কাজে অবশ্য উভয়েই ব্যর্থ। প্রশ্ন : কে বেশি? ও কেন?

[২১] "It is indeed wise to be on one's guard at two related points: reckless and subjective speculation about what a poet's intention might have been, and the uncritical acceptance of the poet's own account of the intention that lay behind the writing of a certain poem." Harold H. Watts, "Reckoning."

পাশে এজরা পাউন্ডের স্থান কোথায় নির্ণীত হবে। তিনি কি আদৌ মহৎ কবিদের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন? এ বিষয়ে নানা জনের নানা মত। আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করছি।

সমালোচকদের কথা বাদ দিলে, পাউন্ডের বিভিন্ন টীকাটিপ্পনী[১০] কম গোলমালের সৃষ্টি করেনি। অবশ্য তাতে উত্তাপ ও আলো দুইই পাওয়া যাবে। পিতাকে লিখিত এক পত্রে পাউন্ড কবিতাটির রূপদেহ বা প্যাটার্নের এই রকম সূত্রাকার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন :

ক.ক. জীবিতের মৃত্যুলোকে প্রবেশ।

গ.খ. 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি'।

খ.গ. 'শুভক্ষণ' বা রূপান্তরের মুহূর্ত, প্রাত্যহিকতার জগৎ হতে দিব্য বা শাশ্বত লোক', দেবগণের মাঝে উত্তীর্ণ হওয়া।

সাধু সংকল্প। কিন্তু এ হোলো ১৯২৮ সালের কথা। পরের বছর অন্য সূত্রে শোনা গেল এক ভিন্ন লক্ষ্য, রীতি বা উদ্দেশ্যের কথা : বিখ্যাত বাখ্ ফিউগের তুলনা। "প্যাকেট ফর এজরা পাউন্ড" পুস্তিকাটিতে ইয়েটস (যাঁর সঙ্গে পাউন্ডের এ-বিষয়ে কিছুটা স্বাজাত্য লক্ষণীয়, দ্রষ্টব্য "এ ভীজন্"-এর অলৌকিক অলংকরণ) যার বিবৃতি দিয়েছেন এইভাবে :

'শেষ পর্যন্ত, পাউন্ড বোঝালেন, এর একশততম সর্গ সমাপ্ত হলে সমগ্র কবিতাটিতে বাখ্ ফিউগের[১১] অনুরূপ কায়া বা নির্মিতি দেখা যাবে। এর মধ্যে থাকবে না কোনো রকমের প্লট বা কাহিনীর পারম্পর্য, আলোচনার রীতি, এর থাকবে কেবল দুটি প্রতিপাদ্য বা theme : হোমার থেকে নেওয়া নায়কের নরকদর্শন এবং ওভিড থেকে নেওয়া রূপান্তরের একটি কাহিনী বা ঘটনা। এর সঙ্গে থাকবে কিছু মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক চরিত্রাবলী...।

(এর পর পকেট থেকে একটি এনভেলপ বের করে পাউন্ড) 'কয়েকটি অক্ষর লিখলেন (বা আঁকলেন), সেগুলি হ'লো অনুভব বা শাশ্বত ঘটনার প্রতীক হিসাবে...কখগঘ, তারপর পফবভ...আবার তাদের পুনরাবৃত্তি...তারপর একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা হযব...আবার এমন কয়েকটি অক্ষর পাওয়া গেল যাদের পুনরাবৃত্তি হয় নি...আবার এলো সব কটির মিশ্রণ ...বেশ এক চর্কিপাক...(সমস্ত মিলে) কসিমা ট্যুরার[১২] ভিত্তিচিত্রের মতন...।"

এ-জাতীয় গূহ্য বা সাংকেতিক ইঙ্গিত পাঠককে খুব বেশি সাহায্য করে কি? অধিকাংশ পাঠকের মনে হয়েছে যে ক্যান্টোজে পাওয়া যাবে না সেই ধরনের নির্মিতি যাতে করে এর একটি অংশের শেষে আমরা বলতে পারি এর কি আসছে বা আসা সম্ভব। সমগ্র কবিতাটিতে এমন কোনো লক্ষণ নেই যা থেকে বলা চলে যে কবিতাটির সূচনায় পাউন্ডের মনে এই সম্পর্কে সত্যি কোনো স্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল। প্রথম ত্রিশ সর্গের (ও চৈনিক

১১ সংক্ষেপে, নানা বিষয়বস্তু ও কণ্ঠস্বরের, হয় একত্রে বা ক্রমিক প্রয়োগের সাহায্যে এক মিশ্র সঙ্গীত, মিশ্র অথচ ঐক্যবন্ধ। বলা বাহুল্য বাখের উদাহরণ পাউন্ডের সপক্ষে যায় না। এই তুলনা বা আদর্শের উল্লেখ পাউন্ডের সচেতন প্রয়াস, সদিচ্ছা বা উচ্চাভিলাষের অংশ হতে পারে, কৃতির নয়।

১২ অর্থাৎ একই চিত্রের বিভিন্ন অংশ বা প্যানেলে বিভিন্ন কাল, ঘটনা বা দশার যুগপৎ বর্ণনা বা আলেখ্য। আধুনিক উপন্যাসেও এই 'simultaniety' বা 'multiplicity of eye' লক্ষণীয়। Philosophy of History-তে এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী, সর্বকালের ইতিহাসকে সমকালীন, টয়েনবী যাকে "philosophically contemporaneous" বলেছেন, হিসাবে দেখার প্রয়াস চোখে পড়ে। আধুনিক কবিরা হয়তো সমদর্শী, ত্রিকালজ্ঞ হবার স্বপ্ন দেখছেন, কিন্তু সে স্বপ্ন সার্থক করার কাজে এই জাতীয় রীতি কতদূর সফল হবে বলা শক্ত।

১৩ এমনকি "পীজান ক্যান্টোজ" সম্পর্কে ফ্রেজারের মনে হয়েছে "that the drama is wholly subjective".

অংশটির, ৫৩-৬১ সর্গের) যদিবা কোনো সঙ্গতি থেকে থাকে এর পরবর্তী অংশে পাউন্ড কিন্তু রচনার রেশ টানার কাজে ব্যর্থ হয়েছেন। এ কবিতা চলেছে নিতান্ত অরাজক রীতিতে, যদৃচ্ছার পথ বেয়ে। এহেন সাবজেকটিভ,[১১] অশোধিত বা মেজাজি লেখাকে মহাকাব্যের মর্যাদা দিতে আপত্তির কারণ বোঝা কঠিন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে এর প্রথম সর্গটি ওডিসির এক রেনেশাস অনুবাদস্য অনুবাদ। দ্বিতীয়টিতে রয়েছে ওভিড-বর্ণিত একটি কাহিনীর রেশ। গ্রীক, রেনেশাস জগৎ এবং প্রথম মহাযুদ্ধ এই ত্রয়ীর সমাহারে পাউন্ডের ইনফার্নো পর্ব সম্পূর্ণ হবার কথা ছিল। কিন্তু এই তিনটি ঘটনার মধ্যে যোগাযোগের অংশটুকু সব সময়ে স্পষ্ট নয়। আর পার্গেটোরিও? এই প্রসঙ্গে পাউন্ড তাঁর প্রাচীন আক্রোশকে প্রয়োগ করেছেন : অর্থ ও ব্যাঙ্কিং'এর ইতিহাস—মধ্যযুগীয় পরিভাষায় যাকে বলা হোতো ইউজরা (usura)—সেই অকল্যাণী দাবদহনের বিবরণের মারফত, বৈশ্য সভ্যতার তীব্র ধিক্কারে। আর প্যারাডিজো? সেকথা কেউ বলতে পারে না, এমন কি স্বয়ং পাউন্ড অবধি পারেন নি। বইয়ের শেষের সর্গ ক'টিকে,—রক ড্রিল (৮৫-৯৫ সর্গ) বা থ্রোনসকে (৯৬-১০৯ সর্গ) সে সম্মান দিতে অনেকেই অস্বীকার করেছেন।

ক্যান্টোজের বিস্তৃত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, হয়তো তার প্রয়োজনও নেই। সংক্ষেপে বলা যায় যে কবিতাটি সফল হয় নি। এর আত্মপরিচয়কে স্বয়ংপ্রকাশ বলা চলে না। অগণিত টীকাটিপ্পনী সেই মূল ত্রুটিকে সংশোধন করতে পারে না। কবির নিজস্ব পরিকল্পনার ব্যাপ্তি ও ব্যাখ্যাতাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমর্থনই যথেষ্ট নয়। এই সম্পর্কে কোলরিজ শেষ কথা বলেছিলেন : কোনো শিল্পকর্ম যদি তার স্বরূপের যাথার্থ্য প্রমাণ করতে অক্ষম হয় তাহলে তার আনন্দের রসদে ঘাটতি পড়তে বাধ্য। পাউন্ডের এই কাব্যগ্রন্থে এমন কোনো নিজস্ব সঙ্গতি নেই যার থেকে তার নির্মিতি বা ক্রমিক রূপায়নের কোনো ধারণা করা সম্ভব। যদিবা কবিমানসে কোনো পূর্বসিদ্ধান্ত থেকে থাকে কাব্যদেহে তার সার্থক প্রকাশ ঘটে নি। সত্য বলতে এর কোনো ঐক্যসূত্র ধরা পড়ে না। এর না আছে কোনো স্বচ্ছতা না সার্থক পরিণতি। এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচক[১২] বেশ মজার কথা বলেছেন : 'এই কবিতাটির বিভিন্ন অংশ বা ঘটনা যদি স্থানান্তরিত করা হোতো অথবা অন্যমনস্ক মুদ্রকের দৌলতে কয়েকটি পৃষ্ঠা অদলবদল হোতো তাহ'লে কি কবিতাটির বিশেষ তারতম্য ঘটতো বা সেই পার্থক্যটি ধরা পড়তো?' অকাট্য যুক্তি!

মোট কথা, মহাকাব্যের দাবী সমর্থন করা বেশ কঠিন। এর সোচ্চার আত্মসচেতন অসঙ্গতির বহর, অজস্র ব্যক্তিগত ও অবান্তর ব্যাপার উল্লেখের ফলে মহাকাব্যের মরণদশা ঘনিয়ে আসতে বিলম্ব ঘটে না। সেদিক দিয়ে পাউন্ডের এই বিশিষ্ট প্রয়াসের সঙ্গে গদ্য ও পদ্যে এ যুগের আরো দু'টি কৃত্রিম মহাকাব্যের সঙ্গে স্বাজাত্য লক্ষণীয় : "ইউলিসিস" ও "দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড"। মহাকাব্যের নিজস্ব ধারা বা ধর্ম আছে, সেখানে কাহিনী, প্লট, চরিত্র ও পরিণতির অভাব বা যথেচ্ছ গুরু চণ্ডালী প্রশংসনীয় নয়। বিভিন্ন ভাষা, নানা যুগের ও অপরের উদ্ধৃতি চমকপ্রদ লাগতে পারে, হয়তো এই জাতীয় সমাহারের সাহায্যে একটি নূতন ও বিস্তৃত বোধের আভাস তিনি স্থানে স্থানে দিতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে,

[১১] David W. Evans, "Ezra Pound as Prison Poet."

[১২] এই লেখাকে "idea in action"-যেমন পাউন্ড দাবী করেছেন—হিসাবে গ্রহণ করা বেশ কঠিন। আসলে "The tragic view is alien to him." E. S. Fraser, *Ezra Pound.*

মহাকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই রীতির সমর্থন করা কঠিন। সর্বোপরি লেখাটিতে নাট্যরসের একান্ত অভাব[২৭]। কবিতাটিকে তুলনা করা হয়েছে ওভিডিয় যাত্রার সঙ্গে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই তা শ্লথ। 'সাহিত্যিক মহাকাব্য' হিসাবে মিলটনের লেখায়—যার প্রতি পাউন্ডের তীব্র বীতরাগ সুবিদিত—চাইতেও ব্যর্থ, যদিও পাণ্ডিত্যশূন্যতার মাত্রা অধিকতর প্রকট। ক্যান্টোজে স্বচ্ছতার[২৮] আভাস একেবারেই নেই তা নয়, কিন্তু সে হঠাৎ আলোর ঝলকানি। এমন কি সমগ্র লেখাটিকে মুখ্যতঃ প্যারডি বা তুলনাত্মক গবেষণা ও কারিকু উদ্ভট পাঠ্য-তালিকার আদর্শ আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা চলে। এর প্রভাব অস্বীকৃত হবার নয়, যদিও অধিকাংশ সময় সে প্রভাবে ভালোর চাইতে মন্দের মাত্রাই বেশি। অবশ্য তাই বলে এর মহৎ দিকটি উপেক্ষিত হবার নয়, যদিও সেটি হয়তো কবির সচেতন রীতির চাইতে কালরাত্রির কৃপা, দুঃখের দান। সে বিষয়ে পরে বলছি। কিন্তু একথাও ঠিক যে একাধিক ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও, ক্যান্টোজে, যেমন এক সহৃদয় সমালোচক লক্ষ্য করেছেন, পুরোপুরি বা প্রধানতঃ সেই সকল বিষয়ই আলোচিত হয়েছে যা সর্বাগ্রে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন: বর্তমান সভ্যতায় কবিতা ও ভাষার স্থান, সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বা তার বিকাশের জন্য কি ধরনের প্রতীতির প্রয়োজন এবং সেই প্রতীতির নিজস্ব সর্তই বা কি। দেশত্যাগী পাউন্ড তাঁর সদাগরি স্বদেশকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন।[২৯] বেচাল ও বাচাল হলেও, সব রকম বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্বভাবধর্ম, কবিকর্মই পালন করেছেন অকবির রাজ্যে[৩০]। ক্যান্টোজের একটি অংশ অন্ততঃ সর্বপ্রকারের অসঙ্গতি, অন্তঃসারশূন্যতা ও চাতুরি মুক্ত। সেখানে নূতন সুরে শোনা গিয়েছে বেদনার ভাষা, পাউন্ডের দ্বন্দ্বসংকুল জীবনের পরি-শীলিত সঙ্গীত। সে তাঁর "পীজান ক্যান্টোজ"। বিপক্ষ দলও এখানে সশ্রদ্ধ এবং প্রশংসায় মুখর। এই কাব্যাংশের মানসিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা সুবিদিত: দেশদ্রোহিতার দায়ে প্রৌঢ় কবিকে কিভাবে পীজার নিকটবর্তী অপরাধী সৈন্য-শিবিরে অসহায়, অনাদৃত ও বলতে গেলে নির্যাতিত জীবন যাপন করতে হয়েছিল। ফলে তাঁর স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দেয়। কিন্তু এই বোধ হয় পাউন্ড প্রথম জীবনে মাটির পূর্ণতার—মুখোমুখি হলেন। প্রকৃতির পরিহাসে দুর্যোগের রাত্রিই বহন ক'রে আনলো কবিতার ফসল, পাউন্ডকে ফিরিয়ে আনলো জীবন ও শিল্পকর্মের জগতে[৩১]। বন্দীদশার কাব্য, সাহিত্যক্ষেত্রে তার যথেষ্ট কুলগৌরব আছে। পীজান ক্যান্টোজ তারই নবতম নিদর্শন, এতে রয়েছে অভূতপূর্ব সংহতি ও ঘনত্ব, সর্বোপরি—একবারের জন্য হলেও—এর অকৃত্রিম ভাষণ। লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতার মধ্যে

[২৭] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় মধ্যযুগীয় দার্শনিক আদর্শ বা ত্রিরত্নের কথা: *Claritas, integritas, consonantia.*

[২৮] "The *Cantos* is—wholly or in part—the truth about matters that ought to be our first concern: the estate of poetry in our culture, the role of language in that culture, the sort of belief needed if that culture is to survive and unfold, the conditions under which belief of any sort is arrived at. This is the gift which Ezra Pound offers the country which he left; it should counteravail much that is urged against him." Harold H. Watts, "Reckoning."

[২৯] যদিও শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, প্রকারান্তরে, আধা-কবি আখ্যা দিয়েছেন।

[৩০] "Pound's imprisonment in Pisa seems to have brought him back to art and life. The Pisan Cantos show a new sense of proportion. He begins to feel pity and gratitude, and he begins to smile, wryly, even at himself." Louise Bogan, 1940.

[৩১] *A. B. C. of Reading* বইটিতে পাউন্ড সাহিত্যের এই সংজ্ঞা দেন: 'news that STAYS.'

দিয়ে তিনি পৌঁছেছেন তৃণাদপি সুনীচেন বিনয়ের, অহংকারের বিলোপসাধনের পথে, তাঁর পূর্বকালীন বহুরূপী ক্রিয়াকলাপে যার আভাসমাত্র ছিল না। এই দহনের ফলে তাঁর কাব্যে দেখা দিলো সেই আশ্চর্য সরলতা যা কেবল রচনাচাতুর্যের দ্বারা আয়ত্ত হবার নয়। মুখোসের বেসাতি, হরবোলার ডাক, একাধিক অনুবাদ, প্রতীকী সমান্তরালতা, পরিচিত কলাকৌশল, সে শৌখিন মজদুরি নিমেষেই নিষ্প্রয়োজন হোলো। পরিবর্তে পেলাম প্রবীণ কবির নিজস্ব, পরিশ্রুত কণ্ঠস্বর এবং এই প্রথম তাঁকে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা সম্ভব হোলো। এর জন্য অবশ্যই মূল্য দিতে হয়েছে। বলতে গেলে এ-কবিতা পাপের ফুল। পাপপুণ্যের বিচার একদিন ইতিহাস বিস্মৃত হবে, জেগে থাকবে এই কবিতা, যার সংবাদমূল্য হ্রাস পাবে না ('newsthatSTAYS')। যে পাউন্ড প্রথম মহাযুদ্ধ সম্পর্কে প্রায়-অসার মন্তব্য করেছিলেন[৩২] :

War, one after another,
Men start 'em who couldn't put up a good hen-roost—

যাতে সৎ ভাবনা বা প্রজ্ঞার চাইতে ঘৃণা ও ধিক্কারের সুরই শোনা গিয়েছিল বেশি, আজ সে কণ্ঠস্বর কত প্রবীণ, বেদনায় মহিমান্বিত[৩৩]! সুন্দরের উপাসক আজ সাবালক, প্রায় নৈতিক প্রবক্তার আসনাসীন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের চাইতে জেন গুরুদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য বুঝি বেশি। অপ্রত্যাশিতভাবে হলেও পাউন্ডের পরিক্রমার বিশেষ পরিণতি ঘটেছে এই কাব্যাংশে। হাইকুর বিদগ্ধ পাঠক, চীনা-জাপানী কবিদের অনুরক্ত অনুবাদক, ক্ষণিকের জন্য হলেও, সেই অন্তর্লোকে প্রবেশের অধিকারী হয়েছেন, যে-কবি একদা প্রবাহকে (flux) উপাস্য মেনে নিয়েছিলেন, আজ তিনি প্রবেশ করেছেন তত্ত্বের সেই আদিলোকে, সেই শিশুসুলভ

---

[৩২] "He resents the war, not as a tragedy of our civilization, but as an unpardonably stupid intrusion of the world on the artist." Alice Steiner Amdur, *The Poetry of Ezra Pound.*

উদাহরণস্বরূপ ষোড়শ সর্গের এই অংশটির উল্লেখ করা যেতে পারে :

And Henry Gautier went to it,
And they killed him,
And killed a good deal of sculpture,
And ole T. E. H. he went to it,
with a lot of books from the library,
London Library, and a shell buried 'em in a dug-out,
And the Library expressed its annoyance.

[৩৩] ফরেস্ট রীড "ক্যান্টোজ" সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা "পীজান ক্যান্টোজ", পাউন্ডের পার্গেটোরিও, সম্পর্কে অধিকতর প্রযোজ্য : "The narrator is Ezra Pound as Odysseus, and his *Cantos* relate the education of Ezra Pound, the modern man, as Homer's poem relates the education of Odysseus." Forrest Read, "A Man of No Fortune." কিন্তু উভয় নায়কের শিক্ষার উপায় ও সিদ্ধান্ত যে যথেষ্ট ভিন্ন সে কথা ভুললে চলবে না।

[৩৪] "....Pound is the true child, which so many people in vain essay to be." Wyndham Lewis, *Time and Western Man,* অন্যত্র লিউইস পাউন্ডকে নির্বোধ ("simpleton") আখ্যা দিয়েছেন। "Behind the formidable facade of learning, a simple-minded man. Alfred Alvarez. [illegible] ধারণা পাউন্ড বিদ্রোহী (révolte) কবিই, কিন্তু ইউরোপীয় গুরুঠাকুরদের তুলনায় বিচার-বিবেচনাবর্জিত বা বুদ্ধিহীন। "Less of an intellectual....His radical simplifications will not stand up against the most elementary criticism." W. M. Frohock, "The Revolt of Ezra Pound." "Pound has no scale of values....His mind is not big enough to include anything but technique...." Alice Steiner Amdur, "The Poetry of Ezra Pound."

সারল্যে যাকে ফিরে পাবার জন্য সভ্য জগতের কতই না কারচুপি[৫৩]। স্বল্প হলেও এর গভীরতা ও সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা নূতন করে স্মরণ করিয়ে দেয়, জীবনে ও কাব্যজীবনে, বয়স্কতার অসীম মূল্য, আধুনিকরা সে-শিক্ষা লাভ করলে তাঁদের অর্বাচীনতা কিছুটা সংহত হোতো :

A fat moon rises lop-sided over the mountain
The fat eyes, this time my world
But pass and look *from* mine
between my lids
sea, sky and pool
alternate.
pool, sky, sea....
If the hoar frost grip thy tent
Thou wilt give thanks when night is spent.

যুদ্ধের, দেশদ্রোহিতা ও বন্দীজীবনের অপ্রত্যাশিত অবদান, সরলতা ও অভিজ্ঞতার রসায়ন এই পীজান ক্যান্টোজ। বিশ্বযুদ্ধ ও একনায়কত্ব—যার সপক্ষে নির্বিচার ফতোয়া, এমন কি বেতার ভাষণ দেবার ফলে তিনি দেশদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হ'ন এবং মার্কিন মনোবিকলনবিদ্‌রা তাঁকে উন্মাদ বলে চিহ্নিত করায় অবধারিত মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পান—বিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকটি ভয়াবহ সংস্থা, দুর্দৈবের বা প্রতীকের জন্ম দিয়েছে তার মধ্যে যুদ্ধবন্দীশিবির অন্যতম। একালীন প্রধান কবিদের মধ্যে এজরা পাউন্ডের কপালে জুটেছিল সেই অভিজ্ঞতা ও তার সারাৎসার পেশ করার দায়।[৫৪] সেই রক্তক্ষরা বর্ণনা যেখানে চালাকির কাল ফুরিয়েছে। "কঠিনেরে ভালবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা......রক্তের অক্ষরে চিনিলাম আপনার রূপ"। পরিশ্রুত, অনুতপ্ত—*O dieu, purifiez noscoeurs !*[৫৫] হে প্রভু, শুদ্ধ হোক এ হৃদয়—চরম মূল্য দিয়েই এজরা পাউন্ড মহৎ কবিদের শ্রেণীতে প্রেম, সংযম ও বিনয়ের কবি হিসাবেই তাঁর আসন করে নিলেন। নৈতিক দৃষ্টির কথা আজ আর হয়ত অবান্তর নয়। কবির স্বগতোক্তি কি সেই নজিরই দিচ্ছে না?

"Master thyself, then others shall thee beare."
Pull down thy vanity
Thou art a beaten dog beneath the hail,

[৫৪] "The exigencies of war have made the concentration camp and the prison stockade a rather particular symbol of the twentieth century....Any number of writers....have tried to perpetuate the symbol in prose....Alone among the poets of stature, Ezra Pound has had the unhappy privilege of preserving the symbol and the experience in poetry... a very moving reflection of one aspect of the contemporary human situation." David W. Evans, "Ezra Pound as Prison Poet."

[৫৫] *Personae*, "Night Litany."

[৫৬] সাম্প্রতিক অবান্তরতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারলে হয়তো এই কথাই মনে হবে, অন্ততঃ বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের মনে হয়েছে : "My contention is that a brief collection of his early lyrics and of autonomous lyrical passages from the *Cantos*....encomposses all the durable poetry and that his poetry, viewed quite apart from the poet's historical importance is exquisite and technically masterful, but slight in its impact." George P. Elliot, "Poet of Many Voices."

Half black half white
Nor know'st 'ou wing from tail
Pull down thy vanity
　　　How mean thy hates
Fostered in falsity,
　　　Pull down thy vanity
Rathe to destroy, niggard in charity,
Pull down thy vanity
　　　I say pull down....
Pull down thy vanity, it is not man
Made courage, or made order, or made grace,
　　Pull down the vanity, I say pull down.
Learn of the green world what can be thy place
Pull down thy vanity.

শেষ পর্যন্ত এই নৈতিক বা প্রবীণ সুর তাঁর কাব্যকে স্পর্শ করেছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু আদতে তাঁর আনুগত্যের বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। সৌন্দর্য-রসিক, এই হয়তো পাউন্ডের প্রথম ও শেষ পরিচয়। প্রভাঁসের, রোমান্সের, শৌর্যের, প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা, মেজর ডগলাসের অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষক, ডেমোক্রেসির কড়া সমালোচক, একাধারে এ-যুগের অসুর একনায়কদের ও রাখালিয়া স্বপ্নের সমর্থক, পাউন্ড কোনো দিনই সাদা চোখে বর্তমানকে দেখতে বা চিনতে শেখেন নি। বুদ্ধিজীবীর বড়াই সত্ত্বেও সদবুদ্ধির সবিশেষ পরিচয় তিনি—বা তাঁর অনুরাগীবৃন্দ—দিতে পারেন নি। তাই এমন কথাও বলা যেতে পারে যে প্রগতির ধ্বজাধারী পাউন্ড কিন্তু আদৌ বা মুখ্যতঃ আধুনিক নন। কথাটি আপাতবিরোধী ঠেকলেও ভেবে দেখার মত। আগেই লক্ষ্য করেছি লীভিসের মতে পাউন্ডের বিভিন্ন ধরনের লেখার মধ্যে একমাত্র "মবার্লি"-ই সার্থক রচনা। ক্যান্টোজ-কে তিনি সরাসরি বাতিল করেছেন। কিন্তু মবার্লি-প্রশস্তির কালেও লীভিস কবিমানসের মূল সূত্রটি লক্ষ্য করতে ভোলেন নি : "প্রথম থেকেই শিল্পই পাউন্ডের প্রধান উপজীব্য : তিনি সেই শব্দটির গভীরতর অর্থে যাকে বলে নান্দনিক"। এবং সেই সঙ্গে, আমরা যোগ করতে পারি, খণ্ডকবি (আদৌ মহাকবি নন)। প্রগতিসাধক কবির পক্ষে পরিচয়টি মনঃপুত নাও হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটি আদতে ও আদ্যন্ত তাই।[৩৮]

'বাল্লাট্রেটা' থেকে আরম্ভ করে :

　The light became her grace and dwelt among
　Blind eyes and shadows that are formed as men :
　So, how doth the light melt into song

'এ গার্লে'র চিত্রকল্প বর্ণনা :

　The tree has entered my hands,

---

[৩৮] ১৯২২ সালে বিদ্রূপ মন্তব্য করার কালেও এডমন্ড উইলসন লক্ষ্য করেছিলেন : "Ezra Pound's aesthetic ideal is probably one of the highest in contemporary poetry," যদিও শেষ পর্যন্ত, "Let us, at least, do him honor for having failed in so high a cause."

The sap has ascended my arms,
The tree has grown in my breast—
Downward,
The branches grow out of me, like arms—

নাগরিক চঙে লেখা 'দা গার্ডন' :

Her boredom is exquisite and excessive
She would like someone to speak to her,
And is almost afraid that I
will commit that indiscretion

বা আত্মসচেতন 'কমিশন' :

Go, my songs, to the lonely and the unsatisfied. . . .
Go out and defy opinion

বা অপেক্ষাকৃতভাবে আন্তরিক 'দা রেস্ট' :

O helpless few in my country,
O remnant enslaved!

Artists broken against her,
Astray, lost in the villages,
Mistrusted, spoken-against,
Lovers of beauty, starved,
Thwarted with systems,
Helpless against the control;
You who cannot wear yourselves out
By persisting to successes,
You who can only speak,
Who cannot steal yourselves into reiteration;
You of the finer sense,
Broken against false knowledge

বা 'অভোয়া'র শিল্পপ্রশস্তি (সুরসঙ্গতি ও বাকচাতুর্যে যা ওয়ালরকেও ছাপিয়ে গেছে) :

Go, dumb-born book,
Tell her that song once the song of Lawes. . . .
Tell her that sheds
Such treasure in the air. . . .
Tell her that goes
With song upon her lips. . . .
The maker of it. . . .
Might, in new ages, gain her worshippers,
When our two dusts with Waller's shall be laid,

Siftings on siftings in oblivion
Till change hath broken down
All things save beauty alone.

পাউন্ডের স্বধর্ম সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই, আদান্ত তিনি শিল্পীমানসের অধিকারী[৩১]। এহেন কবির পক্ষে আধুনিক হওয়া সহজ নয়। বহিরঙ্গে দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখলে একথা বোঝা সহজ যে নান্দনিক দৃষ্টির রকমফেরই তার কাব্যের প্রধান আশ্রয়। এই রসাশ্রিত, পলায়নী, বিদ্রোহী মানসের শুদ্ধি ঘটল—প্রয়োজন ছিল বলেই হয়তো—পীড়ায়, বন্দীদশায়। ফলে নান্দনিক রূপান্তরিত হলেন প্রেম, মমত্ব ও করুণার কবি হিসাবে। অবসান ঘটলো উদ্ধত, উন্নাসিক রীতিচাতুর্যের। পূর্বরচনার অগভীর বক্তব্য ও সচেতন শিল্পপ্রয়াস এবং বেদনার মূল্যে অর্জিত শেষ লেখার সহজ মহিমা ও আত্মবোধ, পাউন্ডের কবিজীবনের প্রগতির সত্য পরিমাপ। সম্ভাবনার বীজ অবশ্য পূর্ব হতেই নিহিত ছিল, 'ইন প্রেইজ অব ইজোল্ট'-এ তার আভাস পাওয়া যাবে···

. . . . Their echoes play upon each other in the twilight
Seeking ever a song.
So, I am worn with travail
And the wandering of many roads has made
　　　my eyes
As dark red circles filled with dust.
And yet there is a trouble upon me in the twilight. . . .

অবশ্য এ-জাতীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য সামাজিক প্রসঙ্গও তাঁকে পীড়া দিয়েছে। সহানুভূতি দিয়ে বিচার করলে পাউন্ডের সামাজিক-অর্থনৈতিক মতবাদ যত উদ্ভট ঠেকে, বা তিনি স্বয়ং যে-সকল অতিশয়োক্তি করে থাকেন তাদের কথা বাদ দিলে, তা আদতে ততটা উদ্ভট নাও হতে পারে। আদতে তা আহত শিল্পীমনের, এমনকি মধ্যযুগীয় মানসেরই প্রকাশ। "ক্যান্টোজে" শোনা গিয়েছে সেই ব্লেকসুলভ উদ্দীপ্ত প্রতিবাদ ও ঘোষণা :

With *Usura*
no picture is made to endure or live with
but is much to sell and sell quickly
with usura, sin against nature,
is thy bread ever more of stale rags
is thy bread dry as paper,
with no mountain wheat, no strong flour
with usura the line grows thick
with usura is no clear demarcation. . . .

·

Usura slayeth the child in the womb
It stayeth the young men's courting
It hath brought palsey to bed, lyeth

[৩১] এই অংশটির শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত-কৃত অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

between the young bride and her bridegroom
CONTRA NATURAM
They have brought whores for Eleusis
Corpses are set to banquet
at behest of usura.

কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ ও আক্রোশই পাউন্ডের মূল সুর নয়। তাঁর শুদ্ধ গীতিকাব্য বা গীতিময়তার—যেখানে সমস্যা, মুখোস বা তেজারতির বালাই নেই—উদাহরণের জন্য ক্যান্টোজ ১৭-য় যাওয়া দরকার। মর্তধূলিতে স্বর্গখেলেনার এই স্বপ্নচ্ছবি যে-কবির হৃদয়রক্তে সিঞ্চিত তিনি হয়তো প্রধান অপেক্ষা অপ্রধান কবির পর্যায়ভুক্ত হবেন। হলেনই বা! শুনুন পাউন্ড কবির চিরায়ত স্বপ্নপ্রয়াণ :

So that the vines burst from my fingers
And the bees weighted with pollen
Move heavily in the vine-shoots....
And the birds sleeping in the branches....
With the first pale-clear of the heavens
And the cities set in their hills,
And the goddess of the fair knees
Moving there, with the oak-wood behind her,
The green slopes, with white hounds
leaping about her;
And thence to the creek's mouth, until evening,
Flat water before me,
and the trees growing in water,
Marble trunks out of stillness,
On past the palazzi,
in the stillness,
The light now, not of the sun,
Chrysophose,
And the water green, clear and blue clear,
On, to the great cliffs of amber....
And the cave salt-white and glare purple
Cool, porphyry, smooth,
the rock, sea-worn
No gull-cry, no sound of porpoise,
Sand as of malachite, and cold there,
the light not of the sun.[৬০]

[৬০] "He is much more modern, in my opinion, when he deals with Italy and Provence, than when he deals with modern life. His Bertran de Born is much

কবিতা হিসাবে এই জাতীয় লেখার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি, সেখানে তিনি চিরন্তন রোম্যান্টিকতায় একটি নিজস্ব সুর বা জগৎ যোজনা করেছেন। হয়তো তার পরিধি বিস্তৃত নয়, কিন্তু সে তাঁর নিজস্ব। সেখানে তিনি আধুনিকোত্তম বা আধুনিক নন।

সব দেখেশুনে মনে হয়, যেমন ও'কোনর বলেছেন, এজরা পাউন্ড হয়তো আদৌ আধুনিক কবি নন। অথবা বলা চলে অল্পকালের জন্যই তিনি আধুনিক দলভুক্ত ছিলেন। এবং তাঁর সেই সাম্প্রতিক দিকটি হয়তো তাঁর অতীতমুখী—এলিয়ট যাকে প্রত্নতাত্ত্বিক বলেছেন—দিকটির চাইতে কম মূল্যবান। যুগের প্রভাব বা পরিসর থেকে সরে গিয়েই—অথবা, যেমন পীজান ক্যান্টোজে, সেই হলাহল নিঃশেষে পান করে--তাঁর কাব্যের মুক্তি বা সহজ ধর্ম। সমসাময়িকতায় জড়িত বা পীড়িত পাউন্ড মহৎ কবি নন, বরং যখন তাকে আত্মসাৎ বা অতিক্রম করে, ভাবে ও ভাষায়, স্বকীয় সরলতা অর্জন করেছেন তখনই তাঁর কবিকৃতির যথার্থ পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। কৃত্রিম জটিলতা সৃষ্টি তাঁর স্বভাব নয়, বিকার। অবশ্য আমাদের এ অভিমত বা দৃষ্টিভঙ্গী সর্বজনগ্রাহ্য নাও হতে পারে। যাই হোক, যেমন অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, তাঁর মধ্যযুগীয় চরিত্র বের্ত্রাঁ দা বর্ন সাম্প্রতিক হেকাটুম স্টিরাক্স-এর চাইতে জীবন্ত"[*]। "পার্সনী" বইটিতে পাউন্ডকে বলতে শোনা গিয়েছিল : "এই বইটিতে আমার সত্য সন্ধানের সূচনা, এর প্রতিটি কবিতায় আবরণ উন্মোচনের একটি চেষ্টা করেছিলাম।" দীর্ঘকাল পরে সেই আবরণ ভেদ করে দেখা দিয়েছে মুখশ্রী, স্বরূপবোধ। পীজান ক্যান্টোজ সেই উন্মোচন বা আত্মবোধের কাহিনী। অভিজ্ঞতার শৃঙ্খলীকরণে আমরা এক নূতন পাউন্ডকে লাভ করলাম। তিনি তাঁর প্রিয় মানসলোক প্রভাঁস, ও প্রভাঁসের অতিরিক্ত, এক উজ্জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন :

Provene know; we who wise beyond your dreams of wisdom;
Drink our immortal moments, we 'pass through'....

তাঁর মানসপরিক্রমার অন্তে পাউন্ড সত্যি তাঁর প্রিয় ইথাকা নগরীতে ফিরে গিয়েছেন, কিন্তু সে পথ গিয়েছে পীজার পাশ ঘেঁষে। সর্বপ্রকার অধীর আগ্রহ, অসহিষ্ণুতা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, আত্মসচেতন নির্মিতি বা কলাকৌশলকে পিছনে ফেলে সহজ ও গভীর সুরে কথা বলেছে তাঁর শেষের কবিতা। সর্বকালের কবিদের পাশে তাঁর স্থান।

দীর্ঘ ষাট বছর এই অশীতিপর কবির কণ্ঠে বহুবিধ বন্দনা ও বিবৃতি শোনা গিয়েছে। একাধিক সমালোচক ঠাহর করতে পারেন নি এই নানা কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোনটি তাঁর নিজস্ব বা কোনটির স্থায়িত্বের মর্যাদা। কিন্তু সত্য কি তাই? ভঙ্গী ও ভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে এই কবির জীবনে বারংবার, এমনকি তিনি নিজেই আধুনিকদের অন্যতম বিগ্রহ ('tin-god')। 'শক' দিতে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম; অনায়াসে তিনি মেটাতে পেরেছেন যুগের দাবী; অবাধ শিল্পের বন্দনা করেছেন তিনি, বা তাঁর এককালীন মুখপাত্র, হিউ সেলউইন মবার্লি; এমনকি আন্তর্জাতিক গুন্ডাসর্দারদের প্রশস্তিতেও তিনি পিছপা নন (যথা 'হিটলার একজন সাধুব্যক্তি...শহীদ...কিছু উগ্র মতামত পোষণ করতেন এই যা')। অথচ, যেমন দেখেছি, বন্দী থাকাকালীন, যুগের দাবী বা আধুনিক রীতি ভোলার কালেই, তিনি ফিরে পেলেন সেই সরলতা ও প্রশান্তি যা আধুনিকতার সর্বাগ্রগণ্য এই মুখ্যৎ দৌহ

more living than his Mr. Hecatomb Styrax (*Moeurs Contemporaines*)." Ezra Pound, *Selected Poems*. Introduction by T. S. Eliot. 1928.

[**] ....Pound....has a desperate desire to insult the world" (Yeats). "....Was everybody's schoolmaster" (Iris Berry). Save his own! (প্রবন্ধলেখক)।

কবির সারা পৃথিবীকে ভর্ৎসনা, অপমান ও উপদেশ[৩৯] দেবার প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সেই শুদ্ধ মুহূর্তগুলি—তাদের রীতি গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুরূপ হয়তো নয়—যাদের সত্যতা বিতর্কের ঊর্ধ্বে, যারা চিরকালের। "সত্যের সন্ধান" আপন আপন পথে সকলকেই একদিন না একদিন করতেই হয়। পাউন্ড এই পথে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন বলতে গেলে কিছুটা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে। অথচ একথা সত্য যে এই কবি যখন, অর্থাৎ প্রায়ই, বর্তমান সভ্যতার কর্তৃত্বের নিন্দা করেছেন অথবা যখন কল্পনা করেছেন সুখী বা সার্থক সমাজের, আদতে তিনি অপরের জন্য তাই আশা করেছেন শিল্পীরা নিজের জন্য চিরকাল যা দাবী বা কামনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে কালরাত্রির অবসান, বা মার্কিন উন্মাদাশ্রম হতে ইটালিতে প্রত্যাবর্তন, বহু অসঙ্গতি ও ঘাতপ্রতিঘাতকে পিছনে ফেলে করুণা, আত্মশুদ্ধি ও প্রেমের কবি হিসাবেই তাঁর শেষ স্বাক্ষর রইলো।

Nay whatever comes
One hour was sunlit and the most high gods
May not boast of any better thing
Than to have watched that hour as it passed.

দীর্ঘ জীবনের প্রত্যন্তে আজ পাউন্ডের জীবনে দেখা যাবে এক বিচিত্র প্রশান্তি, আঘাতের কোনো চিহ্নই সেখানে আজ চোখে পড়বে না। তাই যখন ভাবি তাঁর নানা কীর্তিকলাপের কথা, বিরোধ, মতবিরোধের সুদীর্ঘ কাহিনী, এবং কিভাবে সংসার ফিরিয়ে দিয়েছে তাঁর সকল আঘাত তখন মনে পড়ে সতীর্থ সম্পর্কে উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মের উক্তি : 'পাউন্ড যেভাবে কবিধর্ম পালন করেছেন, সেই শক্তি ও সৎসাহস আমাদের মধ্যে অল্প লোকেরই ছিল।' ১৯১০ সালে লিখিত এই প্রশংসাপত্র বহুলাংশে তাঁর প্রাপ্য[৪০]। পাউন্ডের প্যারাডিজো হয়তো অলিখিতই রইলো, কিন্তু আজ অগ্রজের বিশ্রামের কাল।[৪১] আজ আর তিনি আধুনিকতার মুখর, তার্কিক মুখপাত্র নন। শান্তিবচনের দিন হয়তো ঘনিয়ে এলো। ঝড়ের রাতে তাঁর নির্বাসনের পালা শেষ হয়েছে :

I have weathered the storm
I have beaten out my exile.

[৩৯] আর্চিবল্ড ম্যাকলাইসের প্রশস্তির কয়েকটি পঙক্তি :

EZRY

Maybe you ranted in the Grove—
Maybe!—but you found the mark
That measures attitude above
Sea-level for a poet's work.

[৪০] ১৯৫৩ সালে পাউন্ডকে বলতে শোনা গিয়েছিল : "My *Paradiso* will have no St. Domnic or Augustine, but it will be a Paradiso just the same, moving toward coherence. I'm getting at the building of the City, that whole tradition."

[৪১] "সাহিত্যে আধুনিকতা" এই বিষয়ে আলোচনার অবসর এখানে নেই। কিন্তু শিল্পীর স্বাভাবিক স্বপ্নপ্রয়াণের কথা বাদ দিলে পাউন্ডের সমাজচেতনাকে প্রশ্ন করা চলে। একথা বোঝা কঠিন নয় যে তিনি কেন বলেছিলেন (১৯৩৯) : "I regard the literature of social significance as of no significance...It is psuedo pink blah." কিন্তু এর চেয়েও মূল্যবান তাঁর অন্য একটি প্রাসঙ্গিক অভিমত : "As a good reader you will refuse to be bamboozled, and when a text has no meaning or when it is merely a mess or bluff you will drop it and occupy yourself with good literature." *Jefferson or/and Mussolini.* পাউন্ডের সাহায্যেই পাউন্ডকে বুঝতে চাওয়া সমীচীন।

আধুনিক সাহিত্য

প্রকৃতির রাজ্যে যখন আকস্মিক কিছু ঘটে, সাধারণত অনেক আগে থেকে তার কোন কোন সংকেত কোথাও কোথাও থাকে।

যেমন, যে বৎসর সুদূর নবদ্বীপে শুভ দোল-পূর্ণিমায় গোরাচাঁদ জন্মাবেন, সে বৎসর ভীমাদল নগরীর গোলক শুঁড়ির পিতামহ এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিল।

গোলক শুঁড়ি তার শুঁড়িখানায় বসে এখনো গল্প করে থাকে, 'কর্তাদাদা মৈথাদল হতে হাঁটাপথে আসতে আসতে স্পষ্ট দেখেছিল, মিছে বলব কেনে গ', ইনি আমার কর্তাদাদার মুখে শুনা কথা, তিনি দেখেছিল নীলবন্ন কমল যেন দ' জুড়ে ফুটে র'ইছে। দেখেই তিনি সেথোদেন বললে লোণাদহে নীলকমল, ই'থার জানবি ভোবেন দেবতা উদয় হ'ইছে।'

প্রকৃতির রাজ্যে এমন সংকেত পাওয়া গেলেও দুঃখের বিষয় সাহিত্যের রাজ্যে এমন সংকেত পাওয়া যায় না। তাই "কবি বন্দ্যঘটী গাঞির"* মত এমন আশ্চর্য জন্ম বাংলা সাহিত্যে এমন চুপিসাড়ে ঘটে যায়।

এই বই-এর আশ্চর্য বস্তু হচ্ছে ভাষা। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে নিস্তরঙ্গ এবং স্রোতহীন ব্রাহ্মণশাসিত বাংলার সমাজজীবনেই শুধু প্লাবন আনেনি, কাব্য সাহিত্যে এবং মানুষের চেতনাতেও জোয়ার এনেছিল। রাঢ়বঙ্গের যে অমূল্য ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ শব্দসম্ভার এতাবৎ মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ান ছিল তা গদ্যের অধিকারে এনে প্রজাস্বত্ব দিলে যে কি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটতে পারে, আমাদের গদ্য লেখকরা সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। আমার ধারণা শ্রীকমলকুমার মজুমদারের "অন্তর্জলী যাত্রা"ই বাংলা ভাষার এই ডাইমেনশন সম্পর্কে আমাদের চোখ ফোটায়। মহাশ্বেতা দেবীর কৃতিত্ব এই যে তিনি অনেক সাবলীলতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে ভাষার এই জাদুকে ব্যবহার করেছেন। আরম্ভের তিনটি অনুচ্ছেদই এর সুন্দর প্রমাণ।

অন্তর্জলী যাত্রা এবং কবি বন্দ্যঘটী গাঞি—বাংলা সাহিত্যের এই দুই প্রেরণাদায়ক উপন্যাস পাশাপাশি পড়লে একটি আশ্চর্য শিক্ষা লাভ করা যায়। দেখা যায় প্রাজ্ঞলতার ক্ষেত্র থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে কমল মজুমদার বিশেষ এক গোঁড়া ভক্তগোষ্ঠির টাটে উঠে অবতাররূপে পূজা পাওয়াটাই শ্রেয় ধরে নিলেন এবং উত্তরোত্তর অনাবশ্যক দুর্বোধ্যতার আড়াল তাঁর প্রতিভাকে অশরীরী করে তুলে একটি মিথ্ সৃষ্টির সুযোগ করে দিলেন। তাই কমলকুমার মজুমদার আজ বাংলা সাহিত্যে আগ্রহী বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠির আত্মীয় বা স্বজন নন, বিশেষ এক সম্প্রদায়ের আদরণীয় মাত্র। আমাদের পক্ষে এটা একটা ক্ষতি।

অপরপক্ষে মহাশ্বেতা প্রাজ্ঞল এবং ব্যঞ্জনাময়। তিনি সৎ, সাহসী, সংবেদনশীল এবং শিল্পী। তাই অমৃতের ভাণ্ড হাতে নিয়ে লোকালয়ে এসে দাঁড়াতে আদৌ কুণ্ঠিতচরণ নন।

এই বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাষা সাজিয়ে পরিবেশ সৃষ্টির অনুপম কারিকুরিতে অন্তর্জলী যাত্রা এবং কবি বন্দ্যঘটী গাঞির কোথাও কোথাও গায়ে গায়ে ঠেকাঠুকি হয়েছে। যথা :

অন্তর্জলী যাত্রা : বৈজুনাথ হয়ত তাহার মানরক্ষার নিমিত্ত মুয়েক পদ সরিয়া আসিয়া হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া কুয়াশা পরিবৃত গঙ্গার দিকে চাহিল, ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস, সম্ভবত তাহার, চণ্ডালের, ঘুরিতে ঘূর্ণায়মান অপসারিত, ক্রমে শান্তকণ্ঠে আপনমনে বলিতে লাগিল, 'তোমার বিয়ে দেখলাম গো, গান গাইলাম গো, আমি তারাগুলোকে জলে দেখি, জাত চাঁড়াল এমন বিয়াসাদি আমি দেখি নাই, মাগভাতার মাদুরে এক, হে'সেলে দুই, প্রকারে তিন—আমার বউ বলত ; তোমার বিয়ার দিন তারিখ নাই কিন্তু তুমি দিলে দিলে বুড়ার হাঁড়িতে চাল, তাই বলে......এমন বিয়ে এ যে ভেল্কী......বুঝাও কোন মতে সিদ্ধ, তবে হ্যাঁ খুব খেয়েছিলাম গো —এ এক অবাক গল্প না গো কনে বউ?'

কবি বন্দ্যঘটী গাঞি : 'নদটি ক্ষেপা ঠাকুর পারা গ', তাই ত' শিলাই নদী উনিকে বিভা বসলেন না, দ্বারকেশ্বরের মিলে ধাওয়াধাই চলে ফেললেন, তা থেকেই রূপনারায়ণ উ-দের গ্রাস করে নিলেন' নদনদীর পূর্বরাগ ও বিয়ের এ আশ্চর্য উপাখ্যান ভীমাদলের শবরজাত এখনো চণ্ডীপুজোর শারদরাতে, অথবা দ্যুত-পূর্ণিমার কোজাগর রাতে, যে রাতে নগরবাসীরা পাশা খেলে প্রহর জাগে, সে রাতে গল্প করে থাকে।

অন্তর্জলী যাত্রা : 'তুমি আকাশ কালো করবে গো, হাতী হাতী ধোঁয়া উঠবে, সতী হবে, তোমার নামে কত মানত, কত নোয়া শাঁখা জমা হবে। তোমার নামে অপুত্রের পুত্র হবে, নিধনের ধন হবে।' ক্ষিপ্রবেগে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'তোমার বরে হিজড়ে ট্যাঁড়া দিবে হাটে হো সতীর বরে গো মানুষ হইলাম।'

কবি বন্দ্যঘটী গাঞি : 'মেয়ে সন্তান বিপথে গেলে সংসারে হাহাকার উঠে গ তা নদ বল, নদী বল, মানুষের সংসারকে কোলে ধরে রাখে, মায়ের নাইকুণ্ডলীর নাড়ীতে পোয়া যেমন, তা সেখানেও হাহাকার উঠত। সংসার বিজুবন হত, প্রজার গোহারির সীমা থাকত না, তা নদ নদী কি চেয়ে দেখত?'

মহাশ্বেতা যে কাহিনী রচনা করেছেন তার সময়কাল ষোড়শ শতক। তার একশ চার বছর আগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়েছে। তখন ঘোর কলি, কারণ একদিকে ইসলাম এবং অন্যদিকে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম সকল অজাতকে কোল দিয়ে রেখেছে। এই জোয়ারের তাড়নায় অরণ্যচর এই চুয়াড় যুবকের কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠেছিল। নিম্নবর্ণের এই যুবক নিজের জন্ম ও জীবনকে অতিক্রম করে, একটি দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করে মানুষের পরিচয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু সমসাময়িক সমাজ তার আকাঙ্ক্ষা, তার প্রতিষ্ঠা, তার প্রেমকে ধ্বংস করে ছেড়েছিল। এই 'বিদ্রোহী' 'যোগ্যতা যার পৃথিবী তার' এই মনে করে নতুন পৃথিবী খুঁজতে গিয়েছিল। সমাজ তাঁকে ক্ষমা করে নি।

এই উপন্যাসে রচনার গুণে কোনও চরিত্রই কালির আঁচড়ের শিকলে বাঁধা পড়ে থাকে নি, রক্তমাংসে সৃষ্ট হয়ে দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে। এমন এক ব্যর্থতার ইতিহাস মহাশ্বেতা রচনা করেছেন এখানে যা হতাশ করে না, মানুষকে সতত তার সীমারেখা পেরিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে।

গৌরকিশোর ঘোষ

* কবি বন্দ্যঘটি গাঞি : জীবন ও মৃত্যু—মহাশ্বেতা দেবী। চতুষ্পর্ণী প্রকাশনী। কলিকাতা ৯। মূল্য ৪·০০ টাকা।

স মা লো চ না

বিজ্ঞানের সংকট—সত্যেন্দ্রনাথ বসু। লেখক সমবায় সমিতি। কলিকাতা ২৬। মূল্য ৬·৭৫

অনেকদিন আগে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখা একখানি চিঠির কথা মনে পড়ছে। এই শতকের প্রথমদিকে ১৯১৬ খৃস্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর তারিখে লেখা। চিঠিখানা তুলে ধরছি।

> 'শ্রীমান হারীতকৃষ্ণ (সম্প্রতি পরলোকগত) লিখেছেন যে, নানাকারণে তাঁর পক্ষে কাল (২৫।১১।১৯১৬) বিকেলে এখানে আসার সুবিধে হবে না। তবে আপনি যদি আসেন তো বড় সুখী হবো। যাঁরা লেখাপড়া করেছেন অর্থাৎ মন নামক পদার্থটির চর্চা করেছেন তাঁদের সংগে আমি মিশতে কথাবার্তা কইতে ভালবাসি। পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানে যে আনন্দ পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়। আমাদের নতুন মনোভাব সব অবশ্য আমরা সকলেই বই থেকে পেয়েছি। কিন্তু সেইসব বইয়ের কথা প্রতি লোকের ভিতর থেকে অল্পাধিকতর নূতন মূর্তি ধারণ করে বেরিয়ে আসে। যেন মরা জিনিস জ্যান্ত হয়ে ওঠে। মুখের কথার ভিতর যে প্রাণ ও বৈচিত্র্য আছে তা লেখার কথায় সচরাচর পাওয়া দুর্ঘট। এই কারণেই আমি নিজে বকতে ও পরের কথা শুনতে এত ভালবাসি। তাছাড়া যাঁরা পড়েছেন তাঁদের আমি লেখাতে চাই। কেননা বাংলা সাহিত্যে জ্ঞানের দিকটে আজ পর্যন্ত ফাঁক রয়ে গেছে। আর যতদিন বাংলা সাহিত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার না হবে, ততদিন উঁচুদরের কাব্য ও সমালোচনার জন্যও আমাদের দু'একটি প্রতিভাশালী লেখকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে যুগে যুগে জন্মাতে বাধ্য প্রকৃতির এমন কোন বাঁধা নিয়ম নেই। সাহিত্যের গ্লানি হলে এ ভূ-ভারতে প্রতিভাশালী লেখক অবতীর্ণ হতে বাধ্য, একথা শাস্ত্রেও লেখে না। সুতরাং আমাদের মত প্রতিভাহীন লোকদের পক্ষে যেটুকু জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চয় করেছি তার ভাগ দেশের লোককে দেওয়াটা কর্তব্য। এই কারণেই আমি আপনাকে "সবুজপত্রে"র আসরে নামতে চাই।'

এই দীর্ঘ পত্রটির মধ্যেই বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এতৎসত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা রচনার গ্রন্থাকারে প্রকাশ এই প্রথম। রামেন্দ্রসুন্দরের মত তিনিও হয়তো বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনা করতে পারতেন কিন্তু তা করেননি। এমনকি তাঁর এই সুদীর্ঘ জীবনে তিনি 'বিশ্ব-পরিচয়ের' মতো কোন গ্রন্থ রচনা করবার কথা ভাবেননি। অথচ বিদেশে আইনস্টাইন থেকে আরম্ভ করে বহু খ্যাতিমান বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও তথ্যকে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন নিজের মাতৃভাষায়। সত্যেন্দ্রনাথ মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় একান্ত আগ্রহী, বিজ্ঞানের গ্রন্থ মাতৃভাষায় প্রণয়নে অত্যন্ত আগ্রহশীল, তথাপি তাঁর নিজের রচনাসংখ্যা অতি সীমিত। এ আমাদের দুর্ভাগ্য। "বিজ্ঞানের সংকটে"র প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালে। 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায়। তৎকালীন পাঠককুল চমকিত হয়েছিলেন ভাষার লালিত্য দেখে। বিজ্ঞানের বিষয়ের অভিনব প্রকাশ দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন সকলে।

বঙ্কিমযুগে প্রবন্ধকারেরা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা এবং মননশীলতা সে যুগে রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। রবীন্দ্রযুগে প্রবন্ধ রচনারীতির পরিবর্তন সাধিত হলো। এই যুগের বক্তব্যকে হৃদয়ের বর্ণে রঞ্জিত করে তাকে শ্রীমণ্ডিত

ক'রে তোলবার চেষ্টা হলো। প্রমথ চৌধুরী রচনার নতুন ভঙ্গী দেখালেন। সত্যেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে এই তিনের আশ্চর্য সমন্বয় দেখা যায়। এ কাজ নিঃসন্দেহে দুরূহ। বিশুদ্ধ প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে এই সমন্বয় বিরল বললেই চলে। অথচ তিনি প্রায় অনায়াসে এই কাজ সমাধা করেছেন। কঠোর গবেষণার বিষয়বস্তুকে তিনি নির্ধূম আলোকরেখায় উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছেন, আবার অতিমাত্রায় শিল্পশ্রীমণ্ডিত করবার তাড়নায় অনর্থক অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেননি। 'বিজ্ঞানের সংকট' প্রবন্ধ থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে একথার প্রমাণ করছি—'ইলেকট্রন ও প্রোটন কিংবা গতিশীল সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের রঙ্গস্থল আকাশ-ক্ষেত্র। প্রথমে পরমাণুবাদীদের ধারণা ছিল যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়গোলকের আয়তন ও আকৃতি যেমন আমরা ভাবতে পারি, অতি ক্ষুদ্র ও ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের কিংবা আরও ছোট প্রোটন বা ইলেকট্রনের আয়তন ও আকৃতিও আমরা সেইরূপ কল্পনা করতে সক্ষম। অণুতে অণুতে কিংবা প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরকার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক অংশের ব্যবধান এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খণ্ডগুলির আকৃতির এবং আয়তনের অনুপাতে অনেক অধিক, জগৎ বিচ্ছিন্ন কণাসমষ্টি। তাদের মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব এত বেশি যে জগতের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই পদার্থ-রিক্ত আকাশক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে।' (পৃ ৬-৭)

ঈথারে পরিপূর্ণ যাবতীয় শূন্যলোক। এক পরমাণু থেকে অন্য পরমাণুর মধ্যে যে ব্যবধান, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও পৃথিবীর মধ্যে যে অপরিমেয় দূরত্ব বর্তমান তাদের প্রত্যেককে সংযুক্ত করে রেখেছে ঈথারের তরঙ্গ। এই তরঙ্গমালায় প্রতিটি বস্তুনিচয় সংঘ-বদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই ঈথার তরঙ্গের মাধ্যমেই চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা থেকে আসছে, এই পথেই সূর্যের আলো পৃথিবী পাচ্ছে এবং সূর্যের আলোই জীবনীশক্তির মূলে। এই তত্ত্ব সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় সুন্দররূপ পেয়েছে—

'পৃথিবী যে আজ জীবনের বিচিত্র লীলায় ছন্দিত, যে-শক্তির বিকাশ ও অপচয় আজ আমরা মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপে দেখছি, সে-সমস্তেরই মূলে হচ্ছে ঈথার-পথে আনীত সূর্যের কিরণরাজি। আলোক-তরঙ্গে আনীত শক্তিকে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জড়পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরে রাখছে এবং কল্পনাতীত অতীত থেকেই এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সঞ্চিত আছে। ঈথার তরঙ্গের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন ও প্রোটন-ইলেকট্রনের পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণেই জগতের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ধর্মী জড়ের বিকাশ হয়েছে ও তার লীলাখেলা চলছে, এইটা আজকে পদার্থ বিজ্ঞানের মূল কথা' (পৃঃ ৮)

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক তাঁর রচনাসমূহ শুধু যে সাবলীল তা নয়, সাহিত্যিক মনীষায়নায় তা উজ্জ্বল। 'শক্তির সন্ধানে মানুষ' প্রবন্ধটির আগাগোড়া তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

(১) 'কি অব্যর্থ নিয়মের বশে বাষ্পময় নীহারিকা জমাট বেঁধে তারকাজগতের জন্ম দিল, আবার কোন্ দুর্যোগের ফলে তারকা ভেঙেচুরে গ্রহজগতের সৃষ্টি হল—এ সবের তথ্য তার কল্পনা, তার প্রতিভা ধরতে চায়। চোখে দেখা যায় না যে সূক্ষ্ম কণারাশির জগৎ, তার কথাও সে ভাবে। প্রকৃতির সকল গোপন রহস্যের উপর নিজের বুদ্ধির আলোক ফেলে জানতে চায় তার অন্তরের মর্মকথা' (পৃঃ ১৩)

(২) 'জুয়াখেলায় সর্বস্বান্ত হয়েও পাকা জুয়াড়ীর চৈতন্য হয় না। সে ফেরে নতুন বিত্তের সন্ধানে, যা পণ রেখে আবার সেই সর্বনেশে জুয়ায় নিজের ভাগ্য পরীক্ষা নতুন ক'রে করতে পারবে। মানুষের প্রকৃতি কতকটা এই জাতীয়। খনিজ সম্পদ, তেলের স্রোত যখন এইভাবে বৃথায় ভস্মীভূত হতে বসেছে তখন এই পরিচিত জগতে অন্য কোনভাবে কার্যকর

শক্তি লুকোনো আছে কি-না তাই সে খুঁজছে! বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করছে। ঊর্ধ্বে তারা-মণ্ডলীর বিরাট তেজোসম্ভারের দিকে চেয়ে ভাবছে এইসব জ্যোতিষ্করা তো তারই মতো অমিতব্যয়ী, তেজস্রোতে যা ঢালে তা তো ফিরে পায় না! ওদের অফুরন্ত ভাণ্ডারের রহস্য কি?' (পৃঃ ১৮)

এমনি আরো অনেক উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা চলে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম দুটি প্রবন্ধের জাত অন্যসবকটির থেকে আলাদা। বিজ্ঞানের জটিল ও রহস্যজালে পরিপূর্ণ দিকগুলি নিয়ে রচিত এ-দুটি। এখানে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ-কুশলতার পরিচয় সর্বত্র। দুরূহ বিষয়কে সহজ ও সুখপাঠ্য ক'রে তোলা যথেষ্ট মুন্সীয়ানার কাজ। বিষয়-বস্তুর উপর অসাধারণ অধিকার থাকলেই চলবে না। রচনার যাদু থাকা প্রয়োজন। তাঁর রচনার মধ্যে দুদিকেরই সার্থক সমন্বয়।

জীবনী-বিষয়ক রচনাতেও সত্যেন্দ্রনাথ উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে প্রশ্ন জাগে যে গ্রন্থের নাম 'বিজ্ঞানের সংকট' (মলাটে এবং ভিতরে গ্রন্থের শিরোনাম বিভিন্ন। মলাটে 'বিজ্ঞানের সংকট' এবং ভিতরে যাকে টাইটেল পেজ বলা হয় তাতে আছে 'বিজ্ঞানের সংকট ও অন্যান্য প্রবন্ধ'। এ ত্রুটি চোখে বিশ্রী লাগে।) সেখানে জীবনীর সংযোজন কেন। বলা বাহুল্য জীবনী লেখার মেজাজ স্বতন্ত্র পর্যায়ের। তাই প্রথম দুটি বা তিনটির (আইনস্টাইন, ১) সঙ্গে বাকী সবগুলির ছন্দ মেলে না। কয়েকটি জীবনী প্রবন্ধ একেবারেই মামুলী। স্মৃতিকথা ছাড়া তার অন্য কোন মূল্য নেই। বর্তমানকালে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে আত্মিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে সে-বিষয়ে অধ্যাপক বসুর কোন নিবন্ধ থাকলে সত্যিকার সংকটের কথা বলা হতো। অবশ্য কোন প্রবন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে তা বলা হয়েছে।

'নানা চিন্তা' প্রবন্ধটি এই গ্রন্থে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। হালকা চালে গম্ভীর কথা বলেছেন নিপুণ শিল্পীর মতো।

যেসব ত্রুটির কথা বলা হয়েছে তাকে ছাপিয়ে উঠেছে সত্যেন্দ্রনাথের রচনার সরস ভঙ্গী। তাঁর গদ্য যেন বৈঠকী মেজাজের। সাহিত্য-সভায় বা বাড়িতে যেমন তিনি বৈঠকী আমেজের সৃষ্টি করে থাকেন, অবিকল সেই ছবি তাঁর গদ্যে। এ পারা বড়ো শক্ত পারা। "সবুজপত্রে"র অনায়াস সমস্যা হ'য়েও তাঁর রচনার বুকে স্বতন্ত্র সুর। সুরস্রষ্টা সত্যেন্দ্রনাথ গদ্যরচনার এলাকায় সৃষ্টি করেছেন সুরবাহার।

প্রকাশের ভঙ্গী পরিমিত হলে গদ্যে চলার বেগ বাড়ে, তার উদাহরণ এখানে প্রচুর। যেমন, 'সূর্য সারা ব্রহ্মাণ্ডে তেজ ছড়াচ্ছে, পৃথিবীকে দিচ্ছে উত্তাপ আর আলো। সেই তেজ আলো এবং উত্তাপের সাহায্যে প্রাণ গড়ছে নতুন জীবজগৎ।'

"সবুজপত্রে"র সমসাময়িক অনেকের রচনাভঙ্গীতে আতিশয্য দোষের প্রাচুর্য বর্তমান। তাছাড়া কয়েক ধরনের একঘেয়েমি থেকে অনেকেই মুক্ত হতে পারেন নি। তার ফলে রচনা সর্বদা সাবলীল হয়নি। ভাষাকে ঐশ্বর্যসম্পন্ন করবার তাগিদে তাঁরা অনেক সময় ভাষাকে মুচড়ে জটিল করেছেন, কৃত্রিম করে তুলেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের বড় গুণ তাঁর ভারসাম্যতা। কখনোই তিনি প্রগল্ভ হননি, বাকচাতুর্যে পাঠকের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে চাননি, বক্তব্যকে অতিক্রম করে ভাষা ছোটেনি। গ্রন্থের মোট চৌদ্দটি প্রবন্ধে দুরূহ বিষয়কে অবলম্বন করে তিনি দুরূহতর, কঠিনতর সাধনায় সফলকাম হয়েছেন অবলীলাক্রমে।

অমিয়কুমার মজুমদার

Slowly Down the Ganges. ***By*** **Eric Newby. Hodder and Stoughton. London. 50*s*.**

নিউবী সাহেব পাকা ইংরাজ। তিনি নদী ভালবাসেন। যুবাবস্থায় ১৯৪১-৪২ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রংরুট হইয়া ভারতে আসিয়া গঙ্গার প্রেমে পড়েন। ১৯৬৩-৬৪ সালে, দীর্ঘ ২২ বৎসর পরে স্ত্রী সমভিব্যাহারে সেই প্রেম ঝালাইয়া লইতে আসেন। এবার আর আগেকার মতন দূর হইতে দেখা নয়। ১৯৬৩র ডিসেম্বরের গোড়ায় হরিদ্বার হইতে গঙ্গা-বক্ষে পাড়ি সুরু হইল। শেষ হইল জানুয়ারী মাসে (ঠিক কোন তারিখে হদিশ পাওয়া শক্ত) সাগর দ্বীপ ছাড়াইয়া ষাট মাইল দক্ষিণে স্যান্ডহেড্স-এ।

আলোচ্য বইটি এই দেড় হাজার মাইল অভিযানের কাহিনী। অন্ধ ভারতপ্রেমিক বাদে বিদেশীগণ ভারতবর্ষে আসিয়া গরম, ধুলো, মশা-মাছি, গন্ধ ও জঞ্জাল এবং দৈনন্দিন সামান্যতম স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে উত্যক্ত হইয়া পড়েন। তাছাড়া যাঁহাদের কাজকর্ম ও দৈনন্দিন নানা প্রয়োজনে ভারতীয়দের উপর নির্ভর করিতে ও দ্বারস্থ হইতে হয় তাঁহারা সরকারী-বেসরকারী লোকজনের সময়জ্ঞানের অভাব, অকর্মন্যতা, কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীনতা, অসৌজন্যতা ও অর্থগৃধ্নুতার ফেরে পড়িয়া আরও অবসন্ন হইয়া পড়েন। নিউবী সাহেবের রোজনামচায় পদে পদে এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা রহিয়াছে। তবে তিনি রসিক লেখক। সেইজন্য তাঁহার নালিশগুলিকে পরিহাসের পলস্তারা দিয়া মোলায়েম করিয়া দিয়াছেন। নিউবীর সম্পর্কে পরিহাস কথাটি বড় কথা কারণ তিনি মুখ্যতঃ হাস্যরসের লেখক, শ্লেষ ও ব্যঙ্গ তাঁহার প্রধান অস্ত্র। লেখার কায়দা ছাড়া ভ্রমণ কাহিনীকে কি করিয়া সরস ও উপভোগ্য করিয়া তুলিতে হয় তাহা তাঁহার পুরোপুরি জানা আছে। তিনি তাঁহার নৌকা-ভিযানের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সহিত গঙ্গা ও তাহার কূলবর্তী স্থানসমূহের ইতিহাস ও পুরাবৃত্তকে পরিমাণ মত মিশাইয়াছেন। তবে পুরাতন বই, রিপোর্ট ইত্যাদি হইতে যাহা বাছিয়া ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে গুরুগম্ভীর তথ্যের তুলনায় সরস খবরাখবর ও কিম্বদন্তীই বেশি স্থান পাইয়াছে। তাহা ছাড়া নিউবী জানেন যে ভ্রমণ কাহিনীতে এইসব ছাড়া 'হিউম্যান ইন্টারেসট্' না থাকিলে সাধারণ পাঠকের মনোহরণ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য তিনি যে স্থানেই গিয়াছেন সেখানকার বর্ণনা, লোকজনের জীবনযাত্রার মোটা চেহারা ছাড়াও ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র ও তাঁহাদের সহিত কথাবার্তার বিবরণ দিয়াছেন। বইটি সমগ্রভাবে উপভোগ্য এবং কাশীর বিবরণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা যে কয়টি জিনিসের কথা উপরে বলিলাম সেগুলির এই পরিচ্ছেদে সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়াছে। কাশীর অঘোরপন্থী অঘাবাবা প্রসঙ্গে লেখকের শ্লেষাত্মক রচনার ক্ষমতা খুব ভালভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু রসিকতা ও শ্লেষ-এর একটা বিপদ আছে। ওস্তাদী গান সম্বন্ধে শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উক্তির মত বলিতে হয় এই রসের কারবারী হইলে টনটনে জ্ঞান থাকা দরকার যে কখন ও কোথায় থামিতে হয়। মাত্রাজ্ঞান এখানে কেবল পরিমিত উক্তি নয়, স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধেও সমাধিক প্রযোজ্য। যেমন আসরে যে রগড়জ্ঞান বাহবা পায়, শ্মশানে তাহা খুব সমুচিত হয় না। নিউবী সাহেব অনেক ক্ষেত্রেই রসিকতার লোভ সামলাইতে না পারিয়া স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে দাবিশেষ সচেতন থাকেন নাই।

এই গণ্ডগোলটা বেশি চোখে পড়ে বইটির মূল ব্যাপার অর্থাৎ গঙ্গাকে লইয়া। লেখক গঙ্গাকে 'দি হোলি রিভার' ত বলিয়াছেনই, তা ছাড়া গঙ্গার অষ্টোত্তর শত নামের ফিরিস্তি

দিয়াছেন এবং একথাও বলিয়াছেন যে হিন্দুদের বিশ্বাস যে এই নদীতে একবার স্নান করিলে সব পাপ ধুইয়া যায়। এটা ভাবা একটু বাড়াবাড়ি হইবে যে একজন সাহেব গঙ্গাকে কলুষ-বিনাশিনী, সর্বতাপহারিণী ও দ্বন্দ্ব সংসারে একমাত্র গতি বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু যে কোন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে বোঝা শক্ত নয় যে হাজার হাজার বছর ধরিয়া কোটি কোটি নরনারী গঙ্গাকে মাতৃজ্ঞানে, দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছে। বৈজ্ঞানিক যুগেও গঙ্গার প্রতি নিষ্ঠাবান হিন্দুর এই অচলাভক্তির পৃথিবীতে কোন তুলনা নাই এবং একটা নদীর প্রতি আজিকার বৈজ্ঞানিক জগতে একটা সমগ্র জাতির এই মনোভাব বিশ্বের বিস্ময়। এদেশের মানুষের সঙ্গে গঙ্গার এই সম্বন্ধটি না বুঝিলে নদী বা লোকজন কোনোটিকেই ঠিকমত বোঝা যায় না।

নিউবীর বইটি পড়া শেষ হইলে তাই মনে হয় যে এই নৌকাভিযানের কাহিনী ঠিক ভাবের ঘরে চুরি না হইলেও কোথাও যেন একটা ফাঁক রহিয়া গেল। আরও মনে হয় লেখকের ক্ষমতার সীমার কথা। ভাগিরথীর রহস্যের উৎস সন্ধান নিউবীর সাধ্যাতিত।

রামপ্রসাদ সেন

The Socialist Register 1967. The Merlin Press. London. 15*s*.

ভিয়েৎনামে একটা যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ চলছে, মার্কিনীদের এবং তাঁদের অনুচরদের কথা-মতো, দক্ষিণ ভিয়েতনামী স্বাধীনতাকামীদের সঙ্গে উত্তর ভিয়েতনামী ভিয়েতকংদের। মার্কিনীরা প্রকাশ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের হয়ে যুদ্ধ করছেন এবং অপ্রকাশ্যে চীনারা এবং রাশিয়ানরা ভিয়েতকংদের হয়ে।

ভিয়েতনামের যুদ্ধ নিয়ে আমরা সবাই আলোচনা করি। যাঁরা মার্কিনীদের বিশ্বাস করেন, শ্রদ্ধা করেন, তাঁরা জেনে রেখেছেন, কম্যুনিস্টদের শিক্ষা দেবার জন্য আমেরিকা তার সবল শস্ত্রবাহিনী নিয়ে ভিয়েতনামের মাঠে নেমেছেন। ভিয়েতনামে কম্যুনিস্টরা জব্দ হলে, কম্যুনিস্টরা লাওসে জব্দ হবে, কাম্বোডিয়ায় জব্দ হবে, বার্মায় জব্দ হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নিরুপদ্রব হবে। ইউরোপে রাশিয়া ভদ্র হয়েছে, পশ্চিম জার্মানী সবল হয়ে উঠছে, ফ্রান্স শক্তি ফিরে পাচ্ছে। সুতরাং, ভিয়েতনামে শান্তি এলে, আমেরিকার জয় হলে, পৃথিবীতে শান্তি আসবে।

যাঁরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের এই মার্কিন ভাষ্য গ্রহণ করেন না, তাঁরা ভিয়েতনাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেন। তাঁদের বিশ্বাস ভিয়েতনামে যুদ্ধ হচ্ছে মার্কিন ঐশ্বর্য এবং তাঁদের আশ্বাসে কিছু দক্ষিণ ভিয়েতনামীর সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামেরই স্বাধীনচেতা অধিবাসীদের। মার্কিনীদের ভিয়েতনামে উপস্থিতি এবং লোভী দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের সাহায্য দিয়ে পরভৃত সরকার চালাতে দিতে এঁরা অস্বীকার করছেন। এই যুদ্ধ দেশ-প্রেমিকদের স্বাধীনতা যুদ্ধ। উত্তর ভিয়েতনাম থেকে প্রথমদিকে এঁরা সাহায্য পেয়েছেন নামমাত্র, মার্কিন অত্যাচারের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকায়, এখন বেশিমাত্রায় সাহায্য পাচ্ছেন। কিন্তু যুদ্ধ চলছে দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের সঙ্গে পরভৃত দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের, উত্তর ভিয়েতনাম বনাম দক্ষিণ ভিয়েতনাম নয়। ১৯৫৪ সালের জেনিভা চুক্তির পর থেকে

আমেরিকা অনবরত অপপ্রচার করে করে ১৯৬৮-র এই পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

আমরা যারা ভিয়েতনাম নিয়ে আলোচনা করি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নরহত্যা, নারী-হত্যা, শিশুহত্যা, হাসপাতাল ধ্বংস, ক্ষেতখামার ধ্বংস, নাপাম মারা, গ্যাস ছোঁড়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে শিউরে উঠি, মার্কিনীদের কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানাই। যদিও, যুদ্ধ হলে হত্যা হবেই, ধ্বংস হবেই এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সভ্যতা ও বর্বরতার মধ্যে সীমা টানা অসম্ভব। সুতরাং যুদ্ধকে মেনে নিয়ে হত্যা ও ধ্বংস নিয়ে মায়াকান্নায় ডুবে গিয়ে আমরা মূল ব্যাপারটি বিস্মৃত হই। মূল ব্যাপার হচ্ছে আমেরিকা একটা বিরাট প্রতারণা চালিয়ে ভিয়েতনামে যুদ্ধ করছেন। এবং তা করছেন অকম্যুনিস্ট দেশের প্রেমে নয়, নিছক স্বার্থে, নিজের অর্থনৈতিক চক্রের চাপে পড়ে।

মার্কিনীদের বক্তব্য : দক্ষিণ ভিয়েতনামের ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট এবং উত্তর ভিয়েতনাম অস্ত্রবলে দক্ষিণ ভিয়েতনাম জয় করে, উত্তর ভিয়েতনাম দক্ষিণ ভিয়েতনাম এক করে আপন আধিপত্য স্থাপন করতে চান। কথাটি সত্য নয়, কারণ এন এল এফ এবং উত্তর ভিয়েতনাম বারবার বলে এসেছেন সেই ১৯৫৪ সাল থেকে যে, তাঁরা চান দক্ষিণ ভিয়েতনামে স্বাধীন নিরপেক্ষ প্রতিনিধিমূলক সরকার। যদি তখন, উভয় দেশ সংযুক্তি চান গণভোটের মাধ্যমে, তাহলেই সংযুক্তি হবে, নইলে নয়। মার্কিনীরা অবশ্য গণভোটের কথাটা বরাবর এড়িয়ে গেছেন।

এর মধ্যে কম্যুনিজম আসে কোথা থেকে? বিচার করতে গেলে দেখা যাবে, এন এল এফ অনেক ক্ষেত্রেই কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন নন। সেই হিসেবে উত্তর ভিয়েতনামের হো চি মিনও রাশিয়ার বা চীনের অন্ধ স্তাবক নন। এই অবস্থায় কম্যুনিজমের দোহাই পাড়া বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করা।

যাঁরা ভিয়েতনামে মার্কিন প্রচারে ভুলতে রাজি নন, তাঁদের বিশ্বাসের মূলে আছে এই যুদ্ধের প্রকৃতি। দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা স্বয়ং এই যুদ্ধে লিপ্ত না হলে, যুদ্ধ বহুদিন আগেই থেমে যেত।

তাছাড়া, কম্যুনিজম আটকানোর দোহাই পাড়া আরও নিরর্থক এই জন্য যে, কম্যুনিস্ট বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতি ভিন্ন রকম। তার জন্য মানসিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক প্রস্তুতি দরকার। ভিয়েতনাম কম্যুনিস্ট হলে ভারতবর্ষ কম্যুনিস্ট হয়ে যাবে, এটা পাগলের প্রলাপ।

সুতরাং মার্কিন প্রচারিত domino theory একটি বিরাট ধাপ্পা। আসলে, ভিয়েতনামে আমেরিকা নতিস্বীকার করলে, আমেরিকাতেই বিরাট পরিবর্তন অনিবার্য এবং তাই জনসন-প্রমুখ মার্কিনীরা এত দিশেহারা। আমেরিকার বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হল, পৃথিবীর যে-কোন ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থার পরিবর্তন ঘটলে আমেরিকা সেখানে যুদ্ধং দেহি বলে ঝাঁপ দেবেন। ভিয়েতনামে পরাজয় হলে এই পররাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়বে, ফলে ভেঙে যাবে আমেরিকার ধনবাদের অর্থনৈতিক কাঠামো, তাঁর বর্তমান কর্ণধারদের অবধারিত পতন তখন ঠেকান দুষ্কর হয়ে পড়বে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রকৃত রূপটি যাঁরা জানেন বলে দাবী করেন, তাবৎ বিশ্বব্যাপী সেই সব সোশ্যালিস্টরা কী করছেন? তাঁরা, অর্থাৎ ইংল্যান্ড, ইটালি, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশের সোশ্যালিস্টরা বলছেন, ভিয়েতনামে অন্যায় যুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু মার্কিনীরা এত শক্তিশালী, তাঁরা আমাদের কথা শুনবেন কেন? আমাদের কীইবা অস্ত্রবল, অর্থবল যে আমরা এন এল এফদের সাহায্য করতে পারি।

এটি ভ্রান্ত ধারণা। জনবল বা অর্থবলই একমাত্র শক্তি নয়। যে কোন একটি দেশ ধরা যাক। যথা ইংল্যান্ড। হ্যারল্ড উইলসন ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে যেভাবে জনসনকে সমর্থন জানান, সেটা সম্ভব হত কি, যদি ব্রিটিশ সোশ্যালিস্টরা সক্রিয় জনমত সৃষ্টি করে স্বাধীন ভিয়েতনামীদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করতে পারতেন। হ্যারল্ড উইলসন আপন স্বার্থে স্তাবক হতে পারেন, কিন্তু মূর্খ নন। প্রত্যেকটি দেশ আজ যদি দ্য গলের মতো ভিয়েতনামে জনসনের কার্যকলাপ নিন্দা করতে পারতেন, তাহলে প্রেসিডেন্ট জনসন হয়তো যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হতেন। কারণ, মার্কিনীরা আর যাই হোন নির্বোধ নন, তাঁরা যুদ্ধ করছেন টমাস পেইনকে জেফারসনকে শিখণ্ডী করে।

তাছাড়া ভিয়েতনামে জনসনের ক্রিয়াকলাপকে নিন্দা করা মানেই কম্যুনিস্ট বনে যাওয়া নয়। দ্য গল কম্যুনিস্ট নন, সোশ্যালিস্টও নন।

বিশ্বের সোশ্যালিস্টরা যদি সার্থক প্রতিবাদ করে আপন আপন দেশকে জনসন-বিমুখ করতে পারতেন, মার্কিনীদের স্বরূপ উদঘাটন করতে পারতেন, তাহলে আমেরিকার অভ্যন্তরেই যে আর-এক আমেরিকা আছে, তা শক্তিশালী হতে পারতো। এখন পর্যন্ত এই অন্য আমেরিকা অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ করছে। মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল, ছাত্র, অধ্যাপক, কবি, লেখক এবং নিগ্রোদের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ। এঁদের শক্তিশালী করে তোলা দরকার। জনসন দ্য গলকে পাগল বলে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু রবার্ট কেনেডি ইউজিন ম্যাকার্থীদের অত সহজে অস্বীকার করতে পারবেন না। দুর্ভাগ্য এই, রবার্ট কেনেডিরা যে-কোন কারণেই হোক ভিয়েতনামের যুদ্ধবিরোধিতা করে কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। তার জন্য অনেকাংশে দায়ী পৃথিবীর তাবৎ সোশ্যালিস্টদের সবল প্রতিবাদ করার অক্ষমতা। বারট্রান্ড রাসেল প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু ইংল্যান্ডের শ্রমিক দল কী করেছেন? নিজেদেরকে শ্রমিক দল, সোশ্যালিস্ট দল বলার অধিকার তাঁরা হারিয়েছেন। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই সোশ্যালিস্ট দল একইভাবে মিথ্যা আখ্যায় নিজেদের ভূষিত করছেন।

১৯০০ সালে ইংল্যান্ডের লেবার পার্টি গড়ে ওঠে। শ্রমিকদের একমাত্র পার্টি হিসেবে। পঁয়তাল্লিশ বছর সাধ্যসাধনার পর এই পার্টি সরকার গঠনের সুযোগ পান। তারপর ছয় বছর ধরে নাকি তাঁরা ইংল্যান্ডের ধনতান্ত্রিক কাঠামো অনেকটা পাল্টে দিয়েছিলেন। তাঁরা একমাত্র লোহা আর ইস্পাত ছাড়া আর যার যার দরকার সবেরই জাতীয়করণ করেছিলেন, ন্যাশনাল হেল্‌থ সার্ভিস চালু করেছেন, সর্বব্যাপী ইনশ্যুরেন্স গঠন করেছেন। এত করার পরও এই লেবার পার্টিকেই ১৯৬৪ সালের ভোটাভুটির সময় বলতে শোনা গেছে, ইংল্যান্ডের গরীবেরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। সোশ্যাল সিকিউরিটি নিয়ে যে এত হৈ চৈ, পরে দেখা গেল, ইওরোপের অনেক অ-সোশ্যালিস্ট দেশ তার চাইতে উন্নততর সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ-সুবিধে করে দিয়েছেন। দেখা গেল ন্যাশনাল ইনশ্যুরেন্স স্কীম ধনতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গেও মিশ খায়, সোশ্যালিজমের মূল কথা ধনীদরিদ্রের প্রভেদ ঘুচিয়ে দেওয়া, তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ এতে দূর হয় না, যদিও মধ্যবিত্তদের এতে সুবিধেই হয়েছে। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র হয়েছে, তবে মধ্যবিত্তের কল্যাণ। ১৯৬০ সালে দেখা গেল দেশের শতকরা ৫ ভাগ লোক দেশের ৭৫ ভাগ ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন। দেশের আয়ের শতকরা ৯২ ভাগ ওই ৫ ভাগের কবলে।

বর্তমান লেবার সরকারের আমলে এই সোশ্যালিজমের ধাপ্পা আরও বেশি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথমে wage freeze, পরে devaluation-এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক

কাঠামো হয়তো একটু কম নড়বড়ে হবে, কিন্তু তাতে সোশ্যালিজম আসবে না। বরং এই দুই প্রক্রিয়ার দেশের সবচেয়ে কম মাইনে পাওয়া লোকের দুর্দশা আরও বাড়ছে, যদিও সেই সঙ্গে দেশের উৎপাদন ক্ষমতাও বেড়েছে। অর্থাৎ ধনীর আরও ধনবৃদ্ধি হচ্ছে, গরীবের কোন সুরাহাই হচ্ছে না।

আমেরিকার মুখাপেক্ষী ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির যাঁরা কর্মকর্তা তাঁদের, আমেরিকার ধনতান্ত্রিকদের মতোই, একমাত্র লক্ষ্য : দেশের জাতীয়-উৎপাদন বাড়ানো। তার ছিটেফোঁটাও অবশ্য শ্রমিকদের স্বার্থে নিয়োজিত হচ্ছে না। ন্যাশনাল হেলথ-এর চাঁদা কমিয়ে, পেন্সনের মাত্রা বাড়িয়ে, বাড়ি ভাড়া আইন সংশোধন করে দোকান সাজানোই সার। এর প্রমাণ ন্যাশনাল প্ল্যান। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত GNP করা হয়েছে ৮,০০ কোটি পাউন্ড। GNP-এর ১০০ কোটি পাউন্ড নিয়োজিত হবে সোশ্যাল সার্ভিসে। বাড়িঘর তৈরিতে ব্যয় হবে ১৯৭০ সালে মাত্র শতকরা ৩ ভাগ, হেলথ সার্ভিসে ৪ ভাগ। টোরিরা কিন্তু এর থেকে বেশি ব্যয় করেছিলেন। বেশির ভাগ ঐশ্বর্যই অবশ্য যাচ্ছে বড়লোকের পকেটে। যার একটা নিদর্শন : ১৯৬৩-৬৪ সালে স্যার এ্যালেক ডগলাস-হোমের মন্ত্রিরা যে মাইনে পেতেন, উইলসনের মন্ত্রিরা তার দ্বিগুণ নিচ্ছেন ১৯৬৭-৬৮ সালে।

উইলসন অবশ্য একটা কাজের কাজ করছেন। তাঁর লেবার দলের বামপন্থীদের একেবারে অকেজো করে দিয়েছেন। এতে অবশ্য একটা কথা স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে লেবারিজম আর সোশ্যালিজম দুটো আলাদা জিনিস।

এমন কেন হল? উত্তর পরিষ্কার। ব্রিটিশ রাজনীতিতে ক্ষমতালাভের একটিই গতি, পার্লামেন্টে ক্ষমতা লাভ। পার্লামেন্টে ক্ষমতা এঁরা নিয়ে, যাঁরা সত্যসত্যই দেশ চালান, সেই আমলাতন্ত্রের হাতের পুতুল বনে যান। কোন আমলাতন্ত্রই ইজ্‌ম্‌-এর ধার ধারে না, তাঁদের লক্ষ্য নিজ স্বার্থোন্নতি। দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল না হতে পারলে কোন দেশেই আমলা হওয়া যায় না। ইংল্যান্ডের সোশ্যালিস্টদের ধারণা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আয়ত্তে আনতে পারলে দেশের শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতি আনা সম্ভব হবে। তাঁদের ধারণা রাষ্ট্রকে ইচ্ছেমতো চালানো যায়। গত সত্তর বছর ধরে, যে পার্টিই সরকার গঠন করছেন, সরকার গঠনের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বড়ো বড়ো কথা বললেও, সরকার গঠন করার পর যে চরম রক্ষণশীল হয়ে যাচ্ছেন, তা থেকেও কিন্তু ব্রিটিশ সোশ্যালিস্টদের শিক্ষা হচ্ছে না।

পৃথিবীর অন্যতম উন্নত সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্রের এই হাল! নবজাগ্রত সোশ্যালিস্টরা অবশ্য অন্যতর প্যাঁচে পড়ছেন। ঔপনিবেশিকরা নিজেদের স্বার্থে সে-দেশে কিছু কিছু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আধুনিকতা এনেছিলেন, আফ্রিকার অধিবাসীদের কিছু কিছু ক্ষমতাও বিলিয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে যেমন রাজনীতিতে সচেতন লোক গড়ে উঠছিলেন, তেমনি তৈরি হচ্ছিলেন ঔপনিবেশিক-পুষ্ট আমলাতন্ত্র, কোর্ট-আদালতের বুদ্ধিজীবী, মিলিটারি এবং সওদাগরি অফিসের ম্যানেজারের দল। এই শেষোক্ত দলেরা যত না আফ্রিকান হলেন, তার থেকে বেশি হলেন এ্যাংলো-আফ্রিকান বা ফ্রাঙ্কো-আফ্রিকান বা বেলজো-আফ্রিকান। স্বাধীনতা পাওয়ার পর এঁরাই রাজনৈতিক ক্ষমতা পেলেন, কারণ বিদ্যাবুদ্ধির জোর এঁদেরই বেশি। আফ্রিকার বহু দেশেই, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এঁরাই সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন সরকার স্থাপন করেছেন।

এনক্রুমা ঘানায় এঁদেরই হাতের পুতুল হয়ে পড়েছিলেন। সোশ্যালিজম সেখানে সম্ভব ছিল, যদি রাজনৈতিক কাঠামোগুলোর হাতে অধিকতর ক্ষমতা ছাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব

হত। তাঁর Convention People's Party আপাতদৃষ্টিতে লেনিনীয় পদ্ধতিতে গঠিত মনে হলেও, মূলত এটা হয়ে উঠল নিম্ন মধ্যবিত্তের রোগাক্রান্ত। এর ডিরেক্টরেট, পার্টির সেন্ট্রাল কমিটিতে একমাত্র কথা বলতে পারবেন এনক্রুমা স্বয়ং, আর সবাই তাঁর কথা শুনতে বাধ্য হবেন। পার্টির বার্ষিক অধিবেশনগুলো হয়ে উঠল জাম্বোরি বিশেষ। রাষ্ট্রের নতুন আমলাদের তো এনক্রুমা ঠেকাতে পারলেনই না, উপরন্তু তাঁর পার্টিতে সকলের বিনাবাধায় সদস্যপদ লাভ করতে থাকায়, পার্টি বলতেও কিছু রইল না। যার ফলে আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন থাকল না, কৃষকসভা থাকল না, সকলে ওই এক CPP-এর কলেবর স্ফীত করে আপন আপন চরিত্র নষ্ট করলেন। এত বড় পার্টি দিয়ে কাজ হয় না, তার আসল যে directorate সেটা হয়ে উঠল এনক্রুমার পরম মুখাপেক্ষী। যার ফলে পার্টিতে অগ্রগামীর দল বলে কিছু রইল না। অর্থাৎ রাষ্ট্র ও পার্টির মিলন ঘটিয়ে এনক্রুমা একদিকে যেমন পার্টির কর্মক্ষমতাও নষ্ট করলেন অপরদিকে রাষ্ট্রক্ষমতাও তুলে দিলেন আমলাদের হাতে। এর ফল, ঘানায় এনক্রুমার পতন ঘটলেও দেশে তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না, বিদ্রোহ তো দূরের কথা। জাতীয় স্বার্থের প্রতিভূ করতে গিয়ে এনক্রুমা তাঁর CPP-কে বৃহৎ কলেবর একটি পার্টি বানিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তার সদস্যদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে, বিপ্লবাত্মক সংগঠন করতে না দিয়ে, কার্যত সেটাকে একনায়কতন্ত্রে পরিণত করেছিলেন।

ঔপনিবেশিকতা-মুক্ত স্বাধীন দেশগুলোতে সর্বত্রই সোশ্যালিজমের প্রায় একই দশা।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

A Survey of Folklore Study in Bengal. *By* Sankar Sen Gupta. Indian Publications. Calcutta. Rs. 20·00.

পথিকৃৎমাত্রেই কতকগুলি বাধা ও সমস্যার সম্মুখীন হন্। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের একক-যাত্রীদের প্রায়শই নিঃসঙ্গ, নিরুদ্ধ ও অনুযোগপ্রবণ হতে দেখা যায়। কখনও কখনও আত্মঘোষণা বা আত্মরতির পীড়াদায়ক রোমন্থনে তাঁদের রচনা আগ্রহী পাঠক-মনকে ব্যথিত করে।

অনূ্যন একশত বৎসর পূর্বে পাশ্চাত্যদেশে সমাজবিদ্যার যে শাখা-বিজ্ঞানের অঙ্কুরোদ্গম, ভারতের মাটিতে যার এখনও শৈশবাবস্থা, সেই লোকায়ন বা লোকবৃত্তকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা লেখক প্রায় বারো বৎসর পূর্বে শুরু করেন।

বাংলাদেশের লোকায়ন চর্চার একটা গবেষণা ফল এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কাজেই গ্রন্থকার প্রথমেই প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং গ্রামীণ ও নগর জনবিভাজনের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি মানচিত্র ও সংখ্যাযুক্ত তথ্য-তালিকাও এখানে সংযোজিত। সমাজবিদ্যার অন্যান্য শাখায় এ-সবের প্রয়োজন স্বীকার করলেও বর্তমান আলোচনায় বাংলার প্রাগিতিহাসজনিত তথ্যাদি, মানচিত্র, গমনাগমন, পথরেখা, এবং বর্তমানকালের আদিবাসীদের অবস্থানসূচক রেখাচিত্র পাঠককে অনেক বেশি বিষয়াশ্রয়ী হতে সাহায্য করত।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি সম্পর্কে বিশদ্ আলোচনা প্রয়োজন। কারণ যে-বিষয় নিয়ে চর্চার

সাম্প্রদায়িক প্রশ্রয়নে আমরা নিজেই তার মুখোপাধ্যায় না হলে সমস্ত আলোচনাই অবান্তর হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এক কথায় ফোকলোর নামক বস্তুটির সংজ্ঞা কি? লেখক নিজে এ-বিষয়ে কতখানি স্থির-সিদ্ধান্ত এই অধ্যায় থেকে পাঠকের সে-বিষয়ে সন্দেহ জাগ্রত হতে পারে। কারণ তিনি বলেছেন, Folklorists as is wellknown are confronted with great many a problem as to what is folklore. তারপর তিনি জনৈক মার্কিন পণ্ডিতের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, 'The problem of what is, and what is not, folkore is also present when we consider the disciplines of anthropology, sociology ...ect. অবশেষে তিনি কতকটা সিদ্ধান্তবাচক সূত্রে বলেছেন যে folkore is the accumulated knowledge of homogeneous people tied together not only by common physical bonds, but by emotional ones, giving unity and individual distinction. তাহলে যে কোন জাতি-অধিজাতির কৃষ্টির সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই। অথচ পাশ্চাত্যদেশে একে কেন্দ্র করে একটা পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে; অন্য কোন শব্দ যথেষ্ট অর্থবহ না মনে হওয়ায় এ-বিজ্ঞানের অন্যতম উদ্গাতা উইলিয়াম জন টমাস যখন ১৮৪৬ সালে *Athenæum* পত্রিকায় এই শব্দটির গোড়াপত্তন করলেন তখন সকলে এটি গ্রহণ করলেন কোন্ সংজ্ঞার ভিত্তিতে? লেখক এ-সব ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্যে না গিয়ে শেষ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে Folklore, in fact, is the pragmatic expression of psychology of man. সংজ্ঞাটি বেশ ধন্যাত্মক ও গ্রাসভারী নিঃসন্দেহ, কিন্তু সাধারণ পাঠক ত নয়ই পণ্ডিতদের কাছেও যথেষ্ট প্রাঞ্জল হবে কিনা সন্দেহ। আমাদের প্রশ্ন হল, লেখকের মত কৃতবিদ্য গবেষক এ-বিষয়ে সঠিক আলোকপাতে দ্বিধাগ্রস্ত ও অপরাগ কেন। এর মূল নিহিত আছে সমগ্র গ্রন্থে। ফোকলোর বিজ্ঞান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে জার্মানীতে (ওঁরা বলেন Volkskunde), চর্চা হয়েছে ফ্রান্স ও বৃটেনে, এ-যুগে পরিবর্ধিত হয়েছে রুশিয়ায়। মার্কিন দেশে আজ এর ব্যাপক চর্চার আয়োজন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সে কেবল কৃষ্টির ব্যাপারে অগ্রগামিতা জাহির করার উন্মাদনা ছাড়া কিছুই নয়, তাছাড়া মার্কিন দেশে নিষ্ঠাবান গবেষকদের সামনে বড় বাধা তার সমাজ। সেখানকার আদিম অধিবাসীরা আজ নিশ্চিহ্ন। নতুন সমাজের folk people ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে আমদানীকৃত। তারা যে ঐতিহ্য বহন করে এনেছে শ্রেণীসংঘর্ষে তা ছিন্নভিন্ন।

মনে রাখা প্রয়োজন, নগর-সভ্যতা ও সংস্কৃতি আবির্ভূত হওয়ার গোড়ারদিন থেকেই সর্বদেশে 'পল্লী সংস্কৃতি' চর্চাও হয়ে আসছে। বিজ্ঞান হিসেবে ইউরোপে এর চর্চার প্রারম্ভিক কালে নানা নামে একে বিশেষিত করা হ'ত। কেউ বলতেন popular antiquity, কেউ বলতেন rural culture, rural beliefs, peoples culture, popular tales, rural sayings ইত্যাদি। এই চর্চার ধারাবাহিকতার মধ্যে এমন একটা বিষয়ের প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল যাকে কেবলমাত্র popular বা rural নামে ভূষিত করলেই সব বলা হয় না। গ্রামীণ বা পশ্চাৎপদ মানুষের মধ্যে এর সতেজ গন্ধ পাওয়া গেলেও দুনিয়ার সব মহৎ নগর-সভ্যতা, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতেও এরা মূর্তিমান। শুধু কারিক অবস্থানেই নয়, সর্বদেশের চিরায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এরা বৈভব প্রদান করে চলেছে এবং এরা চলমান। অর্থাৎ পণ্ডিতরা অনুভব করলেন এর মধ্যে একটা সর্বজনগ্রাহ্যতা আছে, এবং এর প্রবাহ অফুরন্ত। পল্লী-সংস্কৃতি এবং গ্রাম ও নগরের পশ্চাৎপদ মানুষের মধ্যে এদের সজীব অবস্থান দৃষ্টিগ্রাহ্য। এর সৃষ্টিকর্তা কে? সমবেত মানুষ, বহুজনের সুখ সবল

চিন্তার অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞতার সমবেত ফল। আমাদের শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এ চিন্তা কি করে সম্ভব, আমরা তো জানি সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত এমন কি বাক্য বা বাক্যাংশ বিশেষ এক ব্যক্তিই সৃষ্টি করে। বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও এক বিষয়ে পণ্ডিতরা একমত হলেন, এই বস্তুটি Unanimous Culture এবং Collective Creation। কি নামে একে বিশিষ্ট করা যায়, ইংরেজ পুরাতত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম টমাস বাতলালেন Folklore কথাটি। বহু আলোচনার পর গৃহীত হল। সেই থেকেই প্রাচীন (ancient) সংস্কৃতি, পল্লী (rural) সংস্কৃতি বা ভাবধারা folklore থেকে ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে গ্রীম-ভ্রাতৃদ্বয়, থিওডোর বেনফী, কসকী, ক্রুসটন, বারটেন ও জ্যাকবস-এর বিভিন্ন রচনায়। শ্রীসেনগুপ্ত এঁদের বক্তব্য উপস্থিত করলে তরুণ গবেষকরা লাভবান হতেন।

ফোকলোর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে, যে শ্রমপ্রক্রিয়া চতুষ্পদী মানুষকে মেরুদণ্ডের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিপদী হতে সহায়তা করেছিল তা-ই মানুষের সংস্কৃতিরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। কিন্তু আদিম সংস্কৃতির অধিকাংশ ইতিহাসবিদরা শ্রমপ্রক্রিয়া ও প্রাচীন মানুষের সমাজ-জীবনের ঘটনাবলীজাত বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাধারার ন্যূনতম চিহ্ন সম্পর্কে নীরব। জনৈক লোকায়নিক বলেছেন, These signs have come down to us in the form of fairy-tales and myths, which carry memories of the work of taming wild animals, discovering herbs and inventing tools. তাই data of folklore, the peoples oral art, or the evidence provided by mythology on the whole is a reflection of natural phenomena, of the struggle against Nature, and a reflection of social life, in broad artistic generalisation. কিন্তু এই সমগ্র উপলোধে সমবেত কর্মপ্রয়াসের চিহ্নও বর্তমান। এই কারণে লোকায়নিকরা বলেন, Art lies with the individual but it is the collective that is capable of creativity. সমবেত কর্মপ্রয়াসজাত বলেই ফোকলোরে সর্বজনগ্রাহ্যতাও এসেছে। তাহলে এর আবির্ভাব কালে সমাজকাঠামো কি ছিল? সমাজকাঠামোও নিশ্চয়ই সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। সমাজতাত্ত্বিকদের ভাষায় একে বলা হয় শ্রেণীহীন সমাজ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এবং ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করেও এই আদিম শ্রেণীহীন মানুষেরা তাদের উত্তরাধিকারসূত্রেপ্রাপ্ত সংস্কৃতিকে যে কেবল লক্ষ্মীন্দরের মত জীইয়ে রেখেছে তাই নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কলুষ কমবেশি স্পর্শ করলেও নব অভিজ্ঞতা ও চেতনায় নতুন নতুন সর্বজনগ্রাহ্য সংস্কৃতি নিজেদের গণ্ডীর মাঝে সৃষ্টি করেছে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা আসার আগে পর্যন্ত এ ধারা মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হলেও স্তব্ধ হয়নি। যন্ত্রসভ্যতার আগমনে শ্রেণীগুলি যেমন অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে, শ্রেণী সংঘর্ষও তেমনি তীব্র হয়েছে। তাহলে লোকায়নিকদের ভবিষ্যৎ কি! folkloreই রইল না, তাহলে folklorist থাকবে কি করে? এখানেই ইউরোপের বনেদী লোকায়নিকদের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের মার্কিন লোকায়নিকদের পার্থক্য। জার্মান-ফরাসী-বৃটিশ বস্তুতান্ত্রিক লোকায়নিকরা বলেন যে নগর-সংস্কৃতি ছিন্নমূল নয়, ব্যাপক লোকসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে আহরণ করেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগর-সংস্কৃতিগুলির জন্ম। এবং এ প্রক্রিয়া অতীতেও যেমন ছিল, আজও তেমনি। এরই ফলে, বেদব্যাস বাল্মিকী হোমার কালিদাস সেক্সপীয়ার গোটে, তলস্তয় এবং আমাদের দেশেও চণ্ডীদাস কীর্তিবাস কাশীরাম বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র মানিক প্রমুখের

আবির্ভাব। এঁদের প্রত্যেকের চারিত্রিক গঠন ফোকলোরের অন্তর্নিহিত উপাদানে প্রভাবিত বলেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজেও সর্বজনগ্রাহ্য হতে পেরেছেন।

উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তমান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা না থাকলে আমরা মার্কিন পণ্ডিতের ন্যায় what is folklore and what is not বিষয়ে জটিল আবর্তে পড়ব এবং ব্যাপক জনসমাজে এই বিজ্ঞানের মূল প্রতিষ্ঠায় অক্ষম হব। লেখক এই দৃষ্টিকোণ উপস্থিত করতে না পারলেও দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনায় তরুণ গবেষকদের জন্য বিভিন্ন লোকায়নিক উপাদানসমৃদ্ধ বাংলা দেশের অজস্র কর্মপ্রয়াসের সুসংবদ্ধ ও শ্রেণীবিভক্ত তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তবে মূল ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল না হওয়ায়, লেখক চাইলেও, মঙ্গলকাব্য প্রণেতা থেকে সমরেশ বসু পর্যন্ত সকলকেই লোকায়নিক বলে তরুণ ও অদক্ষ গবেষকের ভ্রান্তি জন্মাতে পারে। এবং আর একটি বিষয়ে লেখকের সচেতন হওয়া উচিত ছিল, লোকসাহিত্য ও শিক্ষা আলোচকমাত্রই লোকায়নিক নন। রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য আলোচনা করেছেন রসতত্ত্বের বিচারে; তিনি লোকায়নিক বা ফোকলোরিস্ট হলে কবিগানের অভদ্র বা অশ্লীল বিষয়বস্তু সামন্ততান্ত্রিক রসে রঞ্জিত বলে বিচার করে এর আঙ্গিককে আদিম বাংলা নাটকের, যা গ্রীক ডায়ালগের সমপর্যায়ভুক্ত, শেষ চিহ্ন বর্তমান দেখতে পেতেন। এই সচেতনতার অভাব থাকায় লালবিহারী দে রিচার্ড টেম্পলের অনুরোধে "ফোকটেল্‌স অব বেঙ্গল" সংকলন করে বিশ্ববিশ্রুত হওয়া সত্ত্বেও 'নটে গাছটি মুড়লো' ছড়া a string of nonsense purposely put together to amuse children বলেই খালাস হয়েছেন, আদিম বাঙালীর কার্যকারণ সম্ভূত দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছেন। ইদানীংকালে বাংলা দেশে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার পটভূমিকায় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা দরকার।

বর্তমান গ্রন্থে বগ্‌স-এর ফোকলোরের শ্রেণীবিন্যাসের দীর্ঘ তালিকাটি মূল্যবান। তবে তাঁর বিভাগ ঠিক নয়, যদিও কোন কোন বিদেশী পণ্ডিত লোকায়নিকদের এই বিভাজন পছন্দ করেন। কোন পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানেই এই বিভাজন চলে না। পরীক্ষিত সত্য সর্বজনগ্রাহ্য হতে বাধ্য। তিনি যাকে বিভিন্ন সত্যাবলম্বী বলেছেন তার সবটা মিলিয়েই এই বিজ্ঞানের বিকাশ।

তরুণ রায়

Eros In The Cinema. *By* Raymond Durgnat. Calder and Boyars London. 42*s.*

চ্যাপলিন লিখেছেন, মানুষের জীবনে প্রেম সবচেয়ে বড়ো তাগিদ নয়; বরং ক্ষুধা, শীত ও দারিদ্র্যের লজ্জা জীবনে অনেক বেশি অপরিহার্য। সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে চ্যাপলিনের আরো এটা-সেটা মতামতের মতো এ-ও হয়তো তাঁর একটা শৈশবার্জিত ধারণা —ভিক্টোরীয় সমাজে যার সূত্রপাত বলা যেতে পারে। তবে এ-কালে ফ্রয়েড-ইয়ুং-এর তর্ক-বিতর্কে আলোড়িত জগতেও মনে হয় প্রেম ও যৌনাবেগকে তার যথাযথ মর্যাদা দিতে লেখকরা কুণ্ঠিত। এঁদের মধ্যে একদল যুক্তিনির্ভর মানুষ আছেন যাঁদের দৃষ্টিতে জীবন

যাদেরই জন্ম, রমণ, মৃত্যুর ঘূর্ণাবর্ত, প্রেম অথচ অন্তহীন অজানতের পরিক্রমা—অবসাদ যার একমাত্র ফলশ্রুতি। এঁরা এক স্থবির বিষাদের মধ্যে বাস করেন। আবার ঠিক বিপরীত মনোভঙ্গির লেখকরাও আছেন যাঁদের দৃষ্টিতে গোলাপ যেমন সুন্দর, শিশু ও ঈশ্বর যেমন সুন্দর, প্রেম-ও সেরকম সুন্দর। ডি. এইচ. লরেন্স এ'দের প্রতিনিধিস্থানীয়।

দৈহিক ক্ষুধাকে একালে সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে সাহিত্যে নয়, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে দৈহিক ক্ষুধার অর্থ শুধু সেই ক্ষুন্নিবৃত্তির শারীরিক উপায় নয়; বরং তা জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে নির্মোহ কৌতূহল, যা একই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক। George Bataille তাঁর *Eroticism* গ্রন্থে লিখেছেন—Eroticism, unlike simple sexual activity is a psycholigical quest independent of the natural goal, reproduction and the desire for children। যৌনতার এই পরিব্যাপ্ত রূপ এবং সেইসঙ্গে তার সামাজিক ও নৈতিক বাধা, তার নানা সমস্যা এবং নানা বিকৃতি——চলচ্চিত্রের আদিযুগ থেকে একাল পর্যন্ত তার একটা মোটামুটি ধারাভাষ্য র‍্যামন্ড ডুরনাট আলোচ্য বইটিতে দিতে চেয়েছেন। বিষয়বিস্তারে লেখক কখনো নিছক ঐতিহাসিকের ভূমিকা গ্রহণ করেননি। বিভিন্ন অধ্যায়ের নামকরণ থেকেই তাঁর দৃষ্টিকোণগুলি হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

অন্যান্য অভিজ্ঞতার মতোই যৌনতা অভিব্যক্ত করতে চলচ্চিত্রে বিভিন্ন পরোক্ষ কৌশলের সাহায্য নিতে হয়। সেই সূত্রে প্রতীকের ব্যবহার অপরিহার্য। তবে অতিরিক্ত মস্তিষ্ক-নির্ভর হওয়ার ফলে প্রতীক হয়তো অনুভূতির তীব্রতাকে কিছুটা অবদমিত করে। যথার্থ প্রতীক মনন এবং হৃদয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য সঞ্চার করতে সক্ষম। চলচ্চিত্রে যৌনপ্রতীক এতো বেশি ব্যবহৃত হয়েছে যে তার তালিকা প্রস্তুত করতে একটি পঞ্জিকা প্রয়োজন। এখানে আমরা বার্গম্যান ও বুনুয়েলের কিছু ছবি দেখেছি--যেখানে যৌন-প্রতীকের ছড়াছড়ি। পোলানস্কির Knife in the Water-এ একটি ছুরির অকল্পনীয়ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এক দম্পতির আত্মপ্রবঞ্চনা এবং অধিকারবোধকে বিদ্রূপ করতে; ছুরিটি যৌনতার শাণিত প্রতীক। লেখক একটি সার্থক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন Franju-র La Premiere Nuit থেকে। স্বপ্নের মধ্যে একটি বালক ও একটি বালিকা পাশাপাশি চলন্ত দুটি ট্রেনের কামরা থেকে পরস্পরকে লক্ষ্য করতে দেখা যায়। কখনো এ ট্রেনটি বেশি এগোয়; কখনো অন্যটি। শেষে অকস্মাৎ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে দুটি ট্রেনই দুই টানেলের মধ্যে ছিটকে যায়। এই স্বপ্নদৃশ্যটি একটি অনুচ্চারিত যৌনাবেগে আন্দোলিত, কারণ ট্রেন দুটির ছন্দোময় বিষম-গতির সঙ্গে কোথায় যেন দুটি পতঙ্গের পাখার-ভাসা যৌনক্রিয়ার নিখুঁত সাদৃশ্য বর্তমান।

সমাজ ও যৌনতার চিরন্তন প্রশ্নটি অসামান্য বৈদগ্ধ্য ও রসগ্রাহিতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে Cupid Vs the Legions of Decency নামক পরিচ্ছেদে। চলচ্চিত্রে ডাইনীতন্ত্র ভ্যামপায়ারের কাণ্ডকারখানা--এসবের আলোচনাসূত্রে পাঠককে প্রবৃত্তি বনাম সামাজিক অবদমন, এই মৌল সমস্যার একেবারে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখক কার্ল ড্রেয়ারের ১৯২৮ সালে তোলা The House of Wrath ছবিটি বিশ্লেষণ করেছেন। ছবিটির পটভূমি মধ্যযুগের ইয়োরোপে। মার্থা নামে একটি জড়বুদ্ধি বৃদ্ধাকে ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে মারা হয়। শহরের প্রবীণ ধর্মযাজক তরুণী এ্যানা-কে বিবাহ করেন। যাজকের মা তার পুত্রবধূকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে এবং যাজক নিজে সারাদিন বইয়ের ভিতর ডুবে থেকে মৃত্যুর জন্য নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে ব্যস্ত থাকেন। এ্যানা যাজকের প্রথম পক্ষের পুত্রের প্রেমে পড়ে; এবং এ-কথা প্রকাশ হলে মানসিক আঘাতে তার স্বামীর

মৃত্যু ঘটে। শবাধারের পাশে বালকের মা তার পুত্রবধূকে ডাইনি বলে অভিযুক্ত করে; ক্রমশঃ চার্চ কাউন্সিল, শহরের লোক, এ্যানার প্রেমিক এবং এ্যানা নিজেও সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করে সে ডাইনি। ছবির শেষে দেখা যায় শহরের কেন্দ্রস্থলে আরেকটি ডাইনীকে পোড়াবার উদ্যোগ শুরু হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ, সংযম এবং কঠোরতার দেবীকে প্রকাশ্য সমর্থন করে দৈহিক স্ফূর্তিকে শ্বাসরুদ্ধ করার চলন্ত চির-প্রয়োজন। শেক্সপীয়রের *Twelfth Night*-এ ম্যালভোলিও-র মুখে পিউরিটানিজমকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। মার্লো তাঁর *Edward II* নাটকেও শুচিবায়ুগ্রস্ত সমাজকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি। Witch এবং Vampire আসলে সেইসব রহস্যময়ী যাদের স্বাভাবিক যৌনতা এবং মানসিক স্বাধীনতা এলিজাবেথীয় অথবা জ্যাকোবীয় নীতিবাগীশদের চোখে কাঁটার মতো অস্বস্তিকর।

এইভাবে চলচ্চিত্রে প্রবৃত্তির প্রশ্নকে নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। অতি সরল এবং প্রাত্যহিক পরিস্থিতি থেকে তিনি যৌনতার ইঙ্গিত আবিষ্কার করেছেন। অবশ্য তার ফলে কখনো সখনো তাঁর আলোচনায় যে ঈষৎ ভারবৈষম্য দেখা যায় নি এমন নয়। জাঁ-লুক গদারের A Bout de Souffle সম্পর্কে তাঁর আলোচনাটি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে—যেখানে ছবির নায়কের (জাঁ-পল বেলমঁদো অভিনীত) স্বাধীনতা-রক্ষা এবং স্বাধীনতা-অর্জনের সংগ্রামকে (যা প্রত্যক্ষভাবেই সার্ত্রীয় চিন্তার প্রতিধ্বনি) লেখক অবদমিত যৌনতার সূত্রে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। এই বিশেষ সূত্রটিকে প্রায়ই কিছু বিপজ্জনকভাবে টানাটানি করা হয়েছে—যেমন রবার্ট এলড্রিচ পরিচালিত Kiss Me Deadly ছবির বেলা। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখক ব্যক্তিনিরপেক্ষ তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ প্রয়োগ করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য লেখক যে প্রচুর স্থিরচিত্র ব্যবহার করেছেন তা শুধুমাত্র অলঙ্কার হয়ে না থেকে তাঁর আলোচনাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে।

প্রসঙ্গতঃ, বার্গম্যানের The Virgin Spring সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য উল্লেখ করে বর্তমান আলোচনায় ছেদ টানা যেতে পারে। এক ধর্মভীরু যাজকের কিশোরী কন্যাকে নির্জন অরণ্যের ভিতর কয়েকজন মেষপালক ধর্ষণ ও হত্যা করে; তারাই না-জেনে রাত্রির জন্য আশ্রয় নেয় যাজকের গৃহে। যাজক এঁদের পরিচয় জানতে পারেন এবং তাঁর কন্যার হত্যাকারীদের (তাদের মধ্যে একজন নিরপরাধ বালক) নির্মমভাবে হত্যা করেন। অর্থাৎ যৌন অপরাধ মানুষের হৃদয়ে যে উদ্দাম প্রতিহিংসাবৃত্তি সঞ্চার করে, খৃষ্টের বাণী 'হত্যা করিও না' তার সামনে হাস্যকরভাবে দুর্বল—এই হয়তো ছবিটির অন্যতম বক্তব্য। ধর্ষণ ও নারীহত্যার তুলনায় শিশুহত্যাকেও মানুষ অক্লেশে ক্ষমা করতে পারে। লেখক মন্তব্য করেছেন So, after all, rape does enrage us more than murder, virginity is more sacred to life—once we abandon our reasonable point of view that sex doesn't really matter much.

যৌনতার এই গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে পৃথিবীর নবীনতম শিল্পের সরব বিদ্রোহকে লেখক সাফল্যের সঙ্গে বিধৃত করেছেন।

সুজিত মিত্র